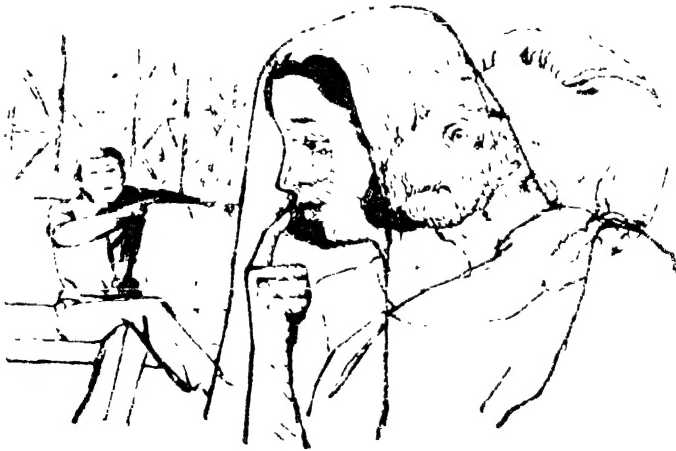


১৯। খুনী। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৩৬—২৪৬
২০। একটি সূত্র (বড় গল্প)।	
বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২৪৭—২৬৬
২১। আমার প্রিয় সখী (বড়গল্প)। সন্তোষকুমার ঘোষ	২৭০—২৯৩
২২। মংথ্রাজঃ। জরাসন্ধ	২৯৯—৩০৭
২৩। একটি নারী হত্যাকাণ্ডের কিনারা।	
ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল	৩০৮—৩১৭
২৪। খুনচুরি। সুধাংশু কুমার গুপ্ত	৩১৮—৩২৭
২৫। কে যেন। তারা প্রণব ব্রহ্মচারী	৩২৮—৩৩৮
২৬। ছিন্নান্বেষী ইন্দ্রনাথ। অদ্রীশ বসু	৩৩৯—৩৫০
২৭। মন্ডল বাড়ীর মৃত্যু রহস্য। প্রবুদ্ধ	৩৫৪—৩৫৬

মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩৬০



সত্যোৎকৃষ্টতার ঘোষের ভূমিকা

রহস্য গল্প :—যার ডাক নাম গোয়েন্দা কাহিনী। নাক-উচু সাহিত্যের সমাজে ভদ্র কুলান। ঈদানাং এই তার পরিচিতি। লোকের মন পায় অথচ মন পায় না। অপরাধটুকি অপরাধমূলক রচনার, না আমাদের অনেকের ভ্রান্ত-উদ্ভ্রান্ত বসবোধ আর কচির? ঠিক ঠিক যাচাই একালে হয়তো ক'রে উঠতে পারিনে। তাতে ঐ ধরনের লেখা কি ঠকে? না। বরং আমরা আমাদেরই চোখ ঠারি, তলে তলে ঠকাই। যেমন বাড়িতে কেউ এল তো অমনই তাকে লাগাতে ডাক-সাইটে খান-ইট-মারকা একটা ওজনদার বোঝা বহিকে বোরখা মুখ-ঢাকা দিলুম। যাতে ভিজিটারের মনে একটা সেলামের হাত আপনা থেকেই ওঠে আর নামে। অথচ যদি প্রশ্নে চড়ি, (প্রশ্ন? দূর ছাই, এমনাক ট্রেনেও যদি লম্বা পাড়ি দিতে হয়) তবে নিখাত নিখালার একটা ছমছমে বই—আবল্‌ স্ট্যানলি গারডনার অথবা নিক্‌ কারটার তো নিক্‌ কারটারই মই, আজকাল পেপার বাকের কল্যাণে এ সব শব্দনসঙ্গী একটু শস্তাই বলতে হয় বৈকি! রোমাঞ্চ, পুলক, ভয়, বিস্ময়, কী হয়, কী হয়, এই কোতুলক আর দরদর ঘামই সব। বিনিময়ে বড়ো জোর পাঁচ, সাত কি দশ টাকা নগদ দাম।

এইখানেই আমাদের আশঙ্কণ। তবু আমরা মূলটাই বুঝি ভুলে যাই। সাহিত্য-সমাজপতিদের উচ্চ-কপালে চাউনি না থাকলে বহুস্ত-গল্প হয়তো, ব্রাত্য বা পাতত বল গণ্য হত না। আর দশ পাঁচটা ভালো-মন্দ-মাকারি লেখার পাশাপাশি তার পাত পড়ত। যে-বর্ণাশ্রম দাঁখি, সেটি পরবর্তী কালের।

নইলে জীবন থাকে, জীবন যায়। আঘাত সয়েও থাকে, আবার অপঘাতে যায়।

গোয়েন্দা—প্রথম (১)

এই বিচারে জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কোনও তফাত, কোনও মাথা-তোলা চীনের প্রাচীর নেই। একাকার, সব একাকার। আর তাই বুকি আঁদ মানুষও মা-মাটা জীবন আর তার ধাপনের মধ্যেই বাবে বাবে কোনও অভূত, কিছুত (এমন কি ভূত) এবং রহস্য খুঁজে ফিরেছে। বাবে বাবে। হাসা নেই, থাকলেও হাসি দিয়ে সব ভরে না, তাই রহস্যের ফরমাস। যে জিনিস যোগ নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে, যে জিনিস ঘটনে-অঘটনে কখনও সত্য, কখনও সত্যেরই প্রায়—অনেক সংস্কৃতিতে তার প্রতি সন্দ্বানী দৃষ্টিকে নিবদ্ধ দেখতে পাই।

আমরা রহস্য গল্প পড়ি কেন? উত্তরটা অদূরে। সেটা মনের গহনে। জীবনে তো না-রহস্য—না-রোমাঞ্চ অথবা অধিকাংশ জীবন অতিশয় সমতল। মেয়েদের যেমন স্বাধার পরে চুল বাঁধা বেশির ভাগ পুরুষেরও তাই। চুল বাঁধাবিধি দূরে থাক, কমসে কম নিত্য প্রাতঃকৃত্যের পরে বাগি ঝুলিয়ে বাজারে ছোট্টা কিংবা রেশম কেবোসিন টেরোসিনের অন্তে লাইন তো দেওয়া চাই। এত কষ্ট, তাই মুক্তির অন্ত পড়া। বেশির ভাগ লোকেরই ভোট হালকা পাঠো। মানে হাফ ছাড়ার মতো বাতাস যদি মেলে : ছেলেবেলায় ওই কারণেই থাকে রূপকথা আর—দুপুর থেকে বিকেলে, যা নেই বা অবাস্তব সেই রোমাঞ্চ, হত্যা—নিদেন ভৌতিকতা। আমাদের মনের চাইল মেটাতেই এসব এসেছে। প্রকৃতকৈ জন্ম করে তার ওপরে সওয়ায় হয়েছে অপ্রাকৃত অথবা অতি প্রাকৃত—ষ্টংরেজিতে থাকে বলে স্পারহাচারাল। ভূত? কন্যাচ দেখি না বলে তাকে দেখতে চাই—সত্য হোক মিথো হোক অন্তত লেগায়। স্বাভাবিক মৃত্যু? মানে বোগ ভোগের পর সবশেষ? মন জানে, তবে মানতে চায় না বলে একটা অবশেষের লোভনিপা থাকে। মৃত্যু অবশ্যই। তবে একটু আলাদা জাতের মৃত্যু। যাকে মজিবানে বলে হত্যা।

মনস্তত্ত্ব এই পর্বত। এর কতটা পাপ কতটা অপরাধ কতটাই বা হিংসা আর কতখানি পুলিশী কেরামতি বা বোকামির সংবাদ এই ভূমিকায় তার মধ্যে ঘাব না। কোনও বিদেশী লেখক যা বলেছেন, সবটাই হয়তো তাই, এই সাহিত্যটাই হাইব্রিড। সবই শেষ হয়ে যায় তবু বিশ্লেষণের এতো ভান আর ভড়ং। মানে শেষ যদি শেষ হয় তো হোক, তবে একটা অবশেষ থাক।

বিদগ্ধ পাণ্ডিত্যে কী বলবেন জানি না, অপরাধমূলক কাহিনীই বলবেন সম্ভবত। সাসপেনস স্টোরি যার প্রথমে কী হয়েছে আর তার পরে সারাক্ষণ জুড়ে কী হয় কী হয়—এবং। সংাপ্তিও একটা দেখুন—কী করে আর কেন।

কে কে কে এই জিজ্ঞাসাও। রবীন্দ্রনাথের প্রায় শেষ একটি কবিতার যে প্রশ্ন এখানেও তাই। কে তুমি বা কে সে? হুডান ইট। মাঝে কি বিদেশীরা কী-র চেয়ে কে—এই কথাটাকে বড় করে দেখে? কী যে তা তো জানাই আছে। কেন, সেইটাই আবিষ্কারীয়।

অপরাধ—সচরাচর হত্যা। তখন মানুষ আর তার বিজ্ঞান খুঁতখুঁত নাকে যেন

কুসুম হয়ে যায় ; কয়েকটা কোঁতুল শুধু। এক, কে মৃতকে সর্বশেষে জীবিত দেখেছিল। ছই, কার সবচেয়ে বেশি স্বেপোগ ছিল। তিন, সন্দেহের ছায়ায় আচ্ছন্ন নর বা নারীদের কার কার ছিল আলিবাই, মানে অকুসলে অশ্রুপস্থিতির অশ্রাস্ত অজুহাত, আর সর্বশেষে এই প্রশ্ন : এই মৃত্যুতে কার বৈষয়িক লাভ হল ?

এখানে মোটিভ বা মতলব ব্যাপারটা ব্রহ্মের চেয়েও প্রবল হয়ে পড়ে। মানে “কে” এই কথাটারও চেয়েও বড় হয়ে দেখা দেয় কেন এবং কী কারণে। মরা আর মারা তো ছুনিম্বাভর লেখায় বরাবর। তবে এইসব জিজ্ঞাসা পরবর্তী সময়ের। বিদেশে এডগার অ্যালান পোর নাম লিখেছি তবে নামাবলীর খই পাইনি, শেষ নেই। ফ্রান্স যদি বাইরেও রাখি তবু স্নেক রটেন আর আমেরিকা এই ইংলিশভাষা দুটি এলাকার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মত পালোয়ান নজরে পড়ে কই ? অন্তত মারডার কর প্রেম্ভার মানে মজার জন্তই মারা এরকম কোনও ব্যাপার তো আমার কল্পনার আগতার হাজার বোজন বাইরে ছিল।

তবু তো চেনটাটেন। তবু তো তাঁর কাদার ব্রাউন। কোথায় হত্যা কোথায় বহুস্ত—কত শত কত মতো। পর সময়ের রচনা বালজাককে নিশ্চয় লজ্জা দেবে। তাঁর কনোদি টুংগই কত দূর আর গেছে। বড় জোর সম সময়ের সমাজের উপরে তাঁর ভর, ব্যক্তিবিষয়ে বা স্বাক্ষর তো তাঁর নির্ভর নয়।

পাণ্ডিত্যে কান্ন কী ? যখন খুব কাঁচাকাঁচি মাহেন প্রায় শিলাখ শার্লক হোমস (এই নামটা কি পোনান ডয়েল কখনও শেরিংটন ভেবেছিলেন আর বোকাবোকা ওয়াটসন ? তিনি স্বয়ং স্তার আবধার কোনান ডয়েলই তো নন ?) এই ছাঁচেই আবার বোধহয় আগাথা ক্রিসটি অনেক পরে ঢালাই করে নেন তাঁর কাপটেন হেনটিংহেট। অর্থাৎ দেখেও যারা দেখে না, বুঝেও যারা বোঝে না সেইসব মৃত। তারঃ আমাদের মতো। স্বজন আপনজন।

সুতরাং ডিক্টেটিভ নভেলকে ক্রাইম নভেল বলে না বলি তার মধ্যে বিস্তারিত জীবনের খুব দৃশ্যসত্য বিবৃত। মারা আর মরে যাওয়া। তথাকথিত কী বহুস্ত কী রোমান্স কী গোয়েন্দা কোনও গল্পকেই বোধহয় এই চাখে কেউ দেখেন নি।

আমরা জীবনে চাই না অথচ পড়তে চাই। সাংঘাতিক ভগ্নমি মনুষ্যদের। বিনোদনের নামে একই সঙ্গে পলায়ন আর আগমন এই হ'ল গোয়েন্দা গল্প। প্রিয়নাথবাবুর দারোগার দফতর আজ আর কেউ মনে রাখেনি, পাঁচকড়ি দেব কোথায় দেবেন্দ্রবিজয় কোথায়ই বা কুমেলিয়া এমন কি দীনেন্দ্রকুমার বায়ও বুঝি বিস্মৃত। তাঁর রবার্ট ব্লেক, যার কান ঘোঁষে গুলি চলে যত, আর শিথ বনতো “কর্তা” (এর অনেকটাই বিলিভ মেকসটন ব্লেকের ছাঁচে ঢালাই, সটা পরে ছেনেছি) সব আজ অজুমান করি কবরস্থ। কেন না তার কিছু পরেই শরদিন্দুবাবু এলেন কি না। তাঁর বোয়ামকেশকে দিয়ে (সত্য বলিব, মিথ্যা বলিব না—মজুর ?) শারলক হোমসের ডিটেকশন নামক থিয়েটারিটাকেই অপভ্রংশ ভাষায় সাজিয়ে চালান দিলেন। চললো ও

তো। নকলে বরং আসলটাই এদেশের পড়ুয়াদের কাছে খাস্তা হয়ে গেল। আরও মজা। শরাদিন্দুবাবু অবিভ্রমান, যুতদের বিষয় অশালীন কিছু জানি যে বলতে নেই, তবু লক্ষ্য করোছি তিনি শারলককে হঠাৎ আগাধার এরকুল পোয়াবো করে দিলেন। হাওয়া বুকে মোরগের মুখ ফেরানো—ভুলেছি। শরাদিন্দুবাবু। বড় ভাবায় ওপর তাঁর ঐক্য অধিকার নিশ্চিত। তথাপি যোপ বুকে কোপ মেয়েছিলেন কথাটা বলা দরকার। মানে মুখ হাওয়াই মোরগের মতোই ঘুরিয়েছিলেন।

(ভুত, ঈশ্বর আর হত্যাকারী এবং যাঁরা নিহত)

অনেক দিন কবিতা আর গান মাছের শিল্প সৃষ্টির এই দুটে। দিক যেমন মিলে-মিশেছিল, প্রমাণ লবকুশের মুখে বাগ্ম্যাকর, রামায়ণ গান, প্রমাণ একালেও যে কোনও দেশেতে হয় করে রামচরিতমানস পড়া আর শোনা, গল্পার ঘাটে ঘাটে কথকতাও বোধহয় তাই। তেমনই রহস্য, বোমারু, হত্যা আর গোয়েন্দা-কাহনী কোনও এক আদি উধাকালের কুয়াশায় মোটামুটি ছিল এক পারবারের। অন্তত জ্ঞাত। যেমন এডগার অ্যালেন পো।

যদি গোয়েন্দা গল্পকে আলাদা করে নিই, চাল থেকে ডাল বেছে নেওয়ার মতো। তবে দেখব, গোয়েন্দা গল্পও কিন্তু আসলে কোথাও পুরাণ-পন্থা। অথবা ধর্ম-ধর্মী বললে কি খুব কথার চালাকি হবে? কথার যদি-বা হয়, সত্যের নয়। যে-কোন মহাকাব্য বা পুরাণের মোক্ষা ব্যাপারটা কী, অর্থাৎ উপসংহারের উপদেশ? ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়। এই না? যারা অস্বয়, যারা রাক্ষস, তারা শেষ পথন্ত হারবেই। আর হার নেই কার? সত্যমেব—এই স্বয়ং ইচ্ছা বা উচ্চারণটার!

গোয়েন্দা গল্পও তাই। হত্যাকারাকে শেষ পথন্ত ধরা পড়তেই হয়। শাস্তি? সব সময়ই যে খুন্সী পায়, এমন নয়, বিধের বড়ি আছে, জানালায় আলগা শিক আছে আর একালে হোলকপটার থেকে ডুবো-জাহাজ—কত কিছুই তো! তবু খুন্সীর মানে রক্তের দাগ। সেটা লেগে থাকে, আমরঃ মানে সামাজিক মাত্রাধারা তাতেই খুন্সী, তাই আরামে একটা আল্লাদিত সিগারেট ধরাই। সোজা কথায়, তায়-অন্তায়, পাপ পুণ্য, সামাজিক ভারসাম্য সব যে-কোনও তথাকথিত শিরস্ত্রাস সাহিত্যের চেয়ে গোয়েন্দা গল্প বজায় রাখে। রাগতে চায়। কী উচিত, কী অসুচিত, কী হিত কী গহিত, সে স্পষ্ট সীমারেখা আঁকে।

সেই জন্তেই তাকে বলছি পুরাণ আর মহাকাব্যের উত্তরাধিকারী। জাতে মহৎ হোক বা না-ই, হোক আঁতে সে সর্বাংশে সৎ। হানাহানির বিরুদ্ধে তার অবোচিত সংগ্রাম অবিরাম। জনমানসে এই স্বাক্ষরটি কী সে পায়নি? তো বয়েই গেল। সেখানে রাক্ষস যখন আক্রান্ত হত, তখন রাজারা তলব করতেন কাদের? মন্তর-পড়া পুরুতদের, না ডালিদের? সাহিত্যে গোয়েন্দা হল সেই প্রতিরক্ষার ঢাল।

আমাদের গোয়েন্দা কাহিনী এই শর্ত পূরণ করে, নিশ্চিত। কিন্তু তার কতটা ধার-করা আর কতটাই বা আপনা-আপনি, মানে মৌলিক? লজ্জা নেই, যদি ঋণ হয়। যুদ্ধোত্তর ইউরোপও তো স্বেচ্ছ মারশাল এইড্-এর দৌলতে উঠে পান্নে-গতবে দাঁড়াবার মতো জাচ্, পায়! সত্যি বলতে কি, মোদের গরব, মোদের আশা এই বাংলা ভাষার গত শ-খানেক কি শ-দেড়েক বছরের যে ইতিহাস, তারও অনেকটাই কিন্তু ঠেকেনো। ঋণ করে? হলই বা। তবু স্মৃত তো? তাই তো দুর্গেশনন্দিনী। তাই তো সনেট চতুর্দশপদী, ট্রাজেডির কৃষ্ণচ্ছায়া নিম্নে বাংলার প্রথম কৃষ্ণকুমারী এবং হোমার মিন্টনের এপিক দাঁচে তিলোত্তমা থেকে মেঘনাদ বধ বা বারাকিনা। গোেষধটা অবিভি ওভিড্-এর হিরোইক এগিস্‌লস্-এর ধরনে।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যদি “হট্, আগু কপার স্কাই”-কে দম্বতায় দিগন্ত করে থাকেন, তবে গোয়েন্দা গল্পেরও লজ্জা নেই। কিংবা এইটুকু ঘাটতি: যেমন মোটর বা বৈজ্ঞাতিক সমঞ্জস তৈরিতে, আমরা তেমনই যতটা না নিজেবা বানাই, তার চেয়ে বেশি প্রোটোটাইপ চাই। অবশেষে যা দাঁড়ায় তা শুধুই আমাদের বলিৎ। মানে স্বল্পপাতি ছোড়া-খালি দেওদ্বার কারিকুরি? যেমন অগ্ন্যাগ্ন শিল্পে, হয়তো বা গোয়েন্দা গল্পেও তারই কাছাকাছি। সেক্সটন ব্রেককে দীনেন্দুকুমার বায় না হয় রবার্ট করলেন, তবু ছ’পেনি খিলারকে তাঁর উৎকৃষ্ট স্টাইল আর যথা-প্রয়োজন ইক সংলাপকে ব্রাকেটে রেখে চমৎকার বঙ্গ করলেন। আমরা, অর্থাৎ আমাদের বয়সীরা মজলাম। আর পর কাল? তেমন মনেও রাখল না।

প্রিয়নাথবাবুর দারোগাবর দম্বরকে কি কারও মনে আছে? কারও? অথবা পাঁচকড়ি দে-র দেবেন্দ্র বিজয়কে? ক্রমেলিয়া না হয় কয়ালের মতো হাওয়া হয়ে গেল, কিন্তু দেবেন্দ্র? সে উত্তরকালীন রোমানকেশ, প্রতুল লাহিড়ী, কির’টি, এমন কি মোহনের আলোয় ছায়া তো ছায়া, একেবারে কালো হয়ে গেল। কালো মানে ব্ল্যাকআউট। পাঠকের স্মৃতিতে এখন তো ধরে নিচ্ছি রোমানকেশকেও হঠিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ফেলুদা। সময় বহুতা।

যা কানেকের, তা আজকের নয়। এই কথা বলে যেই এই অংশটার দাঁড়ি টানতে যাব তারিচ্ছ, তক্ষুঁনি মনে পড়ল, প্রিয়নাথবাবুর মূল চাঁচটাও ছিল শারলক হোমস্। আর আজ কেউ কি বিশ্বাস করবেন স্ত্রীর আরখার কোনান ডয়েল এক সময় তথাকথিত সিরিয়াস লেখক হতে চান? একের পর এক প্রকাশক যেই প্রত্যাখান করলেন অমনি তিনি হঠাৎ অপরাধমূলক লেখায় ঢুকে কি নিজের অপরাধটাকে ঘোচাতে চাইলেন? যার নাম “সাইন অফ ফোর” সেটাও দু-তিন বার “না-না, চলবে না” শোনবার পর (আমাদের দেশের কনে দেখার মতই আর কি) এক প্রকাশকের কাছে পান মোটে কত বলুন তো? সার আরখার কোনান ডয়েল তাঁর প্রথম অল্প জাতের লেখার জন্য পান স্বেচ্ছ পঁচিশটি পাউণ্ড। সর্বস্ব বিক্রীত। কার? কোনান ডয়েলের না শারলক হোমসের?

বিশ্বাস হয়না। এই শার্লক হোমসকে নিয়েই না পরে কত সাজানো জাহু-শালা ; বানানো চরিত্র নিয়ে বানানো ব্যাপার। অথচ বানানো তো সবই। শার্লক তাঁর বত মেধা বোধ বোধ আর বুদ্ধি থাকনা কেন, একালের পাঠকদের মনে কি হয় না যেন একটু অ-মানবিক ? মানে, মানবীয় কোনো প্রকার স্নেহা, সদি-কফ ইত্যাদি নরম-নরম, তুলো তুলো তুলে-তুলে ভাব ব্যাপারস্থাপার তাঁর মেধাবী ডিডাকশনের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি। ফলত চিরজ্ঞাত তিনি, হয়ত এক অর্ধে হয় অতি-মানব ; নয়তো না-মানব হয়েই থাকবেন।

সেই থেকে গোয়েন্দা গল্পে একটা প্যাটার্ন বরাবর বহাল ছিল। খুন এবং তার কিনারা কিন্তু নয় ও নারীর প্রেম-ট্রেম কক্ষনো নয়। পরের লেখকেরাও মেনে নিয়েছিলেন যে প্রেম অর্থাৎ হৃদয়গত তুরতুরে ব্যাপারস্থাপার ঢোকালে মূল বিষয়টি পাঠকের লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যাবে। যদি খুনটাই ঘটনা হয় তবে বুকে রগে যে সব বেদনা বহিল তা কাউ। তা নিয়ে সাতকাহন কথা ফেঁদে বসলে পড়ুয়ার মন, পড়ুয়ার চোখ অশ্রুদিকে লেপটে যাবে।

চেস্টারটনের ফাদার ব্রাউনও ভালবাসা টাশায় বাসা বিশেষ বাঁধতে চাননি। এবং ক্রাইম স্টোরিতে যিনি ভিক্টোরিয়া প্রতিমা সেই অগাধা ক্রিস্টিও না। আড় চোখে প্রেমের উইংসের দিকে তাকালেও তিনি মোটামুটি গোটা ব্যাপারটার দিকেই দৃষ্টিপাত করে গেছেন! সেখানে যদি বা পতি-সোহাগিনী তাঁর লেখায় কমাচ বা প্রস্তুতব এসেছে হৃদয়ের উদয় তেমন ঘটেনি। তা ছাড়া এই ক্রাইম স্টোরির সম্রাজ্ঞী একটি সংজ্ঞা হঠাৎ লঙ্ঘন করে ফেলেন—সেই যে আকরয়েডের গল্প! একটা ঐতিহ্য ছিল যে উত্তম পুরুষে যে বলবে সে কি খুনী হতে পারে ? ক্রিস্টি একেবারে আন-ক্রিস্টিয়ান হয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, পারে। শেষ মেষ দেখা গেল “আমিই” খুনী মানে আমি নামে কথকটি।

গোয়েন্দা গল্পে এরকম অনেক প্রচলিত সিদ্ধান্ত আছে। যেমন চাকর-চাকরানী পাচক-পাচিকা প্রভৃতিকে জের-জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে তবে সচরাচর তারা কেউ হত্যাকারী হয় না। তার চেয়েও বড় ব্যাপার, সবচেয়ে কম সম্ভবপর অপরাধী যে আসল হত্যাকারী হয়ত সেই। কোনো খোঁড়া কিংবা কানা। সন্দেহের ফোকাস যার মুখে সবচেয়ে কম, পিস্তল, ছুরি বা হাতুড়ি পাওয়া যায় তারই হাতে।

অপরাধ মূলক লেখায় এর সবই ঘটে গেছে। প্রতুল লাহিড়ী আর বোমকেশ। এবং অবশেষে ফেলুগ। এরই মাঝখানে কিরীটকে ভুললেই বা চলবে কেন ? ঠিক লিখছি কিনা জানি না, মনে হয় পরিমল গোস্বামী ভাঁওতাটা ধরতে পারেন, তাঁর ব্রজবিলাস-ই তার সাক্ষী।

তবু ব্রজবিলাস বাঙলা গোয়েন্দা সাহিত্যে চিরায়ত হতে পারেননি, যেমন পারেন নি দীনেন্দ্রকুমারের রবার্ট ব্লেক। কারণ, বেশির ভাগ লেখকরা মারলে হাতি নইলে নবাব বা লাখপতি মারতেন। লুঠতে হলে লুঠতেন ভাণ্ডার—বোম্বাগড়ের রাজার অস্ত্র মহলে ছুটতেন। খানিক আগে পাঁচকড়ির নাম লিখেছি না ? তাঁর সমসাময়িক

আর এক লেখকের নাম যখনাথ ভট্টাচার্য। পুলিশ কর্মচারী এই ভক্তলোক কয়েকটা গল্প লেখেন, এবং এই লেখকের বতনূর পড়াশোনা তাতে মনে হয় সেগুলো মৌলিক। তাঁর কাহিনী অভিজ্ঞতার, দারুণা আর গ্রাম্য পরিবেশে বহুচনা শ্রীমতী আগাখার মিস্ মারপুলকে মনে পড়িয়ে দেয়। হারিয়ে দেয় তাঁর এরকুল পোষারোকে। পল্লী-বাসিনী মিস্ মারপুল তাঁর নিজের দেখা সমাস্তর অভিজ্ঞতা দিয়ে এক-একটা রহস্যের কুল কিনায়ায় ভিড়ে যেতেন। আঁকার চালাকি তত ছিল না। কিন্তু পল্লীচিত্র অঙ্কনে ওস্তাদ হয়েও দীনেন্দ্রকুমার গৌড়ঙ্গনের চিত্র থেকে এখন বুঝি নিঃশেষে মুছে গেছেন। তবু সার্থক তাঁর “পল্লীচিত্র” তো রইল। তুলনায় বাড়াবাড়ি হবে তবু বলি যেন “ছিন্ন পত্র”। যেমন হয়ে গেছে দীনেন্দ্রকুমারের লেখার তাঁর রহস্য-লহরীতে আর “যশোমার্কের দক্ষতরে”। বিলুপ্ত তবু এই মুহূর্তে এই লেখকের কাছে স্বতঃ। শুধু এই ভক্ত যে তিনি পিকাডিলিকে কখনও চোরকাঁ বলে চোরাচালান দেননি। তবে বিলিতি প্রবাদে বলেনা যে বিড়ালের নটি প্রাণ? দুর্ধর্ষ ব্লেকের ছিল অন্তত নশোটি। গুলি বরাবর তাঁর কান ঘেঁষে ছিটকে গেছে। তাঁর রূপান্তরও অশেষ অলৌকিক—এই চীনেমান তো এই হাবসী, কুকুর বা ভালুক হয়ে যে কখনও আবিস্কার হননি এই ভাগ্যি। হতে যে পারে না এমন নয়। লন চ্যানিকে নিবাক যুগে ধারা দেখেছেন তাঁদের কাছে ব্লেকের ছদ্মবেশ অবস্থাসা ঠেকবে না।

তবু গোয়েন্দা কাহিনী চিরায়ত হয় না। নারকিন ভ্যান ডাইক (কী জানি, কতকাল আগে পড়াত, গল্পটর গুলে খেয়ে ভুলে আছি, লেখকের নামটাও নির্ভুল হলনা সম্ভবত) কিংবা জর্জেস সিমেনস এঁরা আপাতত দূরে থাকুন, হেমেন্দ্রকুমারের বিমল কুমার এবং পরে জয়ন্ত এদেরই বা কাকে কাকে আজ একাল যথের ধন করে আগলে রেখেছে। বরং এই শেষ পর্ষায় গোয়েন্দা গল্পের কয়েকটি সামান্য লক্ষণ নিয়ে কিছু বলি। এক—অতি বুদ্ধিধর বা শক্তিধর কোন নায়কের পাশে অবোধ একটি সহকর্মী। যেমন বলেছি তো হোমসের ওয়াটসন, ব্লেকের স্মিথ, পোয়ারোর কাপটেন হেস্টিংস। আমাদের শরাদিন্দুবাবুর বোমকেশের অজিত কিংবা ফেলুদার তোপসেও কতকটা সেই ছাঁচে তৈরি নয় কি? এরা দেখেও দেখেনা, বুঝেও বোঝেনা, কেউ কেউ বড় জোর শুধু লিখে থাকে। তাদের কাউকে কাউকে বুঝ দেওয়া হয়, যে তারা বিজলী নয়, তবে বিজলীর তার (হোমস এই ধরনের কি একটা কথা বলে না ওয়াটসনকে ভোলান?)—কাহিনীতে ঠাই পাওয়ার যোগ্যতা তাদের শ্রেষ্ঠ একটাই : নীরেট বোকা। হতেই হবে। পুত্রলিকাং অথবা একটু বেশি। দেখিয়ে দিলে এরা দেখে। শোনালে শোনে, বুঝিয়ে দিলে বোঝে।

অথচ মহা ভুখোড়, চতুর লেখকেরা জানেন না, তাঁদের বানানো গোয়েন্দাদের আগেই অনেক পাঠক আজকাল খুনীকে মনে মনে সনাক্ত করে ফেলে। ট্রিক বা কায়দাগুলো জানা হয়ে গেছে কিনা? ব্যবহারে ব্যবহারে পুরনো। লোকে আগে আগেই বুঝে নেয় যার ওপর সবচেয়ে কম সন্দেহের ছায়া খুনী নিশ্চয় সেই। রক্তের

দাগ জল জল করে জলতে থাকে।

আর একটা সনাতন স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে পুলিশ মাজেই ভাঁড়, অর্থ, অহু, অক্ষয়। এটা কিন্তু বাস্তবতাকে সরাসরি উড়িয়ে দেওয়া। কারণ জীবনে (এক্ষেত্রে মরণে) পুলিশই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হত্যাটিতার কয়লালা করে। করতে না পারলে সে সব মাথলা অনন্তকাল ফাইলের ফাঁদে আর এক বার মরে। মরে থাকে। তবে পুলিশ বাদ দিয়ে সাধারণত বাঁও মেলেনা, কিনারা হয় না। এই বোধটা পরবর্তীকালে কোনো কোনো সত্যকার সত্যাবেষী লেখকের লেখায় ফুটে উঠতে দেখেছি। যেমন ডাঃ ধর্নডাক, যেমন ইন্সপেক্টর মাইগ্রেন।

আর একটা কথা। গোয়েন্দা গল্পের হত্যা ইত্যাদি প্রায় কখনই রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত হয় না। এসব বেশির ভাগই ব্যক্তিগত। অর্থাৎ, নিহতের মৃত্যুতে সংশ্লিষ্ট লাভ কার? —এইটে প্রথম প্রশ্ন? তাই উইল টুইল এবং উত্তরাধিকারীর কথা এসে পড়ে। দ্বিতীয় প্রশ্ন—কার স্বযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। তৃতীয় অকুস্থলে কে বা কারা ছিল বা ছিল না। যারা ছিলনা বলে দাবি করছে তাদের সম্পর্কে নিঃস্বার্থ সাক্ষী আছে তো? এখানে বিলিতি বইয়ে একটা কথা কেবলই দেখা যায় আলিবাই। যেন তেন প্রকারেণ ঐ আলিবাইটাকে মজবুত পায়ে দাঁড় করানো চাই। মজবুত বললা কেন? এক—ডাক্তারের রাইগর মরটিসের রিপোর্টে সময়ের গানিকটা ছাড় থেকেই থাকে। ঘড়ির ঘণ্টা ঘুরিয়ে দেওয়া বা ঘরের টেমপেরেচার ইত্যাদি ইত্যাদি কত কী। এই সবের উপরই তো মারার বহুত কুয়াসার মতো ঘন হয়ে জমে থাকে। গল্পও জমে সেই জন্মই না? শেষ প্রশ্ন: কে তাকে শেষ বারের মত জীবন্ত দেখেছে?

এত ঘাঁটাঘাঁটি সব শেষ। সাধারণ গল্পে আজকাল যেমন গল্পো মেলা ভার, তেমনি গোয়েন্দা কাহিনীও বেশ কিছুকাল অগ্র ষাতে প্রবাহিনী হয়েছে। দূরদর্শন থাকলে সৌদীন্দ্রমোহন, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ (যাঁদের নাম উল্লেখ করতে হুঃলছি—কমার অযোগ্য। অপরাধ নিয়ে লিখতে বসেও বিষম অপরাধ) হয়ত বা সতর্ক হতেন। দীনেন্দ্রকুমার, নীহারবঙ্গন, শরদিন্দু, সত্যজিৎ প্রভৃতি তো বটেই—অধিকাংশ বাংলা গোয়েন্দা গল্প ভাষার নৈপুণ্যে বিশিষ্ট কার্য কারণের সম্পর্ক নিরূপণে বিজ্ঞান-অভিমাত্রী, বুদ্ধি আর বিশ্লেষণ চাতুর্থে অনগ্র। অনেকের মধ্যে সন্দেহ ছড়িয়ে দিতে দিতে হঠাৎ লেজুয়ার মুহূর্তে একটি সনাক্তকরণের পরিণাম। বিষয়ে উপনীত হওয়াও একটা উপনয়ন। গোয়েন্দা কাহিনী ত্রাতাই যদি হবে তবে কী করে মৃত শালক হোমস্ সগোরবে তাঁর শত-বার্ষিকী উৎসাপন করলেন?

কোনটা সাহিত্য আর কোনটা নয় এই নিয়ে অগ্রাগ্র আখড়াতেও তো অনর্গল অবিরল সংশয়। কত লেখা এই আছে তো এই নেই। শর্ত কি জীবনের প্রতি সত্যতা? তবে তো গোয়েন্দা গল্পও সাহিত্য, কারণ মৃত্যু, অপঘাতে মৃত্যু, হত্যা এসবই কি জীবনের অংশ নয়? অংশ, তবে প্রতিলিপি হবে কেন? হল তো ঠাকুরমার ঝুলি থেকে আলিস সবই যদি হয়ে যায়। বাদ যায় অরওয়েলের রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক

প্রবেশ

বিশেষ কালে বা কলকে পাশ্চাত্য সাহিত্য, আর নির্বিশেষ কালে গেলে ? অনেক গোয়েন্দার অদৃষ্টে সেই অমরত্বও তো মিলেছে। হোমস্, মসিহে দুপী, পোয়ারো ? ক্রিস্টি আস্তে আস্তে যেন হাঁটের উপরে থাকে হাঁট সাজিয়ে তঠাং চিলে কোঠায় সবাইকে টেনে নিয়ে গিয়ে থাকে বলে ক্রাইম রি-কন্সট্রাক্ট করা মানে হত্যার সম্ভাব্য দৃষ্টের পুনর্নিমাণ—সমস্ত সমূহ সমাধা করে শেষ সমাধানটা হুডমুড় করে ভেঙে দিতেন। একটা বেদানা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে শেষ দানাটিকে বের করে চিনিয়ে দেওয়ার মতো। সাথে কি ডি-কুইনসি মার্ভার কনসিডারড আজ ওয়ান অফ দ্য কাইন আর্টস লিখেছিলেন ? তিনি অবশ্যই ছিলেন ত্রিকালদর্শী।

লিখতে লিখতে পেইট হারিয়েছি। একালে শুধু খুনের বড় পাঠকের মনের বড় ধাবার আগে বাড়িরে দিয়ে যায় না, তাই অনেকে এনেছেন সেকস। অনেকে স্পাইট টোব। গুপ্তচরের ব্যাপারে সমারসেট মমের আশেনেডেন স্মরণীয়। এই ধারা বয়েই পরে এসেছে ভোশাজ ইত্যাদি। এসেছেন ইয়ান ফ্রেমিং। তিনি আনলেন চির-ধূবা জেমস ব্রুক - একালের এক শ্রেণীর রাজনীতিবীদেবা শুনে উৎফুল্ল হবেন—বও ছিলেন লাইসেন্সড টু কিল। নানুশ মারার খোলাখুলি ফরমান। ব্যবসায় একেই বোধহয় ও জি এল বলে।

মানে, মনের সঙ্গে স্তম্ভন উচাটন সবই এল। লোকের মন উপছে গেল। নিক কার্টাররা যারা পরে এলেন তাঁরা ঐ মাড়ানো বাস্তবই ধরলেন। অর্থাৎ, যে মরেছে সে তো বরাবরের মত শুয়েছেই, ব্যাপারটার হিল্লো করতে বেশ বড় সড বুক-দপ ওয়াল। যুবতীদেরও খানিকক্ষণের জন্য শোয়ানো চাই।

এই ধারাই চলছে। সেকস আর ভায়োলেন্স। খুনী হোন বা যারা করেন গোয়েন্দাপিরি কেউই কামিনী কাঞ্জে বিতৃষ্ণ, শুক দব আর নন। এর আভাস হয়ত আরল স্ট্যানলি গার্ডনার (চলুনো এ ফেরার) সাঁটে দিয়ে থাকবেন। তবু চূড়ান্ত আইনজ্ঞ তাঁর সব কোর্টম্যান, আর পেরি মেসনের সওয়ালগুলো তো ছিল! কত বাস্তবিক অপরোধ ঐ সব কাল্পনিক কাহিনীর কলাপেই ধরা পড়েছিল। পেয়েছিল শাস্তিও।

এখন সবাক নাস্তি ? না। অন্ততঃ চোস্ত ইংরিজীটা আছে। প্রত্যেকেই দারুণ লেখেন। যখন মহামহিমময় হাডলি চেজ। ভাব প্রায় প্রাচীন পেচকের বয়সী এই লেখকের মনের আশার কিছু কিছু হারিয়েছে বলে একটু একটু কালি খালি লাগে বই কি ! খুনীকে যে আগে থেকেই জানা যায়, চেনা যায়। একালে শুধু পিছু পিছু ধাওয়া। কে হারে, কে জেতে, এই রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা। তবু কবুল করি, পাতা মুড়ে বইটা তো সরিয়ে রাখতে পারি না। ওর ভিতরে মিশে যায় আমার নিঃশ্বাস।

আর খুব শিবরামায় না হলেও মিলিয়ে বলি, গোয়েন্দা পল্লের সম্পর্কে শেষ বিশ্বাস। সেটা ধোরা যায়নি। সেটা কী ? না, নৈতিকতা, আর সত্যের জয়।

মানুষ মরে, মানবতা থাকে, জগতের সব শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তাই বলে । নয় ? আজ প্রকরণ যেমনই হোক, যত যৌনতা আর জৈব বিকৃতি আশঙ্ক, এখনও বেশির ভাগ গল্পের বক্তব্য ওইটাই । যারা খারাপ ভাষা জ্ঞেতে না । এই শর্তটা এখনও পূর্ণ । তথাকথিত অস্বেবাসী অপরাধমূলক কাহিনী আগে এই কথাটাই হয়ত কোনো মিনার থেকে আজানের মত জানান দিত, আজ নিচের তলায় নেমে এসেও কিন্তু সেই একই কথা বলছে : খুন করছে বরুক, একের পর খুন, কিন্তু খুনির ক্ষমা নেই । এত রক্ত, এত রক্ত কেন ?—রবীন্দ্রনাথের বিসঙ্গনে এই ধরনের একটা জিজ্ঞাসা ছিল না ? একালের, সেকালের সব কালের গোয়েন্দা গল্পেরও জিজ্ঞাসা এই ।

পুলিশ : লেখক হিসাবে জায়গা পাওয়ার অধিকার এই লেখকের ছিল কি না সেই রায় দিন এই সংকলনের পাঠকেরা । তবে ভূমিকা লেখার ভার সে ঠেলতে পারে নি । এই অমুচ্ছেদটা তাই অধিকন্তু । যতদূর জানি, বাংলা গোয়েন্দা গল্পের গদ্যোদ্যো থেকেই শুরু করা হবে—সম্পাদকের এই সংকল্প । তবে ভোজের সুবিধার্থে ভোজ্য বস্তুকে দুটি খণ্ডে ভাগ করা হল । এই শতকের সূত্রশাতিটি বিভাজন রেখা । একটু অসুবিধা, তথাপি । বাংলায় রহস্য কাহিনীতে যারা পথিকৃত তাঁদের অনেকেই জয় উনিশ শতকে । যথা পাঁচকড়ি, দে, দীনেন্দুকুমার থেকে শরদিন্দু ইত্যাদি অনেকেই । এই খণ্ডে যারা হাজির তাঁরা স্বকীয় শক্তিতে । মনোজ বসু থেকে সমবেশ বসু প্রমুখ খ্যাতিনামারা তো বটেই, অতিশয় কমবয়সী আগন্তুকেরাও । ভাগের রেখা স্তরায় কৃত্রিম । সম্পাদক অল্প একটি মুখবন্ধে সমস্তটায়ই নিপুণ বিদগ্ধ ব্যাখ্যা দিয়ে আমার কাজ হালকা করেছেন—পাঠকেরা জেনে রাখুন । তাঁরা এও জাহ্নন যে, দ্বিতীয় খণ্ডটিও দেখা দেবে অচিরে । যার বিষয়বস্তু যদিও ইত্যাদি, তবু এই প্রতিশ্রুতিটা খুন হবে না, আশা করি । রসজ্ঞ পাঠকদের জ্ঞাতার্থে, ইতি ।

স. ক. ঘ

প্রসঙ্গ : দেশ বিদেশের গোয়েন্দা কাহিনী

পৃথিবীর সর্বাঙ্গের বহুল প্রচারিত গ্রন্থ বাইবেল। তবে বাইবেলের নয়ই যদি কোন গ্রন্থ বিশ্ববাসীর নিকট, সৌর মণ্ডলের অন্তর্গত আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহের মানুষের কাছে সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়ে থাকে তবে তা ডাঃ স্ত্রার আর্থার কোনান ডোয়েলের শার্লক চরিতমালা। বাইবেল সর্বাধিক সম্মানিত ও আদৃত। শার্লক হোমস্ সর্বাধিক গঠিত। The Bible is less read and more revered but Sherlock Holmes is more read and less revered. বিশ্বনা-হত্যের অমর, অনন্ত ও অবিস্মরণীয় পুরুষ শার্লক হোমস্। আর শার্লক হোমসের কাহিনী গত অর্ধ শতাব্দী ধরে বিশ্ববাসীকে এক অনাস্বাদিত পূর্ব রহস্য, রোমাঞ্চ ও অসুস্থত্বের এক বিরল প্রদেশে অসুস্থবেশের অর্গল উন্মোচিত করে দিয়েছে।

শার্লক—শার্লক—শার্লক হোমস্, তাঁর স্রষ্টা পুরুষ কোনান ডোয়েল হতেও অনেক নামী, অনেক দামী, অনেক পরিচিত নাম। রামায়ণের অমর কথায় হামের উজ্জল উপস্থিতি মনে করে দেয় বাল্মীকী মুনিকে। ডানিয়েল ডিকোর চেয়ে মানুষ বেশি চেনে রবিনশন ক্রুশোকে। তাই আশ্চর্য্য হই না যখন স্বদূর ভারতবর্ষের তো দূর অন্ত, খোদ ইংলণ্ডের বহু বিজ্ঞ মানুষ শার্লক হোমস্কে কেবল একজন প্রাণচঞ্চল অস্থিমজ্জাবৃত্ত মানুষই ভাবে না, তাহে এক সুরধার বুদ্ধি, অসুস্থত্বের বিষয়ে মুশকিল আশানকারী লণ্ডন শহরের ২২১-বি বেকার স্ট্রীটে বসবাসকারী এক বিরল প্রতিভার মানুষ।

স্ত্রার কোনান ডোয়েলের অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটে শার্লক হোমসের বিশ্ববিজয়ী জনপ্রিয় অবস্থিতির কাছে। কোনান ডোয়েলের পরাজয় হয় শার্লক হোমসের খ্যাতি

পরিব্যাপ্ত উদ্ভাসে। স্রষ্টা হতে সৃষ্টি বড় হয়ে যায়। গুরু শিষ্যের পরাজয়ে। The creation is greater than the creator.

“চুরিবিজ্ঞা বড় বিজ্ঞা যদি না পড় ধরা” এই চোর ধরার কাহিনীকে কেন্দ্র করেই যুগ যুগ ধরে গোয়েন্দা কাহিনীর অমূল্য বর্ডন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও গোয়েন্দা গল্পের বীজ নিহিত আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে চৌর্য ও চাতুর্ঘ্য অনেক ক্ষেত্রেই সমার্থক হয়ে গেছে। এক কথায় চুরি বিজ্ঞাও চৌর্য কলার এক কলা, অর্থাৎ কাইন আর্টসের অন্তর্গত হওয়ায় প্রাচীন সাহিত্যে চোরের শাস্ত্রকে চৌর্যশাস্ত্র বলা হত। চৌর্যশাস্ত্রের অধিদেবতা স্বন্দ অর্থাৎ কাতিক। আর এই শাস্ত্র পারদমন্দের অর্থাৎ চোরদের বলা হত স্বন্দপুত্র। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে চোরের ও চুরির বর্ণনায় মুচ্ছকটিক নাটক অনন্ততার দাবি রাখে।

ধর্মের কল বাতালে নড়ে। তাই চোর ধরা বিজ্ঞাও এক বড় বিজ্ঞা। প্রাচীন কালেও ঘারী, কোটাল সবই ছিল। চোর ধরে পুরস্কৃত হওয়ার রেওয়াজও ছিল। আর চোরের ধরা পড়া তার নিবৃত্তিভার পরিচায়ক হিসাবেও গণ্য হত।

তবে আজকের দিনের গোয়েন্দা সাহিত্যে যে ডিটেকশন, পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধি বিশ্লেষণ তার রেওয়াজ আমাদের ঊনবিংশ শতকের পাক্ষাত্য সাহিত্যের অবদান।

তবে মহাভারতের যুগেও পর্যবেক্ষণ, ডিটেকশন, বিশ্লেষণ সবই ছিল। মহাভারতের বনপর্বে বক-যুষ্টিধির সংবাদে যুষ্টিধিরের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার নানা নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। হ্রদের জল আনন্দন করতে গিয়ে পাণ্ডবরা চার ভাই-ই ত্রৌপদীসহ নিখোঁজ হ'ল। ব্যাকুল প্রাণ যুষ্টিধির খুঁজতে গিয়ে হ্রদের তীরে তাঁদের জলে নামার পদ চিহ্ন দেখলেন। কিন্তু জল হতে প্রত্যাবর্তনের কোন চিহ্নই অনুসন্ধান করেও দেখতে পেলেন না। কলে জলডুবি ৪ অপঘাত মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। কলে যুষ্টিধির বিপদ সঙ্কুল জলপথে অগ্রসরে বিরত হলেন।

পঞ্চতন্ত্রের গল্পমালায় আর হিতোপদেশের উপদেশ-মালায় ধর্মবুদ্ধি পাপবুদ্ধি কথায় গোয়েন্দা গল্পের আভাস পাওয়া যায়। দেড় দুই হাজার বছর পূর্বের “মূলদেব” কাহিনীকে আধুনিক শার্লক হোমসের প্রাচ্যদেশীয় পূর্বসূরী বলা যায়। দেবভাষার পর প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্যেও সংস্কৃতের অনুরূপ সব চৌর্য ও চাতুর্ঘ্যের নানা গল্প দেখা যায়। আজকের গোয়েন্দাগল্পেও যেমন ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয় দেখা যায় সে দিনও তাই ছিল। অর্থাৎ পাপের বিচার ও পুণ্যের বিজয় কেতন। আজকের গোয়েন্দা গল্প খুন, বলাৎকার, চুরি, ডাকাতি ছাড়াও বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সব অত্যাধুনিক চাতুর্ঘ্য ও নব নব উদ্ভাবনী বুদ্ধি আকীর্ণ অপরাধ প্রবণতায় পঙ্কিল। তবে একটা বিষয়ে এখনও সেই সুপ্রাচীন কাল—কালিদাসের কাল হতে এই আজকের গ্রহান্তর-গামী মানুষ্যের একই ধারা চলে আসছে তা হচ্ছে, যে কোন ধরনের গোয়েন্দা গল্পে অপরাধীর বিরুদ্ধে পাঠকমন সজাগ ও সজীব। পাঠক পাঠিকা সর্বোত্তমভাবে গোয়েন্দার

বিচিত্র সাহিত্য—ডঃ স্বকুমার সেন।

পক্ষে। অর্থাৎ সাদা মাটা কথায় বলতে বাধা নেই অপরাধীর বিপক্ষে। আর এই এটা আছে বলেই এত সব অনাস্থ্যের মধ্যেও মানুষ নামক বিপদ জীবটি আজও বেঁচে আছে। তবে জানি না আর কতদিন থাকবে।

আবার বর্ল চোবের চতুর্থতার গল্প বা কাহিনী সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে সুপ্রচুর। বিজ্ঞানস্বরের চৌধ প্রেমের গল্প আর কোটাল ঘারী প্রমুখ রাজপুরুষদের চোর ধরার কথায় আধুনিক গোয়েন্দা কাহিনীর ইঙ্গিত আছে। বিশেষ করে রাজার কোটালের ধোপা বাড়িতে গিয়ে কাপড়ের দাগ দেখে চোর ধরার কাহিনীর মধ্যে আধুনিক Forensic (detection) science-এর পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

তবে আধুনিক অর্থাৎ এ যুগের গোয়েন্দা গল্পের শুরু সাথে জড়িয়ে আছে প্রায় গত দুই শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক বিবর্তন ও পরিবর্তনের কাহিনী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড তথা ফ্রান্স ও ইউরোপের নানা দেশে যে পুলিশী ব্যবস্থা চালু হয় তার সাথে গোয়েন্দা বিভাগও ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠতে থাকে।

বিশেষ করে ভক্টোরিও ইংলণ্ডের স্থিতি শান্তি ও সমৃদ্ধির সাথে সাথে ১৮২২ সাল হতে লণ্ডনে যে পুলিশী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা পরবর্তী কালে অপরাধ নিবারণে ও অপরাধী অধেষণে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। তাই আজও পৃথিবীর সবদেশের ও সবকালের গোয়েন্দাদের তাঁথক্ষেত্র স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। পুলিশ আজও জনসংযোগ, জনগণ মঙ্গল বিবরণকের ভূমিকায়। অপর পক্ষে ক্রমাস্রদেশে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের শাসনকালে যে সঙ্গতিত পুলিশী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাতে জনগণ মঙ্গল, জনসংযোগ ঘটপানি ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল বোনাপার্টের শাসন স্বত্বকরণ, রাজনৈতিক শত্রু নিবন, জনগণ দমন, গাড়ন ও নির্ধাওন।

ফলে ইংলণ্ডে যত সহজে এক সভা সহনশীল ও প্রাণচকল সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে আর কোথাও তত সহজে গড়ে উঠেনি। আর অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে নতুন মহাদেশ আমেরিকায়, ইংলণ্ড তথা ইউরোপ হতে গিয়ে হাজার হাজার ভাগ্যবশী মানুষ জীবন ও জীবিকার জগৎ বসতি স্থাপন করে। কিন্তু যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও খুব সঙ্গতিত সরকারী প্রশাসন গড়ে উঠেনি ফলে নব গঠিত দুর্বল পুলিশী ব্যবস্থায় তখন কোন গোয়েন্দা বিভাগ গড়ে উঠেনি। তাই সম্ভব কারণেই মার্কিন মানুষ অপরাধের অধেষণে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও মূলত নির্ভর করেছে Private Detective Organisation-এর উপর। কারণ এখানের নতুন ও ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় শত্রুর পালন ও ছুটের দমনের কথা আক্ষরিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে আরও অনেক পরে।

এরপর সাহিত্যে যেহেতু সমাজের দর্পণ, সচেতন অথবা অবচেতন ভাবেই হোক আর না হোক সামাজিক পরবর্তনের ছাপ সাহিত্যে অপরিহার্যভাবে প্রতিকলিত হয়।

-
1. Bloody Murder—Julian Symons 2. Development of
Detective Novel—A. E. Much

ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নতুন মহাদেশ আমেরিকায় যে নতুন সমাজ, নতুন জনজীবন গড়ে উঠল তাতে সেই অজানা দেশের বিপুল বিস্তৃতি ও জনবিরল জনজীবনে যে রহস্য সাহিত্য সৃষ্টি হ'ল তাতে ডিটেকটিভ আছে, ডিটেকশনও আছে ; তবে তার থেকেও বেশি যা আছে তা হল রহস্য, রোমাঞ্চ ও ভৌতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির দুর্ঘটনা প্রচেষ্টা ও প্রবণতা ।

তাই ইংলণ্ডে শার্লক হোমসের স্রষ্টা পুরুষ কোনান ডোয়েল সাহেব অপরাধীর অন্বেষণে ক্ষুরধার বুদ্ধি বিচক্ষণতা ও অহুসঙ্কিতসার এক বিরল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলেন । অশচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এডগার আলেন পো গোয়েন্দা গল্প রচনা লিখলেন, রহস্য রচনা সৃষ্টি করলেন তার থেকে অনেক বেশি । অজানা অচেনা নিঃসীম নিসর্গ প্রকৃতির কোড়ে বিহারী মার্কিন মানুষ মানুষকে ভয় করল রত তার থেকেও বেশি ভয় করল প্রকৃতিকে আর অতিপ্রাকৃত গল্প কথায় ভরে উঠল মার্কিন রহস্য সাহিত্যের অঙ্গন ।

এডগার আলেন পোর অহুসরণে মার্কিন সাহিত্যে রহস্য রোমাঞ্চ ও বিভৌষিকার পরিমণ্ডল সৃষ্টির এক দুনিবার প্রবণতা দেখা দিল । ফলে দীর্ঘকাল মার্কিন সাহিত্যকে যুক্তিনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধার, বিশ্লেষণ ও অহুসঙ্কিত নির্ভর গোয়েন্দা গল্প সৃষ্টি করতে দেয় নি । বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মার্কিন সাহিত্যে যে গোয়েন্দা কাহিনী রচনার প্রবণতা তা ইংলণ্ডের সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব বললে অতুক্তি হবে না ।

তবে ফরাসী সাহিত্যে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধই বালজাকের লেখায় গোয়েন্দা গল্পের ও গোয়েন্দা উপন্যাসের প্রবণতা দেখা যায় । তবে তাকে গোয়েন্দা বিহীন গোয়েন্দা উপন্যাস বলাই ভাল । কারণ বালজাকের মৃত্যুর অন্ততঃ দশ বৎসর পর টাইপ গোয়েন্দা হিরো সৃষ্টি হয় ।

তবে একথা ঠিকই যে অধিকাংশ ফরাসী লেখক বালজাকের লেখা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গোয়েন্দা গল্পে হাত পাকিয়েছেন । বালজাকই সম্ভবতঃ এমন একজন ক্লাসিক সাহিত্যিক যিনি সত্যিকারের গোয়েন্দা গল্পের পটভূমি সৃষ্টি করেছেন । তাঁর অমর দুই গ্রন্থ *Maitre hornilius* (1831) এবং *Une Tinibreuse Affaire* (1841) । প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী গোয়েন্দা উপন্যাস ইউজিন স্যু (*Eugene sue*)-এর দ্বারা, নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে ।

এবারে আর একজন দিকপাল ক্লাসিক সাহিত্যিক আলেকজান্ডার ডুম্যো তাঁর গোয়েন্দা কাহিনীকে পার্যির সমকালীন জীবনের অতিবাস্তবতা হতে মুক্ত করে অভিজাত রাজসভার অত্যাঙ্কল অঙ্গনে উপস্থাপিত করেন । ফলে ডুম্যোর অভিজাত গোয়েন্দা নাটক সামান্য সূত্র হতে অসামান্য সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন প্রত্যাশমতীতঃ, ছুঃসাহসী অভিযান ও বিশ্লেষণ লাক্ষিত অবধানের মাধ্যমে ।

তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশক হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কিন এডগার আলেন পো, ইংরাজ রুডিয়ার্ড কিপলিং ও কোনান ডোয়েল গোয়েন্দা গল্পকে এক বিশিষ্টতা দান করেন ।

তবে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালকেই ইংরাজী গোয়েন্দা গল্পের স্বর্ণযুগ বলতে পারি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক থেকে ক্রোনান ডয়েল, আগাথাক্রিস্টি, এইচ. সি. বেল্লি, ডরোথি সোবার্স প্রমুখ লেখকদের লেখায় ইংরাজী গোয়েন্দা সাহিত্য পুষ্ট হয়। ইংলণ্ডে আর্থার ক্রোনান ডয়েলের বিশ্লেষণ, অন্বেষণ ও বিচার নিষ্ঠ আলোচনার অমূল্যবর্তন দেখা যায় উল্লিখিত ইংরাজী গোয়েন্দা গল্পের লিখিত্বের লেখায়। আর এডগার আলান পোর স্থিতি বিজয়িত Mystery writers of American Organisation কর্তৃক বৎসরান্তে খ্যাতি বহুস্ত ও রোমাঞ্চকর কাহিনীর জন্য প্রদত্ত “এডগার আলান পো পুরস্কার” ঘোষিত হওয়ায় মার্কিন সাহিত্যে ইংরাজী ষাঁচে গোয়েন্দা গল্প লেখার প্রবণতার পরিবর্তে বহুস্ত কাহিনী রচনার প্রচেষ্টা জনপ্রিয়তা (লিখন প্রিয়তা) লাভ করে।

তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে মার্কিন সাহিত্যেও ইংরাজী সাহিত্যের তায় গোয়েন্দা, গুপ্তচর ও রোমাঞ্চকর যৌনতাপূক্ত এক অভিনব অনাধারিত পূর্ব ও উপাদেয় ভোজ্য পরিবেষণের বেওয়াজ দেখা যায়। আর এখানে ইংলণ্ড-আমেরিকা হতে হাজার হাজার মাইল দূরত্ব পরাধীন ভারতের পূর্ব উপকূল আশ্রয়া এই প্রত্যন্ত প্রদেশের সামাদের আ মরি বাংলা ভাষাতে ইংরাজী রথী মহারথীদের লেখার অবশ্যপ্রাণী ও অনিবার্য প্রভাব স্পষ্টভাবে পারলক্ষিত হয়েছে এই শতাব্দীর প্রতি দশকে এবং দশক হতে দশকাবধি। তাই পাঁচকড়ি দে হতে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় আর দৌনেন্দ্রকুমার রায় হতে হেমেন্দ্রকুমার রায় পর্যন্ত কেউই বিদেশী প্রভাব মুক্ত হয়ে বাংলা গোয়েন্দা গল্প লেখতে প্রয়াসী বা সমর্থ হন নি। আর বাংলা গোয়েন্দা গল্পের পটভূমিকায় যে কথা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত পরিতাপের তা হচ্ছে গোয়েন্দা গল্পের তায় এক জনপ্রিয় সর্বাধিক পঠিত বিষয় সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের রথীমহারথীদের এক অনির্দেহ অনীহা।

তবে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেহাতীত ভাবে প্রথম লেখক যিনি সাহিত্যিক রসবিচারে সত্যিকারের উন্নত মানের গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে প্রয়াসী ও সক্ষম হয়েছেন। তাঁর হাতে বাংলা গোয়েন্দা গল্প উচ্চমানের শিল্প ও সাহিত্যের পর্ষায়ে উন্নীত হয়েছে। সমসাময়িককালে প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীহারবঙ্কন গুপ্ত ও পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায় প্রমুখ লেখকগণও বেশ কিছু সার্থক গোয়েন্দা কাহিনী লিখেছেন। সন্তোষকুমার ঘোষ মশাইয়ের “আমার প্রিয় সখী”, সমরেশ বোসের “হুয়াধনি”, মুস্তাফা সিরাজের “ঘটনা ঘন বহুস্তজনক” ও নাগায়ণ সান্তালের “উলের কাটা” বাংলা গোয়েন্দা কাহিনীতে এক সাহিত্যিক সংযোজন। তবে পরিতাপের বিষয় আমাদের সাহিত্যের অভিজাত পাঠক ও লেখকগণ আজও গোয়েন্দা বা বহুস্ত সাহিত্যের অঙ্গনে প্রকাশ্যে বিচরণে আগ্রহী নন। তবে অভিজাততর অনেকের হাতেই একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্ত নিঃসঙ্গতার সঙ্গ হিসাবে দেখা যায় “মুহূর্ত”-অথবা “নিঃসঙ্গ নায়িকা” তায় রসাল রোমাঞ্চকর বোবালো বই। সর্ববর্ণে হস্ত সর্বকালেই

গোয়েন্দা তথা রহস্য সাহিত্যের পাঠক পাঠিকা যে-কোন তথাকথিত সংসাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশি। আর বিশ্বব্যাপী জনশিক্ষার প্রসারে ও গণশিক্ষার প্রসারে যে বই মুক্ত হুনিয়ায় সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তা হচ্ছে, গোয়েন্দা, রহস্য ও রোমাঞ্চকর রোমান্সের দুঃসাহসী কাহিনী।

আব্রাহাম লিঙ্কন হতে জোসেফ স্টালিন কেউই এডগার আলেন পোর কম অমুখ্যগী ছিলেন না আর আজকের বিধা বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবীতে সাধারণ ও অসাধারণ বিমানচারী ইরানী মাকিনা, আরব-ইজরাইল, বাজালা-পাকিস্তানসকলেরই হাতে হাতে ইরান স্ট্রিমিং হেডলি চেন, নিকোলাস ব্রেক প্রমুখের পেশার ব্যাকের নিরবচ্ছিন্ন পারফরম্যান্স।

আর আমাদের মশা ক্রিষ্ট (নব পর্ষদে) ম্যালেরিয়া পুনঃব্যাধি, বিদ্যুৎ বিদ্যুতিত বাংলাদেশের ট্রেন, দূরগামী বাসচারী মাস্টারের হাতে অভিজাত লেখনী মজাৎ রোমকেশ, পরাশর, ফেলুদা, ছাড়াও হরিনারায়ণের পারজাত বজ্রা, অশ্রীণ বর্ধনের ইজ্ঞান, মুস্তফা সিরাজের কর্ণেল এবং সত্যিকথা বলতে কি শ্রীমদনকুমার সিরাজেরও অপ্রতিরোধ্য গতি।

তাই আজকের বঙ্গোপকূল সমস্যা আকীর্ণ অস্থির উন্নত পৃথার ব্যস্ত সমস্ত অস্ত্র মাস্টার তাঁদের নষ্টহুট জীবনের ক্ষণিক আনন্দের ভোজ্য হিসাবে গোয়েন্দা ও রোমাঞ্চকর কাহিনীকে গ্রহণ করে। আর রহস্য ও গোয়েন্দা সাহিত্যেও যখন সমাজ ও জীবনের বাস্তবতার বিস্তৃত প্রতিফলন ও মানবিক উত্তরণ দেখান সম্ভব তখন সংসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকদের তত্ত্বিষ্ট পোষকতায় গোয়েন্দা সাহিত্য সমৃদ্ধ হলে নিশ্চয় সমাজের সকলেরই মঙ্গল কারণ। পূর্বেই বলেছি সমস্ত মার্শক গোয়েন্দা গল্পের অন্তর্নিহিত মূল স্বরূপই শিষ্টের পালন ও দুষ্টির দমন; সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্।

তুমার কান্তি পাণ্ডে

ডিটেক্টিভ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি পুলিশের ডিটেক্টিভ কর্মচারী আমার জীবনে দুটিমাত্র লক্ষ্য ছিল। আমার স্ত্রী এবং আমার ব্যবসায়। পূর্বে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে ছিলাম, সেখানে আমার স্ত্রীর প্রতি সমাদরের স্বভাব হওয়াতেই আমি দানব শত্রু অগড়া করিয়া বাহির হইয়া আনি। দাদাগ উপাঙ্গন করিয়া আমাকে পালন করিতেছিলেন। অতএব মতসা সন্তানক তাঁহার আশ্রয় ভাগ করিয়া আসা আমার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ হইয়াছিল।

কিন্তু কখনও নিজের উপরে আমার বিধানের ক্রটি ছিল না। আমি নিশ্চয় জ্ঞানিতাম, গন্ধবী স্ত্রীকে যখন বশ করিয়াছি বিমুখ অন্তঃ লক্ষ্যকেও তেমন বশ করিতে পারিব। মাহিমচন্দ্র এ সংসারে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না। পুলিশ বিভাগে সামান্যভাবে প্রবেশ করিলাম। অবশেষে ডিটেক্টিভ পদে উত্তীর্ণ হইতে অধিক লিঙ্গ হইল না।

উজ্জনা এবং কালক যখন কজ্জলপাত হইতে তেমন আমার স্ত্রীর প্রেম হইতেও দীর্ঘ এবং সন্দেহের সান্নিধ্য বাহির হইত। সেটাকে আমার কিছু কাজের ব্যাঘাত করিত। কারণ পুলিশের কর্ম স্থানস্থান কালকাল বিচার করিলে চলে না, বরঞ্চ স্থানের অপেক্ষা অঙ্গান এবং কালের অপেক্ষা অকালটারই চা অধিক করিয়া করিতে হয়। তাহাতে কারো আমার স্ত্রীর স্বভাবানুকূ সন্দেহ আরও যেন দুনিবার হইয়া উঠিত। সে আমাকে ভয় দেখাওয়ার জন্য বলিত, “তুমি এখন যখন—এখন যেখানে—সেখানে যাপন কর, কালেভাল্লে আমার সঙ্গে দেখা হয়, আমার জন্য তোমার আশঙ্কা হয় না।” আমি তাহাকে বলিতাম, “সন্দেহ কর আমার ব্যবসায়, সেই কারণে ঘরের মধ্যে সেটাকে আর আনি না।”

স্ত্রী বলিল “সন্দেহ কর, আমাদের ব্যবসায় নহে, উহা আমার স্বভাব। আমাকে তুমি লেশমাত্র সন্দেহের কারণে সঙ্গে আম সব করিতে পার।”

ডিটেক্টিভ পদে আমি সকলের দেবা হইব, একটি নান রাশিব, এ প্রতিজ্ঞা আমার দৃঢ়। কিন্তু এ সংসারে বড় কঠোর এবং সজ্জ আছে তাহার কোনোদিকে পদে একটা নাই নাই। কিন্তু পাওয়া যেবে নবের এ ক্ষোভ এবং অসীমতা বাড়ি। লক্ষিত কারণ, আমাদের দেশের অপরাধাঙ্কন ভয় এবং নিবোধ, অপরাধের পালিত এবং করল, তাহার মধ্যে দুইকোটা দুইকোটা কিছুই নাই। আমাদের

বিশ্বভারতী কল্পপত্রের সৌভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গায়েন্দা গ্রন্থ “ডিটেক্টিভ” প্রকাশিত হইল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গলা সাহিত্যে গায়েন্দাগুলির পৃষ্ঠপোষকতা না করলেও তাঁর এই গায়েন্দাগুলি “ডিটেক্টিভ” গুলির অসুসাহায্যতা ও অব্যবহা ছাড়াও গায়েন্দা নিয়ে এক শরম বাজ কৌতুক প্রবাহ পাঠককে বসন্তিত করবে।

গায়েন্দা - প্রঃ (২)

দেশের খুনী নররক্তপাতের উৎকট উদ্বেজনা কোনোমতেই নিজের মধ্যে সম্বরণ করিতে পারে না। জালিয়াত যে জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতিবিলম্বে নিজেই আপাদমস্তক জড়াইয়া পড়ে, অপরাধ বৃহৎ হইতে নির্গমনের কটকৌশল সে কিছুই জানে না এমন নিজীব দেশে ডিটেক্টিভের কাজে স্থগণ নাই, গৌরবও নাই।

বড়োবাজারে মাড়োয়া বা জুয়াচোরকে অনায়াসে গ্রেফতার করিয়া কতবার মনে মনে বলিয়াছি, ‘ওরে অপরাধী কুলকলহ, পরের সর্বনাশ করা গুণী ও ওস্তাদ লোকের কর্ম; তোর মতো আনাড়ি নিবোধের সাধুতপস্বী হওয়া উচিত ছিল।’ খুনীকে ধরিয়া তাহার প্রতি স্বগত উক্তি করিয়াছি, ‘গভর্মেন্টের সমুদ্রত ফাঁসি কাষ্ঠ কি তোদের মতো গৌরববিহীন প্রাণীদের অস্ত্র হইয়াছিল—তোদের না আছে কঠোর আত্মসংযম, তোরা বেটোরা খুনী হইবার স্পর্ধা করিস।’

আমি কল্লনাচক্ষে যখন লণ্ডন এবং প্যারিসের জনাকীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে নীতবাস্পাকুল অত্রভেদী হর্ষশ্রেণী দেখিতে পাইতাম তখন আমার শরীর বোমাক্রান্ত হইয়া উঠিত। মনে মনে ভাবিতাম, ‘এই হর্ম্যরাজি এবং পথ উপ-পথের মধ্য দিয়া যেমন জনশ্রোত কর্মশ্রোত উৎসবশ্রোত সৌন্দর্য শ্রোত অহরহ বহিয়া যাইতেছে, তেমনি সর্বত্রই একটা হিংস্র কটিল কৃষ্ণকৃষ্ণিত ভয়ংকর অপরাধ প্রবাহ তলে তলে আপনার পথ করিয়া চলিয়াছে; তাহারই সমীপে যুরোপীয় সামাজিকতার হাস্তাকৌতুক শিষ্টতার এমন বিরাট ভীষণ বমগীরতা লাভ করিয়াছে। আর আমাদের কলিকাতার পথপার্শ্বের মুক্তবাতায়ন গৃহশ্রেণীর মধ্যে বায়া বাটনা, গৃহকাষ, পরীক্ষার পাঠ, তা সদাগার বৈঠক, দাম্পত্যকলহ, বড়োজোর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এবং মকদ্দমার পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছু নাই। কোনো একটা বাড়ির দিকে চাহিয়া কখনও একথা মনে হয় না যে হয়তো এই মুহূর্তেই এই গৃহের কোনো একটা কোণে শয়তান মুখ জুড়িয়া বসিয়া আপনার ছলে ডিমগুলিতে তা দাঁদতেছে।

আমি অনেক সময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকদের মুখ এবং চলনের ভাব পর্যবেক্ষণ করিতাম; তাহা হইতে বাহাদিগকে কিছু মাত্র সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেক সময়ই গোপনে তাহাদের অহুসরণ করিয়াছি, তাহাদের নামধাম ইতিহাস অহুসন্ধান করিয়াছি, অবশেষে পরম নৈরাশ্রের সহিত আবিষ্কার করিয়াছি—তাহারা নিষ্কল ভালো মানুষ এমন কি তাহাদের আত্মীয়-বান্ধবেরাও তাহাদের সম্বন্ধে আড়ালে কোন প্রকার গুরুতর মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে না। পথিকদের মধ্যে সব চেয়ে বাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে, এমনকি বাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি যে, একমাত্র যে কোনো একটি উৎকট দুষ্কার সাধন করিয়া আসিয়াছেন, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি—সে একটি ছাত্রবৃত্ত স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, তখনই অধ্যাপনকার্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এই সকল লোকেরাই অত্র কোনো দেশে জয় গ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোর ডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমাত্র যথোচিত জীবনী শক্তি এবং যথেষ্ট পরিমাণ পৌরুষের অভাবেই আমাদের

দেশে ইহারা কেবল দ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া কাটাইল। দ্বিতীয় পণ্ডিতটার মিরীহতার প্রতি আমার বৈরাগ্য স্বপ্নভীর অশ্রদ্ধা অনিয়মিত ছিল কোন অতি ক্ষুদ্র ঘটি বাটি চোবের প্রতি তেমন হয় নাই।

অবশেষে এক দিন সন্ধ্যাবেলায় আখানের বাসার অনতিদূরে একটি গ্যাস্পোষ্টের নীচে একটি মানুষ দেখিলাম, বিনা বাক্যব্যয়ে সে উন্মুগ্ন ভাবে একই স্থানে ঘূর্ণিতেছে কিরিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমার সন্দেহমাত্র রহিল না যে সে একটি গোপন ছুরতি ক্রির পশ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। নিজে অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার চেহারা নানা বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইলাম—তরুণ বয়স, দেখিতে সুশ্রী; আমি যাহাদের সর্বপ্রধান বিরুদ্ধ সাক্ষী তাহারা যেন সর্বপ্রকার অপরাধের কাজ সর্বদা পেরিবার করে, সংকার্য করিয়া তাহারা নিষ্কলঙ্ক হইতে পারে কিন্তু দুর্ভাগ্য দ্বারা সকলতা লাভও তাহাদের পক্ষে দুর্বাশা। দেখিলাম, এই ছোকরাটির চেহারা ইহার সর্বপ্রধান বাহ্যভূমি, সেই জন্য আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার তাকি করিলাম। বলিলাম, “ভগবান তোমাকে যে দুর্ভাগ্য সৃষ্টি দিয়াছেন সেটাকে হীনমিত কাজে পাটাইতে পার তুমি না বলি শাস্তি।”

আমি অন্ধকার হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়াই পৃষ্ঠ চপেটাঘাত পূর্বক বলিলাম, “এই যে ভালো আছেন তো ? সে তৎক্ষণাত্ত প্রবল মাত্রায় চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফাফাসে হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, “মান করিবেন, কিছুমাত্র ভুল করি নাই, যাহা ঠাণ্ডা হইয়াছিল তাই বটে।” কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল, ইহাতে আমি কিছু ক্ষুদ্র হইলাম। নিজের শরীরের প্রতি তাহার আরও অধিক দৃষ্টি থাকি উচিত ছিল; কিন্তু শ্রমের সম্পূর্ণ আদর্শ অপরাধ শ্রেণীর মধ্যেও বিরল। চোবকেও সেয়া চোব করিয়া তুলিতে প্রকৃতি কৃপণতা করিয়া থাকে।

অন্তরালে আসিয়া দেখিলাম, সে ত্রস্তভাবে গ্যাস্পোষ্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে গেলাম, দেখিলাম গোলদিগির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণী তীরে তৃণশয্যার উপর চিৎ হইয়া পড়িল, আমি তাই বলিলাম, উপায় চিন্তার এ স্থান বটে, গ্যাস্পোষ্টের তল দেশের অপেক্ষা অনেকাংশে ভালো—লোক যদি কিছু সন্দেহ করে তো বেড়াছোর এই ভাবিতে পারে যে, ছোকরাটি অন্ধকার আকাশে প্রেরণার মুখচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণ পক্ষ রাত্রির অভাব পূরণ করিতেছে। ছেলেরটির প্রতি উত্তরোত্তর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

অজ্ঞানতায় করিয়া তাহার বাসা জানিলাম। মধ্য তাহার নাম, সে কলেজের ছাত্র, পরীক্ষা ফেল করিয়া গ্রামবাসীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ সকলেই আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেছে। দীর্ঘ অবকাশ কালে সকল ছাত্রই বাসা ছাড়িয়া পালায়, এই লোকটিকে কোন দুঃগ্রহ ছুটি দিতেছে না সেটা বাহির করিতে কৃত সংকল্প হইলাম।

আমিও ছাত্র সাজিয়া তাহার বানায় এক অংশ গ্রহণ করিলাম, প্রথম দিন যখন সে আমাকে দেখিল, কেমন একরকম করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল তাহার ভাবটা ভালো বুঝিলাম না। যেন সে বিস্মিত যেন সে আমার অভিজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়াছে, এমনি একটা ভাব। বুঝিলাম, শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে, ইহাকে সোজা ভাবে ফস্ করিয়া কায়দা করা যাইবে না।

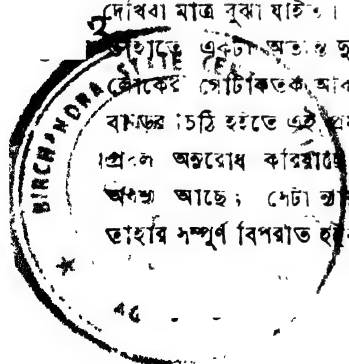
অথচ যখন তাহার সাহিত্য প্রণয় বন্ধনের চেষ্টা করিলাম তখন সে ধরা দিতে কিছুমাত্র ঈর্ষা করিল না। কিন্তু মনে হইল, সেও আমাকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখে সেও আমাকে চিনিতে চায়। মনুষ্যচরিত্রের প্রতি এইরূপ সদাসতর্ক সজাগ কৌতূহল, ইহা ওস্তাদের লক্ষণ। এত অল্প বয়সে এতটা চাতুরী দখিয়া বড়ো খুশা হইলাম।

মনে ভাবিলাম, মাঝখানে একজন রমণী না আনিলে এই অসাধারণ অকাল-ধূর্ত ছেলেটির হৃদয়দ্বার উন্মোচন করা সহজ হইবে না। একদিন গদগদ কণ্ঠে মন্থনকে বলিলাম, “ভাই, একটি জ্বালোককে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না।”

প্রথমটা সে যেন চকিত ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ঈর্ষ্য হাসিয়া কহিল “এরূপ দুযোগ বিবল নহে। এই প্রকার মজা কববার জন্তই কৌতুকপর বিধাতা নর নারীর প্রভেদ করিয়াছেন।”

আমি কহিলাম, “তোমার পরামর্শ ও সাহায্য চাই।” সে সম্মত হইল আমি বানাইয়া বানাইয়া অনেক ইং হাসি কহিলাম, সে সাগ্রহে কৌতূহলে সমস্ত কথা শুনিল, কিন্তু অধিক কহিল না। আমার ধারণা ছিল, ভালোবাসার বিশেষতঃ গভীর ভালোবাসার ব্যাপার প্রকাশ করিয়া কালকে মানুষের মধ্যে অবজ্ঞতা জন্ম বাড়িয়া উঠে বর্তমান যেন তাহার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, ছোকরাটি পূর্বাপেক্ষা যেন চুপ মাঝিয়া গেল, অথচ সকল কথা যেন মনে গাঁথিয়া লইল। ছেলেটির প্রতি আমার ভক্তির সীমা রহিল না।

এরূপে মন্থন প্রত্যহ গোপনে দ্বার বোধ করিয়া কী করে, এবং তাহার গোপন অভিমুখি কিরূপে কতদূর অগ্রসর হইতেছে আমি তাহার ঠিকানা করতে পারিলাম না, অথচ অগ্রসর হইতোছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কা একটা নিপুণ ব্যাণ্ডের সে ব্যাপৃত আছে এবং সম্প্রতি সে, অত্যন্ত পারদর্শী হইয়াছে, তাণ্ডা এত নবনবগতির মুখ দেখিয়া মাজ বুঝা যায়। আমি গোপন চাৰিতে তাহার ডেস্ক খুলিয়া দেখিয়াছি, সেখানে একটা অত্যন্ত সুবোধ্য কাঁচের খাতা, কলমের বন্ধতার নোট এবং ব্যাণ্ডের কয়েকটি স্টিকিটের আকাক্ষরিক চিহ্ন আছে। আর কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল ব্যাণ্ডের চিহ্ন হইতে এই প্রমাণ হইতে পারে, ব্যাণ্ডের বন্ধের উক্ত সাজিয়া যখন ব্যাণ্ডের প্রথম অস্ত্রবোধ করিয়াছে, তখনই তৎসম্বন্ধে ব্যাণ্ড না খানবার একটা সংস্কার কারণ অস্ত্র আছে; সেটা তখন সংগত হইত তবে সন্দেহ কবায় এখন কোন হইত, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকাতো এই ছোকরাটির গাভাবি এবং



ইতিহাস আমার কাছে এমন নিরতিশয় ঔৎসুকজনক হইয়াছে যে অসামাজিক মনুষ্য সম্প্রদায় পাতালে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া এই মনুষ্য সমাজকে সর্বদাট নীচের দিক হইতে দোলায়মান করিয়া রাখিয়াছে, এই বালকটি সেই বিশ্বব্যাপী বহু পুরাতন বৃহৎজাতির একটি অঙ্গ, এ সামান্য একজন স্কুলের ছাত্র নহে। এ জগৎ-বর্নবিহারিনীর সর্বনাশিনীর একটি প্রলয় সহচর; আধুনিক কালের চশমা পরা নির্বাহী বাঙালী ছাত্রের বেশে কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতেছে; নৃমুণ্ডধারী কাপালিক বেশে ইহার ভৈরবতা আমার নিকট আরও ভৈরবতর হইত না। আমি ইহাকে ভক্তি করি।

অবশেষে শরীরের রমণীর অবতারণা করিতে হইল। পুলিশের বেতনভোগী হরিমতি আমার অসহায় হইল। মন্থথকে জানাইলাম, আমি এই হরিমতির হতভাগ্য প্রণয়কাজী, ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি কিছুদিন গোলদিঘির ধারে মন্থথের পাখি চর হইয়া 'আবার গগনে কেন তুমি উড়িয়া উড়িয়া' কবিতাটি বারবার আবৃত্তি করিলাম। এবং হরিমতিও কতকটা স্বস্তির সহিত, কতকটা লাল্য সহকারে জানাইল যে, তাহার চিত্ত মন্থথকে সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু আশাভ্রষ্ট ফল হইল না। মন্থথ স্তব্ধ নিলিপ্ত হইয়াছিল। কৌতূহলের সহিত সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এক সময় একাদশ মধ্যাহ্নে তাহার ঘরের মেজেতে একখানি চিত্রের গুটিকতক ছিন্নাংশ কুড়াইয়া পাঠিলাম। ছোড়া দিয়া দিয়া এক অসম্পূর্ণ বাকাটুকু আলায় করিলাম। "আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় গোপনে তোমার পায়"—অনেক খুঁজিয়া আর কিছু বাহির করিতে পারিলাম না।

আমার অসংকরণ পুঙ্কিত হইয়া উঠিল। মাটির উপর হইতে কোনো বিলুপ্তবংশ প্রাচীন প্রাণীর একগুণ হাড় পাঠিলে প্রত্নজীবতত্ত্ববিদের কল্পনা :—মহানন্দে সজাগ হইয়া উঠে আমারও সেই অবস্থা হইল।

আমি জানিতাম, আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের বাসায় হরিমতির আবির্ভাব হইবার কথা। আজ, ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সাতটার সময় বাপাবাবানা কী : ছেলেটির যেমন সাহস তেমনি তাক্স বৃদ্ধি। যদি কোনো গোপন অপরাধের কাজ করিতে হয় তবে ঘরে যে কোন কোনো একটা বিশেষ হাঙ্গামা সই দান অবকাশ বুঝিয়া করা ভালো। প্রথমত প্রবান বাপাবাবের সঙ্গে সন্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ থাকে, দ্বিতীয়ত যেদিন যখন কোনো বিশেষ সমাগম আছে সেদিন সেখানে কেহ ইচ্ছাপূর্বক কোনো গোপন বাপাবাবের অনুপ্রাণিত করিতে ইচ্ছা কেহ সম্ভব মনে করে না।

ইচ্ছা আমার সন্দেহ হইল যে, আমার সহিত এই নৃতন বন্ধু এবং হরিমতির সহিত এই প্রেমভিনয়, ইহাকেও মন্থথ আপন কাষসন্ধির উপায় করিয়া লইয়াছে; এইজন্যই সে আপনাকে ধরাও দেয় না, আপনাকে ছাড়াইয়াও লয় না। আমরা তাহাকে তাহার গোপন কাষ হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছি, সকলেই মনে করিতেছে যে, সে আমাদের লইয়াই বাপূত বহিয়াছে—সেই সেই ভ্রম দূর করিতে চায় না।

তর্কগুলা একবার ভাবিয়া দেখো। যে বিদেশী ছাত্র দুটির সময় আত্মীয় স্বজনের অমুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া শূণ্য বাসায় একলা পাড়িয়া থাকে, নির্জন স্থানে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না, অথচ আমি তাহার বাসায় আসিয়া তাহার নিজনতা ভঙ্গ করিয়াছি, এবং একটা রমণীর অবতারণা করিয়া নূতন উপদ্রব সৃজন করিয়াছি; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে বিরক্ত হয় না, বাসা ছাড়ে না, আমাদের সঙ্গে হইতে দূরে থাকে না—অথচ হরিমতি অথবা আমার প্রতি তাহার তিলমাত্র আসক্তি জন্মে নাই ইহা নিশ্চয় সত্য, এমন কি তাহার অন্তর্ক অবস্থায় বারবার লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের উভয়ের প্রতি তাহার একটি আন্তরিক ঘৃণা ক্রমেই যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

ইহার একমাত্র তাৎপৰ্য এই যে, সজ্ঞতার সাক্ষাৎটুকু রক্ষা করিয়া নির্জনতার সুবিধাটুকু ভোগ করিতে হইলে আমার মতো নবপরিচিত লোককে নিকটে রাখা সর্বাপেক্ষা সহুশায়, এবং কোনো বিষয়ে একান্তমনে দিশূন হওয়ার পক্ষে রমণীর মতো এমন সহজ ছুতা আর কিছু নাই। হাতপূর্বে মন্থর আচরণ স্বরূপ নিরর্থক এবং সন্দেহজনক ছিল, আমাদের আগমনের পর তাহা সম্পূর্ণ লোপ হইল। কিন্তু একটা দূরের কথা মুহূর্তের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, এত বড়ো মতলবা লোক যে আমাদের বাংলাদেশে জয়গ্রহণ করিতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মন্থর কিছু যদি মনে না করিত তবে আমি বোধহয় তাহাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে পারতাম।

সেদিন মন্থর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তাহাকে বলিলাম, “আজ তোমাঞ্চে সন্ধ্যা সাতটার সময় হোটেল খান্সাইব সংকল্প করিয়াছি।” শুনিয়া সে একটু চমকিয়া উঠিল। পরে আশ্বসনদ্বয় করিয়া কহিল, “ভাই, মাপ করো, আমার পাক্ষস্বের অবস্থা আজ বড়ো শোচনীয়।” হোটেলের খানায় মন্থর কখনও কোনও কারণে অনভিক্রমিত দেখি নাই, আজ তাহার অন্তরিক্স নিশ্চয়ই নিতান্তই দুরূহ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বভাগে আমার বাসায় থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন গায়ে পাড়িয়া নানা কথা পাড়িয়া বৈকালের দিকে কিছুতেই আর উঠিবার গা করিলাম না। মন্থর মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, আমার সকল মতের সঙ্গেই সে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিল, কোনো তর্কের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। অবশেষে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বাকুলচিত্তে উঠিয়া পাড়াইয়া কহিল, “হরিমতকে আজ আনিতে যাইবে না?” আমি সচকতভাবে কহিলাম, “হাঁ হাঁ সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি আহাতিদি প্রস্তুত করিয়া রাখো, আমি ঠিক লাড়ে দশটা রাতে তাহাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিব।” এই বলিয়া চলিয়া গেলাম।

আনন্দের নেশা আমার সর্বশরীরের রক্তের মধ্যে সঞ্চার করিতে লাগিল। সন্ধ্যা

সাত ঘটিকার প্রতি মন্মথের যে প্রকার ঐশ্বর্য দেখিলাম আমার ঐশ্বর্য তদপেক্ষা অল্প ছিল না; আমি আমাদের বাসার অনতিদূরে প্রচুর থাকিয়া প্রেমসী সমাগমোৎকর্ষিত প্রণয়ীর প্রায় মুহূর্ত্ত ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম। গোপালর অঙ্ককার ঘনাকৃত হইয়া যখন স্বাক্ষপথে গ্যাস জালিবার সময় হইল এমন সময় একটি কৃষ্ণকার পাল্কি আমাদের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ আচ্ছন্ন পাল্কিটির মধ্যে একটি অশ্রুসিক্ত অবগুষ্ঠিত পাপ, একটি মূর্ত্তিমতী ট্রাজেডি কলেজের ছাত্রনিবাসের মধ্যে গুটিকতক উড়ে বেহারার স্বন্ধে চাপিয়া দম্ভ হাঁট-হাঁট শব্দে অভ্যস্ত অনায়াসে সহজ ভাবে প্রবেশ করিতেছে কল্পনা করিয়া আমার সর্বশরীরে অপূর্ব পুলক সঞ্চার হইল।

আমি আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। অনতিকাল পরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিলাম। ইচ্ছা ছিল, গোপনে লুকাইয়া দেখিয়া শুনিয়া লইব, কিন্তু তাহা ঘটিল না; কারণ সিঁড়ির সম্মুখবর্তী ঘরেই সিঁড়ির দিকে মুখ করিয়া মন্মথ বসিয়াছিল এবং গৃহের অপর প্রান্তে বিপরীত মুখে একটি অবগুষ্ঠিত নারী বসিয়া মুহূর্ত্তের কথা কহিতেছিল। যখন দেখিলাম মন্মথ আংগকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম, “ভাই আমার ঘড়িটা ঘরে ফেলিয়া আনিয়াছি, তাহা লইতে আসিলাম।” মন্মথ এমনি অতিভূত হইয়া পড়িল যে, বোধ হইল যেন তখন সে মাটিতে পড়িয়া যাইবে। আমি কোতুক এবং আনন্দে নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, “ভাই, তোমার অস্থখ বরিয়াছে নাকি।” সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। এখন সেই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ আড়ষ্ট অবগুষ্ঠিত নারীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি মন্মথের কে হন না?” কোনো উত্তর পাইলাম না, কিন্তু দেখিলাম তিনি মন্মথের কেহই হন না, আমারই স্ত্রী হন। তাহার পর কী হইল সকলে জানেন। এই আমার ডিটেক্টিভ পদের প্রথম চোর ধরা।

আমি কিয়ৎক্ষণ পরে ডিটেক্টিভ মহিমচন্দ্রকে কহিলাম, “মন্মথের সহিত তোমার জ্ঞার সম্বন্ধ সমাজবিরুদ্ধ না হইতেও পারে।” মহিম কহিল, “না হওয়াও সম্ভব। আমার জ্ঞার বাক্য হইতে মন্মথের এই চিঠিখানি পাওয়া গেছে।” বলিয়া একখানি চিঠি আমার হাতে দিল, সেখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সুচরিতান্ত,

হৃতভাগা মন্মথের কথা তুমি বোধকার এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছ, বাল্যকালে যখন কাজি বাড়ির মাতুলালয়ে যাইতাম, তখন সবদাই সেখান হইতে আমাদের বাড়ি গিয়া তোমার সহিত অনেক খেলা করিয়াছি। আমাদের সে খেলাঘর এবং সে খেলার সম্পর্ক ভাঙিয়া গেছে। তুমি জান কি না বলিতে পারি না, একসময় ধৈর্যের বাধ ভাঙিয়া এবং লজ্জার মাথা খাইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বয়স প্রায় এক বলিয়া উভয় পক্ষেরই কর্তারা কোনোক্রমে রাজি হইলেন না।

তাহার পর তোমার বিবাহ হইয়া গেলে চার পাঁচ বৎসর তোমার আর তার

কোনো সন্ধান পাই নাই। আজ পাঁচ মাস হইল তোমার স্বামী কলিকাতার পুলিশের কর্ম লইয়া শহরে বদলি হইয়াছেন, খবর পাইয়া আমি তোমাদের বাসা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

তোমার সহিত সাক্ষাতের চুরাশা আমার নাই এবং অন্তর্ধানী জানেন, তোমার গার্হস্থ্যস্থের মধ্যে উপদ্রবের মতো প্রবেশ করিবার দুঃখিতসন্ধিও আমি রাখি না। সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসার সম্মুখবর্তী একটি গ্যাসপোর্টের তলে আমি সূক্ষ্ম-পাকের স্ত্রায় দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি ঠিক সাড়ে-সাতটার সময় একটি প্রজলিত কেবোসিন ল্যাম্প লইয়া প্রতাহ নিয়মিত তোমাদের দোতলায় দক্ষিণ দিকের ঘরের কাঁচের জানলাটির সম্মুখে স্থাপন কর; সেই সময় মুহূর্তকালের জন্ত তোমার দীপালোকিত প্রতিমাখানি আমার দৃষ্টি পথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তোমার সম্বন্ধে আমার এই একটি মাত্র অপরাধ।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে তোমার স্বামীর সহিত আমার আলাপ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র ধ্বংসকর দেখিলাম তাহাতে বুঝিতে পারি নাই যে, তোমার জীবন স্থগিত নহে। তোমার প্রতি আমার কোনো প্রকার সামাজিক অধিকার নাই কিন্তু যে বিধাতা তোমার দুঃখকে আমার দুঃখে পরিণত করিয়াছেন, তিনিই সে দুঃখ মোচনের চেষ্টা তার আমার উত্তরেই স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব আমার স্পর্ধা মাপ করিয়া শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সাতটার সময় গোপনে পাল্কি করিয়া একবার বিশ মিনিটের জন্ত আমার বাসায় আসিলে আমি তোমাকে তোমার স্বামী সম্বন্ধে কতকগুলি গোপনকথা বলিতে চাহি, যদি বিশ্বাস না কর এবং যদি সহ্য করিতে পার তবে তৎসম্বন্ধে প্রমাণও দেখাইতে পার, এবং সেই সম্বন্ধে কতকগুলি পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি, আমি ভগবানকে অন্তরে রাখিয়া আশা করিতেছি, সেই পরামর্শমতে চলিলে তুমি একদিন সুখী হইতে পারিবে।

আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নহে, কণকালের জন্ত তোমাকে সম্মুখে দেখিব, তোমার কথা শুনিব এবং তোমার চরণ তল স্পর্শে আমার গৃহখানিকে চিরকালের জন্ত সুখ-স্বপ্নমণ্ডিত করিয়া তুলিব, এ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তরে আছে। যদি আমাকে বিশ্বাস না কর এবং যদি এ সুখ হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিতে চাহ, তবে সে কথা আমাকে লিখিয়া, আমি তদন্তের পর যোগেই সকল কথা জানাইব। যদি চাঠি, লিপিব্যবস্থার বিশ্বাসও না থাকে তবে আমার এই পত্রখানি তোমার স্বামীকে দেখাইয়া তাহার পরে আমার বাসা বন্ধবা তাহা তাঁহাকেই বলিব।

মিতান্ত্রতাকারুণী



নীলমাণ দারোগা

বহুনাথ ভট্টাচার্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ খুলনায় ॥

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন খুলনা যখনইর জেলার অন্তর্গত একটি থানা মাত্র। তখন খুলনায় জল-পুলিশ ও জল পুলিশের বড় আড্ডা ও কালেক্টরের অফিস ছিল। খুলনায় অনেক চোর ডাকাতি ধরা পড়িত, খুলন হইতে দুই-তিন দিনের পথে নিয়া চুরি ডাকাতি হইত। এখন যেমন বহুনাথের পুলিশ বিভাগে পদ-বিভাগ করা হয়, তখন তেমন বুদ্ধি ও চুরি-ডাকাতি আন্দাকা করিবার ক্ষমতা অনুসারে লোক নিযুক্ত করা হইত।

পুলিশের বড় কর্তা ক্যাপ্টেন হগ সীমার সহযোগে বাসার অনেক স্থানে জল-পুলিশের

অনেক আড্ডা পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি খুলনার নিকটে নদীগর্ভে একটি সন্দেহজনক মৃতদেহ পাইয়াছেন। মৃতদেহটির গলা প্রায় বারো আনা কাটা ছিল। তাহার মাঝায় একটি দড়ি দিয়া এক মেটে কলসী বাঁধা ছিল। কলসী জলে সম্পূর্ণ ডুবে নাই। সীমার চালানোর টেউতে কাপ্তেন হগ মৃতদেহের মাথা দেখিতে পান। তিনি মৃতদেহটা তুলিয়া লইলেন। মৃতদেহ হইতে পাইয়াছেন তিনি একটি মেটে কলসী, একগাছ দড়ি, একখানি পরিধেয় বস্ত্র, একখানি গামছা ও একগাছি লম্বা পৈতা।

পুলিসের বড় কর্তা কাপ্তেন হগ খুলনায় আসিয়াছেন। খুলনা থানার বড় প্রাক্ষণে তাহার তাঁবু শড়িয়াছে : দলে দলে লোক অসিয়া কাঁথপ্রার্থী হইতেছে। কেহ কনেষ্টবলী, কেহ রাইটার কনেষ্টবলী, কেহ হেড্-কনেষ্টবলী ও কেহ দারোগাগিরী কার্খের উমেদারী করিতেছে। আমাদের নালমণিও আজ দারোগাগিরী চাকুরী প্রার্থী। কাপ্তেন হগের কথা এইরূপ যে, যিনি এই খুন আস্কারা করিতে পারিবেন, তিনি দারোগা ও বাঁহারা এই খুন আস্কারা সহজে সাহস করিবেন, তাহার গুণানুরূপে কনেষ্টবল ও হেড্-কনেষ্টবল হইবেন।

নীল। আমি দারোগাগিরী কাঁথের প্রার্থী।

হগ। তুমি কি লম্বা পড়া জানে?

নীল। আমি বাংলা, উর্দু, পার্শী ও অল্প অল্প ইংরাজী জানি।

হগ। তুমি খুন আস্কারা করিতে জানে?

নীল। আজ্ঞে, তা পারি।

হগ। মনে কর, আমি জলে একটি খুন পাইয়াছি। খুনের সঙ্গে আর পাইয়াছে একটি কলসী, একখানি কাপড়, গামছা ও পৈতা। এটে তুমি খুন আস্কারা করিতে পারে?

নীল। মৃত ব্যক্তির মাপ ও ছবি রাখেন নাই?

হগ। ই, তাও পাবে।

নীল। তবে তো খুন আস্কারা করা অতি সহজ, সবই ত আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৥ নিয়োগ ॥

অনন্তর কাপ্তেন হগ দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন এবং নীলমণিকে তাঁবুর মধ্যে লইয়া পরামর্শ করিতে বলিলেন। কাপ্তেন হগ বলিলেন—“তুমি এই খুন আস্কারা করিতে চাহিলে কি কি চাহে?”

নীলমণি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন,—“এই খুন আস্কারা করিতে, চাই তাহার নক্সা, মাপ, ঐ কলসী, পৈতা, কাপড় ও গামছা, চারজন কনেষ্টবল, তাহার মধ্যে তিন

জন গান ও খোলকরতালে বিশেষ অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক আর একখানি নৌকা ও কিছু টাকা আরও চাই সকল খানার দারোগার উপর এই মর্মে এক পরোয়ানা যে, আমার যখন যত কনষ্টেবল, দারোগা ও চৌকিদারের প্রয়োজন হইবে, তখনই তা সব দিবে।

হুগ। কাল এগারটার সময় টুপি এ সব পাবে। এ সব পেলে টুপি খুন আস্কারা করিতে পারিবে?

নৌল। আজ্ঞে, নিশ্চয় পারিব।

পরদিন বেলা এগারটার সময় নৌলমণি কাপ্তেন হগের সহিত দেখা করিলেন। চারজন গায়ক, কনষ্টেবল, একখানি দুই মাল্লা নৌকা, পাঁচশটি টাকা ও মৃত ব্যক্তির সহিত যে যে জ্রা ছিল, তাহা ও মৃতব্যক্তির একখানি ছবি ও মাপ প্রাপ্ত হইলেন। নৌকায় আরও তিনটি দাঁড় বসাইলেন। একটি খোল, দুই জোড়া করতাল, পাঁচটি বাউল বৈরাগীর পোষাক ও কৃত্রিম দাড়ী গোঁফ প্রস্তুত করিলেন। মাঝিদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা বাউল বৈরাগী। তাঁহারা পূর্বদেশে ভিক্ষা করিতে গমন করিবেন। সেদিন আয়োজনই কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে নৌলমণি পূর্ব উত্তরাভিমুখে নৌকা চালাইয়া দিলেন। নৌলমণির নাম হইল জগদানন্দ গোস্বামী ও অন্য চারজন লোকের নাম হইল যথাক্রমে অভুলানন্দ বাবাজী, প্রেমানন্দ বাবাজী, পুলকানন্দ বাবাজী ও নিত্যানন্দ বাবাজী। সকলেই গৈরিক কোপীন পরিধান করিল ও গৈরিক আলখাল্লায় সর্ব শরীর আচ্ছাদিত করিল।

তৃতীয় পারচ্ছেদ

॥ কুস্তকার গৃহে ॥

বৈরাগী বাবাজীরা স্থানে স্থানে কুস্তকার বাটীতে খুব গান করিয়াছেন ও বেশ চাউল ডাইল উপার্জন করিয়াছেন। বাবাজীদের ভিক্ষার পাত্র একটি কলসা।

জগদানন্দ প্রভু স্নান করিয়া আসিয়া পাক করিতে বসিলেন। প্রভু তিনবার স্নান করেন। প্রচার আছে যে, প্রভু নানাপ্রকার আদি ভৌতিক ঔষধ ও কবচ জ্ঞানেন। আজ গোপাল পালের বাটীতে তাঁহারা অতিথি! গোপালের মাতা রন্ধনের আয়োজন করিতেছেন। গোপালের কোন সম্ভান-সম্ভতি হয় নাই! জামহলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, গোপালের স্ত্রী বধ্যা কিন্তু গোপালের মাতা এখন ঔষধ কবচ কুড়াইতে বিবর্ত হন নাই। প্রভু জগদানন্দ রন্ধন করিতেছেন এবং গোপালের মাতা রন্ধনের আয়োজন করিতেছেন। গোপালের মাতা যুক্ত কবে বলিলেন—“প্রভু শুনলাম, আপনি অনেক ঔষধ ও কবচ জ্ঞানেন। আপনি বেশ গোনা পড়া জ্ঞানেন। আপনি গুণে বলুন, আমার গোপালেন্দ্র ছেলেপিলে হয় না কেন এবং একটি ভালো ঔষধ দিন।”

জগ। আজ হ'তে বাতে বিকালে তোমার বাড়ী হ'তে এক পক্ষের মধ্যে কে কলসী নিয়েছে ?

গোপালের মাতা অনেকক্ষণ চিন্তার পর বলিলেন—“গত মঙ্গলবার দিন প্রায় দুই প্রহর রাত্রিতে বাবুবাবুদের বাড়ীর বিধু চোপদার একটি কলসী লইয়াছিল।”

জগ। তবেই হয়েছে, তবেই হয়েছে। দুধ নাই, তা ছেলে হয়ে পাবে কি ? উড়োবানে আগে তোমার গোপালের জীব দুধ নষ্ট করেছিল। সেদিন বাজে কলসী নিয়ে একেবারে আসল বানে সর্বনাশ করেছে। যা হ'ক, কলসী আমার হাতে পড়েছে। আমি দোষদৃষ্টির কলসীই শোধন ক'রে নিয়ে ভিক্ষা করি। দোষটা আমি আগেই কেটে দিয়েছি। আমি জলপড়াও প্রস্তুত হ'লে দিচ্ছি, আজ হ'তে এক বৎসরের মধ্যে তোমার গোপালের সুস্থান হবে :

সে রজনী কুস্তকার বাটীতে অতীত হইল। গোপালের মাতা জলপড়া ও কবচ পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন। শ্রোতৃগণ আবার প্রভুদের আহ্বানে মগ্ন হইয়া আসিতে বলিলেন। প্রায় রজনী অতিবাহিত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ রজক-গহে ॥

পরদিন প্রাতে বৈষ্ণব প্রভুগণ কুস্তকার বাড়ী ছাড়িয়া পথ বাগিয়া চলিলেন। তাঁহার যে সে বাড়ীতে গান করেন না—প্রকৃত হরিভক্তের বাড়ীতেই গান করেন। কিছু দূর যাইতেই অতুলানন্দ প্রভু বলিলেন—“প্রভো ! এ মথুরানাথ রজকের বাড়ী, কি করা যাইবে ?”

জগদানন্দ প্রভু বলিলেন—“মথুরের না প্রকৃত হরিভক্ত। এ বাড়ীতে হরিনাম করতে হবে।”

এই বলিয়া জগদানন্দ প্রভু তাঁহার ভিক্ষার কলসীর গলায় একখানি কাপড়ে ধোপার চিহ্ন দেখাইয়া বলিলেন,—“বল দেখি মথুরের মা, এই কাপড়ের দাগটি কার ? এই কি তোমার মথুরের দেওয়া।”

মথুরের মাতা হাসিয়া উত্তর করিল,—“এ দাগ তো মথুরেরই দেওয়া। এ দাগ মথুর দেয়, আমি দেই ও আমার এক ছোট মেয়ে দেয়। এই দাগ বাবুবাবুদের বাড়ীর গোমস্তা রমাকান্ত চক্রবর্তীর কাপড়ে দেওয়া হয় ! কিন্তু সেট ঠাকুর আজ সাত পাঁচ দিন নিরুদ্দেশ। সেই সঙ্গে রামটল পাড়েকে পাওয়া যাইতেছে না।”

জগ। চূপ কর, চূপ কর মা, বাজে কথা কাজ নাই। কোন ছুট লোক তোমার মেয়ের ছেলে, কি ছেলের চিরুমা নষ্ট করেছিল। জলপড়া ও কবচ লও। আমরা আর দেরি করতে পারি না, এখনই উঠবো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ থানায় ॥

চৈত্র মাস, বেলা প্রায় একপ্রহর হইয়াছে। থরকর সূর্য্যদেব প্রখরভাবে উদ্ভিত হইয়াছেন। বরিশাল জেলার পশ্চিম প্রান্তে এক থানার দারোগা বাবু এজলাসে বসিয়া আছেন। থানা লোকে পূর্ণ হইয়াছে। এমন সময় আর এক নূতন দারোগা থানাগৃহে প্রবেশ করিলেন। নূতন দারোগার সহিত মাত্র চাৰিজন কনেষ্ট ব্ল। নূতন দারোগা অজ্ঞাত লোকদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তিনি থানার দারোগাকে এক পরোয়ানা দেখাইয়া বলিলেন—“আমি চাই, এমন একখানি জুতগামী নৌকা, বেলা একটার মধ্যে একশত চৌকাদার দশ বারজন কনেষ্টবল, তিনজন সাব-ইন্সপেক্টার ও হেড কনেষ্টবল।”

থানায় দারোগা বাবু সূর্য্যদেবের সহিত বলিলেন—“আমি সব যোগাড় করছি। বেলা একটার মধ্যে সব পাবেন।”

থানার দারোগা বাবু এই কথা বলিয়া উক্তরবে দেবদাস সিং, পহাঁপত পাড়ে, দামটুহল দোবে, লক্ষ্মণ মিশ্র, বাহাদুর বিখাস, আবদুল করিম, কাজী এইজ্জি লস্কর প্রভৃতি কনেষ্টাবলদিগকে ডাকিলেন। তাঁহান দোবেকে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে একখানি জুতগামী নৌকা আনতে বলিলেন ও পাড়ে, মিশ্র এবং কাজীকে বেলা একাটটার মধ্যে দেড়শত চৌকাদার আনিতে তাহা দেশ কাগলেন, আর স্বর ও বিখাসকে কুড়িটি বন্দুক যোগাড় করিতে বলিলেন। থানায় ঘোর সমরায়োজন হইতে লাগিল।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে দোবে এক দো মাল্লার নৌকায় ছয় দাঁড় বসাইয়া তাহাকে জুতগামী করিয়া লইয়া আসিল। সে নৌকায় উঠিয়া নবাগত দারোগাবাবু তাহার সম্মুখে এক কনেষ্টবলের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মের একখানি পত্র লিখলেন :—

“মহামহিম মাহমার্বার শ্রীল শ্রীযুক্ত কাপ্তান হুগ সাহেব।

বাহাদুর প্রবল প্রতাপেশু।

সলাম বহুত বহুত আরো বিশেষ, আমি হুজুরের সন্দেশ হইতে বিদায় লইয়া ছুটিন দখে পথে ছিলাম। তৃতীয় দিন রাত্রিতে ঘটনার কতক অংশ জ্ঞাত হই। চতুর্থ দিন সকালে আরও কিছু অগ্গম্য হই। পঞ্চম দিন রাত্রিতে সমস্ত অবগত হইয়াছি। ঘটনা বড় বহুসংজ্ঞক। ঘটনায় বড় ঘরে কলঙ্ক, বড় ঘরের বহু লোকের জীবন লইয়া চান নান। আমার হুজুরের কাছে নিবেদন আছে। আমার প্রথম আস-কারোয় মাকদমার কাহাকেও ফাসি দিতে পারিবেন না। আমি সমস্ত বিষয়েরই আদ্যকারা কবদয়া। সরকার মনো আশা করিতে প্রেমতার কারব ও আর এক খুন আদ্যকারা কারব। হুজুর কন্য যত সত্যল আনিতে পারেন, ততই ভাল হইবে। আপন আসিয়া ছুৎ কল বজায় রাখিতে আজ্ঞা হয়। ইতি সন ১২১৩ সাল ভাদ্র ১৮ চৈত্র।

আবোজ্জ কারা

শ্রীনীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলা তিনটার সময় অমুক গ্রামের রাস্তাবাড়ীতে দেড়শত চৌকাদার বারো জন কনেটবল, তিনজন হেড কনেটবল ও দুইজন সাব-ইনস্পেক্টর উপস্থিত হইলেন। চৌকাদারগণ পদব্রজে ও পুলিশের লোকজন অশ্বপৃষ্ঠে। সূর্য্যকরে ঢাল, অগ্নি প্রভৃতি ঝক্ ঝক্ করিতেছে ও গুলিহীন বন্দুকের ছড়ুম ছড়ুম শব্দ শ্রুত হইতেছে। চারিদিকে চৌকদারী লাঠির ঠন ঠন শব্দ উদ্ভিত হইতেছে। সন্দের জন পুলিশ কর্মচারী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বহির্বাটিতে প্রবেশ লাভ করিলেন। তাঁহারা কালাকিশোর রায় ও তাঁহার কর্মচারী ও পাইক—স্বেচ্ছাদাগণকে বন্দী করিলেন। রায় বাড়ীর অতঃপুত্র ও বহির্বাটি তিনজন হেড-কনেটবল ও পাঁচ জন কনেটবল ও পঁচিশ জন চৌকাদারগণ বাধবগঞ্জ জেলায় অমুক থানায় উপস্থিত হইলেন। বিশ হাজার টাকা ঘুসের প্রস্তাবেও দারোগাধর কর্ণপাত করিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ কাপ্তেন হগের রিপোর্ট ॥

পঞ্চম দিন মধ্যাহ্নে কাপ্তেন হগ সীমারে বাধবগঞ্জ জেলার অমুক থানায় উপস্থিত হইলেন। অগ্রে নীলমণি, পরে সেই থানার দারোগাবাবু ও পরে অগ্রাগ্র পুলিশ-কর্মচারীগণ কাপ্তেনের সহিত দেখা করিলেন। নীলমণি খুনঘটিত আশঙ্ক্য বিবরণ কাপ্তেনকে জানাইলেন এবং কাপ্তেন নীলমণির সকল কথা বিশ্বাস করিলেন। জমিদার এবং তাঁহার কর্মচারীগণের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তাঁহাদিগের সাক্ষ গোপনেও কিছু কিছু কথা হইল। রায়বাবু ও স্বেচ্ছাদানজী জমিনে বাড়ী ঘাইবার অবসর পাইলেন। ক্রমে সকল জমিদারীর কর্মচারীগণ গৃহে ঘাইবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। কাপ্তেনের নিকট অনেক ডালি উপঢৌকন আসিতে লাগিল। মাছ, মাংস, মুরগী, আণ্ডা, মাখন, ঘি, মিষ্টান্ন, ফল-ফুলারি কতই আসিতে লাগিল। নীলমণি ও থানার দারোগা তৎক্ষণে তৎক্ষণে লাগিলেন। নবম দিনে জমিদার বাড়ী হইতে পুলিশ ও চৌকাদার-উঠাইয়া আনা হইল, দশম দিনে কাপ্তেন হগের রিপোর্ট প্রস্তুত হইল। রিপোর্ট শুনাইবার জন্য নীলমণি ও থানার দারোগাবাবুকে ডাকা হইল। রিপোর্ট এইরূপঃ—

“বাধবগঞ্জ জেলার মাজিষ্ট্রেট মহাশয় সমীপেষু,—

আমি বাঙ্গালা চৈত্র মাসের প্রথম ভাগে খুলনার নিকট নদীপথে একটি যুতদেহ প্রাপ্ত হই। নূতন দারোগা নীলমণি বন্দোপাধায়কে যুত ব্যক্তির পরিচয়ে বন্ধ, গামছা, তাঁহার উপবীত, সন্দের একটি কলসী, মাণ ও নক্কা দিয়া খুন তদন্ত করবার আদেশ দেই। নীলমণি অতি বিচক্ষণতার সহিত খুন আস্কারা করিয়া সাক্ষী প্রমাণ লইয়া রিপোর্ট প্রস্তুত করত আসামী চালান দিবার জন্য আমাকে পত্র লিখেন আশ্রম তদাহসারে তিন দিন সাক্ষী প্রমাণ লইয়া এই রিপোর্ট প্রেরণ পূর্ব্বক আশামোগণের দণ্ড প্রার্থনা করি।

কালীকিশোর রায় এক পুরাতন জমিদার বংশের লোক। এই বংশের বহু সংকার্য আছে। ইহাদের বাড়ীতে স্থল, ডাক্তারখানা, কবিরাজা গ্ৰন্থ খানা, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও পোষ্টোফিস দেখিলাম। কালীকিশোর ঘুরা পুরুষ। দুই এক বৎসর মাত্র জমিদারী দেখিতেছেন। সরকারী সার্কুলার, ক্লস ও বেগুলেশনের কিছুই জানেন না। পুরাতন জমিদার বাড়িতে যেমন হঠিয়া থাকে, সেইরূপ কালীকিশোর রায় মহাশয়ের অন্তঃপুরে একটি দাসী আছে। এই দাসীর নাম অলকমণি দাসী, মন্দচরিত্রা। রমানাথ চক্রবর্তী কালীকিশোরের ছোট ভ্রাতাকার। ইহার উভয়ে গোপনে মন্দ অভিপ্রায়ে অলকের লক্ষ্যতক্রমে তাহার ঘরে বাইত। রমানাথ অলকের ঘরে বাইয়া থাকিতে থাকিতে অলক কোন কাৰ্য উপলক্ষে বাহিরে যায়। এই সময় রামটহল এক স্ত-ধার তরবারি লইয়া অলকার ঘরে প্রবেশ করে। রমানাথ প্রাণভয়ে রামটহলের পেটে ছোরা মারে এবং রামটহল তরবারি দিয়ে রমানাথের গলায় কোপ মারে। ঐ আঘাতে রাত্রি এগারটার সময় রমানাথের মৃত্যু হয় এবং রাত্রি চারটার সময় রামটহলও ইহলোক পরিত্যাগ করে। জমিদার কালীকিশোর রায়ের অন্তঃপুরে এই খুন হওয়ায় তাঁহার কোন স্বজন—মহিলার উপর অন্তায়রূপ কলঙ্ক আরোপিত হইবে। আশঙ্কায় তিনি কর্মচারীবর্গের সহিত যোগে 'প্রথম খুন জলে ফেলিয়া দেন ও দ্বিতীয় খুন মাটিতে পুঁতরা রাখেন। জমিদার কালীকিশোর রায়, তাঁহার দেওয়ান ভবদেব চক্রবর্তী, পেদার নালকঠ মুখোপাধ্যায়, জমানবী রাজমোহন ঘোষ, হুগুনবাগ হরিমোহন দে, বধু চাপদার, গজপতি সিং, কাজল বিশ্বাস ও আইতল কর্ণন থাকে খুন গোপন করা অপরাধে চালান দিলাম। আমি অলকমণি দাসী মোহন পাড়ে প্রভাত জমিদারের চাকর ও চাকরাণীদের ও স্থল মাষ্টার শ্রীনাথ রায়, দেবনাথ রামুখুটি, স্ববন্ধুদার আচাৰ্য, কবিরাজ গঙ্গার মেন, পণ্ডিত জগমোহন বিজ্ঞানেশ্বর, শেঠমাষ্টার হরকুমার ঘোষ ও গ্রামের বিশিষ্ট ভ্রলোক মণিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ভুবনমোহন রায়ের জবান বন্দী লইয়াছি ও তাঁহাদের নির্দিষ্ট তারিখে কাছারাতে হাজির হইবার নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকা করিয়া মুচলেকা লইয়াছি। এ মোকদ্দমার হত্যাকারী ও হত ব্যক্তি উভয়েই মরিয়াছে, কেবল খুন গোপনকারীগণ মূল আসামী। কালীকিশোরের সঙ্কট অবস্থা, তরুণ বয়সে ও অনাভিজ্ঞতার কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। আগামী ৮ই এপ্রিল এই মোকদ্দমার বিচারের দিন স্থির হইয়াছে।"

রিপোর্ট শুনিয়া নীলমণি বলিলেন—"বেশ হয়েছে। পাশা দেবও অল্প অল্প দণ্ড হয় এবং কাহারও প্রাণদণ্ড না হয়, এই হ'লে বীচ।"

অপর দাবোগা বলিলেন—"মোকদ্দমাটা আমি অনুরূপ বুঝেছিলাম।"

হগ। মোকদ্দমাটা অগ্ররূপ বটে, নীলমণির ইচ্ছা জমিদার বাঁচে ও তাঁর বাড়ীর মেয়েলোকের নিশা না হয়। এটা কবিত্তে হইলে মোকদ্দমা একটু বদলাইতে হয়।

বি-দা। হাঁ হজুর! সকল দিক বজায় রাখতে হইলে এই বেশ রিপোর্ট হয়েছে।

এই সময় পর্যন্ত নূতন পেনাল কোড অর্থাৎ ভারতের দণ্ডবিধি আইন মঙ্কলন হয় নাই। এই সময়ে পুলিশের বড় সাহেবগণের মতান্তরমতেই মাজিস্ট্রেটগণ আসামীগণের দণ্ড করিতেন। চাই এপ্রল দুই খুনী মোকদ্দমার বিচার হইল। বিচারে কালীকিশোর রায়ের হাজার টাকা, তাহার দেওয়ানজীর হাজার টাকা ও তাহার অন্যান্য শিক্ষিত কর্মচারীগণের দুই শত টাকা ও শাইক পেয়ানগণের প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইল। রায়ে নীলমণি দাবোগার খুব প্রশংসা উঠিল।

সত্য গোপন থাকিবার জিনিস নহে। মোকদ্দমার বিচারান্তে ছয় মাসের মধ্যে প্রচার হইল, এই মোকদ্দমায় কালীকিশোর রায়ের ত্রিশ হাজার টাকা উৎকোচ লাগিয়াছে। নীলমণি ও অমুক থানার দাবোগা এক পরস্পর ঘৃণা লন নাই। বমানাথ চক্রবর্তীর আত্মায়গণ কোন নূতন কথা তুলিলেন না। তাহার আত্মায়গণ অজ্ঞাচার করায় তহবিল তহবিল দেড় হাজার টাকার বেয়াত পাইয়াছেন ও নগদ হাজার টাকা পাইয়াছেন। পাণ্ডের দেশ হইতে কেহ আসেও নাই, কেহ কিছু পায় নাই। গজপতি পাণ্ডেই সর্বময় কর্তা বলিয়া পরচয় নিয়াছেন এবং গজপতি দুই শত টাকা বকশিস পাইয়াছেন। যে আটজন পুলিশ কর্মচারী রায় পাণ্ডীর প্রহরা কার্ষে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা চারি হাজার টাকা পাইয়াছেন। এম খুন আনকারী করায় নীলমণি পাকা দাবোগা হইলেন, দুই সহস্র টাকা পুরস্কার পাইলেন ও কাশ্মির হগের স্বদৃষ্টিতে পরিতত হইলেন।

যতুনাথ ভট্টাচার্য : উনিবিংশ শতাব্দীর উষাকালে জন্ম গ্রহণ করে যে কয়েকজন সাহিত্যসেবী বাংলা ভাষাকে গোয়েন্দা গল্পের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন যতুনাথ ভট্টাচার্য মশাই তাঁদের অন্যতম। তাঁর লেখায় তৎকালীন বাঙ্গলা দেশের অসংখ্য প্রাচীন প্রশাসনের সংগঠন প্রয়াসী ভূমিকার নানা নিদর্শন ভরা য়ে আছে। যিনি “নীলমণি দাবোগা” নামক গল্পেও শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারী প্রচেষ্টার কলঙ্ক এক চিত্র ফুটি উঠেছে।



শেষ লীলা

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পারচ্ছেদ

দ্বিবা আন্ডাজ নয়টার সময় সংবাদ পাইলাম যে, কয়েক দিবস হইল, পাঁচু বোপানীর গলিতে রাজকুমারী নামী একটি জ্বালোককে কে হত্যা করিয়া, তাহার বখাসবস্ত্র অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিশের প্রধান প্রধান কর্মচারীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সেই অহুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কেংই তাহার কোনরূপঃসন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

যে সময়ে রাজকুমারীর হত্যা সংবাদ প্রথমে ধানার আলিয়া উপস্থিত হয়, সে দিবস আমি কলিকাতায় ছিলাম না, অপর একটি সরকারী কার্যের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম। কলিকাতায় যেমন এই সংবাদ জানিতে পারিলাম অমনি পাঁচু বোপানীর গলির যে বাড়ীতে রাজকুমারী হত্যা হইয়াছিল, সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দোখিলাম, সেই স্থানে বসিয়া চারি পাঁচজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী অহুসন্ধান করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া, তাঁহারা যে স্থানে বসিয়াছিলেন, অহুসন্ধান পূর্বক তাহার এক পার্শ্বে আমাকে বাসবার স্থান প্রদান করিলেন। আ ম সেই স্থানে উপবেশন করিলে, একজন কর্মচারী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিবস আপনি গোয়েন্দা—প্রথম(৩)

কোথায় ছিলেন ? আজ কয়েক দিবস হইল, এই হত্যা হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু আপনি একেবারে নিমিত্তও এদিকে আসেন নাই কেন ?”

আমি । আমি কলিকাতায় ছিলাম না । অপর কাণ্ডের নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম বলিয়া, আপনাদিগের সহিত এই অমুসন্ধানে যোগ দিতে পারি নাই । অতঃ কলিকাতায় আসিয়া এই ব্যাপার যেমন শুনিতে পাইলাম, অমনি আপনাদিগের সাহায্যের নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি । এখন আমাকে কি করিতে হইবে বলুন ?

কর্মচারী । আপনাকে এখন আর বেশী কিছু করিতে হইবে না, কেবল যে ব্যক্তি রাজকুমারীকে হত্যা করিয়া তাহার ধ্বংসার্থে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে কেবল তাহারই অমুসন্ধান করিয়া ধরিয়া দিলেই হইবে ।

আমি । আপনারা দেখিতেছি সমস্ত কার্যই প্রায় শেষ করিয়াছেন, আমার নিমিত্ত অতি অল্পই রাখিয়া দিয়াছেন ।

সেই সময় আমি আমার বাসায় গমন করিলাম । দ্বান-আহার বিজ্ঞামাদি করিয়া পুনরায় অপরাহ্ন চারিটার সময় সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম, কর্মচারী মহাশয় আমার অপেক্ষায় সেই স্থানে বসিয়া আছেন, আরও তিন-চারিজন কর্মচারী সেই স্থানে উপবিষ্ট । বাড়ীর ভাড়াটিয়ামাজেই বাড়ীতে উপস্থিত, কর্মচারীগণের নিকট ত্রৈলোক্য বন্ধনাবস্থায় বসিয়া রহিয়াছে ।

আমি সেই স্থানে গমন করিয়া, অপরাপর কর্মচারীগণ যে স্থানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে গিয়া উপবেশন করিলাম, এবং পূর্বকথিত কর্মচারীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলাম, “এই যে বন্ধনাবস্থায় বসিয়া আছে, এ ত্রৈলোক্য নহে ?”

কর্মচারী । ই ।

আমি । ইহার এ দশা কেন ?

কর্মচারী । হত্যাপরোধে এ দৃশ্য হইয়াছে ।

আমি । এই কি রাজকুমারীকে হত্যা করিয়াছে ?

কর্মচারী । ই মহাশয় । রাজকুমারীকে হত্যা করা অপরাধে এ দৃশ্য হইয়াছে ।

আমি । এই হত্যা ইহার দ্বারা হইয়াছে, তাহা কি বেশ প্রমাণিত হইয়াছে ?

কর্মচারী । এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত না হইলেও, এই হত্যা যে ইহার দ্বারা হইয়াছে, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই !

আমি । ইহার উপর সন্দেহ হইবার কারণ কি ?

কর্মচারী । যাহার ব্যবসাই কেবল হত্যা করা, তাহার দ্বারা যে এই হত্যা হয় নাই, তাহা আমি কিরূপে বলিতে পারি ?

আমি । হত্যাই যে ইহার ব্যবসা তাহা আপনাকে কে বলিল ?

কর্মচারী । তাহা আর কে বলিবে ? কেন আপনি জানেন না যে হত্যা করাই ইহার ব্যবসা । আপনিই এ হত্যাপরোধে ইহাকে চালান দিয়াছিলেন ।

আমি। পূর্বে হত্যাপর্যায়ে আমি ইহাকে চালান দিয়াছিলাম বলিয়াই যে, এই হত্যা ইহা দ্বারা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। পূর্বে আমি ইহার বিরুদ্ধে অনেক লোকের নিকট হইতে অনেক অনেক কথা শুনিতে পাই। সেইরূপ কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনের গতি ধারাপ হইয়া যায়। সেই সময় যেমন ইহার উপর একটি নালিশ হয়, অমনি আমি তাহা বিশ্বাস করিয়া, সেই মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই। অনুসন্ধান আর কি করি? ইহার শত্রুপক্ষীয় লোকে বাহা বলে, তাহারই উপর বিশ্বাস করিয়া, হত্যাপর্যায়ে ইহাকে দোষী স্থির করিয়া লই, এবং বিচারার্থ ইহাকে মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করি। মাজিস্ট্রেট সাহেব ইহাকে দায়বায় পাঠাইয়া দেন। যখন দায়বায় বিচারে সাক্ষীগণের উপর জেরা চলিতে থাকে, তখনই আমি বুঝিতে পারি যে, ত্রৈলোক্যকে আমি অনর্থক মিথ্যা কষ্ট দিয়াছি, অজসাহেবও সেই মোকদ্দমার বাপার ঠিক বুঝিয়াছিলেন, এবং ইহাকে সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধী জানিয়া অব্যাহতি প্রদান করেন। সেই মোকদ্দমার পূর্বে ত্রৈলোক্যের চরিত্রের উপর আমার যেমন বিশ্বাস ছিল, মোকদ্দমার পর হইতে সেই বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ত্রৈলোক্যের বাসনাই হত্যা, এই বিশ্বাস ব্যতীত এই মোকদ্দমার যদি ইহার উপর আর কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে ইহাকে নিরর্থক কষ্ট দিবে না, এখনই ইহাকে ছাড়িয়া দিন।

কর্মচারী। তাহা হইলে আপনার বিশ্বাস যে, এই হত্যা ত্রৈলোক্যের দ্বারা হয় নাই।

আমি। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, এই হত্যা ত্রৈলোক্য কর্তৃকই হয় নাই।

কর্মচারী। তবে কে এই হত্যা করিয়া, রাজকুমারের মৃত্যু অসম্ভব-পত্র চূড়ি করিয়া লইল?

আমি। কে যে এই হত্যা করিয়াছে, তাহা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু আমি যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি তাহাতে বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, এই হত্যা ত্রৈলোক্য কর্তৃকই হয় নাই। আরও একটু একটু শুনিতে পাইতেছি যে, এই হত্যা অত্র কোন লোকের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে।

কর্মচারী। তাহা হইলে বলুন না, আপনি কি শুনিয়াছেন, ও কে এই হত্যা করিয়াছে?

আমি। বলিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যখন সে সময় হইবে, তখন আপনি তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন। এখন ইহাকে ছাড়িয়া দিন, বিনা অপরাধে একজন বন্ধনাবস্থায় ইহাকে আর কষ্ট প্রদান করিবেন না।

আমার কথা শুনিয়া কর্মচারী মহাশয় ত্রৈলোক্যের বন্ধন মোচন করিয়া দিতে কহিলেন—জটিল প্রহরী আদেশমাত্র তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিল।

সেই সময় অপরাধের কর্মচারীগণকে সোধোদন করিয়া ক'হলাম, “আজ কয়েক দিবস পর্যন্ত আপনারা এই বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণের মধ্যে যে সকল অনুসন্ধান করিয়াছেন, বা

তাহাদিগের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। আমি জানিতে পারিয়াছি, ভীত হইয়া তাহারা কেহই প্রকৃত কথা কহে নাই। আমার বিবেচনা হয়, এখন তাহারা প্রকৃত কথা বলবে। এই বাড়ীর সমস্ত ভাড়াটিয়াগণকে ডাকাইয়া পুনরায় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন। দেখুন দেখি, এখন তাহারা প্রকৃত কথা বলে কি না?

ইহার পর সেই বাড়ীর কি জ্বী, কি পুরুষ, সকল লোককেই আমি সেই স্থানে ডাকাইলাম।

বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণ পুনরায় কিরূপ জবানবন্দী দেয়, তাহাই সকলে নিতান্ত ঐশ্বর্য্য সহকারে শ্রুতিতে লাগিলেন; ত্রৈলোক্যের মন্তক ঘুরিতে লাগিল; তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, তথাপি কে কি বলে, তাহা শুনিবার নিমিত্ত সে সেই স্থানে বাসিয়া রহিল।

পুনরায় সেই বাড়ীর ভাড়াটিয়াগণের বেক্ষণভাবে জবানবন্দী লেখা হইতে লাগিল, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এইরূপ :—

একটি জ্বীলোক কহিল,—“আমি হরিকে উত্তমরূপে চিনি। সে ত্রৈলোক্যের পুত্র। তাহার মাতার সহিত সে এই বাড়ীতেই থাকে। কোনরূপ কাণ্ড—কর্ম্ম করিতে তাহাকে কখনও দেখি নাই, বা শুনি নাই, অথচ বেঞ্চালয়ে গমন ও মজাদার পান করিতে তাহাকে প্রায়ই দেখিতে পাই। এই এই সকল কাণ্ডের নিমিত্ত যে সকল অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা সে কোথা হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতে পারি না।

যে দিবস রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার পূর্বদিবস সন্ধ্যার পূর্বে রাজকুমারীর সহিত সে নিঃস্বপ্নে ক্রীড়া করিতেছিল, তাহা আমি দেখিতে পাই, এবং উহারও আমাকে দেখিতে পাইয়া উভয়ে উভয় দিকে প্রস্থান করে। ইহার পর রাত্রি আন্দাজ বারটা কি একটার সময় আমি কোন কার্যবশতঃ আমার গৃহ হইতে বাহির হই।

সেই সময় দেখিতে পাই, হরি ধীরে ধীরে তাহার মাতার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রাজকুমারীর গৃহের দিকে গমন করিতেছে। রাজকুমারীর গৃহের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল না, কেবল ভেঁজান ছিল মাত্র। হরি সেই দরজা ধীরে ধীরে ঠেলিয়া নিঃশব্দে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি সেই সময় অচুমান করিয়াছিলাম, রাজকুমারী তাহার প্রেমে আসক্ত হইয়াছে, তাই হরি উহার গৃহে গোপনে গমন করিয়া থাকে। আমি পুলিশের ভয়ে একথা পূর্বে বলিতে সাহস করি নাই।”

অপর আর একটি জ্বীলোক কহিল,—“রাত্রি আন্দাজ দুইটার সময় আমি আমার গৃহ হইতে বহির্গত হই। আমার গৃহে একটি লোক ছিল, সেই সময় সে আমার গৃহ হইতে চলিয়া বাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, সন্ধ্যা দরজা খুলিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিবার নিমিত্ত, আমি তাহার সহিত আমার গৃহ হইতে বহির্গত হই এবং তাহার সহিত

সদর দরজা পৰ্যন্ত গমন করিয়া দেখি যে, সদর দরজা খোলা রহিয়াছে। কে যে সেই দরজা খুলিয়া বাহিরে গমন করিয়াছে, সেই সময় তাহার কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া, সেই দরজা ভিতর হইতে পুনরায় আমি বন্ধ করিয়া দিই। এবং আমার গৃহে গিয়া আমি শয়ন করি।”

তৃতীয় ভাড়াটিয়া কহিল—“যে দিবস রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, সেই দিবস অতি প্রত্যাশে আমি গাজোখান করিয়া আমার বাবুর সহিত আমি সদর দরজা পৰ্যন্ত গমন করি।

‘সেই সময় সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। সেই দরজা আমি খুলিয়া দিলে, আমার বাবু এই বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যান। সেই সময় দরজা আমি পুনরায় বন্ধ করিবার বাসনা করিয়া যেমন উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করি, সেই সময় হরি বাহির হইতে আসিয়া বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে। সেই সময় তাহার অবস্থা দেখিয়া, আমার মনে কেমন একরূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। উহাকে দেখিয়া আমি বেশ ক্রুদ্ধিতে পারিয়া-ছিলাম, ও যেন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছে, আর উহার মনে যেন কি একটি ভয়ানক চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উহার পূর্বে, আমাদিগের সহিত যখন হরির সাক্ষাৎ হইত, সেই সময় দুই একটা কথা না বলিয়া, সে কখনও প্রস্থান করিত না। কিন্তু সে দিবস আমার সহিত কোন কথা না বলিয়া, যেন নিতান্ত চিন্তিত অন্তঃকরণে সে তাহার মাতার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।”

চতুর্থ ভাড়াটিয়া কহিল,—“যে দিবস রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায় তাহার পূর্ব রাত্রিতে আমিই সকলের শেষে সদর দরজা বন্ধ করিয়া আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। আমি যখন সদর দরজা বন্ধ করি, তখন শোধহয়, রাত্রি বারোটা। সেই সময় হরিকে দেখিতে পাই, সে তাহার মাতার গৃহের সম্মুখে বারান্দার উপর চূপ করিয়া বসিয়াছিল। ওরূপ সময় ওই স্থানে আমি হরিকে ঈতিপূর্বে আর কখনো বসিতে দেখি নাই; সুতরাং আমার মনে একটু সন্দেহ হয়। মনে করি, বোধহয়, তাহার কোনরূপ অসুখ হইয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া আমি হরিকে জিজ্ঞাসা করি, এমন সময় ওরূপ ভাবে তুমি বাহিরে বসিয়া রহিয়াছ কেন? আমার কথায় হরি কোনরূপ উত্তর প্রদান করে নাই; সুতরাং তাহার ব্যবহারে আমি একটু বিরক্ত হইয়া তাহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আমার গৃহে গিয়া শয়ন করিয়াছিলাম।”

পঞ্চম ভাড়াটিয়া বা কামিনী কহিল,—“রাত্রি আন্দাজ বারটা কি একটার সময় আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। আমি আমার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, আমার গৃহের সম্মুখের বারান্দার উপর আসিয়া উপবেশন করি। সেই সময় রাজকুমারীর গৃহ হইতে কেমন একরূপ গোঁ গোঁ শব্দ আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করে। আমি উঠিয়া ধীরে ধীরে রাজকুমারীর গৃহের নিকট গমন করি, এবং তাহার গৃহের দরজা খেলিয়া দেখি, উহা ভিতর হইতে বন্ধ। বেড়ার কাঁক দিয়া দেখিতে পাই উহার গৃহে

একটি প্রদীপ জলিতেছে, মেঝের পাটির উপর রাজকুমারী চিং হইয়া শুইয়া বহিয়াছে, হরি তাহার বকের উপর বসিয়া বহিয়াছে, রাজকুমারী অন্ন অন্ন গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। এই বাপার দেখিয়া আমার মনে অল্প এক ভাবের উদয় হইল, আমি মনে মনে সর্বিশেষ লক্ষিত হইয়া আমার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। তৎপরে আমার গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া আমি আমার বিছানায় শয়ন করিলাম।”

ষষ্ঠ জ্বীলোক বা বিধু কহিল,—“যে দ্বিবেশ প্রাতঃকালে রাজকুমারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহার পূর্ব রজনী আন্দাজ একটাকি দেড়টার সময় আমি আমার গৃহ হইতে বাহিরে গমন করিয়াছিলাম। সেই সময় রাজকুমারীর গৃহ হইতে অন্ন গোঁ গোঁ শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করে। কিসের শব্দ তাহা আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, কিয়ৎক্ষণ আমার গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি। তাহার পরই দেখিতে পাই, হরি রাজকুমারীর গৃহ হইতে বাহিরে গমন করে, এবং ক্ষুণ্ণপদে সদর দরজার নিকট গমন করিয়া, সেই দরজা খুলিয়া বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যায়। যে সময় সে রাজকুমারীর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়, সেই সময় তাহার হস্তে সাদা কমাল বা সাদা নেকডার বাঁধা ছোটগোছের একটা পুঁটুলি ছিল। এখন আমার বেশ অনুমান হইতেছে যে, সেই পুঁটুলির মধ্যে রাজকুমারীর গৃহ হইতে অপহৃত অলঙ্কারগুলি ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা।” সেই বাড়ীতে বসন্তগুলি ভাড়াটিয়া ছিল, সকলেই কিছু না কিছু হরির বিপক্ষে বলিল। কেবলমাত্র প্রিয় কহিল,—“আমি ইহার কিছুই অবগত নাই, বাহিরের বিপক্ষে আমি এ পর্যন্ত কোন কথা শুনি নাই।” আমরা ত্রৈলোক্যকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। সাক্ষীগণ বৈরূপ জবানবন্দী দিতে লাগিল, ত্রৈলোক্য সেই স্থানে বসিয়া স্থিরভাবে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে একটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল।

এইরূপে সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া গেল। তখন কর্মচারী মাঝেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, “এখন এই যোকর্দ্দমার উদ্ধার হইল, এখন উত্তমরূপে জানিতে পারা গেল যে, এই হত্যা কাহার দ্বারা হইয়াছে। রাজকুমারীর গৃহ হইতে অপহৃত অলঙ্কারগুলি পাওয়া যাউক, বা না যাউক, এই সকল সাক্ষীর সাক্ষ্যে যে হরির ফাঁসি হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।”

এ পর্যন্ত হরিও সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া, সকল কথা শ্রবণ করিতেছিল। কর্মচারীগণের কথা শেষ হইবার পর, আমি কহিলাম, “এখন আর হরিকে এরূপভাবে রাখা উচিত নহে হত্যাকারীকে যেরূপ ভাবে রাখা হইয়া থাকে ইহাকে এখন সেইরূপ ভাবে রাখা কর্তব্য।”

আমার কথা শেষ হইবামাত্রই একজন কর্মচারী উঠিয়া হরিকে ধরিলেন, ও তাহার হাতে হাতকড়ি পরাইলেন; তৎপরে বস্ত্র দ্বারা পুনরায় উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া দুইজন প্রহরীর হস্তে তাহাকে অর্পণ করিলেন।

হরির মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। কেবল তাহার চক্ষু দিয়া বেগে:

জলাধারা বহিতে লাগিল, এবং সজলনয়নে মধ্যে মধ্যে এক একবার কেবল ত্রৈলোক্যের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, “মা! আমি তোমার পায়ে হাত দিয়া দিবা করিয়া বলিতে পারি, আমি ইহার কিছুই জানি না। রাজকুমারীকে আমি হত্যা করি নাই, বা তাহার অলঙ্কার পত্র প্রভৃতি কোন দ্রব্যই আমি অপহরণ করি নাই। আমি সমস্ত রাজি বাড়ীতেই ছিলাম, একবারের নিমিত্ত আমি বাড়ীর বাহিরে গমন করি নাই।”

আমরা হরির কথায় কর্ণপাত করিলাম না। অধিকন্তু তাহাকে কহিলাম, রাজ-কুমারীর গহনাগুলি তুমি কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ, তাহা এখনও বলিয়া দাও। নতুবা আমাদের হস্তে তোমার যন্ত্রণার শেষ থাকিবে না।”

*

*

*

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় : আজ থেকে প্রায় দেড় শ' বছর আগে ভদ্রগ্রন্থকরেও যে ক'জন সাহিত্যসেবী বাঙালী ভাষায় সাহিত্য অমূল্যলন করে আজকের দিনেও অনেক পাঠকের নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে বাঙালী গোয়েন্দা সাহিত্যের পথিকৃৎ হিসাবে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় নিশ্চয় এক উল্লেখ্য নাম। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের দারোগার দপ্তর ইত্যাদি গ্রন্থ বাঙালী সাহিত্যে রহস্য ও রোমাঞ্চের বহুমান স্রোতধারার উৎসমুখ উন্মোচনকারী গ্রন্থ। সেই সে কালের নবগঠিত দুর্বল পুলিশ-ব্যবস্থায় গোয়েন্দা কাহিনীর মালমশলা সংগ্রহ যে কোন লেখকের পক্ষে এক অসাধারণ প্রত্যঙ্গ। প্রিয়নাথবাবু যত্নাথ ভট্টাচার্য প্রমুখের দ্বারা বিভাগাগর; মধুসূদনের, সমসাময়িক হয়েও বাঙালী ভাষায় এক নতুন দিকের সন্ধান করেছেন। যে গোয়েন্দা ও রহস্য সাহিত্য আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাধারণ পাঠকের জনগণমন অধিনায়কের স্থান গ্রহণ করেছে তা আমাদের এই নদীনালা অধুষিত সেদিনের মশকত্যাড়িত গ্রীহ-বন্ধ ফাঁত বাঙালী জীবনের ব্যক্তিগত হত্যা, যত্না ও প্রতিহিংসার অল্পসঙ্কানের এক নতুন আত্মদান এনেছিল সাহিত্যে রসাত্মগ্রাহীদের তৃষ্ণার্ত বসনায়। সে যুগে বাংলা ভাষায় কয়েকজন প্রিয়নাথ নামধেয় লেখক সাহিত্যচর্চা করেন। তবে তাঁদের মধ্যে “দারোগার দপ্তর”-এর লেখক প্রিয়নাথবাবুই আজও পরিচয়ে অগ্নান।

*

*

*



হত্যাকারী কে ?

পাঁচকড়ি দে

হান্স, পরদিন প্রভাতের সেই ঘটনার সেই লোমহর্ষক ঘটনার, সেই ভয়ঙ্করী
 স্বতির হাত হইতে আমি কি মরিয়াও অব্যাহতি পাইব ?

তখন বেলা ঠিক দশটা। এমন সময়ে নরেন্দ্রনাথ উদ্বিগ্নস্বরে ছুটিয়া আসিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিলাম তাহার মুখ বিবর্ণ এবং দুটি উয়াদের মত। মুখ চোখের ভাবে যেন একটা কোন ভীষণতার ছায়া লাগিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

নরেন্দ্রনাথ দৃঢ়মুষ্টিতে আমার জামাটা ধরিয়া এমন একটা টান দিল, আর একটু হইলে বা জামাটা অধিক দিনের পুরাতন হইলে তাহাতেই সেটা একেবারেই ছিঁড়িয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ ব্যাকুলকণ্ঠে কেবল বলিতে লাগিল, “যোগেশনা, সর্বনাশ হয়েছে! যা ভেবেছিলাম, তাই হয়েছে—একেবারে খুন, আর উপায় নাই। যোগেশনা, কি হবে—তুমি চল—শীঘ্র এঁঠে—এমন খুনে সে—”

আমি বিস্ময়-বিস্ময়লচিতে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। সেই মুহূর্ত্তে একটা অনিবার্য বিমূঢ়তা আসিয়া আমার মস্তিষ্ক এমন পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া বাসিল যে, আমি নরেন্দ্রের কথা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। আমি তাহাকে একান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি হয়েছে নরেন। আমি তোমার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।”

দেখিলাম, নরেন্দ্রনাথের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। সে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, “সর্বনাশ হয়েছে যোগেশনা! লীলা নাই—শশিভূষণ কাল রাতে লীলাকে খুন করিয়াছে, পুলিশের লোক শশিভূষণকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।”

আর শুনেতে পাইলাম না, বজ্রাহতের গ্রায় সেইখানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিয়া পেলাম।

যখন কিছু প্রকৃতিস্থ হইলাম, দেখি নরেন্দ্রনাথ পাশে বসিয়া আমার চোখে মুখে জলের ছিটা দিতেছে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া তাহাকে বলিলাম, “আর কিছু করিতে হইবে না। সহসা এ ভয়ানক কথাটা শুনিয়াই—বাক, তুমি বলিতেছিলে না শশিভূষণকে পুলিশের লোক গ্রেপ্তার করিয়াছে?”

নরেন্দ্রনাথ কহিল, “তাহাকে অনেকক্ষণ চালান দিয়াছে, চালান দিতে শশিভূষণের উপরে বড় একটা জোর-জবরদস্তি করিতে হয় নাই; সে একটা আপত্তিও করে নাই—নিভেই ধরা দিয়াছে। হয়ত শশিভূষণের তখনও নেশার ঝাঁক ছিল। যাই হোক, তুমি একবার চল যোগেশনা, এমন সময়ে তোমার একবার যাওয়া খুবই দরকার, যদি কোন একটা উপায় হয়।”

আমি কম্পিতকণ্ঠে, কম্পিতহৃদয়ে এবং কম্পিতকলেবরে ভীতি-বিস্ময়ের গ্রায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “কোথায়? লীলাকে দেখিতে? দাঁড়াও—দাঁড়াও—নরেন। আমার একটু প্রকৃতিস্থ হইতে দাও—আমি বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বুকের ভিতরে যেন কি হইতেছে!”

আমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ আমার মনের অবস্থা দৃঢ়ক বুঝিতে

পারিয়াছিল। আমার কথার সম্মত হইল; কিন্তু সে একান্ত অধীরভাবে আমার অন্ত্র অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া আমি আর বড় বিলম্ব করিলাম না—তখনই বাহির হইলাম।

২

বখাসময়ে আমরা শশিভূষণের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া বাহা দেখিলাম, এ কাহিনীর মধ্যে একান্ত উল্লেখযোগ্য হইলেও, তাহা আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এই হত্যা সম্বন্ধে শশিভূষণের বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সেই যে দোষী, সে সম্বন্ধে আর কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গত রাতে উত্তানমধ্যে আমার সহিত শশিভূষণের যে সকল কথা হইয়াছিল, একজন দাসী তাহা শুনিয়াছে, সে নিজের অবানবন্দীতে আমাদের মুখনিঃসৃত প্রত্যেক কথাটিরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে। প্রাতঃকালে লীলার মৃতদেহ বিছানার পাশে পড়িয়া ছিল এবং তাহার বক্ষে একখানি ছুরিকা আমূল প্রোথিত ছিল; সে ছুরিকাখানি শশিভূষণের নিজেরই ছুরি। অনেকেই সেই ছুরিখানি তাহার বৈঠকখানা ঘরে অনেকবার দেখিয়াছে। সে যকম ধরনের প্রকাণ্ড ছুরি সে গ্রামের মধ্যে আর কাহারও ছিল না। শশিভূষণের বিরুদ্ধে আরও একটা বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, গতরাতে শয়নকালে তাহাদিগের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটা অত্যধিক বায়িতত্ত্ব হইয়াছিল এবং শশিভূষণ তাহাকে অত্যধিক প্রহার করিয়াছিল। লীলার কপালে একটা মুষ্টিঘাতের চিহ্নও ছিল। ডাক্তারী পরীক্ষার এইরূপ স্থিরীকৃত হয় যে, মৃত্যুর দুই-এক ঘণ্টা পূর্বে তাহাকে সে আঘাত করা হইয়াছিল।

এ সকল প্রতিপাত্ত প্রমাণ সম্বন্ধে সে যে স্বীহস্তা, তাহা শশিভূষণ স্বীকার করিতে সম্মত নহে। সে অবিচারিতভাবে এখনও বালিতেছে, সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তাহাকে কাঁসিই দাও—মার—কাট,—কর যা ইচ্ছা। তাই কর—সেজন্য সে কিছুমাত্র দুঃখিত নহে। শশিভূষণ সর্বসমক্ষে এখনও স্বীকার করিতেছে যে, তাহার পত্নীর প্রতি সে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিত, বন্দের খেয়ালই তাহার একমাত্র কারণ, নতুবা সে তাহার স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসিত; এক্ষণে লীলাকে হারাইয়া তাহার জীবন একান্ত দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। জীবন ধারণে তাহার তিলমাত্র ইচ্ছা নাই। শশিভূষণের এ সকল কথা কতদূর সত্য, তাহা বিবেচনা করিবার শক্তি আমার তখন ছিল না। আরও শুনিলাম, আমার সহিত একবার দেখা করিবার তাহার বড়ই আগ্রহ। যে কেহ তাহার সহিত দেখা করিতে বাইত, তাহাকেই সে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিত, আমি যেন একবার বাইরা তাহার সহিত দেখা করি।

শশিভূষণের সহিত দেখা করিবার আমার ততটা ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাহার

এইরূপ বারংবার আগ্রহ প্রকাশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একদিন আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

৩

নিজের হাজত ঘরে আমাকে উপস্থিত দেখিয়া শশিভূষণ অত্যন্ত আশ্চর্য হইল এবং আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে বলিয়া—আরও আমার সহিত যে সমুদয় অস্ত্রায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া, বারংবার আমার নিকটে অশ্রু-সিক্তকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তারপর বলিল, “তাই যোগেশ, তুমি আমাকে ক্ষমা করিলে; কিন্তু অভাগিনী লীলা কি এমন নরকের কাঁটকে কখনও ক্ষমা করিবে? আমি আজ আমার পাপের ফল পাইলাম। ধর্মের বিচার অব্যাহত—আজ না হউক, দুদিন পরে নিশ্চয়ই সকলকে স্বকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ করিতে হইবে; কেহই তাহার হাত এড়াইতে পারে না। আমি লীলার প্রতি যে সকল নিষ্ঠুরাচরণ কারিয়াছি, বোধ করি কোন কঠোর বাক্সেও তাহা পারে না। আমি মনুষ্য নামের একান্ত অযোগ্য—আমার স্ত্রীর মহাপাপীর নাম এ জগৎ হইতে চিরকালের জন্য মুছিয়া যাওয়াই ভাল। যোগেশ, আজ সকলেই বিশ্বাস করিয়াছে, আমি লীলার হত্যাকারী। তুমিও এই এমন বিশ্বাস কর নাই তাহাও নহে। জগতের সকলেরই মনে আমার মহাপাপের প্রারম্ভিক স্বরূপ এই ধারণা, এই বিশ্বাস চিরন্তনের অটুট এবং অটল থাকিবে। থাক—এবং তাহাতে আমি সুখী; কিন্তু তুমি—যোগেশ, তুমি যেন আর সকলের মত তাহা করিয়ো না, এই কথা বলিবার জন্যই আমি তোমার সহিত দেখা করিতে এত উৎসুক হইয়াছিলাম। আমার সত্য নাই, ধর্ম নাই, এমন কিছুই নাই, যাহা শাস্তি করিয়া স্বীকার করিলে তুমি কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পার। আমি ধর্মবিচ্যুত, মনুষ্যত্ব-বিবজিত, শত্রুতানের মোহমন্ত্রপ্রণোদিত, জগতের অকল্যাণের পূর্ণ প্রতিমূর্তি—আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে? তাই যোগেশ, তুমি তাই অবিশ্বাস করিয়ো না, তাহা হইলে মরিয়াও আমার সুখ হইবে না—এ জগতে এমন একজন থাক, সে যেন জানে, আমি একটা মহাপাপী ছিলাম বটে, কিন্তু জীবিত নই।”

বলিতে বলিতে শশিভূষণের কণ্ঠ কন্দিত এবং বাক্কন্ড হইয়া আসিতে লাগিল। সে দুই হাতে মুখ চাপিয়া বালকের স্তায় কাঁদিতে লাগিল।

বলিতে কি, তাহার সেই সঙ্কল্প অবস্থা তখন আমার মর্মভেদ ও মহাভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল। অনেক করিয়া তাহা পর আমি তাহাকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “শশিভূষণ, এ পর্যন্ত যাহা ঘটয়াছে, তুমি অকপটে সব আমাকে বল; কোন কথা গোপন করিতে চেষ্টা করিও না—যদি এ দুঃসময়ে আমি তোমার কোন উপকারে আসিতে পারি।”

শশিভূষণ বলিল, “আমি প্রভাতে উঠিয়া প্রথমে দেখিলাম, লীলা রক্তাক্ত হইয়া

আমার বিছানার পাশে পড়িয়া রহিয়াছে। ধরিয়া তুলিতে গেলাম—দেখিলাম, দেখে প্রাণ নাই। দেখিয়াই আমার বৃকে বস্তু স্থিত হইয়া গেল। বুঝিলাম, লীলা এ শিশুকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজিলে আর তাহাকে ফিরাইয়া পাইব না—পাইবার নহে। বলিতে কি, যোগেশ! প্রথমে আমার বোধ হইল, মদের ঝাঁকে আমিই তাহাকে রাত্রে হত্যা করিয়াছি। তাহার পর যখন দেখিলাম, আমাংই ছুরিখানা লালার বৃকে তখনও আমূল বিদ্ধ রহিয়াছে, তখন আমার স্রম দূর হইল। আমার এখন বেশ মনে পড়িতেছে, ছুরিখানি আমার বৈঠকখানায় যেখানে থাকিত, সেখানে ছুরিখানি কাল রাত্রে দেখিতে পাই নাই, পরে খুঁজিয়াও কোথাও পাওয়া গেল না। আমি সে কথা তখনই লীলাকেও বলিয়াছিলাম। সেজগৎই মনে একটু সন্দেহ হইতেছে; নতুবা এখনও আমার মনে বিশ্বাস, কাণ্ডজ্ঞানহীন আমিই লীলার হত্যাকারী; কিন্তু সেই ছুরিখানি—যোগেশ আর একটা কথা আছে, আমার বোধ হয়—ঠিক বলিতে পারি না—যদি—যদি—”

শশিভূষণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া নিজেও যখন একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। সে ভাব তখনই সামলাইয়া আমি তাহাকে বলিলাম, “কথা কহিতে এমন সঙ্কট হইতেছে কেন? তুমি যা জান বা বোধ কর, আমাকে স্পষ্ট বল।”

শশিভূষণ বলিল, “লীলার বৃকে ছুরি বসাইতে পারে, একজন ছাড়া তাহার এমন ডয়ানক শক্তি আর কেহ নাই। তাহারই উপরে আমার কিছু সন্দেহ—”

আমি অত্যধিক বাগ্মতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে সে? তাহার নাম প্রকাশ কর নাই কেন?”

শশিভূষণ অস্থূল স্বরে বলিল, “তুমি তাহাক জান, আমি মোক্ষদার কথা বলিতেছি। যেদিন আমার-বিবাহ হইয়াছে, সেইদিন হইতে মোক্ষদাও ভিন্ন মূর্তি ধরিয়াছে। কি একটা হতাশায় সে যেন একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। অনেকবার সে আমাকে শাসিত করিয়া বলিয়াছে, “ইহার ফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে—আমি যে-সে মেয়ে নই—তবে আমার নাম মোক্ষদা। এক বাণে কেমন করিয়া দুটা পাখি মারিতে হয় আমা হইতেই তাহা একদিন তুমি দেখিতে পাইবে।”

শশিভূষণ আবার দুই হাতে চক্ষু আবৃত করিয়া কান্দিতে লাগিল।

আমি অতিশয় চকিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, “অসম্ভব! তাহা কি কখনও হয়?”

অন্ততাপদগ্ন রোক্তমান শশিভূষণ বলিল, “তাহা না হইলেও, আমি তোমাকে বিশেষ অনুনয় করিয়া বলিতেছি, লীলার প্রকৃত হত্যাকারী কে, যাহাতে তুমি সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পার, সেজগৎ যথেষ্ট চেষ্টা করিবে।” তাহার পর মুখ হইতে হাত নামাইয়া, তাহার অশ্রুসিক্ত করুণ দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল, “ভাই যোগেশ, তুমি মনে করিতেছ, আমার নিজের জন্ত তোমাকে আমি এমনি অনুরোধ করিতেছি—তাহা ঠিক নয়, আমার ফাঁসি হউক বা না হউক সেজগৎ আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি, একদিন তো সকলকেই মরিতে হইবে—তা দুইদিন আগে

আর পরে; কিন্তু বোগেশ, যখনই মনে হয় যে, লীলার হত্যাকারী তাহার এ বংশসত্তার কোন প্রতিকূল পাইবে না—”

বলিতে বলিতে শশভূষণের অশ্রুশ্রদ্ধ দৃষ্টি সহসা মেঘকৃষ্ণ বাজের তীব্র বিহ্বাদগ্নির স্তায় বলসিয়া উঠিল এবং এমন দৃঢ়রূপে সে নিজের হাত নিজেই মৃতিবদ্ধ করিয়া ধরিল যে, হাতের কান্ডিতে নখরগুলো বিদ্ধ হইয়া রক্তপাত হইতে লাগিল।

ষাণ্ড আম শশভূষণকে অতিশয় ঘৃণার চোখে দেখিতাম, কিন্তু এখন তাহাকে নির্দাক্ষণ অশ্রুতপ্ত এবং মর্মান্বিত দেখিয়া আমার সে ভাব মন হঠাতে একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। শোকাক্ত শশভূষণের সেই কাতরতায় আর আমি স্বয়ং থাকিতে পারিলাম না। বলিলাম, “শশভূষণ, যেমন করিয়া পারি, তোমার নির্দোষতা সপ্রমাণ করিব। এখন হইতেই আমি ইংরাজ জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিব।”

এইরূপ প্রতিক্রিয়ার পর আমি তাহার নিকট হইতে সোদন বিদায় লইলাম।

৪

একজন পুৰাতন পাকা নামজাদা গোয়েন্দা বলিয়া বৃদ্ধ অক্ষয়কুমারের নামের ডাক যথার্থ। আমি এখন তাহারই সাহায্য গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করিলাম। সেই-দিনই বৈকালে আমি অক্ষয়বাবুর বাড়িতে গেলাম।

বৃদ্ধ তখন বাহরের ঘরে তাহার ক্রিয়াকর্মিক পঞ্চমবর্ষীয় পৌত্রটিকে জালুপরি বসাইয়া ঘোটকারোচন শিক্ষা দিতেছিলেন। আমাকে ঘরসমীপাগত দেখিয়া অক্ষয়বাবু তখনকার মত সেই শিক্ষা-কাণ্ডটা স্থগিত রাখিলেন এবং আমাকে উপবেশন করিতে বলিল, বাবা তুমি হাকে শীঘ্র এক ছিলিম তামাকের জন্ত হুকুম করিলেন। বলা বাহুল্য, অতি সস্তর হুকুম তামিল হইল।

তাহার পর বৃদ্ধ ধূমপানে মনোনিবেশ করিয়া, একটির পর একটি করিয়া ধীরে ধীরে আমার সকল পরিচয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পরে আমি শশভূষণ সংক্রান্ত সমুদয় ঘটনা তাহাকে বুঝাইয়া বললাম এবং স্বাকার করিলাম, শশভূষণকে নির্দোষ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারিলে আমি তাহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিব।

অক্ষয়বাবু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আমার কথাগুলি শুনিলেন। তিনি অনেকক্ষণ করতললগ্ন শীর্ণ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। আমাকে কিছুই বলিলেন না, বা কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

তাহাকে সেইরূপ অত্যন্ত চিন্তিতের স্তায় নীরবে থাকিতে দেখিয়া শেষে আমি বলিলাম, “কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে বলুন, আমার মনের স্থিরতা নাই—হয় তো ঘটনাটা একটানা বলিয়া যাইতে কোন কথা বলিতে তুল করিয়া থাকিব, সেইজন্য বোধ হয়, আপন কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন।”

“না, গোলযোগ কিছু ঘটে নাই।” ছাঁকা রাখিয়া, অক্ষয়বাবু বলিলেন, “আমি বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি। সেজন্য কথা হইতেছে না; তবে কি জানেন,

কাজটা বড় সহজ নয় ; সহজ না হইলেও বাহাতে সহজ করিয়া আনিতে পারি, সেজন্য চেষ্টা করিব। তার আগে আপনাকে একটি বিষয়ে আমার কাছে স্বীকৃত হইতে হইবে, আর আমার দুইটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর করিবেন।”

আমি বলিলাম, “দুইটি কেন—আপনার যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, জিজ্ঞাসা করুন, আমি এখনই উত্তর দিব। তবে কোন বিষয়ে আপনাকে স্বীকৃত হইতে হইবে, তাহা পূর্বে না বলিলে, আমি কি করিয়া বুঝিতে পারিব যে, আমার দ্বারা তাহা সম্ভবপর কি না। আপনার দ্বারা যদি সে কাজ হইতে পারে, এমন আপনি বোধ করেন, তাহা হইলে তাহাতে আমার অন্তরত নাই জানিবেন।”

“সে কথা মন্দ নয়।” বলিয়া অক্ষয়বাবু একটু ইতস্তত করিলেন। তাহার পর বলিলেন আমি যে বিষয়ে আপনাকে স্বীকৃত হইতে বলিতেছি, তাহা এমন বিশেষ কিছু নহে, আপনি মনে করিলেই তাহা পারেন ; আজকালকার যে বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে সেটা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা নহে। আপনি যে হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ দিতে চাহিতেছেন, সেইটে এমন একটা লেখাপড়া করিয়া যে কোন একজন ভদ্রলোকের নিকটে আপনাকে গচ্ছিত রাখিতে হইবে যে, পরে যদি আমি কৃতকার্য হইতে পারি, সে টাকা আমিই তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিব। আপনার কোন দাবী-দাওয়া থাকিবে না।”

আমি। আমি সম্মত আছি ; ইহাতে আমার অমত কিছুই নাই। এখন আপনার দুইটি প্রশ্ন কি বলুন।

অক্ষয়। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে এই—ঠিক কথা বলিবেন, গোপন করিলে কোন কাজই হইবে না—শশিভূষণ যে নির্দোষ, এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন ?

আমি। নিশ্চয়ই। আমি। তাহার দুশ্চরিত্রতার জন্য তাহাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি। যদি তাহাকে এই হত্যাপরাধে দোষী বলিয়া আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ থাকিত, তাহা হইলে তাহার মুক্তির জন্য একটি অঙ্গুলি সঞ্চালন করা হুবে থাক, তখনই আমার হাত কাটিয়া ফেলিয়া দিতাম।

অক্ষয়। বটে ! তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—আপনি কি কেবল শশিভূষণ বাহাতে নিরপরাধ বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তাহাই চাহেন ; না বাহাতে দ্বার হত্যাকারীও সেই সঙ্গে ধরা পড়ে, তাহাও আমাকে করিতে হইবে ?

আমি। ক্ষমা করিবেন, আমি আপনার এ প্রশ্নের ভাবার্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

অক্ষয়। ইহাতে না বুঝিতে পারিবার কিছুই নাই ; একটু ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন। এই আমিই আপনাকে বুঝাইয়া বলিতেছি ; কথাটা কি জানেন প্রকৃত হত্যাকারীকে ধরা বড় সহজ কাজ নহে। এবং আমি মনে করিলেই সে আসিয়া ধরা দিবে না ; বড় শক্ত কাজ—কোন নিরপরাধ লোকের সপক্ষে কয়েকটা প্রমাণ সংগ্রহ করা সে তুলনার অনেক সহজ।

উঁহা'র কথা'র আমার একটু হাসি আসিল । আমি বলিলাম, “বুঝিয়াছি, আমি যে হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি তাহা আপনি শশিভূষণকে নিরপরাধ সপ্রমাণ করিবারই পারিভ্রামিকের যোগ্য বিবেচনা করেন ; কিন্তু আমার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে উঁহা'র বেশি আর উঠিতে পারিব না । তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি হত্যাকা'রাকেই ধরুন বা শশিভূষণকেই উদ্ধার করুন, আপনি ঐ হাজার টাকা পাইবেন ।”

অক্ষয়বাবু বলিলেন, “তা বেশ, পরে এই সব লইয়া একটা গোলযোগের সৃষ্টি করিবার অপেক্ষায় আগে হঠাতে একটা ঠিকঠাক বন্দোবস্ত করিয়া রাখা ভাল । বাক্ আপনারকে আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার নাই ।”

৫

ইহার চারিদিন পরে একদিন অক্ষয়বাবু নিজেই আমার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত । সেদিন যেন উঁহাকে কেমন একটু কষ্টচাবশ্যক দেখিলাম । আমি কোন কথা বলিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, “বা মনে করা যায়, তা ঠিক হয় না—কে জানে মহাপ্রদ, টাকার লোভ দেখাইয়া আপনি এমন একটা স্বপ্নাটে কাজ এই বুড়োটারই বাড়ি চাপাইবেন ।”

বলিতে বলিতে অক্ষয়বাবু উঠিলেন কিপ্রহন্তে পথের দিক্কার একটি জানালা সম্মুখে থুলিয়া ফেলিলেন এবং জানালা'র সম্মুখভাগে ঝুঁকিয়া কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বংশীধ্বনি করিলেন ।

৬

নিদারূণ উৎকণ্ঠায় আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল এবং দৃষ্টির সম্মুখে সর্বশ-কুসুম নামক বিবিধ-বর্ণ-বিচিত্র ক্ষুদ্র গোলকগুলি নৃত্য করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল ।

ক্ষণপরে দুইটি লোক সে ঘরে প্রবেশ করিল । এক জননে দেখিবার পুলিন-কর্মচারী বলিয়া চিনিতে পারিলাম ; আর তাহার পাশের লোকটি সেই-ই—গত রাজ্বে যে বালিগঞ্জের পথ হঠাতে আমার বাড়ি পথন্ত আমার অজ্ঞসরণে আসিয়াছিল ।

সেই লোকটির প্রতি আঙুলি নির্দেশ করিয়া অক্ষয়বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি এই লোকটিকে চিনিতে পারেন ?”

আমি বলিলাম, “হাঁ, যখন আমি আপনার বাগান হঠাতে বাড়ি ফিরিতেছিলাম, তখন এই লোকটি আমার বাড়ি পথন্ত অজ্ঞসরণ করিয়া আসিয়াছিল ; কিন্তু তাহার পূর্বে ইহাকে আর কখনও দেখি নাই ।”

অক্ষয়বাবু বলিলেন, “না দেখিবারই কথা । আমারই আদেশে এই লোক আপনার

অনুসরণ করিয়াছিল।” এই বলিয়া তিনি বিদ্বাৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবাগতদ্বয়কে বলিলেন, “তোমাদের ওয়াশেট বাহির কর, ইহারই নাম ষোগেশবাবু—ইনিই লীলার হত্যাকাশী।”

কথাটা শুনিয়া বজ্রাহতের জ্ঞান আমি সবেগে লাফাইয়া উঠিয়া দশ হাত পঁচাত্তে হুটিয়া গেলাম এবং তেমন মধ্যাহ্নরোজোজ্জ্বল দিবালোকেও উদ্ভাসিত চক্ষে চতুর্দিকে অন্ধকার দেখিতে লাগলাম। এই বিশ্বজগতের সমুদয় শব্দ কোলাহল আমার কণ্ঠমূলে যুগপৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। গাঢ়তর—গাঢ়তর—গাঢ়তর অন্ধকারে চারিদিক ব্যাপিয়া ফেলল। কতক্ষণ পরে জানিনা—প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম, অয়ককনে আমার হস্তদ্বয় শোভিত এবং সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অক্ষয়বাবু বলিতেছেন, “ষোগেশবাবু, আপনার জন্ম আমি দুঃখিত হইলাম। কি করিব? কর্তব্য আমাদিগের সবাগ্রে। আপনি জানিয়া শুনিয়াও এইমাত্র মোক্ষদার স্বপ্নে নিজের অপরাধটা চাপাইতেছিলেন? তাহাতে আপনাকে বড় ভাল লোক বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, যেদিন আপনি আমার সহিত প্রথম দেখা করেন, সেইদিন আপনার মুখে হত্যার তান্ত্রিক শব্দটির সময়েই আমি কোন যন্ত্রে আসল ঘটনাটা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেইজন্যই আপনার মেয়ে পুরস্কারের হাজার টাকা একটি দস্তামত লোণশড়া করিয়া কোন ভুললোকের মধ্যস্থতায় জমা রাখিতে বলি। আপনিও তাহা রাখিয়াছেন। আর আপনিও জানেন, শুধু হাত কখন কাহারও মুখে ওঠে না। সে যাহাই হউক, ইহারই আপনার হৃদয়ে একটা মহৎ উদারতার পারচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ আপনার ঘোরতর শত্রু হইলেও সে যে নিরপরাধ তাহা আপনি অন্তরে জানিতেন। আপনার অপরাধে তাহাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, এই ভাবিয়া আপনার বধেই অহুতাপ হইতেই এই হাজার টাকা পুরস্কারের সৃষ্টি। এখন দুই-চারিটি প্রমাণ দেখাইয়া দিলে, আপনি যে একটা অর্বাচীনের হাতে কেসটা দেন নাই, সে সম্বন্ধে আপনার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। যেদিন লীলা খুন হয়, সেদিন রাত দশটার সময়ে বাগানে আপনার সঙ্গে শশিভূষণের খুব একটা বাগারাগি হয়। এবং তাহাকে খুন করিবেন বলিয়া আপনি উচ্চকণ্ঠে শাসাইয়াছিলেন। অবশ্যই আপনার সেই উচ্চকণ্ঠের শাসনগুলি সেই সময়ে শশিভূষণ ছাড়া আরও দুই-একজনের ঐ তেগোচর হইয়াছিল। ইহার কিছুক্ষণ পরে শশিভূষণ তাহার ছুরি চুরির কথা জানিতে পারে। শশিভূষণকে না বলিয়া সেই ছুরিখানি আপনি লইয়াছিলেন। আপনার এই ‘না-বলিয়া ছুরি-গ্রহণ’ সম্বন্ধে আমি দুই-একটা প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছি। সেদিন শশিভূষণের তীক্ষ্ণতর কটুকিতে আপনার রক্ত নির্যাতনের উচ্চ হুইয়া উঠিয়াছিল। আপনি বাড়িতে ফিরিয়াও নিজেকে কিছুতেই লায়লাহিতে পারেন নাই; আপনি শশিভূষণকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পুনরায় তাহার বাড়িতে আসিয়াছিলেন এবং আপনার মাথায় হঠাৎ কি একটা প্লান্ উদ্ভব হওয়ায়, আপনিই বৈঠকখানা ঘর হইতে ছুরিখানা ‘না-বলিয়া-হস্তগত-করা’ নামক পাপে লিপ্ত হইয়া আসেন। তখন একজন পরিচারিকা আপনাকে দোষিয়াছিল।

আপনি ভুল্লোক, সে ছোটলোক—সুতরাং তখন সে আপনার উপরে এরূপ একটা গর্হিত সম্ভেদ করতে পারে নাই। এদিকে যখন এইরূপ দুই-একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আরম্ভ ও সমাপ্ত হইয়া গেল, তখনও শশিভূষণ সেই বৈঠকখানার ছাদে বসিয়া মন পাতিতেছিল। উদ্ভানে আপনারদের সেই গাথ ওতার পরে আপনি যখন চলিয়া গেলেন—কোন হৃৎকম্প কারণে শশিভূষণের একটা বড় অস্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত হয় এবং সেই অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করিবার জন্য সে আবার বৈঠকখানার ছাদে উঠিয়া মন্থন আরম্ভ করিয়া দেয়। মনেই লোকটার মাথা ঝাইয়া দিয়া ছিল। বড়টা পাবল, বসিয়া বাসায় খাইল। তাহার পর ব্যক্তি বোতলের মুখে ছিঁপ আঁটিয়া যখন বৈঠকখানা ঘরের আলমারিতে রাখিতে যায়—তখন দেখে আলমারির খোলা বাহ্যিক ছেদ এবং ছায়াপান দেখানো নাট। দেখিয়া প্রথমে একটু চিন্তিত হইল। তাহার পর হুঁ-একবার বলিক-চাকর খুঁজিয়া না পাইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল এবং লালাকে ছায়াবর সহসা অদ্ভুত হস্তাকর্ষ কথ্য বলল। সেই সময়ে তাহার শয়ন-গৃহের পার্শ্ব গলপথে মোক্ষনা কোন লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। মোক্ষনাকে আমি সেই লোকের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বলে তাহাকে সে চেনে না, পূর্বে কখনও দেখে নাই। তখন আমি একটা কোণল করিয়া আপনাকে তাহার সম্বন্ধে নিশ্চয় বানাই, আপনি তাহার মুখে তখন যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা তখন মাত্র, আমিই তাহাকে এইরূপ একটা অভিনয় দেখাইতে শিখাইয়া দিয়া ছলাম। যাহা হউক, মোক্ষনা আপনাকে দোষকামাত্র চিনিতে পারে। তখন বহুক্ষণ অনেক পাবলার হইয়া আসিল। তাহা হইলেও কেবল মোক্ষনার কথায় আমি বিশ্বাস করি নাই—সেটা ডিটেক্টিভদের স্বমণ্ডল নহে। আর যাহা হউক, সেই প্রাচীরের পার্শ্ববর্তী পদচিহ্নগুলি মিলাইয়া দেখিবার একটা সুযোগ সেই সঙ্গে ঠিক করিয়া লই। সেইজন্য আপনাকে আমার বাগানবাড়িতে লইয়া যাই। বাগানবাড়িতে গিয়া হল ঘরে যাইতে হবে—মাত্র-বিলাতী মাটি-দেওয়ান সোপানে নয়দনে অতি সমুদ্রপে উঠিতে হয়। তাহাতে সেই লক্ষ্যমণ্ডিত বিলাতী মাটিতে আপনার পায়ের যে দাগ পড়, আমি সেইগুলির সহিত ময়দান ছাপে তোলা সেই গলি পথের দাগগুলি মলাইয়া বুঝতে পার—সকলই এক পায়ের চিহ্ন এবং সেই সা মহাশয়েরই।” এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিজের হস্তাবলম্বণ করিতে করিতে অতি উৎসাহের সহিত বালতে লাগলেন, “মোক্ষনা বেটি তার চালাক, তার বুদ্ধিমত্তা—সাবাস মেয়ে বা হাক—বহুদূর ফিচেল হতে হয়। কি জানেন যোগেশবাবু, তাহা হইলেও আমি মোক্ষনার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি নাই। আপনারদের সহিত সাক্ষাৎকালে সে যখন আমার কথা আপনাকে বলিয়া দিয়া থাকে যে, আমি আপনাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি; অথবা আপনি কোণল তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির করে লইয়া আমার অভিপ্রায় বুঝতে পারিয়া থাকেন, এই আশঙ্কা করিয়া আমি এই লোককে তখন আপনার বাড়ি পর্যন্ত আপনার অধীন করিয়া দোখতে বলিয়া ছলাম। আপনি বাড়িতে যান, তার আর কেবাখান যান—কি করেন, আপনার মুখের ভাবাক বকন, এই

সব লক্ষ্য করিতে বলিয়া দিয়াছিলাম। যখন আপনি বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, এই লোক তাহার পর আপনার বাড়ির সম্মুখে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যখন আর আপনাকে বাহ্যের আশিতে দেখিল না—তখন নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া আসিয়া খামাকে সংবাদ দিল। তাহার পর আপনার নামে আজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ির কারওয়ান আমার কর্তব্য নিষ্পন্ন করলাম। বলিতে কি, অনেক যুনের কস্ম আমার হাতে আশিয়াছে, তাহার মধ্যে একটা ছাড়া এমন অদ্ভুত কোনটাই নয়। যাহা হউক, এখন বুঝলেন, শশিভূষণ নিরপরাধ এবং হত্যাকারী কে?

আর কি বলিব? আর কি বলিবার আছে? হে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান! এ দুর্ভাগ্যের স্বপ্নের কথা তুমি সব জান। প্রভু বাহাকে আমি প্রাণের আদক ভালবাসিতাম, তাহাকে একজন নৃশংসের হাতে এইরূপ উপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয়ে কি বিষের দাহন আরম্ভ হইয়াছিল। তুমি সবই জান প্রভু! সেদিন যদি আমার সেই ভুল না হইত, যদি আমি ঠিক শশিভূষণকে হত্যা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধহয়, স্বপ্নে মগ্ন হইতে পারিতাম। লীলাকে একজন নরনাশকের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া মনে করতে পারিতাম আমার মৃত্যুতে একটা কাজ হইল। হায়! মানুষ বাহা মনে করে, তাহার কিছুই হয় না। সেই সর্বশক্তিমানের অঙ্গুলি হেলনে সমগ্র বিশ্ব সমভাবে শাসিত হইতেছে, সেখানে মানুষ আর মানুষের কি বিচার করিবে? তাহার এমনই রচনাকৌশল—পাপী নিজের হাতেই স্বকৃত পাপের দণ্ডবিধান করিয়া থাকে।

দুঃখশেষ অপরিম্ফুটাকাশ শিশু ব্যাঘ্র-কবলিত হইলে যেমন সে প্রথমে নিজের বিপদ বুঝিতে পারে না, বরং যতক্ষণ ব্যাঘ্র কর্তৃক কোনরূপে পীড়িত না হয়, ততক্ষণ তাহার উল্ফন, ভীষণোজল চক্ষু এবং দীর্ঘ লাজুলান্দোলনে বরং সেই শিশুর নিরলস্তু মুখে, নদর অদরপুট দিয়া কল্লোলিত স্তম্ভহাসস্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। হায়! স্বপ্নাবধি আমারও তেমনি এই ভ্রূপ-দারিদ্র্য ভীষণ শোক-তাপপূর্ণ বিপদ সঙ্কুল কঠিন সংসারের বক্ষ্যায়ত হইয়া কোন ঘোহে অবিজ্ঞান হস্ত-তরণে উদ্ধৃত হইয়া উঠিতে থাকি! তাহার পর যখন কোন অপ্রতিহত দুর্দান্ত আঘাতে স্বপ্ন ভাঙিয়া যায় এবং মাহ ছুটিয়া যায়, তখন নিরবলম্বন এবং আশা-ভরসা-শূন্য হইয়া, হৃদয় শোধ্য বিদার্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠি।

উপসংহার

আমার কথা

যোগেশ্বর এই মর্মস্পর্শী আত্মকাহিনী যখন শেষ হইল—তখন চকিতে চাহিয়া দেখি বহির্ভাগ্য প্রভাতের কোমল আলোকে পরিম্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমি তাহার কাহিনীতে এমনি মগ্ন এবং মগ্ন হইয়া গিয়াছিলাম যে, এ সব কিছুই জানিতে পারি

নাই। আমি তাড়াতাড়ি আর একটি চুকট ধরাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। এমন সময়ে একজন গ্রহণী মশকে কারাঘার উন্মোচন করিয়া ফাঁসির আসামী হতভাগা যোগেশচন্দ্রের শেষ আহ্বান হস্তে আমাদের সম্মুখীন হইল। তাহার একদটা পরে মকলই ফুটাইল—যোগেশচন্দ্রের নান এ জগতের জীবিত মস্তায়ে তা লকা হৃদয়ে চিরকালের জন্য মুছিয়া গেল। হতভাগা ফাঁসি-কাঠে আপনার পাখের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

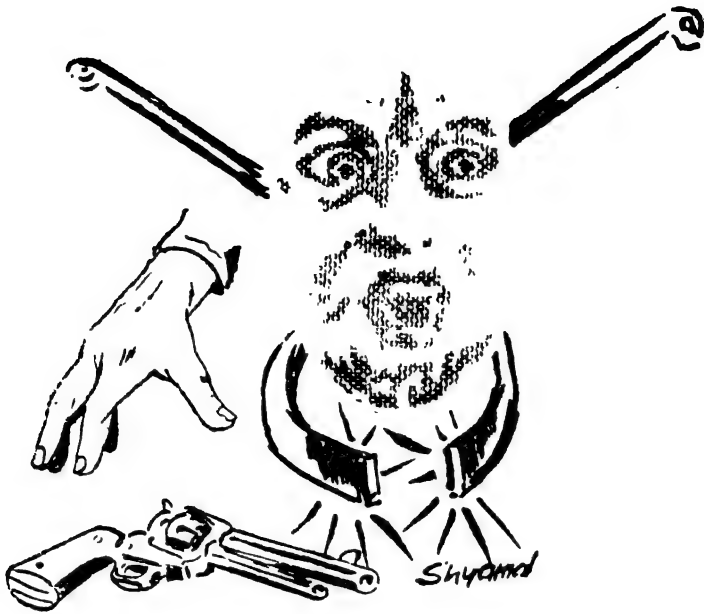
পাঠক! আমি আজ বহুদিন বৎসর এই জেলখানায় কাজ করিতেছি, কিন্তু এমন শোচনীয় বাপার আমার আমলে কখনও ঘটে নাই। সেইদিন হঠাৎ যেন নিজের ও নিজের কারাদাক্ষ পদটার উপরে আমার একটি বিজ্ঞাতীয় ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। আশা করি, পতিত পাবন ঈশ্বর, ভ্রান্ত পতিত যোগেশচন্দ্রের পরলোকগত আমার শাস্তি বিধান করিবেন।

—চৈনৈক কারাদাক্ষ

পাঁচকড়ি দে : পাঁচকড়ি দে মশাই সেই সব হারিয়ে যাওয়া লেখকের একজন ধারা সে দিনের (এই শতকের প্রথম দিকের) দুর্বল বাজলা সাহিত্যের দুর্বলতম শাখা—গোয়েন্দা গল্পের অঙ্গনকে নানা দরনের ফুলের ডালি-তে সাজিয়েছিলেন।

বাজলা গোয়েন্দা বা রহস্য সাহিত্য ইংরাজী, ফরাসী বা মার্কিন সাহিত্যের মত কোনান ডয়েল বা এডগার অ্যালান পোর ত্রায় বখ-মহারখিনের আবির্ভাবে ধন্য হয়নি আজও। তবে যে সকল সাহিত্যিক সে যুগেও নির্ভেজাল গোয়েন্দা গল্পের জাল বুনে বাজলাভাষী পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে সমর্থন হয়েছেন পাঁচকড়ি দে তাঁদের অন্ততম।

সেদিন পাঁচকড়ি দে'র মনোরমা, হত্যাকারী কে, নীলবন্দনা স্বন্দরী ইত্যাদি গ্রন্থ আজকের অনেক অতিবর্ষীয়ান ও বর্ষীয়নী গুরুগম্ভীর পাঠক-পাঠিকার কৈশোর ও যৌবনের জীবনের পাঠ্যসূত্রের স্বত্তির সাথে জড়িয়ে আছে।



অদ্‌শা হস্ত

দীনেন্দ্রকুমার রায়

মেজর ফরেষ্ট পর্বদিন প্রভুত্ব শয্যা ত্যাগ করিয়া তাঁহার কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলেন। কিছুকাল ঘুরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার অতিথিবর্গ সহ প্রাতঃভোজনে বসিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার স্বাক্ষকে বলিলেন, “হত্যাকাণ্ডী-লন্ডেছে এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ইন্সপেক্টর রজার কার্ল অধিক স্বাক্ষে ক্রে-বারোতে ফিবিয়া গিয়াছে। আজ সকালেই তাহার এদিকে আসিবার কথা আছে।—কনস্টেবল জিমির সঙ্গে আমার দুই একটা কথা হইয়াছে।”

হেনরী বাল্লি, “পুলিশ কি হত্যাকাণ্ডের কোনও কারণ স্থির করিতে পারিয়াছে?” মেজর বলিলেন, “জিমির সঙ্গে আলোচন করিয়া সে-রকম তো কিছু বুঝিতে পারিলাম না। লোকটা ভারী বাচাল, তাহার মুখে কথার ভুবড়ী ছোটে; কিন্তু এই ব্যাপার লব্ধে সে একদম চুপ। আমার মনে হয়, সে এই প্রথমবার হত্যাকাণ্ডের তলস্তের ভার পাইয়াছে; কিন্তু ইহার কোন হদিশ না পাওয়ার তাহাতে ভয়কর মাথা ঘামাইতেছে।”

সেই সময় সেই অট্টালিকার সম্মুখস্থ পথে মোটর-গাড়ীর ঘন্ ঘন্ শব্দ শুনিয়া মেজর জানাশা দিয়া পথের দিকে চাহিলেন, এবং উৎসাহভরে বলিলেন, “আরে, পামার্স আসিয়া পড়িয়াছে দেখিতেছি। পল, উহার মতলব কি জান? তোমাকে, আমাকে,

আর হেনরীকে গল্ফ খেলিবার জন্য পাকড়াও করিতে আসিতেছে ; কিন্তু আজ সকালে কোনও রকম খেলাধুলার যোগ দিতে আমার প্ররতি হইতেছে না । যাহার ঘরের দরজায় মানুষ খুন হইয়াছে, গল্ফ খেলিতে তাহার কি মন সরে ?”

মেজর-পত্নী লুসী মিহি আঙুরাঙ্গে অস্থানের ভকীতে বলিল, “কিন্তু তোমাকে বাইতেই হইবে প্রিয়তম । আহা, বেচারা চালির জন্য তোমার মনে কি আঘাত লাগিয়াছে, তাহা কি আর আমি বুঝি না ? কিন্তু উপায় কি ? পুলিশ তো এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ভার লইয়াছে ; এ অবস্থায় তোমার আর কি-ই বা করিবার আছে ? তা যাও, এক বাজি গল্ফ খেলিয়া আস ; মনটা বড়ই দমিয়া গিয়াছে, একটু চাফা হইবে, কি বল নিকোলাস ।”

সেই সময় একটি দীর্ঘদেহ রূপবান যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল । লুসী তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া একথা বলিয়াছিল । কিন্তু লুসীর সকল কথা সেই যুবকের কর্ণে প্রবেশ করে নাই, এইজন্য সে লুসীর কাছে সবিস্ময় হাসিয়া বলিল, “কাহার চাক্ষু হওয়ার কথা বলিতেছিলে ? তোমাদের কর্তাটির না কি ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক বাজি গল্ফ খেলিলে আনবার উহার মন এক পাচের গুড়ির মত চাক্ষু হইবে ।”

এই কথা শুনিয়া মেজর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, না, ওদব আজ আমার ভাল লাগিতেছে না ; আমি সচি কথটি বলিতেছি —নিকোলাস । ইহার সঙ্গে তোমার বুঝি আলাপ নাই ? পলের সঙ্গে তো পূর্বে কোনও দিন তোমার দেখা হয় নাই । পল, ইনি নিকোলাস পামার্স ।”

পল নবাগত পামার্সের হাত ধরিয়া কঁাকাইয়া দিলেন । লুসী তাহাকে এক পেরালা কর্ফ দিলে, পামার্স তাহাতে চুমুক দিতে দিতে হত্যাকাণ্ডের কথাই আলোচনা আরম্ভ করিল । সে এ সম্বন্ধে একটা নূতন কথা বলিবার লোভ স্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল, “যদি আপনারা আমার মত জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিব ডিককে যে খুন করিয়াছে, সে হয় কোনও ভবঘুরে পশুক, না হয় কোন জীপসী । গ্রামের কোন লোক যে এ কাজ করে নাই, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ; কারণ গ্রামের কোন লোকের সঙ্গে তাহার সফতা ছিল না ।”

মেজর বলিলেন, “হ্যাঁ, একথা সত্য বটে ? আর কাহারও সঙ্গে তাহার মনান্তর ছিল —এ অস্বাভাবিক সত্যও হয়, তাহা হইলেও তাহার এরকম সফতা কেহই ছিল না, যে তাহাকে হত্যা না করিয়া স্বর থাকিতে পারে নাই । এই হত্যারহস্য বড়ই জটিল বলিয়া মনে হইতেছে ; পুলিশের একাধি চেষ্টায় কোন ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না । এ অবস্থায় অবিলম্বে তাহাদের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সহায়তা গ্রহণ করা উচিত ।”

যাহা হউক, মেজরের মানসিক অবস্থা শোচনীয় বরিয়া কেহই তাহাকে খেলিতে বাইবার জন্য পীড়াপীড়িকরা সক্ষম মনে করিল না, কিন্তু সকলকেই হাল ছাড়িয়া দিতে দেখিয়া মেজর স্বয়ং হাল ধরিলেন । তিনি চেয়ারখানি পশ্চাতে ঠেলিয়া উঠিয়া পাড়াইয়া বলিলেন, “না, ঘরে বসিয়া নিরীক্ষাভাবে এই অশ্রীতিকর প্রসঙ্গের আলোচনায় মন

আরও খাৰাপ হইবে। যদি ক্লাবে যাইতেই হয় তো তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভাল; নতুবা লাকের সময় আমরা কিরিতে পারিব না। লুসী শ্রিয়তমে। তুমি মিসেস হপ্সনের বাড়ী গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে ভুলিও না। কাল আমি হপ্সনকে বলিয়া রাখিয়াছি—আজ সকালে তুমি তাহাদের বাড়ী যাইবে। আমার সে কথা খেলাপ হইবে না তো?”

লুসী হাসিয়া বলিল, “বেশ তাহাই হইবে। আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিব। আশা করি তোমরা স্তুতি করিয়া খেলিবে। যদি তোমাদের কিরিতে বিলম্ব হয়, তাহা হইলে লাকের জন্য তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিব।”

মেজর তাহার দুইজন অতিথি সহ পামার্সের গাড়ীতে উঠিয়া প্রস্থান করিলে, ফুলোন্সের সঙ্গীত মাংসপিণ্ড হানিয়ান মুখ বিবর হইতে নিষ্টিবনবিহ্ব বর্ষণ করিতে করিতে নেকড়ে বাঘের মত হুকার দিয়া বলিল “মিসেস হপ্সনটা কে? আমি আশা করিয়াছিলাম, তুমি আর আমি এই ফাঁকতালে পরীপথে বাহির হইয়া কিছুদূর পর্যন্ত প্রমোদ-ভ্রমণ করিয়া আসিব।”

লুসী স্বমধুর হাস্তে সেই জরদগবটার মুণ্ড ঘুবাইয়া বলিল, “হাঁ, সে তো আমরা বাবই। তাহাদের এত তাড়াতাড়ি বিদায় করিলাম, ইহার কারণ কি তুমি বুঝিতে পার নাই? যাইবার সময় হপ্সনের কুটারের অদূরে গাড়ী রাখিয়া তাহার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসিব। সে জল-দারোগার স্ত্রী। বেচারী ভয়কর ভূগিতেছে কি না, তাই তাহার রোগ-শয্যা তাহাকে একবার দেখিতে যাইতে হইবে। এই অকালে যত লোক আছে, আমাদের বুড়োটা তাহাদের সকলেরই খোজ-খবর লইয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিতে ভালবাসে; হুতরাং আমাদেরও তাহার মন বোগাইয়া চলিতে হয়, অগত্যা আমাকে যাইতেই হইবে।”

কয়েক মিনিট পরে লুসী সেই সচল মাংসপিণ্ডটাকে পাশে বসাইয়া স্বয়ং তাহার মোটর কার পরিচালিত করিতে লাগিল। গাড়ী পথে আসিয়া, যে দিকে জল-দারোগার বাড়ী, সেই দিকে ছুটিল।

একটি পথ নদী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সেই পথের উভয় পার্শ্বে ঘন সন্নিবিষ্ট গুল্মবাশি ও অরণ্য। লুসী সেই পথে আসিয়া গাড়ী থামাইল। সে তাহার সঙ্গে জালা-পেটা হানিয়ানকে বলিল, “এই পথের অদূরে হপ্সনের কুটার। আমি এখানে নামিয়া সেই কুটারে রোগিনীকে দেখিতে যাইব। তুমি কি করিবে? সেখানে যাইবে না গাড়িতেই বসিয়া থাকিবে?”

হানিয়ান বলিল, “আমি এখানেই বসিয়া থাকিব। কোথাও রোগী-টোগী দেখিতে যাইব, সে রকম বিদগ্ধুটে সখ আমার নাই।”

লুসী তাহাকে গাড়িতে বসাইয়া নামিয়া গেল। হানিয়ান মূল্য মত স্থল একটা চুকট বাহির করিয়া, তোলা হাঁড়ির মত গোল মুখে পুয়িল; তাহার পর তাহার উগ্ন অগ্রদংশে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে সন্ধারিণী পল্লবিনী লতার ত্রায়

লুণীর স্থল'ল' গতিভঙ্গি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। লুণীর প্রতি মমতা ও সহানুভূতিতে তাহার স্নেহ পূর্ণ হইল। তাহার মনে হইল, লুণী ফরেস্টে সন্মরী বটে, ইহা পরমা স্থবরী। তাহার ক্ষুধিত প্রাণ। তাহাকে নগরে লইয়া গিয়া লাঞ্চার যোগাড় করিলে মন্দ হয় না। আর যদি ডিনাবের আয়োজন করিতে পাওয়া যায়—সে আরও ভাল।”

ক্রমশঃ সেট জরনগবের চিন্তার বেগ প্রবল হইয়া উঠিল। সেই সন্মরী যুবতীর নিরানন্দময়, বার্থ জীবনের কথা ভাবিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে ভাবিল, ফরেস্টের মত ভূঁইয়গণা বৈটে কদাকার গাধাটাকে বিবাহ করিয়া, এই প্রকার পল্লী-গ্রামে সেট বুনো বৈয়সিকের সহবাসে জীবনপাত করিয়া তাহার ক'তখ? তাহার জীবন এখানে ন্যাশিত-দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। এই নির্জন নিঃশব্দ পল্লীপ্রান্তে প্রেম নাই, আনন্দ, নাট, ক্ষুধিত ও নাই। সে এই কদাকার, অরসিক, আধরুডা লাঞ্চার প্রেমে মাতিয়া গিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিয়া জীবন বার্থ করিতেছে ইহা হানিমানের অদ্ভুত মনে হইল। লুণীর মত সন্মরী যে কোন ভাগ্যবান পুরুষকে লাভ করিতে পারিত। যদি এই সন্মরীর সহিত আলাপ করিবার, তাহার সঙ্গে মিশিয়া ক্ষুধিত করিবার আশা না থাকত, তাহা হইলে সে মেজবের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সপ্তাহ-শেষে ক্রফোর্ড-হলে মরদর ধাপন করণে আসিত না।

কোনদিন প্রথমে কিরূপে লুণীর সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল, সেট কথা তাহার মনে পড়িল। লগুনে একটি 'চাঁরটি হলে' নিমন্ত্রণ বক্ষা করিতে গিয়া সেট স্থানে তাহাদের প্রথম পরিচয়। লুণী ফরেস্টের দ্বা, এই সংবাদ শুনিয়া তাহার বিশ্বাসের সীমা ছিল না! সেই দিনই সে লুণীর নয়ন-বাগে বিদ্ধ হইয়া—আর তাহার 'চিন্তা' করিবার অবকাশ হইল না। ইহাৎ কাহার দুইখানি হাত পক্ষাৎ হইতে তাহার ঘাড়ে পড়িল এবং তাহার সাঁড়াশীর মত দৃঢ়বলে তাহার গলাটি চাপিয়া ধরিল।

সেই সূদৃঢ় বন্ধনে হানিমানের মুখ-বিবর উদ্ঘাটিত হইল, এবং তাহার মুখের চকুট পলিয়া পড়িল। হানিমানে সেই সূদৃঢ় বন্ধন-পাশ হেঁতে মুক্তিরাজের জন্য তাহার বিশাল বপুল হইয়া আসিতাতায়ীর সহিত প্রবল বেগে সন্মুখস্থি করিতে লাগিল, কিন্তু বজ্রকঠি-অঙ্গুলীর প্রচণ্ড চাপে তাহার কানের ভিতর যেন ঝড় বাহিতে লাগিল। তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। তাহার পর সে অক্ষুণ্ণ গৌ গৌ শব্দে আতঁনাদ করিয়া চলিয়া পড়িল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

* * * *

এখানে 'মঃ পল আর্টনাদ' শুনিতে পাইলেন তাহার সহিত যেন ভীষণ যন্ত্রণা, মর্মভেদী বেদনার স্তূত্র অঙ্কার প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল। মিঃ হানিমানকে গুম করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া তাহার সন্দেহ হইল। 'মঃ পল তৎক্ষণাৎ সেই অট্টালিকার ওক কাঠ নিমিত্ত সদর দরজার পাশে সরিয়া গিয়া অঙ্ককায়ে গুঁড়ি মাঝিয়া বসিয়া বহিলেন। মিঃ পল বিধাশ্রু চিন্তে লব্ধ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্থির

কবিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে বাহাই ঘটুক তিনি সেই গভীর রাত্রেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া গুপ্ত বহস্ত আবিষ্কার করিবেন ।

অতঃপর মিঃ পল সেই ঘর খুলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন ।

চেতনা কিরিলে হার্নিম্যান বিচলিত স্বরে বলিল, “সেই না কি ?”

পল বলিলেন, “সে ভিন্ন আর কে ?”

হার্নিম্যান বলিল, “সে ঘর খুলাইবার জন্ত ঘণ্টা বাজায় কেন ? দরজার চাবি কি তাহার কাছে নাই ?”

পল বলিলেন, “এই বাড়ীর অর্গলকদ্ধ করা হইয়াছে । এক্ষণ করিবার প্রয়োজন ছিল । আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন, আমি তাহাকে ভিতরে আনিবার ব্যবস্থা করিয়া আসি ।”

হার্নিম্যান উত্তেজিত স্বরে বলিল, “আমি এখানে অপেক্ষা করিব না ; আমিও আপনার সঙ্গে যাইব । আমি সেই নবমস্তকে সায়েস্তা না করিয়া ছাড়িব না । পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের অতিরিক্ত আরও কিছু তাহার ঘাড়ে চাপাইতে চাই ।”

পল বলিলেন, “তাহাতে আমার আশঙ্কি নাই, কিন্তু আপনি ঠাণ্ডা হইয়া চলুন ! আপনি অত গরম হইবেন না ।”

পল এই কথা বলিয়া বাহিরা হাতে লইয়াই নিচের দিকে ক্রমপদে ধাবিত হইলেন । হার্নিম্যান মোটা মাথায়, তাহার উপর শৃঙ্খলিত দেহে দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকায় তাহার ক্ষুধা-তৃষ্ণারও স্বভাব ছিল না, সে ক্রমপদে টলতে টালতে অন্ধকারে মিঃ পলের অগ্রসরণ করিল । সেই সময় বহির্দ্বারের ঘণ্টা পুনরবার বাজিতে আরম্ভ করায়, সেই শব্দে হার্নিম্যানের পদশব্দ ডুবিয়া গেল ; ঠহাতে পল অত্যন্ত খুশী হইলেন ।

মিঃ পল বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া, বাহিরা বী। হাতে ধরিয়া ডান হাতে দ্বারের শিকল অপসারিত করিয়া তাহার অর্গল খুলিলেন ; তাহার পর ঘর উদঘাটিত করিলেন এবং দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া আগন্তকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।

মুহূর্ত্ত পরে আগন্তক দ্বারের চোকাঠ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল । তাহার দেহ ওভারকোটে আবৃত, মাথায় নরম ফেট নিশ্চিত টুপি । সে দরজার ভিতর প্রবেশ করিয়াই সকোথে হস্তার দিল ; উল্লেখ্যে বলিল, “ওরে আহাশঙ্ক ! এক্ষণ তুমি কোথায় ছিলি ? ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে আমি হতবান হইলাম !”

মিঃ পল সংযত স্বরে বলিলেন, “সে জন্ত আমি দুঃখিত, প্যার্স !”

তাঁহার কথা শুনিয়া নিকোলাস, প্যার্স ঘাড় বাঁকাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল ; তাহার মুখ আরক্তিম !

“তুমি ?”—বলিয়া হস্তার দিয়া প্যার্স বুক পকেটে হাত পুরিল ।

কিন্তু মিঃ পল সেই মুহূর্ত্তে প্যার্সের ঘাড় লাকাইয়া পড়িয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন । প্যার্সের পিছুলের গুলি সরেগে মেঝেতে প্রতিহত হইল । তাহার পর জড়াজড়ি ও ছড়োছড়ি করিতে করিতে উভয়ের দেহ মশায়ে প্রাচীরে নিক্ষিপ্ত হইল ।

পামার্স পলের মুখে প্রচণ্ড বেগে ঘুসি মাঝিতে লাগিল; পল তাহার ঘুসি-বলিতে বিব্রত হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। পামার্স মুক্তিলাভ করিয়াই পলকে একত্ব বেগে ধাক্কা মাঝিল যে, পল সেই ধাক্কায় মুগ্ধ গুঁজিয়া পাশের দেওয়ালে নিক্ষেপ হইলেন। সেই স্বযোগে পামার্স পিস্তলটা মেঝের উপর হঠাৎ তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সে হাত বাড়াইয়া পিস্তলটি তুলিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে হানিম্যান দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার বিরাট দেহ পামার্সের দেহের উপর নিক্ষেপ করিল। পামার্স তাহার দেহের নীচে পড়িয়া চাপটা হঠাৎ উপক্রম! এবারও তাহার পিস্তলের গুলি বে-কায়দায় অস্ত্র দিকে চলিয়া গেল। হানিম্যান পামার্সের দেহের উপর চাপিয়া থাকিলে পামার্স তাহার পদব্ধ মুক্ত করিয়া একত্ব বেগে হানিম্যানের পাঞ্জরে পদাঘাত করিল যে, হানিম্যান তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া কুমাণ্ডের মত গড়াইতে লাগিল। পামার্স মুক্তিলাভ করিয়া নিঃ পলের মাথা লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিতেই তিনি বসিয়া পড়িলেন। এবার গুলিটা পলের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তই পল পামার্সকে আক্রমণ করিয়া, তাহার হাত হঠাৎ পিস্তলটা কাড়িয়া লইয়া তাহার মস্তকে একত্ব বেগে আঘাত করিলেন যে সে হানিম্যানের পায়েব কাছে পড়িয়া খাবি পাইতে লাগিল। তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

* * * *

এইবার মেজর ফরেস্টের কথা বলিব।

মধ্যরাত্রি অত্যন্ত প্রাণ। মেজর ফরেস্ট তাহার ড্রিং-রুমে পদচারণা করিতেছিলেন। তাহাকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখা যাইতেছিল।

লুনা বিবর্ধ মুখে এক পাশে বসিয়া অগ্নিকুণ্ডের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল; তাহার চোখে মূগ্ধ ভাব দেখা পড়িত।

মহলা সম্মুখের ঘরে ঘটনা ন হইল। লুনা সেই শব্দে চমকিয়া উঠিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার স্বামীকে বলিল, “চাকরের সকলেই তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; কে আসিল আমিত! দেখিয়া আসি।”

মেজর ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “না প্রিয়ে, তুমি কেন কষ্ট করিয়া বাইবে? ‘আমিই বাইতেছি। তুমি বসিয়া থাকো।’

লুনা বসিয়া রহিল। তাহার স্বামী ঘর খুলিলেন, সে শব্দও সে শুনিতে পাইল। মেজর সাবশব্দে বলিলেন, “পল? কি আশ্চর্য! তুমি এই গভীর রাত্রিতে?”

পল মেজরের কথায় বাধা দিয়া কি বলিলেন; তাহার পর উভয়ে হলঘরের দিকে চলিলেন। পল মেজরের সঙ্গে ড্রিং-রুমে প্রবেশ করিলে মেজর তাহার জীকে বলিলেন, “পল কিরিয়াছে দেখিতেছি।” — সেই সময় ওর পাল কাটিয়া বন্ধ করিতেছে; তাহার পরিচ্ছদ ছিন্নবিচ্ছিন্ন। তিনি ধোঁড়াইতেছেন! অবস্থা দেখিয়া মেজর ফরেস্ট গভীর বিষয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “এ কি সর্বনাশ! তুমি কাথায় সিঁদাছিলে পল! তোমার এ রকম অবস্থার কারণ কি? কাহারও সঙ্গে তুমি হু

করিতেছিলে নাকি ?”

পল বলিলেন, “আমি অত্যন্ত অবসন্ন ; আপনার ঘরে ত্রাণ্ডি থাকিলে আমাকে এক গ্লাস আনিয়া দিন। শরীরটা একটু চাঙ্গা করিয়া লইয়া আপনাকে সকল কথাই বলিতেছি।”

মেজর বলিলেন, “আবার ঘরে প্রচুর ত্রাণ্ডি আছে ; আমি এক মিনিটের মধ্যে তাহা তোমাকে আনিয়া দিতেছি।”

মেজর প্রস্থান করিলে পল লুসীর মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, তাহার মুখ গভীর ; দৃষ্টি অচঞ্চল, অত্যন্ত কঠোর।

পল নীরস স্বরে বলিলেন, “আমি হান্নিমানকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। পামার্সকে আমি মুঠোয় পুরিয়াছি ; তাহার ঘে সহযোগিনী ক্লোরোফর্মের সাহায্যে হান্নিমানকে অজ্ঞান করিয়াছিল, তাহাকেও হাতে পাইয়াছি। মার্স গ্রেজে তাহার যে ভৃত্য ছিল, তাহাকে আমার হাতে পড়িয়া শৃঙ্খলিত হইতে হইয়াছে ; আর মানুষের জীবন লইয়া নরপিশাচ মঙলোর খেলা শেষ হইয়াছে ; সে মরিয়াছে। আমার সকল কথা বুঝিতে পারিয়াছ ? তোমার কুহকের ফাঁদ আমি ভাঙিয়া দিয়াছি।”

লুসী বিবর্ণ মুখে রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলিল, “এখন কি করিবে স্থির করিয়াছ ?”

পল বলিলেন, “আমি দরজায় আসিয়া গাড়া লইবার পূর্বেই তোমাদের গ্যারেজে গিয়াছিলাম। তোমার গাড়া গ্যারেজে হইতে বাহির করা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া ছ। তাহার ভিতর তোমার ব্যাগ এবং লগেজ দেখিতে পাইলাম। বঝিলাম, তুমি উডিবার সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছ, এখন ডানা মেলিতে যে কিছু বিলম্ব !”

লুসী ইহা স্বীকার করিতে পারিল না। তাহার মুখে কথা সরিল না। সে অপরাধিনীর মত নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ পল যুদ্ধস্বরে কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বজ্রের কঠোরতা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “আমার অধিক কথা বলিবার সুযোগ হইবে না ; বোধহয় তাহার প্রয়োজনও নাই। আমি ঘাহাই জানতে পারিয়া থাকি, পামার্স তোমার সম্বন্ধে এখনও কোন কথা প্রকাশ করে নাই ; ভবিষ্যতেও সে তোমাকে এই হীন বডবড্বে জড়াইবে বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ সে তোমাকে আড়ালে রাখিবে। এই সুযোগে তুমি ক্রয়ডনে উপস্থিত হইয়া দেশান্তরগামী কোনও এরোপ্লেনে আশ্রয় গ্রহণ কর। আর এদেশে কাহাকেও মুখ দেখাইও না। ঢলাঢলি করিয়া মেজর বেচারার মুখ পুড়াইও না। আর এক কথা—”

মিঃ পল লুসীর হাত ধরিয়া তাহাকে এক পাশে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, “যে জীলোকটা হান্নিমানের নামে চিঠি লিখিয়াছিল এবং যে চিঠির জন্য ডাক-পিণ্ডের-প্রাণ-গিয়াছে, তাহার বহুতটা কি, সে কথা আগাকে বলিতে এখনো তোমার আপত্তি আছে কি ?”

লুদী বলিল, “সেই পত্রে হান্নিমানকে সতর্ক থাকিতে বলা হইয়াছিল। টাকার বখরা লইয়া সেই জীলোকটার সঙ্গে পামার্সের বগড়া হইয়াছিল। হান্নিমানের কলক প্রচাবের ভয় দেখাইয়া তাহারা উভয়েই তাহাকে শোষণ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। জীলোকটা হান্নিমানকে যে দিন সেই চিঠি লিখিয়াছিল, সেই দিনই সে পামার্সের একখানি পত্র পাইয়াছিল। পামার্স সেই পত্রে জীলোকটার প্রস্তাবিত বখরাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিল।”

মিঃ পল বলিলেন, “এই জগুই কি সে হান্নিমানকে পত্র পাঠাইয়া অহুতপ্ত হইয়াছিল? তাহার পর সে বোম্বেয় টেলিফোনে পামার্সকে জা পাইয়াছিল—সে হান্নিমানকে যে পত্র লিখিয়াছিল, ক্রকোর্ড-হাউসে হান্নিমানের নিকট তাহা ডাকে চলিয়া গিয়াছে।—এখন সকল বাপার যুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।”

“তুমি এখন যাটতে পার” বলিয়া মিঃ পল লুদীর হাত ছাড়িয়া দিলেন। লুদী ঘাবরে দিকে অগ্রসর হইয়াছে। সেই সময় মেজর ব্র্যাণ্ডের বোতল ও গ্লাস লইয়া সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিতেই তাহার দ্বারকে দ্বারদাস্তে যাইতে দেখিলেন। তিনি তাহাকে সম্বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাথার যাও প্রিয়তমে, এই গভীর রাতে? তোমাকে এত ঘান দেখিবে কি কেন? একজাজ সড়িক?”

“এ প্রিয়তম”—বলিয়া সেই মায়াবিনী উভয় হস্তে তাহার হামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহার মুখে চুষন করিল। তাহার পর করুণা বিগলিত স্বরে বলিল, “বেচারী পলের দুর্দশা দেখিয়া আমি হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইয়াছি, তবে আশা করি, কয়েক মিনিটের মধ্যে এই দাকড়াটা আমি সামলাইতে পারিব। নারীর মন পরমেশ্বর কি উপাশনে নিৰ্মাণ করিয়াছেন, তা পুরুষ তুমি কি বুঝবে?”

লুদী সেই কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইল। পল ব্র্যাণ্ড ঠিকিয়া কিঞ্চিৎ চাঞ্চ হইলে মেজর তাহাকে বলিলেন, “তোমার দুর্দশার কারণ কি, এবং বোঝায় তুমি ডুব মারিয়াছিলে, এখন তাহা খুলিয়া বালবে তো?”

পল সকল ঘটনার কথা সংক্ষেপে মেজরের গোচর করিলেন; তাহা শুনিয়া মেজর বলিলেন, তুমি কি বলিতে চাও, বোগ ও নিকোলাস পামার্স উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি? একবার সে ডাক্তার বোগের অভিনয় করিতেছিল, আবার খোলস বদলাইয়া নিকোলাস পামার্সের মূর্তিতে আমাদের সঙ্গে মিশিয়া ক্ষুতি করিতেছিল?”

মিঃ পল বলিলেন, “হঁ, আমার এই ধারণা সত্য। পুলিশ তাহাকে গ্রেপার করিয়াছে।”

মেজর সবিস্ময়ে বলিলেন, “বোগের ছদ্মবেশে সে আমাদের উভয়েরই সম্মুখে আসিয়াছিল। আমি একদিন প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া তাহাকে দেখিয়াছিলাম; তুমিও ডাক-শিয়ন ডিক চালির হত্যার ব্যক্তিতে তাহার মৃতদেহের অদূরে সেই ছদ্মবেশীকে দেখিতে পাইয়াছিলে; কিন্তু আমরা উভয়েই তাহাকে চিনিতে পারি নাই—ইহার কারণ কি?”

পল বলিলেন, “সেই দুযোগের বাজে আমি আমার মোটর-কারের মাথার আলোকে তাহাকে দেখিয়াছিলাম,—তখন সে ষানিক দূরেই ছিল। বিশেষতঃ তাহার চন্দ্রবেশ নিখুঁত হওয়ায় আমি তাহাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ পাই নাই। ডাক্তার যোগের কুজদেহ ও আড়ষ্ট ভাব দেখিয়া, বলবান ও চটপটে নিকোলাস পামার্সের সহিত তাহার তুলনা করিবার প্রয়োজন ছিল বলিয়াই আমার মনে হয় নাই।”

মেজর বলিলেন, “তোমার এ কথা সত্য।”

মিঃ পল এক গ্রাস ত্রাণ্ডি ঢালিয়া গ্রাসটা মেজরের হাতে দিয়া বলিলেন, “এটুকু আপনি পান করুন। আপনাকে এখন বাহা বলিব তাহা শুনিবার জন্য আপনার বখেটে ধৈর্য ও মানসিক বলের প্রয়োজন।”

মেজর গ্রাসটি শূণ্ণ করিয়া প্রব্রূচক দৃষ্টিতে মিঃ পলের মুখের দিকে চাহিলেন। মিঃ পল ধীরে ধীরে তাহাকে তাহার গুণবতা পত্নীর গুণ লীলা-সংক্রান্ত সকল কথাই বলিলেন। সেই মায়াবিনী কুহকিনী প্রেমাভিনয়ের অন্তরালে এতদিন কি খেলা খেলিয়া আসিয়াছে, সেই বাড়ুকরী কোন মতে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া কি ভীষণ যড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল—বাহার অন্তিম মাত্র কোন দিন তিনি বুঝিতে পারেন নাই, তাহার বিস্ময়কর বিবরণ শুনিয়া মেজর চেয়ারে কাত হইয়া পড়িয়া উভয় হস্তে মুখ ঢাকিলেন। আত্মসংযম তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

মিঃ পল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার শোচনীয় মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিলেন, দুঃশীলা তরুণীর প্রেমমুগ্ধ সেই প্রতারণিত প্রোচের দুর্দশা দেখিয়া তাহার মনে করুণার সঞ্চার হইল না। তিনি অঞ্চল স্বরে বলিলেন, “কিন্তু আমার কথা সত্য, অতি কঠোর সত্য। লুসী এই কুর্কর্মে পামার্সের বরণাধারী করিত। মডলো হানিমানকে তাহার পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া, তাহাকে বেহাশ করিয়াছিল; তাহার পর লুসীই তাহাকে তাহার মোটর-কারে ফোর-গেবলস্-এ রাখিয়া আসিয়াছিল। সেখানে তাহারা হানিমানকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখিয়াছিল; সন্ধ্যার পর পামার্স তাহাকে মার্সগ্রেঞ্জে লইয়া গিয়াছিল। আমি মডলোর অনুসরণ করিয়া জলার ভিতর দিক্‌ভ্রাস্ত হইয়া ঘুরতে ঘুরিতে মার্সগ্রেঞ্জের সম্মুখে আসিয়া বাহাকে গ্রেঞ্জে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলাম, সে পামার্স ভিন্ন অন্য কেহ নহে। আমার বিশ্বাস, সে আমারই সন্ধান, আমি এখানে আছি কি না, তাহাই জানিতে আসিয়াছিল।”

মেজর অশ্রুটন্তরে বলিলেন, “সম্ভব বটে; কিন্তু একটা কথা বুঝিতে পারিলাম না। যদি তোমার কথা সত্য হয়, তাহা হইলে মডলো কি উদ্দেশ্যে লুসীকে এখানে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল?”

পল বলিলেন, “উহা একটা ছল মাত্র। সে আপনার স্বীকে আদাত বা তাহার উপর কোন অভিযাচার করে নাই, তাহা তো আপনি জানেন। পামার্স পুলিশকে ও আমাকে তুল বুঝাইয়া ভিন্ন পথে পরিচালিত করিবার জন্যই এই খেলা খেলিয়াছিল।”

মেজর বলিলেন, “তুমি বলিতেছ, তুমি লুসীর সকল কীতিই জানিতে পারায় সে

আমাকে ভাগ্য করিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে ; কিন্তু তোমার একথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না । না, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য—আমার প্রতি তাহার ঐতি-যমতা অতুলনীয় ।”

মিঃ পল বলিলেন, “প্রেমের অভিনয়ে তাহাকে অতুলনীয় বলিতে পারেন । আমার কথায় অসন্তুষ্ট হইবেন না ; আপনার মত গতযৌবন, অরমিক প্রৌঢ়কে লইয়া লুনার মত নবযুবতা, মার্যাবিনী কুহকিনী প্রেমের অভিনয় করিতে পারে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আপনাকে বাদব নাটাইতে পারে, কিন্তু আপনাকে ভালবাসিতে পারে না । সে আপনার প্রেমে বন্ধিনা হইবার জন্য আপনাকে দাসারে আসে নাই ।”

মেজর তখন একথা স্বীকার না করিলেও, পরে একদিন ইহা তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল । ডাক-পয়নের হতাপরাধে পামার্সের ফাঁসি হইবার কয়েক মাস পরে মেজর লুনার একখানি পত্র পাইয়াছিলেন । পত্রখানি সে স্বদূরদূর-পার্বত্য বৃষেনোন্মাদ্যসি হইতে লাগিয়াছিল । মেজর সেই পত্রখানি পাইবার পর মিঃ পলকে সপ্তাহপেয়ে তাহার আতিথ্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । পল যথাস্থানে ক্রফোর্ড হাউসে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে সেই পত্র দেখাইলেন ।

মিঃ পল সন্তপ্তে পাঠ করিলেন, “প্রিয় চার্লস, আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, আমি তোমার দ্বা নহ—এই সংবাদ আমার নিকট হইতে পাইয়া তুমি কিঞ্চিৎ সন্তোষ বোধ করবে । যখন আমি য়েঙ্গনের গীজার গিয়া তোমার মত আধাবুড়েকে বিবাহ করিবার সিপান অভ্যস্ত করিয়াছিলাম, তাহার পূর্বেই আমি আর একজনকে বিবাহ করিয়াছিলাম ; কিন্তু তুমি জানিতে না যে, আমি অগ্নের পত্নী । য়েঙ্গনে যখন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ, সেই সময় আমি পামার্সের সহযোগে ববদায় চালাইতেছিলাম । ধনবানের গুপ্তকথা, কলক-কাহনী প্রকাশের ভয় দেখাইয়া স্বর্ধোপার্জনই আমাদের সেই ব্যবসায়ের বিশেষত্ব । পামার্সই আমাকে উদ্দেশ্য দিয়াছিল—যদি আমি কোন সম্ভ্রাণ লোকের স্ত্রী সাজিয়া, আমার রূপের প্রভাবে হৃচ্চারিত্র ধনাচা ব্যক্তিদের মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আমার আতিথ্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করি, তাহা হইলে তাহার আনার নিমন্ত্রণে প্রকৃত-চিত্তে আমার মুঠার ভিতর আসিয়া পড়িবে । তাহার পর আমরা একযোগে তাহাদিগের শোষণের ব্যবস্থা করিতে পারিব । তাহার এই উদ্দেশ্য মূল্যবান মনে করিয়া তোমাকে লোক-দেখানো বিবাহ করিয়াছিলাম ; এবং প্রেমের অভিনয়ে তোমাকে মুগ্ধ করিয়া, তোমার ঘাড়ে চাপিয়া স্ত্রীকোশলে গুপ্তেণে ব্যবসা চালাইতেছিলাম । প্রেমাত্ম তুমি মনে করিতে, আমি তোমার অনুরাগিনী, তোমা ছাড়া আমার দেহতরীর আর কোনও কাতারী নাই ! রূপমুগ্ধ নির্বোধ পুরুষদের ভূলাইয়া স্বার্থসিদ্ধি করা আমাদের পক্ষে এতই সহজ । আমি ও পামার্স—আমরা উভয়েই হানিম্যানের এবং যে পরস্পর তাহার প্রণায়নী, তাহার অবৈধ গুপ্তপ্রেম সংক্রান্ত অনেক কথাই জানিতাম ; হানিম্যানকে তোমার ক্রফোর্ড-হাউসে কোশলে লইয়া বাইতে পারিলে তাহাকে শোষণ করিবার সুযোগ পাইব বুঝিয়া,

লগুনে গিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া, তাহার মন চুরি করিয়াছিলাম। সে আমার রূপের লোভে আমারই নিমন্ত্রণে তোমার পল্লী-ভবনে আমাদের অতিথি হইয়াছিল। তাহার পূর্বেও ঐরূপ কৌশলে আমি বহু লোকের সর্বনাশ করিয়াছিলাম। হানিম্যানের প্রশয়িনীকেও আমাদের দলে যোগদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলাম।

"আমি সংবাদ পাইয়াছি, সে ধরা পাড়িয়া ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হইলে তাহার প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, প্যামাস'ই তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছিল; কারণ, তাহারই নিবুদ্ভিতার ডাকশিয়ন নিহত হইয়াছিল। পিয়নটা নিহত হওয়াতেই আমাদের ভাবস্বভাবের সকল আশা নষ্ট হইয়াছে; নতুবা আরও কত কাল তোমার ঘাড়ে চাপিয়া কত কাণ্ড করিতাম কে বলিতে পারে ?

"আমার ক্ষোভের অনেক কারণ আছে; কিন্তু যখন আমার মনে হয়, তোমাদের যত সরলপ্রকৃতি নির্বোধ বুদ্ধোকে প্রভাবিত করিয়া কি ভাবে বীদর নাচাইয়াছি, এবং তোমাকে কিরূপ অনহায় অবস্থায় ফেলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি, তখন সেই ক্ষোভ মর্শাস্তিক দুঃসহ বলিয়াই আমার মনে হয়। - চিরবিদায়-প্রার্থিনী লুদী।"

নিঃ পল পত্নীমানি কেলিয়া রাখিয়া পাইপে তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন, "হতভাগা প্যামাস'টা অপকর্মের উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে।"

মেজর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তা বটে; কিন্তু লুদীর পক্ষে তাহার নিন্দাসূচক একটা কথাও নাই! সে কি এই নরশিখারেরই স্ত্রী? বেচারার দুর্ভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখ হয়; আহা অভাগী!"

মেজর কামাল নাকে দিয়া লশঙ্কে নাক ঝাড়িলেন; তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল।

*

*

*

দীনেন্দ্রকুমার রায় : বিদেশী গোয়েন্দা কাহিনীর অসুবাদ, ভাবাসুবাদ ও ছায়া অবলম্বনে গল্প লেখার যে রেওয়াজ আজকের দিনে বহুল প্রচলিত আছে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে তার প্রবর্তনা ঘটে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের হাতে। আজ থেকে বেশ কিছু দশক পূর্বে ব্রেক সিরিজের গোয়েন্দা গল্পমালা রচনায় লেখকের সার্থক প্রয়াস তাঁকে বহস্য সাহিত্যের পাঠকদের নিকট এক অতিপরিচিত মানুষ করে তুলেছে। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গোয়েন্দা গল্পে বিদেশী গ্রেট, পটভূমি প্রভৃতি বহস্য গল্পের পাঠকের নিকট পরিচিত হলেও তাঁদের হৃদয়ের দ্বার খুলে দেয় নি। প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নি তবে দীনেন্দ্রকুমারের পল্লী বর্ণনা তাঁকে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল করেছে। পল্লীচিত্র অঙ্কনে তাঁর সার্থক প্রয়াস ও গোয়েন্দা গল্প রচনায় তাহার প্রাজ্ঞতা ও প্রসাদ গুণ তাঁকে তাঁর যুগে বহুল পঠিত লেখকদের অন্ততম করেছে।

লেখকের রহস্যলহড়ী, যত্তমার্কের দপ্তর, লগুনের ড্রাগন, নিশাচর বাজ, প্রচ্ছন্ন আততায়ী, কুকিনীর ফাঁদ ইত্যাদি গ্রন্থ আজকের পরিণত বয়স্কান পাঠকদের অনেকেরই অতিপরিচিত ও বাস্তবপরিচিত গ্রন্থ।

*

*

*



চাবি এবং খিল

হেমেন্দ্রকুমার রায়

। এক ।

মধু ঘবে ঢুকে বললে, “বাবু একটি শুদ্ধ লোক আশনার সঙ্গে দেখা করতে চান।”

জয়ন্ত বললে, “ক তিনি?”

—“নাম বললেন রাধোহরিবাবু।”

—“রাধোহরিবাবু? এমন লেকেলে নামধারী আধুনিক কোন তত্ত্বলোকে আমি চিনি বলে মনে হচ্ছে না তো।”

মধু বললে, “তিনি বললেন, পের বছরে দেওঘরে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে নাকি তাঁর আলাপ হয়েছিল।”

মানিক বললে, “ওহে, হয়েছে। জয়ন্ত, তোমার স্ব-তিন্তি অত্যন্ত দুর্বল দেখছি। দেওঘরের রাধোহরিবাবুকে এর মধ্যেই তুমি ভুলে গেলে?”

জয়ন্ত বললে, “ভায়া, বিংশ শতাব্দীতে এমন পৌরাণিক নাম স্বরণ করে রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তা যা হোক, এতক্ষণে আমার মনে পড়েছে।”

—“আমাদের তোমার করবার জন্তে রাধোহরিবাবু ‘ক চেষ্টাই না করেছিলেন।”

—“যাক মানিক, আর বলতে হবে না। হে শ্রীমধুসূদন, তুমি ঝটিতি নীচে নেমে গিয়ে রাধোহরিবাবুকে বঁলে এস—দ্রাগত।”

মধুর প্রশ্নান। ঘরের ভিতরে রাধোহরিবাবুর প্রবেশ অনতিবিলম্বে :

রাখোহরি নামটির অর্থ মাকাতার আমলের বটে; কিন্তু রাখোহরি নামধারী এই ব্যক্তিটি যে পৃথিবীর আলো দেখেছেন অতি আধুনিক যুগেই, তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই সে কথা আর বুঝতে বাকি থাকে না। বয়স পঁচিশ কি ছা কশ। একহারা, সৌখীন চেহারা, গোরবর্ণ। চোখে চওড়া ক্রেমের চশমা, ঠোঁটের উপরে ‘চালি-চ্যাপলিন’ গৌক। গায়ে গিলে করা চুড়ীদার পাঞ্জাবী, পরনে ফর্নাফনে তাঁতের কাপড়। পায়ে ‘সেলিম-হু’। হাতে রূপো বাঁধানো একগাছা সন্কু ছড়ি। তার উপরে মুক্তার বোতাম, সোনার ‘রিট-ওয়ার্ড’ ও এসেন্সের ভুগুঝে গন্ধ প্রভৃতি আদিকোতার কথা নাই বা বলুম।

নমস্কার ও সাদর সম্ভাষণের আদান-প্রদান হবার পর একখানা চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মানিক বললে, “বসুন রাখোহরিবাবু। কিন্তু আপনাকে দেখলেই আমার কি মনে হয় জানেন?”

—“কি মনে হয়?”

—“পিতার অবাধ্য ছেলে বলে।”

—“কেন?”

—“পিতৃদেব আপনাকে একটি অত্যন্ত সেকলে নামে পরিচিত করতে চেষ্টাছিলেন। কিন্তু আপনি নিজের চেহারাটিকে দস্তবস্ত আপ-টু-ডেট করে তুলে একেবারে ‘হাল ক্যাসানের বাবু’ বলে পরিচিত হতে চান। এটা কি আপনার পিতার ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ নয়?”

রাখোহরি যুহু হেসে বললে, “মোটাই নয়। পিতার অবাধ্য পুত্র হচ্ছে একালের সেই সব ছেলে, যারা পিতৃদত্ত নাম ত্যাগ করে, গ্রহণ করে হাল-ক্যাসানের নতুন নতুন রং চঙে নাম। আমি তো তা করিনি। স্বগীয় পিতৃদেব আমাকে যে নাম দিয়েছিলেন আমি তা মাপায় করে রেখেছি। নিজের সাজসজ্জাকে আমি আপ-টু-ডেট করে রাখব না, আমার বাবা তো এমন কোন ইচ্ছা প্রকাশ করে যাননি। কিন্তু যাক সে কথা, আমি এখানে ছুটে এলেছি বী-ভমত দ্বারা ঠেকেই।”

জয়ন্ত শুধালে, “ব্যাপার কি রাখোহরিবাবু?”

—“আমার ভগ্নীর অত্যন্ত বিপদ।”

জয়ন্ত একটু বিস্মিত হয়ে বললে, “আপনার ভগ্নীর বিপদের জন্তে আপনি আমাদের কাছে ছুটে এয়েছেন?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি ছাড়া আর কেউ তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না।”

—“আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারছি না, আপনার ভগ্নীর কি হয়েছে?”

—“শুনুন তবে বলি।”

। দুই ।

রাখোহরি বললে, “স্বামীর বিপদকে প্রত্যেক জ্যোই নিজের বিপদ বলেই মনে করে। পুলিশ আমার ভগ্নীপতিকে গ্রেপ্তার করেছে।”

—“কেন?”

—“চুরির অপরাধে।”

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল; তারপর বললে, “আপনার ভগ্নীপতি যদি চুরি করে ধরা পড়ে থাকেন তাহলে আমি হাজার চেষ্টা করলেও তাকে পুলিশের হাত থেকে তো ছাড়িয়ে আনতে পারব না।”

—“জয়ন্তবাবু, আমার ভগ্নীপতি চোর হ'লে আমি আপনার কাছে ধরনা দিতে আসতুম না। স্বত্বে আর বাই হোক, চোর নয়।”

—“আপনার ভগ্নীপতির নাম স্বত্বে?”

—“আজ্ঞে ইয়া। স্বত্বে সেন।”

—“আমরা এক ভাই, এক বোন। তার নাম রাধারাণী, আমার চেয়ে সে দুই বছরের ছোট। বাবা খুব ভালো ঘরেই তার বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। স্বত্বেও ছিল দেখতে-শুনতে রীতিমত সুপাত্র। তার পৈতৃক সম্পত্তির আর ছিল মাসিক তিন-চার হাজার টাকা। কিন্তু জয়ন্তবাবু, সর্বনেশে ‘ঘোড়া যোগে’ সর্বস্ব তার উড়ে গিয়েছে।”

—“ঘোড়া যোগ?”

—“হ্যাঁ, ঘোড়দৌড়। সর্বস্বান্ত হয়ে তার যোগ আরো বেড়ে যায়, সে টাকা ধার করে রেস খেলতে থাকে আর কতগুলো হতচ্ছাড়া জুয়াড়ীর সঙ্গে মিশে মদ পবস্ত্র ধরে। বত বাজী হারে তত মদ খায়। জুয়া আর নেশা, এখন এই হয়েছে তার ধ্যান-জ্ঞান প্রাণ।”

জয়ন্ত বললে, “রাখোহরিবাবু, আপনার ভগ্নীপতির যে ছবি আঁকলেন, তা মোটেই উজ্জল বলে মনে হচ্ছে না।”

—“ইদানীং মাতাল হয়ে অনেক রাতে বাড়ীতে ফিরে রাধারাণীকে সে ঘা-তা পালিগালাজ দিতে শুরু করেছিল। তার অপরাধ, স্বামীকে সে মদ খেতে আর জুয়া খেলতে মানা করত। শেষটা আর সহিতে না পেয়ে রাধারাণী আমার কাছে পালিয়ে এসেছে—যদিও এখনো স্বামীকে সে প্রাণের মত ভালোবাসে, দেবতার মত ভক্তি করে।”

—“তারপর এই চুরির ব্যাপারটা কি?”

—“দেবার দ্বারে স্বত্বেতর পৈতৃক বাড়ী বিকিয়ে গিয়েছে, সে এখন ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে। এক অংশে সে থাকে আর এক অংশে থাকে তার বাড়ীওয়ালী জগন্নাথ। শুনছি আজ পাঁচদিন আগে জগন্নাথের পঞ্চাশ হাজার টাকা চুরি গিয়েছে আর পুলিশ চোর বলে গ্রেপ্তার করেছে স্বত্বেকে।”

গোয়েন্দা—প্রথম (৫)

—“স্বতন্ত্র বিকল্পে কি কি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে?”

—“আমি এখনো তা ভালো করে জানতে পারিনি। তবে আমার আর বাধাবাহীরা দুটো বিশ্বাস, স্বতন্ত্র যত নীচেই নামুক, কিছুতেই চুরি করতে পারে না।”

—“রাখোহরিবাবু, আপনাদের এ বিশাল যুক্তিহীন, আদালতে গ্রাহ্য হবে না। পুলিশ বিনা প্রমাণে কারকেই গ্রেপ্তার করতে পারে না। এ মামলাটার তার পেয়েছেন কোন্ পুলিশ-কর্মচারী?”

—“আপনাদের বন্ধু সন্দরবাবু।”

জয়ন্ত গল্পকণ চূপ করে বইল, তারপর বলল, “সন্দরবাবু বোজা সকালে আমাদের প্রভাতা চায়ের আসরে যোগ দেন। কাল তিনি যখন আসবেন, তাঁর কাছ থেকে মামলার সব কথা জেনে নেব।”

—“হয় তো কাল তিনি আসবেন না।”

মানিক বললে, “অসম্ভব! আপনি সন্দরবাবুকে জানেন না। তাঁর নিজের ফরাসি মত কাল এখানে ‘চিকেন পাই’ নামে একটি বিলাতী খাবার তৈরী হবে। সেটিকে উন্নত কন্ঠের জন্তে সন্দরবাবু নিশ্চয়ই পৃথিবীর যাবতীয় আকর্ষণ ত্যাগ করে এখানে ছুটে না এসে থাকতে পারবেন না।” রাখোহরি কাতরকণ্ঠে বললে, “না, জয়ন্তবাবু, আমার বিনীত অনুরোধ, আপনি আজকেই সন্দরবাবুর কাছে গিয়ে সব কথা জেনে আসুন। আপনি বাধাবাহীর অবস্থা জানেন না। আজ ক’দিন থেকেই তার সোপে সেই কান্না, দিন-রাত সে খালি কাঁদছে আর কাঁদছে, কাল খাবার পয়স্ব ভেড়ে দিয়েছে। বলে স্বতন্ত্র খালাস না পেলে অনাহারেই প্রাণ ত্যাগ করবে। তাকে বাঁচাবার জন্তই আমি আজ নাচার হয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।”

জয়ন্ত গম্ভীরভাবে বলে, “রাখোহরিবাবু, আমি বাড়ির নই, আমার উপরে এতটা নির্ভর করবেন না। স্বতন্ত্র যদি সত্যসত্যই চুরি করে থাকে, আমি কিছুতেই তাকে বাঁচাতে পারব না।”

—“তবু আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন, আজই দয়া করে খানায় গিয়ে একবার সন্দরবাবুর সঙ্গে দেখা করুন।”

—“বেশ, তাই করব।”

৥ ভিন ৥

গদিস্থান হয়ে টেবিলের সামনে বসেছিলেন সন্দরবাবু। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর এক সহকারী এবং আর একজন অপরিচিত ভ্রতলোক।

জয়ন্ত ও মানিককে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে দেখে সন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, “হুম, একেবারে মানিকজোড়। ব্যাপার কি জয়ন্ত? অসময়ে কেন হে প্রকাশ?”

জয়ন্ত বললে, “স্বভ্রতের মামলাটার তদবির কবাবার ভার পড়েছে আমার উপরে।”

—“বটে, বটে! তোমার উপরে কে এ ভার দিলে ভায়া? স্বভ্রতের স্ত্রী বাধাবাগী দেবী বুঝি?”

—“আপনার এমন সন্দেহের কারণ?”

—“কারণ? কারণ বাধাবাগী দেবীর ছায়া আমি যে নিজেই আক্রান্ত হয়েছি!”

—“আক্রান্ত?”

—“তাছাড়া আর, আর কি বলি বল? বড়ই মুশকিলে পড়েছিলুম হে! পবন দিন বাধাবাগী দেবী হঠাৎ আমার কাছে এসে ধরনা দিয়েছিলেন। উল্টোখুলো কক্ষ চুল, কোলা-কোলা চোখের পাতা, উদ্ভ্রান্ত চাউনি, ময়লা কাপড়—একেবারে বিষাদ-প্রতিমা! ক্রমাগত কাঁদেন, থেকে থেকে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরতে আসেন আর করুণ স্বরে বলতে থাকেন—“আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন, আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন—তিনি নির্দোষ!” জানোই না ভাই, পুলিশের লোক হয়েছে আমার একটা দুর্বলতা আছে, স্ত্রীলোকের কথা আমি সহ্য করতে পারি না। তার উপরে মহিলাটির স্বামীর মৃত্যু দেখেও আমার মনটা আরো ভিজে গেল। এমন দুঃস্বপ্নের স্বামীর এমন পতিব্রতা স্ত্রী! কি করে যে বাধাবাগী দেবীর কাছ থেকে ছাড়ান পয়েছি, তা আর বলবার নয়। বাবার সময়ে আমার ভয় দেখিয়ে গিয়েছেন, তিনি দিনের মধ্যে স্বভ্রত ছাড়া না পেলে তিনি আমার বাড়ির দরজায় ‘হত্যা’ দিয়ে পড়ে থাকবেন। কিন্তু আমি কি করার বল করব? আমি পুলিশ কর্মচারী, আইনের দাঁতের আঁচের হাত-পা বাঁধা, স্বভ্রতকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই!”

জয়ন্ত শুনেলে, “স্বভ্রতকে কি সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হয়েছে না তার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ আছে?”

—“প্রমাণ আছে বৈকি, যথেষ্ট প্রমাণ আছে।”

—“মামলাটার বিবরণ গোড়া থেকে শুনে পেলেন খুশি হব!”

সামনের অবিচ্ছিন্ন ভ্রলোকটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে স্বন্দরবাবু বললেন, “গোড়ার কথা শোনে: এর মূখ থেকে কারণ ওর বাড়ীই হচ্ছে ঘটনাস্থল। ঠাঁর নাম হচ্ছে বাবু জগন্নাথ পাল।”

জয়ন্ত ফিরে জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে দেখলে। হঠপুই, বৈটেনস্টে, কালো-কালো মাছুষটি, গলায় তুলসী মালা দেখলেই মনে হয়, কোন গদির মালিক।

জয়ন্ত শুনেলে, “আপনিই জগন্নাথবাবু, স্বভ্রতের বাড়ী ওয়ালা?”

—“আজ্ঞে হ্যাঁ।”

—“মশাইয়ের কি করা হয়?”

“দর্শনাট্যের আমার চিনির কারখানা আছে।”

—“আচ্ছা, এইবারে অনুগ্রহ করে সব কথা খুলে বলুন দেখি। ছোট আর বড় সব

কথা, সামান্য বা অকিঞ্চিৎকর ভেবে কোন কথা বলতে তুলবেন না।”

॥ চার ॥

অগস্ত্য বলতে লাগলেন : “আমার বসন্তবাড়ী হচ্ছে দরজী পাড়ায়। সংসারে আমরা ছয়জন লোক—আম, আমার স্ত্রী, দুই ছেলে, এক মেয়ে আর আমার এক ভ্রাতৃপুত্র। আমার চিনির কারবার থেকে মন্দ আয় হয় না, সুতরাং নিজেকে আমি সম্পন্ন গৃহস্থ বলেই বর্ণনা করতে পারি।

শ্রীনাথ বলে আমার এক ছোট ভাই ছিল, পাটের দালালিতে সে বেশ দু’পয়সা যোজগার করত। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাসা বেঁধেছিল আহািরটোলায়। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ঘনায় বছর চারেক আগে তার স্ত্রী মারা পড়ে আর মাস কয়েক আগে হঠাৎ কলেরা রোগে তারও মৃত্যু হয়। তখন শ্রীনাথ আমাকেই তার সম্পত্তির অর্ধ ক’রে যায়।

আমার বসন্তবাড়ীর দুই অংশ। আমার সংসার ছোট্ট একটা অংশেই সকলের স্থান সংকুলান হয়। তাই বাকি অংশটা ভাড়া দিয়েছি। আজ আট মাস আগে সেই অংশের ভাড়া নিয়েছেন স্ত্রতবাবু। বাড়ির এই দুই অংশের মধ্যে আনাগোনা করার উপায় নেই। দোতলার ছাদটা পাঁচিল দিয়ে দুই ভাগে ভাগ করা। দুই অংশেই দোতলার ছাদের উপরে আছে একখানা ক’রে তিনতলার ঘর।

কিছুদিন যাবৎ স্ত্রতবাবুর সঙ্গে নানা কারণে আমার আর বনিবনা নেই। আমি তাঁকে বিশিষ্ট ভ্রতলোক ভেবেই বাড়ীভাড়া দিয়েছিলুম। কিন্তু বেশিদিন যেতে না যেতেই বুঝতে পারলুম, তিনি হচ্ছেন এক নব্বের জুয়াড়ী আর বেহেড় মাতাল। তাঁর বাড়ীতে যে-সব লোক আসা-যাওয়া করে তাদের চেহারা ভ্রতলোকের মত হ’লেও ব্যবহার ভ্রতলোকের মত নয়। কোন কোন রাতে মাতলামি আর হুল্লোড়ের চোটে পাড়ার লোক ঘুমুতে পারে না।

তার উপরে স্ত্রতবাবুর কাছ থেকে আজ তিন মাসের বাড়ী ভাড়ার টাকা আমি পাইনি। কাজেই তাকে আমি ছাড়াবার অস্ত্রে ‘নোটিশ’ দিতে বাধ্য হয়েছিলুম। সেইজন্তে ক্ষেপে গিয়ে একদিন তিনি মদের ঘোরে ছাদে উঠে বা-তা অকথা-কুকথা বলতেও কতর করেন নি। আমি তো দুইয়ের কথা, স্ত্রতবাবুর গালাগালি আর নইতে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী পবিত্র বাপের বাড়ীতে পালিয়ে গিয়েছেন।

এইবার আসল ঘটনার কথা শুন।

আমার ভাই শ্রীনাথ তার জীবনব্যাপী ক’রে গিয়েছিলো। তার ফলে তার মৃত্যুর পরে শ্রীনাথের বীমাশ্রমে পাওনা হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা। আমি শ্রীনাথের সম্পত্তির অর্ধ। তার নাবালক পুত্রের হয়ে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি উদ্ধার করি। এ হচ্ছে ছয় দিন—অর্থাৎ ঘটনার আগের দিনের কথা। সমস্ত টাকা আমি বাড়ীতে এনে আমার তিনতলার শয়নগৃহে লোহার আলমারির ভিতরে তুলে রাখি।

জয়ন্তাবাবু, আপনার মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছেন !
তাবছেন, এই ডামাডোলের দিনে এত টাকা কেউ ব্যাংকে জমা না দিয়ে বাড়ীতে এনে
রাখে না। বিস্মিত হ'বার কথাই বটে।

কিন্তু টাকাটা যখন হাতে পাই, তখন সেদিন ব্যাংকে জমা দেবার সময় উৎতরে
গিয়েছিল। পরদিনও জমা দেওয়া হয়নি কেন, তারও কারণ শুধু ন। আমার এক
বাল্যবন্ধু আছেন, কুমুদকান্ত চৌধুরী, তিনি মনসাপুরের দারোগা। পরদিনেই—অর্থাৎ
গেল চক্ষিণ তারিখে ছিল তাঁর মেয়েদেব বিয়ে, আমি নিমন্ত্রিত হয়ে সকালের ট্রেনেই
লক্ষ্মিবায়ে মনসাপুরে চ'লে যেতে বাধ্য হই।

এজ্ঞে আমার মনে ছিল না কোন চিন্তিত্ব। কারণ প্রথমতঃ বাড়ীতে বইল যে
ছজন ভৃত্য ও একজন পাচক, তারা প্রত্যেকেই পুরানো, পরীক্ষিত ও বিশ্বাসী লোক।
তাদের জিম্মায় বাড়ী রেখে এর আগেও দুই-এক মাসের জন্যে আমরা পশ্চিম পাড়ায়
বেড়াতে গিয়েছি। দ্বিতীয়তঃ আমার শোবার ঘরে যে অত টাকা আছে, তখন পর্যন্ত
এ কথা আমি ছাড়া কোনও জনপ্রাণী জানত না।

এখন বুঝতে পারছি, আমার কাজটা হয়েছিল অত্যন্ত কাঁচা। কারণ, পরদিনেই
মনসাপুর থেকে কলকাতায় ফিরে আবিষ্কার করলুম, আমার আলমারির ভিতর থেকে
অদৃষ্ট হয়েছে সেই পকাশ হাজার টাকার নোট, আর কিছু কিছু অলঙ্কার। বেশীর
ভাগ গহনাই ছিল আমার স্ত্রী আর মেয়েদেব গায়ে তাই বন্ধ, নষ্টলে সেকুলোকেও আর
দেখতে পেতুম না।

আলমারিটা ভাঙা হয়নি, চাবি দিয়েই খুলে ফেলা হয়েছে। চোর যে বাড়ীর
বাইরে থেকে এসেছে, সে প্রমাণও পাওয়া গেল। আমার বাড়ীর ভিতর থেকে
শোবার ঘরে ঢুকবার দরজাটা ছিল শালা বন্ধ, কিন্তু খোলা ছিল বিতলের জানে দাবার
একটিমাত্র দরজা। ঘরে মেঝের কুড়িয়ে পেলুম তার গিলটা, দরজার উপরে বাইরে
থেকে ধাক্কাধাক্কির ফলেই যে সেটা খাঁসে পড়েছে, একথা বুঝতেও আর বাঁকি
হইল না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, সজোবে ধাক্কাধাক্কির ফলে খিল খাঁসে পড়ল, তবু বাড়ীর
লোকজন শুনতে পেল না কেন? এর সহজ উত্তর হচ্ছে, চোর নিশ্চয়ই এসেছিল
ঘটনার দিন রাত্রে এবং সেটা ছিল বিষম দুর্যোগের রাত্রি—বড়, বাক্স আর বস্তির শব্দে
ডুবে গিয়েছিল পৃথিবীর অল্প সব শব্দ। আমার আর কিছু বক্তব্য নেই।”

॥ পাঁচ ॥

জয়ন্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে শুধোলে, “হৃদয়বাবু, এই চুরির মামলার আপনারা
স্বত্বভুক্ত আসামী বলে সম্বোধন করছেন কেন?”

স্বন্দরবাবু বললেন, “হুম, সম্ভব কি হে? তার বিকল্পে অকাটা সব প্রমাণ পেয়েছি।”

“কি রকম প্রমাণ শুনি?”

—“জগন্নাথবাবুর তিন তলার শোবার ঘরে বাইরে থেকে যদি চোর আসে তবে তাকে স্বত্বে যে অংশ থাকে সেইদিক দিয়েই আসতে হবে। দুই, অংশের মাঝখানে আছে কেবল একটা ছয় ফুট উঁচু পাঁচিল, যে কোন বালক সেটা ঠাঙিয়ে এ-ছাদে ও-ছাদে আনাগোনা করতে পারে। কাজেই তদন্ত করবার আগে আমি প্রথমেই গেলুম স্বত্বের বাসায়। কিন্তু গিয়ে দেখলুম অবস্থা তার অত্যন্ত শোচনীয়। তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করব কি মদ খেয়ে সে একেবারে বেহঁশ হয়ে পড়ে আছে। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে পাগলের মত বলতে লাগল যত সব অসংলগ্ন কথা। বাড়ীতে আর ক'কর সাড়া পেলুম না, পাড়ার লোকের মুখে শুনলুম, একটা চাকর ছিল, তাইনে না পেয়ে সেই চম্পট দিয়েছে। আরো শুনলুম, ঘটনার দিনে ‘বেসে’ গিয়ে স্বত্বত্ব হেরে ভুত হরে বাসায় কিরে এসেছে, আর সেই দুঃখে কাল থেকে ক্রমাগত মদ খেয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। তারপর তার বাড়ীখানা তন্নাস ক'রে কি পাওয়া গেল জানো? এই চাবিটা।” তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করে টেবিলের উপরে একটা বড় চাবির দিকে জয়ন্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

জয়ন্ত চাবিটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বললে, “এটা কিসের চাবি?”

—“জগন্নাথবাবুর লোহার আলমারির।”

—“কিন্তু এ চাবি স্বত্বত্বর বাড়ীতে গেল কেমন ক'রে? জগন্নাথবাবু, আপনার আলমারির কোন চাবি কি খোয়া গিয়েছে?”

জগন্নাথ বললেন, “আজ্ঞে না। আমার আলমারির চাবি আমার পকেটেই আছে।”

—“দেখি সেটা।”

জয়ন্ত হুটো চাবিই টেবিলের উপরে পাশাপাশি রেখে কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখে তারপর বললে, “তাহলে বলতে হয়, এর মধ্যে একটা চাবি আসল, আর একটা নকল?”

স্বন্দরবাবু বললেন, “তা ছাড়া আর কি? স্বত্বত্ব অস্ত্র কোনদিন কোন ফাঁকে জগন্নাথবাবুর তিনতলার ঘরের দরজা খোলা পেয়ে আলমারির কলের হাঁচ তুলে নিয়ে গিয়েছিল।”

—“চাবিটা স্বত্বত্বর বাড়ীর কোথায় পাওয়া যায়?”

—“তিন তলার ঘরের মেঝেয়।”

—“সেটাও কি শোবার ঘর?”

—“না, বোধহয় সেটা বাড়তি ঘর। কোন আসবাব নেই। মেঝে ভিক্রে সীতলসেতে, নিশ্চয় দরজা-জানলা খোলা থাকে, কারণ ঘটনার রাতে বৃষ্টির জল এনে

ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল।”

—“সব বুঝলুম। আপনার টেবিলের উপরে একটা খিল পড়ে আছে দেখছি। ওটাও কি ঘটনাস্থল থেকে এসেছে?”

—“হ্যাঁ, জয়ন্ত। ঐ খিল ভেঙেই চোর জগন্নাথবাবুর ঘরের ভিতরে ঢুকেছিল।”

খিলটা তুলে নিয়ে উল্টোপাল্টে দেখতে দেখতে জয়ন্ত বললে, “দেখছি খিলটা ভাঙেনি, ইজুপের পাঁচ খুলে সরাসরি উপড়ে এসেছে। তা লে ঐ চাবি আর এই খিলই হচ্ছে এ মামলার প্রধান প্রমাণ?”

—“হ্যাঁ। ঐ খিল প্রমাণিত করছে চোর এসেছে বাইরে থেকে আর ঐ চাবি প্রমাণিত করছে স্বতন্ত্রই হচ্ছে চোর। তার উপরে স্বতন্ত্র নষ্ট হওয়ার আর দারুণ অধাভাবও তার বিরুদ্ধে যাবে, কেন না মানুষকে অপরাধী করে ঐ দুটো কাণেই। সেইজন্যই আমি তাকে হেপার করেছি।”

“স্বতন্ত্র মনের নেশা তো কেটে গিয়েছে, এখন সে কি বলে?”

—“বলে, চম্পক তার বৈয়ের সন্ধ্যা থেকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গিয়েছে, মনে চুর হয়ে কিছুই সে জানতে পারেনি। বলে ঐ চাবি সে কখনো চোখেও দেখেনি অধাভাবে সে আশ্চর্যতাও করতে পারে কিন্তু চুরি করা তার পক্ষে অসম্ভব, প্রতীতি।”

জয়ন্ত বললে, “জগন্নাথবাবু, লোহার আলমারিটা আপনি কতদিন আগে কিনেছিলেন?”

—“তা প্রায় দশ বৎসর হবে।”

জয়ন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “সুন্দরবাবু, আজ সন্ধ্যার আগে স্বতন্ত্র আর জগন্নাথবাবুকে নিয়ে আমার বাড়ীতে দয়্যা করে একবার যতে পারবেন?”

সুন্দরবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, “কন হে?”

—“আমার আরে কিছু জিজ্ঞাসা আছে। হ্যাঁ, ভালো কথা আপাততঃ এই খিলগাছা আমি নিয়ে চললুম। বৈকালে ফেরে পারবেন। চল হে মানিক।”

বাইরে রাস্তায় এসে মানিক দেখলে, জয়ন্ত প্রশান্ত বদনে নিজের রপোর নশ্তানী বার করে দুই টিপ নশ্ত গ্রহণ করলে।

মানিক বিস্মিত হয়ে বললে, “জয়ন্ত, বেশী খুশি না হ’লে তুমি তো নশ্ত নাও না। এর মধ্যে মামলাটার কোন সুবাদা করতে পেরেছে নাকি?”

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জয়ন্ত বললে, “এই খিলগাছা নিয়ে তুমি আমার বাড়ীতে যাও। আমার অল্প জরুরি কাজ আছে, ফিরতে দেরি হতে পারে।”

২ ছয় ।

বৈকাল উত্তরে গেল। বৈঠকখানার বসে আছে জয়ন্ত ও মানিক। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, “কৈ হে মানিক, স্বন্দরবাবু তো এখনো আত্মপ্রকাশ কবলেন না !”

মানিক কান পেতে শুনে বললে, “কিন্তু বাড়ীর দরজায় কার গাড়ী এসে থামল ? বোধহয় স্বন্দরবাবুই এলেন !”

কিন্তু ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল বাথোহরির পিছনে পিছনে একটি তরুণী মহিলা। তরুণী এবং রূপশীও বটে, কিন্তু তার বাতনাবিকৃত মুখের দিকে তাকালে সে দেহের তারুণ্য ও লাবণ্য দৃষ্টিকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট করে না। পরণে ময়লা কাপড়, মাথার চুল তৈলাভাবে অচিঞ্চ, চোখের চাহনি উদ্ভ্রান্তের মত।

জিজ্ঞাসু নেত্রে বাথোহরির মুখের পানে তাকাল জয়ন্ত।

বাথোহরি বললে, “আমার বোন বাধারানী আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।”

বাস্তবসম্মতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, “বহন বাধারানী দেবী !”

বাধারানী রসে পড়ল বটে তবে চেয়ারের উপরে নয়, হাঁটুগেড়ে মেঝের উপরে। তারপর হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ছই বাহবছ বাড়িয়ে জয়ন্তের পা জড়িয়ে ধরতে গেল।

—“কয়েন কি কয়েন কি...” বলতে বলতে জয়ন্ত তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

বাধারানী করুণস্বরে বললে, “রক্ষা করুন আমার স্বামীকে রক্ষা করুন !”

ঠিক সেই সময়ে সময়ের কাছে আর একখানা গাড়ী এসে দাঁড়ানোর শব্দ হ’ল।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বললে, “বাধারানী দেবী, নিশ্চয় স্বন্দরবাবু আসছেন সদলবলে। শীগগির আপনি পাশের ঘরে গিয়ে দাঁড়ান। আপনার স্বামীকে আমি রক্ষা করতে পারব কি না জানি না, তবে অতীকার করছি, তাঁর সঙ্গে আপনি আপনার দেখা করিয়ে দেব। যান, যান—আর দেরি করবেন না।”

বাধারানী পাশের ঘরে প্রবেশ করলে অত্যন্ত নাচাৱের মত। সঙ্গে সঙ্গে স্বন্দরবাবুর আবির্ভাব, তারপর এল জগন্নাথ ও আর এক বিষণ্ণ মূর্তি; বয়সে যে যুবক, উষ্ণরক্ত চুল, স্বন্দর মুখশ্রী কিন্তু কালিমায় পরিম্মান।

স্বন্দরবাবু বললেন, “জয়ন্ত, এই আসামী।”

জয়ন্ত শুনোলে, “আপনারই নাম স্বরতবাবু ?”

ভীক মুখ তুলে একবার জয়ন্তের দিকে তাকিয়েই আবার মুখ নামিয়ে স্বরত অতি হৃৎস্বরে বললে, “আজ্ঞে হ্যাঁ।”

—“ভদ্রলোকের ছেলে, শেষটা চোর-দায়ে ধরা পড়লেন?”

নতনেত্রেই স্তব্ধত বললে, “ভগবান জানেন, আমি চোর নই!”

—“আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তবে বিচারে নিশ্চয়ই আপনি খালাস পাবেন। কিন্তু খালাস পাবার পরেও তো আবার আপনি যেস খেলবেন, মজা খাবেন, কুসঙ্গে মিশবেন, সান্দ্রী স্ত্রীর সঙ্গে অমায়ুষের মত ব্যবহার করবেন।”

ভগ্নকণ্ঠে স্তব্ধত বলে উঠল, “আবার? কখনো নয়, কখনো নয়।”

অয়ন বললে, “তুনে স্বপ্নী হলুম। আপাততঃ একবার পাশের ঐ ঘরে বান দেখি, এখানে রাখাচাণী দেবী আপনার জন্মে অপেক্ষা করছেন।”

স্তব্ধত চমকে বলে উঠল, “রাখাচাণী দেবী?”

—“হ্যাঁ, আপনার স্বা।”

স্তব্ধত পাশের ঘরের ভিতরে গেল দ্রুতপদে।

স্বন্দরবাবু হন হন করে স্তব্ধতর পিছনে পিছনে অগ্রসর চাচ্ছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ বাধা দিয়ে বললে, “মাইভে:। আপনার আসামী চম্পট দিতে পারবে না। পাশের ঘরে ঐ একটিমাত্র দরজা, কাউকে বেরুতে হলে এই ঘরের ভিতর দিয়েই বাইরে যেতে হবে। আসুন স্বন্দরবাবু এইবার আমাদের কাজের কথা হোক।”

। সাত ।

স্বন্দরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, “কাজের কথা? কি কাজের কথা? বিরহী আর বিরহিনীর মিলন দরজার জন্মে আমরা এখানে আসিনি।”

মানিক বললে “হ্যাঁ, স্বন্দরবাবু। অয়নও সেকথা জানে বলেই আপনাকে পাশের ঘরে যেতে দিলে না।”

স্বন্দরবাবু কুণ্ডকণ্ঠে বললেন, “তুমি থামো মানিক, বাজে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করো না। অয়ন, আসামীকে আতাই আমি চালান দিতে চাই। তার আগে তোমার যদি কোন বক্তব্য থাকে তো বল।”

অয়ন বললে, “জগন্নাথবাবু, আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে, আপনার শোবার ঘরে দুটো দরজা—একটা ছাদের দিকে, আর একটা ভিতর বাড়ীর দালানের দিকে। চুরির পরদিন দেপা যায়, ছাদের দরজাটা খোলা রয়েছে, কিন্তু ভিতর দিকের দরজাটা তো তালাবদ্ধ ছিল?”

—“আজ্ঞে, হ্যাঁ।”

—“তালাবদ্ধ চাবি ছিল কোথায়?”

—“আমার পকেটে।”

—“উত্তম। এখন তুহন স্বন্দরবাবু। জগন্নাথবাবুর লোহার আলমারির আলস

আর নকল চাবি দুটো আমার টেবিলের উপরে পাশাপাশি রেখে দিন।”

কথামত কাজ করলেন স্তম্ভরবাবু।

জয়ন্ত শুধলে, “কি দেখছেন?”

স্তম্ভরবাবু নিরসকণ্ঠে বললেন, “দেখব আবার কি চাই? দুটো চাবি।”

—“চাবি দুটোর মাকজোক, গড়ন-পটন একরকম।”

—“হ্যাঁ, অবিকল।”

—“এটা কি সন্দেহজনক নয়?”

—“কেন, কেন?”

—“ধরুন আপনি এক-একদিনে এক-একজন কারিগর ডাকলেন। তাদের প্রত্যেককে দিয়ে একই কলের জন্ত দুটো চাবি গড়ালেন। সেই দুটো চাবি দিয়ে কল খোলা যাবে বটে, কিন্তু তাদের গড়ন-পটন কিছুতেই একরকম হবে না আর আকারেও কোনটা হবে কিছু ছোট, কোনটা হবে কিছু বড়।”

—“হ্যাঁ, এ কথা ঠিক।”

—“কিন্তু এই দুটো চাবি দেখলেই বোঝা যায়, একই মাপজোকের সঙ্গে মিলিয়ে একই কারিগরের হাতে দুটো চাবিই গড়া হয়েছে।”

—“হুম্।”

—“আর একটা জিনিস লক্ষ্য করুন। আপনারা যেটাকে আসল চাবি বলছেন, তার বয়স নাকি দশ বছর। চাবিটা যে পুরানো, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তবে নিয়মিত ব্যৱহারের দরুণ তার উপরে একটা পালিশ পড়েছে বটে। আর যেটাকে নকল চাবি বলা হচ্ছে, সেটাও দেখতে পুরানো হ’লেও তার উপরে কিন্তু পালিশ টালিশ কিছুই নেই, বয়স বহুদিন ব্যবহৃত হয়নি বলে তার উপরে মরচে ধরে গিয়েছে।”

স্তম্ভরবাবু সন্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, “তুমি কি বলতে চাও জয়ন্ত?”

—“আমি বলতে চাই যে, স্তম্ভরবাবু এ পাড়ার নতুন বাসিন্দা। তিনি যদি আলমারির কলের ছাঁচ হুলে দ্বিতীয় একটা গড়াতেন, তাহলে দেখলে তাকে মরচে-ধরা পুরানো বলে ভ্রম করার উদ্যোগ থাকত না, আর দেখতেও সেটা হ’ত না আকারে আর গড়ন পটনে অবিকল প্রথম চাবিটার মত।”

স্তম্ভরবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বইলেন, কোন প্রতিবাদ করতে পারলেন না।

জয়ন্ত গাজোখান করে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, “এখানে আহুন স্তম্ভরবাবু, এইবারে আর একটা বাণ্যার প্রতিপাদন করতে হবে।”

জয়ন্তের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন স্তম্ভরবাবু! দরজার পাশা দু’খানা ভেজিয়ে দিয়ে জয়ন্ত বললে, “দেখুন, স্তম্ভরবাবুর ছানের দরজার খিলটা আমি নতুন টেক্সট দিয়ে আমার দরজার লাগিয়ে দিয়েছি।”

স্তম্ভরবাবু বললেন, “হুম্, এ আবার কি বাবা?”

জয়ন্ত বললে, “মানিক, তুমি ঘরের বাইরে যাও। আচ্ছা, এইবারে আমি দরজাটা ভিতরে থেকে বন্ধ করে নতুন খিলটা লাগিয়ে দিলুম। মানিক তুমি বাইরে থেকে জোবে ধাক্কা মেখে দরজাটা খুলে কেলবার চেষ্টা কর।”

মানিক সজোবে বাব চারেক ধাক্কা মারার পরেই সশব্দে খিলটা ভেঙে দরজার পাঞ্জা ছুথানা খুলে গেল এবং খিলের একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল মাটির উপরে।

জয়ন্ত বললে, “বা ভেবেছি তাই। সাধারণতঃ বাঙালীদের বাড়ীর খিলগুলো হয় পল্কা অর্গল্কে দরজা জোর করে কেউ বাইরে থেকে খুলতে গেলে ধাক্কা মারে দরজার মাঝ-বরাবর আর খিলটাও ভেঙে যায়, মাঝখান থেকেই—এখানেও ঠিক তাই হয়েছে।”

জয়ন্তবাবু একেবারে শুরু।

খিলের ষা অংশ এখনও দরজার সঙ্গে সংলগ্ন ছিল সেটা দুই হাতে তুলে ধরে জয়ন্ত বললে, “কিন্তু কেউ ষা ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে খিলের মাঝখানে ধরে এমনি করে জোরে টান মারে তাহলে কি হয় দেখুন।”—তার একটানেই খিলের অপর অংশটা ইকুপের পাঁচ ছাড়িয়ে উপড়ে এল।

জয়ন্তবাবু মাথার টাক চুলকোতে চুলকোতে বললেন, “তবে তো দেখছি চোর হচ্ছে বাড়ীর লোক।”

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললো, “হ্যাঁ, আর সেই লোক হচ্ছেন জগন্নাথবাবু নিজেই। জগন্নাথ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুগ্ধ খিঁচিয়ে বললেন, “বুদ্ধির গলায় দড়ি! নিজের টাকা আঁন চুরি করব নিজেই।”

জয়ন্ত বললে, “এ আপনার নিজের টাকা নয় জগন্নাথবাবু, এ হচ্ছে আপনার পিতৃ-মাতৃহীন নাবালক ভ্রাতৃপুত্রের টাকা। স্বতন্ত্রবাবুর দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে সেটাকা আপনি আত্মসাৎ করতে চেষ্টাছিলেন। আলমারি কেনবার সময়েই আপনি পেয়েছিলেন একরকম দেখতে দুটো চাবি—একটা ছিল তোলা, আর একটা নিজে ব্যবহার করতেন। সেট তোলা চাবিটাই আপনি পাঁচিল টপকে গিয়ে বেচায়া স্বতন্ত্রবাবুর ঘরের ভিতর নিক্ষেপ করেছিলেন। আরো শুধুন। আজ সারাদিন ঘুরে ঘুরে আপনার সম্বন্ধে আমি আরো কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। আপনার চিনির কারবার প্রায় অচল হয়ে পড়েছে, শুনে আপনার মাথা বিকিয়ে যাবার মত হয়েছে। লয়েডস্ ব্যাঙ্ক আপনার নামে জমা আছে মাত্র একশো টাকা। গেল ডেইশ তারিখে বাঁমা কোম্পানীর কাছ থেকে আপনি পেয়েছিলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা। পরদিন সকালেই আপনি লণ্ডনবাসে মনসাপুরে যাত্রা করেন বটে, কিন্তু লন্ডনের ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হননি, আগে সেনট্রাল ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক নিজের ও শ্রীমতী সরলাবালা দেবীর নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিয়ে ষ্টেশনে যান। তারপর...”

জয়ন্তর কথা কুরোবার আগেই জগন্নাথ দরজার দিকে অগ্রসর হতে হতে কড়কড়ে

বললে, “আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর পাগলের প্রলাপ শুনতে রাজী নই।”

একলাকে তার সামনে গিয়ে পড়ে স্তম্ভরবাবু বললেন, “হুম্ মাইরি নাকি—বাবে কোথায় চাঁদ ? তোমার চক্রান্তে তুলে স্বত্বতকে আদালতে নিয়ে গিয়ে আসামী ব’লে খাড়া করলে শেখটা হয়তো আমাকে গর্ভভ নাম কিনতে হত, আর কি তোমাকে ছেড়ে দি ?”

আচম্বিতে পাশের ঘর থেকে দুই মূর্তি বেরিয়ে জয়ন্তের পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, স্বত্বত এবং রাধারাণী। তার দুই পা ভিজে গেল তাদের আনন্দের অশ্রুজলে।

তাদের হাত ধরে তুলে জয়ন্ত অভিভূত কণ্ঠে বললে, “আপনাদের ঐ অশ্রুজলই আমার শ্রেষ্ঠ পুস্কার।”

*

*

*

হেমেন্দ্রকুমার রায় : ১৮৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্রের পরিপূর্ণ আলোয় বখন বাংলা সাহিত্য উদ্ভাসিত তখন অপরাপর কয়েকজন লেখকও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জল ছিলেন, হেমেন্দ্রকুমার তাদের অন্যতম। মূলতঃ রোমাঞ্চকর বিষয় বস্তুর প্রতিই তাঁর আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। ত্যাগী ভ্রমণ কাহিনী, অলৌকিক রচনা কিশোরদের উপযোগী অল্পস্ব কাহিনীর জগতই তিনি বাংলা সাহিত্যে অবদান রেখে থাকেন। লেখকের ‘চাঁবি ও ঝিল’ গল্পটি বাংলা ‘গৌরেন্দ্র’ গল্পে এক বিশিষ্ট সংযোজন। আজকের প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকদের অনেকেই তাঁর রচনা পড়ে কৈশোরের স্মৃতিকে খুঁজে পাবেন সন্দেহ নেই। হেমেন্দ্রকুমারের রচনার বৈশিষ্ট্য তাঁর গল্পের সাবলীলতা এবং পরিবেশ বর্ণনার নিখুঁত পারিপাট্য। অত্যন্ত ঘরোয়া ভঙ্গিতে তিনি গল্পকে উপস্থাপিত করেন এবং তা সহজেই পাঠকের চিত্তে দোলা দিয়ে যায়। তিনি একজন আশ্চর্য জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

*

*

*



চোরা বালি

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

কুমার ত্রিদিবের বারংবার সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ আর উপেক্ষা করিতে না পারিয়া একদিন পৌষের শীতে—স্বতীক্ষ প্রভাতে বোমকেশ ও আমি তাঁহার জমিদারীতে গিয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল দিন সাত আট সেখানে নির্ঝাঁপাটে কাটাইয়া ফাঁকা জায়গার বিস্তৃত হাওয়ায় শরীর চাঙ্গা করিয়া লইয়া আবার কলিকাতায় ফিরিব।

আদর যত্নের অবধি ছিল না। প্রথম দিনটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় অপব্যাপ্ত আহার করিয়া ও কুমার ত্রিদিবের সঙ্গে পল্ল করিয়াই কাটিয়া গেল। গল্পের মধ্যে অবশ্য খুড়া মহাশয় স্ত্রীর মিগিস্তাই বেশী স্থান জুড়িয়া বহিলেন।

রাত্রে আহাৰাদির পর শয়নঘরের দরজা পর্যন্ত আমাদের পৌছাইয়া দিয়া কুমার ত্রিদিব বলিলেন, ‘কাল ভোরেই শিকারে বেরুনো যাবে। সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি।’

বোমকেশ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল, ‘এদিকে শিকার পাওয়া যায় নাকি?’ ত্রিদিব বলিলেন, ‘যায়। তবে বাঘ-টাঘ নয়। আমার জমিদারীর সীমানায় একটা বড় জঙ্গল আছে, তাতে হরিণ, শুয়োর, খরগোশ পাওয়া যায়; ময়ূর, বনমূবগীও আছে। জঙ্গলটা চোরাবালির জমিদার হিমাংশু রায়ের সম্পত্তি। হিমাংশু আমার বন্ধু; তাই সকালে আমি চিঠি লিখে শিকার করবার অনুমতি আনিয়া নিয়েছি। কোন আপত্তি নেই তো?’

আমরা দু’জনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, ‘আপত্তি?’

বোমকেশ ঘোণ দিয়া বলিল, ‘তবে বাঘ যে নেই এই যা ছাংখের কথা।’

ত্রিদিব বলিলেন, ‘একেবারে যে নেই তা বলতে পারব না ; প্রতি বছরই এই সময় দু’একটা বাঘ ছুটকে এসে পড়ে—তবে বাঘের ভয়সা করবেন না। আর বাঘ এলেও হিমাংশু আমাদের মারতে দেবে না, নিজেই ব্যাগ করবে।’ কুমার হাসিতে লাগিলেন—‘অমিদারী দেখবার সুবসন্ত পায় না। তার এমনি শিকারের নেশা। দিন রাত হয় বন্ধুকের ঘরে, নয়তো জঙ্গলে। যাকে বলে শিকার-পাগল। টিপও অসাধারণ—মাটিতে কাড়িয়ে বাঘ মাঝে। বোমকেশ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘কি নাম বললেন, অমিদারীর চোরাবালি? অজুত নাম তো।’

‘হ্যাঁ, শুনেছি ওখানে নাকি কোথায় খানিকটা চোরাবালি আছে, কিন্তু কোথায় আছে, কেউ জানে না। সেই থেকে চোরাবালি নামের উৎপত্তি।’ হাতের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ‘আর দেয়ী নয়, শুয়ে পড়ুন। নইলে সকালে উঠতে কষ্ট হবে।’ বলিয়া একটা হাই তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

একই ঘরে পাশাপাশি খাটে আমাদের শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল, শব্দার বেশ একটি আরামদায়ক ক্লাস্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল ; সানন্দে বিছানায় লেপের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ঘুমাইয়া পড়িতেও বেশা দেয়ী হইল না। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম—চোরাবালিতে ডুবিয়া বাইতেছি ; বোমকেশ দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। ক্রমে ক্রমে গলা পর্যন্ত ডুবিয়া গেল ; যতই বাহির হইবার জন্ত হাঁকপাক করিতেছি ততই নিম্নাভিমুখে নামিয়া বাইতেছি। শেষে নাক পর্যন্ত বালিতে তলাইয়া গেল। নিমেষের জন্ত ভয়াবহ যুড়া যন্ত্রণার স্বাদ পাইলাম। তারপর ঘুম ভাঙিয়া গেল।

দেখিলাম, লেপটা কখন অসাবধানে নাকের উপর পড়িয়াছে ; অনেকক্ষণ ঘর্ষাক্ত কলেবরে বিছানায় বসিয়া রহিলাম, তারপর ঠাণ্ডা হইয়া আবার শয়ন করিলাম। চিন্তার সংসর্গ ঘুমের মধ্যেও কিরূপ বিচित्रভাবে সঞ্চারিত হয় তাহা দেখিয়া হাসি পাইল।

ভোর হইতে না হইতে শিকারে বাহির হইবার ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। কোনমতে হাক-প্যাণ্ট ও গরম হোস্ চড়াইয়া লইয়া, কেক সহযোগে ফুটন্ত চা গলাধঃকরণ করিয়া মোটরে চড়িলাম। মোটরে তিনটা শর্ট-গান, অস্ত্র কাভুজ ও এক বেতের বাক্স-ভরা আহাৰ্য্য ত্রা আগের হইতেই বাগা হইয়াছিল। কুমার ত্রিদিব ও আমরা দুইজন শিকারের সিতে ঠাণ্ডাঠাণ্ডি হইয়া বসিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল। কুয়াশায় ঢাকা অস্পষ্ট শীতল উষালোকের ভিতর দিয়া হু-হু করিয়া ছুটিয়া চলিলাম।

কুমার ও তারকোটের কলারের ভিতর হইতে অশ্রুপূর্ণের বলিলেন, ‘সুখোদয়ের আগে না পৌঁছলে ময়ূর বনযোষণ পাওয়া শক্ত হবে। এইসময় তারা গাছেব ডগায় বসে থাকে—চমৎকার টার্গেট।’

ক্রমে দিনের আলো ফুটিয়া উঠিতে লাগিল পথের দু’ধারে সমতল ধানের ক্ষেত ;

কোথাও পাকা ধান শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও লোনালী মাথা ভুলিয়া ঝাঁড়াইয়া আছে। দূরে আকাশের পটভূমিতে পুরু কালির দাগের মত বনানী দেখা গেল, আমাদের রাস্তা তাহার একটা কোণ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কুমার অজুলী নির্দেশ করিয়া বলিলেন যে ঐ বনেই শিকার করিতে চলিয়াছি।

মিনিট দুড়ি পরে আমাদের মোটর জঙ্গলের কিনারায় আশিয়া থামিল। আমরা পকেটে কাঁচুঁজ ভরিয়া লইয়া বন্ধুত্ব ঘাড়ে মহা উৎসাহে বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। কুমার ত্রিদিব একদিকে গেলেন। আমি আর বোমকেশ একসঙ্গে আর একদিকে চলিলাম। বন্ধুত্ব চালনায় আমার এই প্রথম হাতে শড়ি, তাই একলা বাইতে সাহস হইল না। ছাড়াচাড়ি হইবার পূর্বে স্থির হইল যে বেলা নটার সময় বনের পূর্ব দীঘান্তে কাঁকা অগ্নিগায় তিনজনে আবার পুনর্মিলিত হইব। সেখানেই প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা থাকিবে।

প্রকাণ্ড বনের মধ্যে বড় গাছ—শাল, মহুয়া, সেগুন, শিমুল, দেওদার—মাথার উপর ঘন চাঁদোয়া টানিয়া দিয়াছে; তাহার মধ্যে অজস্র শিকার। নিচে হরিণ, খরগোশ—উপরে হাবয়াল, বনমৌরগ, ময়ূর। প্রথম বন্ধুত্ব হইবার উত্তেজনাপূর্ণ আনন্দ—আওয়াজ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গচূড়া চাইতে মৃত পার্থীর পতন-শব্দ, ছব্বাঃ আঘাতে উড়িয়ামান কুক্কুটের আকাশে ডগ্‌বাঁজী পাইয়া পড়ায় প্রাপ্তি—একটা এপিক শিখিয়া চলিতে ইচ্ছা করিতেছে। কালিদাস মহাশয় লিখিয়াছেন, বিধান্তি লক্ষ্যে চলে—ক্ষণমান লক্ষ্যকে বন্ধ করা—একপ, বিনোদ আর কোথায়? কিন্তু ঘাট—পার্থী শিকারের বহল বর্ণনা করিয়া প্রধান বাঘ শিকারীদের কাছে আর হাস্যস্পন্দ হইব না।

আমাদের খলি ক্রমে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বেলাও অস্বস্তিতে বাড়িয়া চলিয়াছিল। আমি একবার এক কাঁচুঁজে—দশ নম্বর—সাতটা হাবয়াল মারিয়া আত্মপ্রাণের সপ্তম স্বর্গে চড়িয়া গিয়াছিলাম—দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল আমার মত অবার্থ সন্ধান সেকালে অজ্ঞানেরও ছিল না। বোমকেশ ছইবার মাত্র বন্ধুত্ব চালাইয়া—একবার একটা খরগোশ ও দ্বিতীয়বার একটা ময়ূর মারিয়াই থামিয়া গিয়াছিল। তাহার চক্ষু বহুবর্ণ শিকারের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। বনে হরিণ আছে; তা ছাড়া, বাঘ না হোক, ভাল্লকের আশা সম্পূর্ণ তাগ করিতে পারে নাই। তাই যদিও মহুয়া গাছে তখনও ফল পাকে নাই তবু তাহার ভাষ্যক-লুক মন সেইদিকেই সতর্ক হইয়াছিল।

কিন্তু বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, জঙ্গলের বাতাসের গুণে পেটের মধ্যে অগ্নিদেব ততই প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা তখন জঙ্গলের পূর্বদীঘান্তে লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কুমার ত্রিদিবের বন্ধুত্বের আওয়াজ দূর হইতে বায়বাহী শব্দে পাইতেছিলাম, এখন দেখিলাম তিনিও পূর্বদিকে মোড় লইয়াছেন।

বনভূমির ঘন সন্নিবিষ্ট গাছ ক্রমে পাতলা হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে

আমরা রৌদ্রজ্বল খোলা জায়গায় নীল আকাশের তলায় আসিলাম। দাঁড়াইলাম। লক্ষ্যেই বালুকার একটা বিস্তার বলয় প্রায় সিকি মাইল চওড়া, দৈর্ঘ্য কতখানি তাহা আন্দাজ করা গেল না—বনের কোল ঘেঁষিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে পাড়িয়া আছে। বালুর উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া চক্চক্ করিতেছে; শীতের প্রভাতে দেখিতে খুব চমৎকার লাগিল।

এই বালু-বলয় জঙ্গলকে পূর্বদিকে আর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। কোনো হৃদয় অতীতে হয়তো ইহা একটি শ্রোতবিনী ছিল। তাহার পর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হয়তো ভূমিকম্পে ঘাট উঁচু হইয়া জল শুকাইয়া গিয়া শুক বালু প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। আমরা বালুর কিনারায় বসিয়া সিগারেট ধরাইলাম।

অল্পকাল পরেই কুমার ত্রিদিব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, ‘দিবিয়া কিদে পেয়েছে—না? ঐ যে দুধোধন পৌছে গেছে চলুন।’

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কুমার ত্রিদিবের উড়িয়া বাবুটি মোটর হইতে বাস্কেট নামাইয়া ইতিমধ্যে হাজির হইয়াছিল। অনতিদূরে একটা গাছের তলায় ঘাসের উপর লাদা তোয়ালে বিছাইয়া খাণ্ডজ্বা সাজাইয়া রাখিতে ছিল। তাহাকে দেখিয়া কুমার প্রত্যাশী সঙ্কার পাখীর মত আমরা সেই দিকে ধাবিত হইলাম।

আহার করিতে করিতে, কে কি পাইয়াছে তাহার হিসাব হইল। দেখা গেল, আমরা এই কাতর্জ্জ সাতটি হরিয়াস সন্দেশ, কুমার বাহাদুরই জিতিয়া আছেন।

আকর্ষ আহার ও অল্পশান হিসাবে খার্যোদ্ধাস হইতে গরম চা নিঃশেষ করিয়া আবার সিগারেট ধরানো গেল। কুমার ত্রিদিব গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে বসিলেন, সিগারেটে সুদীর্ঘ টান দিয়া অধনিমীলিত চক্কে কহিলেন, ‘এই যে বালুবন্ধ দেখছেন এ থেকেই জমিদারী নাম হয়েছে চোরাবালি। এদিকটা সব হিমাংস্তর! বলিয়া পূর্বদিক নির্দেশ করিয়া হাত নাড়িলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, ‘আমিও আন্দাজ করেছিলুম। এই বালির ফালিটা লম্বায় কতখানি? সমস্ত বনটাকেই ঘিরে আছে নাকি?’

কুমার বলিলেন, ‘না। মাইল তিনেক লম্বা হবে তারপরে আমার মাঠ আরম্ভ হয়েছে। এরই মধ্যে কোথায় এক জায়গায় খানিকটা চোরাবালি আছে—ঠিক কোনখানটার আছে কেউ জানে না; এমন কি গরু বাছুর শেয়াল কুকুর পর্যন্ত একে এড়িয়ে চলে।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, ‘বালিতে কোথাও জল নেই বোধহয়?’ কুমার অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িলেন, ‘বালিতে পানি না। শুনেছি ঐদিকে খানিকটা জায়গায় জল আছে, তাও সব সময় পাওয়া যায় না।’ বলিয়া দক্ষিণদিকে যেখানে বালুর রেখা বাকিয়া বনের আড়ালে অদৃশ্য হইয়াছে সেই দিকে আঙুল দেখাইলেন।

এই সময় হঠাৎ অতি নিকটে বনের মধ্যে বন্ধুকের আগওয়াজ শুনিয়া আমরা

চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমরা তিনজনেই এখানে বহিয়াছি, তবে কে আওয়াজ করিল বিস্মিতভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া এই কথা ভাবিতেছি এমন সময় একজন বন্ধুধারী লোক একটা মৃত খগোশ কান ধরিয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে জ্বল হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরিধানে ঘোষণুরী ড্রাচেন, মাথায় বয়স্কাউটের মত পাক্টি টুপি, চামড়ার কোমরবন্ধে সারি সারি কাতুঁজ আঁটা বহিয়াছে।

কুমার ত্রিাংগ উচ্চশাস্ত্র করিয়া বলিলেন, ‘আরে হিমাংগ, এস এস।’

খগোশ মাটিতে ফেলিয়া হিমাংগ াবু আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন; বলিলেন ‘অভ্যর্থনা আমাদেরই করা উচিত এবং করছিও। বিশেষতঃ এঁদের।’ কুমার আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন, তারপর হাসিয়া হিমাংগবাবুকে বলিলেন ‘তুমি বুকি আর লোভ সামলাতে পারলে না? কিছা ভয় হ’ল, পাছে তোমার সব বাঘ আমরা বাগ করে ফেলি?’

হিমাংগ বলিলেন, ‘আরে বল কেন? মহা ফান্সাদে পড়া গেছে। আজই আমার ত্রিপুরায় যাবার কথা ছিল, সেপান থেকে শিকারের নেমস্তর পেয়েছি। কিন্তু যাওয়া হল না, দেওয়ানজী আঁকে দিলেন। বাবার আমলের লোক, একটু ছুতো পেলেই জুলুম অবরোধ করেন কিছু বলতেও পারি না। তাই বাগ করে আজ সকালবেলা বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ছুতোর! কিছু না হোক ছুতো বন্দোবস্ত হওয়াও তো মারা যাবে।’

কুমার বলিলেন, ‘দায় হায়—কোথায় বাঘ ভালুক আর কোথায় বনশায়রা। দুঃখ হবার কথা বটে, কিন্তু যাওয়া হল না কেন?’

হিমাংগবাবু ইতিমধ্যে শাবার বাস্তুটা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া তাহার ভিতর অশ্রুসন্ধান করিতে ছিলেন, প্রদুর্লম্বে কয়েকটা ডিম সিদ্ধ ও কাটলেট বাহির করিয়া দেখিয়া লইলাম। বয়স আমাদেরই সমান হইবে; বেশ মজবুত ও পেশীপুষ্ট দেহ। মুখে একছোড উগ্র জার্মান গাঁফ মুখখানাকে অনাবশ্যক বকম হিংস্র করিয়া তুলিয়াছে। চোখের দৃষ্টিতে পুরাতন বাবাশকারার নিষ্ঠুর সতর্কতা সর্বদাই উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে।

এক নজর দাঁখলে মনে হয় লোকটা ভাষণ দুর্বাস্ত। কিন্তু তবু বর্তমানে তাঁহাকে পরম পারিতোষের সহিত অধম প্রত্নেত্র কাটলেট চিবাইতে দেখিয়া আমার মনে হইল, চেহারাটাই তাঁহার সত্যকার পরিচয় নহে; বস্তুতঃ লোকটি অত্যন্ত সাদাসিধা অনাড়ম্বর মনের মতো কান খাড়াপাচ নাট। সাংসারিক বিষয়ে হয়তো একটু অল্পমনস্ক; নিতাই আগরণে নিরস্তুর বাঘ ভালুকের কথা চিন্তা করিয়া বোধ করি বুঁদটাও সাংসারিক ব্যাপারের অশ্রুযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

কাটলেট ও ডিম সমাপনান্তে চায়ের ফ্রাকে চুমুক দিয়া হিমাংগবাবুকে বলিলেন; ‘কি বললে? যাওয়া হল না কেন? নেহাত বাজে কারণ; কিন্তু দেওয়ানজী ভয়ানক ভাবিত হয়ে পড়েছেন, পুলিশকেও খবর দেওয়া হয়েছে। কাজেই অনির্দিষ্ট কালের গোয়েন্দা—প্রথম(৬)।’

জন্ত আমাকে এখানে ঘাঁটি আগলে বসে থাকতে হবে।' তাঁহার কঠিনবে বয়স্কি ও অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হওয়া উঠিল।

‘হয়েছো কী?’

‘হয়েছে আমার মাথা।’ জান ভো, বাবা মাঝে বাবার পর থেকে গত পাঁচ বছর ধরে প্রজাদের সঙ্গে অনবরত মামলা মোকদ্দমা চলছে। আদায় তামলও ভাল হচ্ছে না। এই নিয়ে এষ্টগ্রহর শাস্তি লেগে আছে; উকল মোক্তার পরামর্শ, সে সব তো তুমি জানোই। যা হোক আমমোক্তারনামা দিয়ে এক বকম নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়েছিল, এমন সময় বাবার এক নতুন ফাচাং—। মাস কয়েক আগে বাবির জন্তে একটা মাস্টার বেখেছিলুম, সে হঠাৎ পরশুদিন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে; বাবার সময় পানকয়েক পুরনো হসেবের খাতা নিয়ে গেছে। তাই নিয়ে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড। খানা পুলিশ হৈ হৈ রৈ রৈ বেধে গেছে। দেওয়া-জার দিখান, এটা আমার মামলাবার প্রজাদের একটা মারাম্মক পাঁচ।’

বোমকেশ সিজ্জামা করিল, ‘লোকটা এখনো ধরা পড়েনি?’ বিসর্জভাবে ঘাড় নাড়িয়া হিমাংশুবাবু বলিলেন, ‘না। এবং যতদিন না ধরা পড়তে—’ হঠাৎ ধামুয়া গিয়া কিছুক্ষণ বিক্ষাভিত হইল বোমকেশের দিকে চাঁচী থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘আরে। এটা তুফান আমার মাথাতেই ঢোকেন। আপনি তে একজন বখাও ডিটেক্টিভ, চার ডাকাতের শাফাৎ ধম। (বোমকেশ মুহূর্তে বলিল সহ্যাবেধা। তাহলে মশায়, দয়া করে যাদু ছ’ এক দিনের মনো লোকটাকে খুঁজে বার করে দিতে পারেন— তাহলে আমার তপুয়ার শিকারটা কস্কাই না। কাল-পরশুর মনো গিয়ে পড়তে পারলে—’

আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। কুমার ত্রিদিব বলিলেন, ‘চোরের মন খুঁই আনাড়ি। তুমি বুঝি কেবল শিকারের কথাই ভাবছ?’

বোমকেশ বলিল, ‘আমাকে কিছু করতে হবে না, পুলিশই খুঁজে বার করবে তখন। এসব জায়গা থেকে একেবারে লোপাট হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; কলকাতা হলেও বা কথা ছিল।’

হিমাংশুবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ‘পুলিশের কস্ম নয়। এই তিন দিনে সমস্ত দেশটা তারা তোলপাড় করে ফেলেছে, কাছাকাছি যত রেলওয়ে ষ্টেশন আছে সব জায়গায় পাহারা বন্দিয়েছে। কিন্তু এখনো তো কিছু করতে পারলে না! দোহাই বোমকেশবাবু, আপনি কেনটা হাতে নিন; সামান্য ব্যাপার, আপনার ছ’ঘণ্টাও সময় লাগবে না।’

বোমকেশ তাঁহার আগ্রহের আভিষা দেখিয়া মুহূর্তে বলিল, ‘আচ্ছা ঘটনাটা আগাগোড়া বলুন তো শুন।’

হিমাংশুবাবু সাক্ষাতে হাত উটাইয়া বলিলেন, ‘আমি কি সব জানি ছাই। তার

সঙ্গে বোধহয় সাতুলো পাঁচ দিনও দেখা হয় নি। যা হোক, বতটুকু জানি বলছি শুধু। কিছুদিন আগে বোধহয় মাস দুই হবে—একদিন সকালবেলা একজন জালা খাপা গোছেয় ছোকরা আমার কাছে এসে হাজির হ'ল। তাকে আগে কখনো দেখিনি, এ অঞ্চলের লোক বলে বোধ হ'ল না। তার গায়ে একটা ছেড়া কমিজ, পায়ে ছেড়া চটিজুতা—যোয়া বেঁটে হুড়িফ পীড়িত চেহারা; কিন্তু কথাবার্তা শুনে মনে হয় শিক্ষিত। বললে চাকরার অভাবে খেতে পাচ্ছে না, যা হোক একটা চাকুরী নিতে হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি কাজ করতে পার? পকেট থেকে বিনামূলীর ডিগ্রি বার করে দেখিয়ে বললে, যে কাজ দেবেন তাই করব। ছোকরার অবস্থা দেখে আমার এমুট দয়া হ'ল, কিন্তু কি কাজ দাও? নেবেস্তার তো একটা জায়গাও খালি নেই। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, আমার মেয়ে বেবির কাছে একজন মাস্টার রাখার কথা। গল্প কয়েকদিন আগে বলো গেলেন। বেবির এই সান্তে বাজেছে, স্ততরাং তার পদাশ্রয়ের সঙ্গে একটা বেশেপাণে দৃষ্টি দেওয়া বরদার।

হাসি মাস্টার না করলুম, তার অবস্থা যাট হোক, ছোকরার শাক : ভয় মনে। ছোকরার পদাশ্রয়ের সঙ্গে তার থাকার ব্যবস্থা করে নেব। ছোকরার কৃতজ্ঞতায় প্রসারিত হৈলে কলমে তখন এক ভবে চল যেন—কোন? নাম? নাম? নাম? মনে পড়ছে, বোনাপ চাঁদুরা—করুণ।

যা হোক, সে বাউন্সেট হইল। কিন্তু আমার সঙ্গে বসে একটা দেখা সাক্ষাৎ হ'ল না। বাউন্সেট কলমে পড়াচ্ছে, এই পদবী জানি হুঁ। তবে সেটা শুনলুম, ছোকরা কাটকেন বলে কয়েকটা উবাচ ভয়েছে। দশম হয়েছে আরও কোন যোগ্য ছিল না, কিন্তু মাস্টার। থেকে কয়েকজনে গাজে পুরানো কলমের পাশা নিয়ে নিয়েই আমার সন্ধান করে গেল। এটা থেকে খুঁজে বার না করা পদবী আমার নিতাই নেই।

হিম্মন্তু বাবু বললেন, 'আমার বাড়িতেও যেন আমার যত্ন ক্রটি হ'ল না, বেবির মাস্টার গলে গরি তাকে নিয়ে—

এই সময় পছন্দে একটা গাছের মাথায় কট কট শব্দ শুনিয়া আমরা মাঝা তুলিয়া দেখিলাম, একটা প্রহরীও বন নোংরা নানা বর্ণের পুচ্ছ এলাইয়া এক গাছ হইতে অন্য গাছে ডাঁড়িয়া যাইতেছে। গাছ হুটার নবো বাবধান ত্রিশ হাতের বেশী হইবে না। কিন্তু নিমেষের নবো বন্ধুকের ব্রাচ, খুলিয়া টোটা ভরিয়া হিম্মন্তু বাবু কায়াব করিলেন। পাখীটা অল্প গাছ পদবী পৌঁছতে পারেন না, মধ্য পথেই ধপ করিয়া মাটিতে পড়িল।

আমি সবসময়ে বলিয়া উঠিলাম 'কি শুভ্র টিপ,

ব্যোমকেশ সপ্তর্ষস নেহে চাখিয়া বলিল, 'সত্যই অসাধারণ।'

কুমার জিদিব বলিলেন, 'ও আর কি দেখলেন? ওর চেয়েও ঢের বেশী আশ্চর্য বিচ্ছে ওর পেটে আছে!—হিম্মন্তু, তোমার সেই শব্দভেদা পাঁচটা একবার দেখাও না।'

‘আরে না না, এখন ওসব থাক। চল—আর একবার জললে ঢোকা থাক...’

‘লে হচ্ছে না—ওটা দেখাতেই হবে। নাও—চোখে কমাল বাধো।’

হিমাংশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, ‘কি ছেলেমানুষী দেখুন দেখি। ও একটা বাজে টিক্, আপনারা কতবার দেখেছেন...’

আমরাও কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলাম, বলিলাম, ‘তা হোক, আপনাকে দেখাতে হবে।’

তখন হিমাংশুবাবু বলিলেন, ‘আচ্ছা—দেখাচ্ছি। কিছুই নয়, চোখ বেঁধে কেবল শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ করা।’ বন্দুক একটা বুলেট ভরিয়া বলিলেন, ‘বোমকেশবাবু, আপনিই কমাল নিয়ে চোখ বেঁধে দিন—কিছু দেখবেন কান দুটো ঘেন খোলা থাকে।’

বোমকেশ কমাল দিয়া বেশ শক্ত করিয়া তাহার চোখ বাঁধিয়া দিল। তখন কুমার ত্রিদিব একটা চাব্বের পেয়ালা লইয়া তাহার হাতলে খানিকটা সূতা বাঁধিলেন। তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া—বাহাতে হিমাংশুবাবু বৃষ্টিতে না পাবেন তিনি কোনদিকে গিয়েছেন—প্রায় পঁচিশ হাত দূরে একটা গাছের ডালে পেয়ালাটা ঝুলাইয়া দিলেন।

বোমকেশ বলিল, ‘হিমাংশুবাবু এবার শুনুন।’

কুমার ত্রিদিব চামচ দিয়া পেয়ালাটার আঘাত করিলেন, ঠুং করিয়া শব্দ হইল। হিমাংশুবাবু বন্দুক কোলে লইয়া বেদিক হইতে শব্দ আসিল সেই দিকে ঘুরিয়া বলিলেন। বন্দুকটা তুলিলেন, তারপর বলিলেন, আর ‘কবার বাজাও।’

কুমার ত্রিদিব আর একবার শব্দ করিয়া ক্ষিপণে সরিয়া আসিলেন। শব্দের বেশ সম্পূর্ণ মিলাইয়া বাইবার পূর্বেই বন্দুকের আওয়াজ হইল; দেখিলাম পেয়ালাটা চূর্ণ হইয়া উড়িয়া গিয়াছে, কেবল তাহার ডাটিটা ডাল হইতে ঝুলিতেছে।

মুগ্ধ হইয়া গেলাম। পেশাদার বাজীকরের শাজানো নাটা মকে এককম খেলা দেখা যায় বটে কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক বকম জুয়াচুরি আছে। এ একেবারে নিজলা খাটি জিনিস।

হিমাংশুবাবু চোখের কমাল খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ‘হ’য়ছে।’

আমাদের মুক্ত কণ্ঠ প্রশংসা শুনিয়া তিনি একটু সজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন ‘ও কথা থাক; আপনারা দুখ্যাতি আর বেশিক্ষণ শুনে আমার গণ্ডেশ ক্রমে বিলিতি বেগুনের মত লাল হয়ে উঠবে। এখন উঠুন। চলুন, ইতর প্রাণীদের বিরুদ্ধে আর একবার অভিযানে বেরুনো থাক্।’

বেলা দেড়টার সময় শিকার-প্রাপ্ত চারিজন মোটরের কাছে ফিরিয়া আসিলাম। হরিনাম মাস্টারের খাতা চুরির কাহিনী চাণা পড়িয়া গিয়াছিল। হিমাংশুবাবুও কি জানি কেন, বোমকেশের সাহায্য লইবার আর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। বোধহয় এক্ষণ তুচ্ছ ব্যাপারে সন্ত পরিচিত একজন লোককে পাটাইয়া লইতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেছিলেন, হয়তো তিনি ভাবিতেছিলেন যে পুলিশই শীঘ্র এই ব্যাপারের একটা

সমাধান করিয়া ফেলিবে। সে বাহাই হোক, বোমকেশই প্রসঙ্গটার পুনরুত্থান করিল, বলিল, ‘আপনার হরিনাথ মাস্টারের গল্পটা ভাল করে শোনা হ’ল না।’

হিমাংশুবাবু মাটির ফর্টবোর্ডে পা তুলিয়া দিয়া বলিলেন, ‘আমি য’ জানি সবই প্রায় বলিছি, আর বিশেষ কিছু আনারাব আছে বলে মনে হয় না।’

বোমকেশ আর কিছু বলিল না। কুমার জিদিব বলিলেন, ‘চল হিমাংশু, তোমাকে মোটরে বাড়ি পৌছে দিয়ে যাট।’ তুমি বোধহয় হেঁটেই এসেছ।’

হিমাংশুবাবু বলিলেন, ‘হ্যাঁ। তবে রাস্তা দিয়ে দূর পড়ে গেল শুদিক দি’র মাঠে মাঠে এমেছি। শুদিক দি’য়ে মাইলখানেক পড়ে।’ ‘বলিয়া দক্ষিণ দিকে আজুলি নির্দেশ করিলেন।’

কুমার জিদিব বলিলেন, ‘রাস্তা দিয়ে অন্তত মাইল দুই। চল তোমাকে পৌছে দিই।’ তারপর হাসিয়া বলিলেন, ‘আর যদি নেমস্তন্ন কর তাহলে না হয় দুপুরের আনাহারটা তোমার বাড়িতেই লাগা যাবে। কি বলেন আপনারা?’

আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না, আমোদ করিতে আসিয়াছি, গৃহস্থানী যেখানে লইয়া যাবেন সেখানে খাইতেই রাজী ছিলাম। আমরা ষাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। হিমাংশুবাবু বলিয়া উঠিলেন ‘নিশ্চয় নিশ্চয়—সে আর বলতে। তোমরা তো আজ আমারই অতিথি—এতক্ষণ এ প্রস্তাব না করাই আমার অন্তর হয়েছে। যা হোক, উঠে পড়ুন গাড়িতে আর দেবী নয়; খাওয়া-লাওয়া করে তবু একটু বিশ্রাম করতে পারেন। আর একেবারে বৈকালিক চা সেরে বাড়ি ফিরলেই হবে।’

বোমকেশ বলিল ‘এবং পারি যদি ইতিমধ্যে আপনার পলাতক মাস্টারের একটা ঠিকানা করা যাবে।’

‘হ্যাঁ, সেও একটা কথা বটে। আমার দেওয়ান হয়তো তার সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলতে পারবেন।’ বলিয়া তিনি নিজে অগ্রবর্তী হইয়া গাড়িতে উঠিলেন।

হিমাংশুবাবু খুবট সমাধর হকারে আমাদের আহ্বান করিলেন বটে কিন্তু তবু আমার একটা ক্ষণ সন্দেহ আগিতে লাগিল যে তিনি মন খুলিয়া খুঁজি হইতে পারেন নাই।

দশ মিনিট পরে আমাদের গাড়ি তাঁহার প্রকাণ্ড উদ্যানের লোহার ফটক পার হইয়া প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ির শব্দে একটি প্রৌঢ় গোছের ব্যক্তি ভিতর হইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর হিমাংশুবাবুকে গাড়ি হইতে নামিতে দেখিয়া তিনি খড়ম পায়ে তড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বিচলিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, ‘বাবা হিমাংশু যা ভেবেছিলাম তাই। হরিনাথ মাস্টার শুধু খাতাই চুর করে নি, সঙ্গে সঙ্গে তহবিল থেকে ছ’হাজার টাকাও গেছে।’

বেশ তিনটা বাজিয়া গিয়াছিল। শীতের অপরাহ্ন ইহারই মধ্যে দিবালোকের উজ্জলতা ম্লান করিয়া আনিয়াছিল।

‘এবার ভট্টাচার্যি মশায়ের মুখে বাপারটা শোনা বাক্, বলিয়া বোমকেশ মোটা তাকিয়ায় উপর কহুই ভর দিয়া বসিল। গুরু ভোজনের পর বৈঠকখানায় গদির উপর বিদ্যুত ফরাসের শয্যার এক একটি তাকিয়া আশ্রয় করিয়া আমরা চারিজনে গড়াইতে-ছিলাম। হিমালয়বাবুর কত্তা বেবি বোমকেশের কোলের কাছে বসিয়া নিবিষ্ট মনে একটি পুতুলকে কাপড় পরাইতেছিল; ওই দুই ঘণ্টায় তাহাদের মধ্যে ভীষণ বন্ধুত্ব জন্মিয়া গিয়াছিল। দেওয়ান কালীগতি ভট্টাচার্য মহাশয় একটু তকাত্তে ফরাসের উপর মেফদগু সিঁধা করিয়া পদ্মাসনে বসিয়াছিলেন—যেন একটু সুবিধা পাঠলেই ধ্যানস্থ হইয়া পড়িবেন। বস্তুতঃ তাহাকে দোখলে জপতপ ধ্যানধারণার কথাই বোঝা করিয়া মনে হয়। আমি তো প্রথম দর্শনে তাহাকে জমিদার বাড়ির পুরোহিত বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। শীর্ণ গোরবর্ণ দেহ, গলায় বড় বড় কুস্ত্রাকের মালা, কপালে আধুলির মত একটি সিঁদুরের টিকা। মুখে তপঃক্লেশ শাস্তির ভাব। বৈষয়িকতার কোনো চিহ্নই সেখানে বিদ্যমান নাই। অথচ এক শিকার পাগল—সংসারউদাসী—জমিদারের বৃহৎ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা যে এই লোকটির তৌক্ মতকর্তার উপর নির্ভর করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। নান্ন অতিথির সংবর্ধনা হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারীর সামান্য খুঁটিনাটি পর্যন্ত ইহার কটাক্ষ ইঙ্গিতঃ স্নিগ্ধস্বিত হইতেছে। বোমকেশের কথায় তিনি নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। ক্ষণকাল মুদ্রিত চক্ষে নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘হরিনাথ লোকটা আপাতদৃষ্টিতে এতই সাধারণ আর অকিঞ্চিৎকর যে তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনে হয় বলবার কিছুই নেই। ঝালা—ক্যাবলা গোছের একটা ছোঁড়া—অথচ তার পেটে যে এতখানি শরতানী লুপ্তানো ছিল তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। আমি মাছষ চিনতে ভুল কর না, এক মজর দেখেই কে কেমন লোক বুঝতে পারি। কিন্তু সে ছোঁড়া আমার চোপেতে ধলো দিয়েছে। একবারও সন্দেহ করিনি যে এটা তার ছদ্মবেশ, তার মনে কোনো কু-অভিপ্রায় আছে। প্রথম যেদিন এল সেদিন তার জামা কাপড়ের ছববন্ধা দেখে আমি ভাণ্ডার থেকে দু’জোড়া কাপড়, দুটো গেঞ্জি, দুটো জামা আর দু’পানা কব্বল বার করে দিলাম। একপানা ঘর হিমালয় বাবাজী তাকে আগেই দিয়েছিলেন—ঘরটাতে পুরনো খাতাপত্র থাকত, তা ছাড়া বিশেষ কোনো কাজে লাগত না; সেই ঘরে তরুপোষ চুকিয়ে তার শোবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হ’ল। ঠিক হল, বেবি দু’বেলা ঐ ঘরেই পড়বে। তার পাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আমি স্থির করেছিলাম, অন্যদি সবকায়ের কিছা কোনো আনবার বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসবে। আমলারা সবাই কাছে পিঠেই থাকে। কিন্তু আমাদের মা লক্ষ্মী সে প্রস্তাবে মত দিলেন না। তিনি অন্যর থেকে বলে পাঠালেন যে বেবির মাস্টার বাড়িতেই পাওয়া দাওয়া করবে। সেই ব্যবস্থাই ধার্য হ’ল। তারপর সে বেবিকে নিয়মিত পড়াতে লাগল। আমি দু’দিন তার পড়ানো লক্ষ্য করলাম—দেখলাম ভালই পড়াচ্ছে। তারপর আর তার দিকে মন দেবার সুযোগ

হয়নি। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসত—ধর্ম সম্বন্ধে ছুঁচুর কথা শুনতে চাইত। এমনভাবে ছুঁমাস কেটে গেল। গত শনিবার আমি সন্ধ্যার পরে বাড়ি চলে যাই। আমি যে বাড়িতে থাকি—দেখেছেন বোধহয় কটকে চুকতে ডান দিকে যে হলদে বাড়িখানা পড়ে সেইটে। কয়েকমাস হ'ল আমি আমার স্ত্রীকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি।—একনাই থাকি। স্বপাক খাই—আমার কোনো কষ্ট হয় না। শনিবার রাতে আমার পুণ্ড্রবর্ণ করণার কথা ছিল। তাই সকাল সকাল গিয়ে উদ্ভোগ আয়োজন করে পূজোয় বসলুম। উঠতে অনেক রাত হয়ে গেল। পরদিন সকালে এসে শুলুম মাস্টারকে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমে বেলা বাবোটা বেজে গেল এখনো মাস্টারের দেখা নাই। আমার সন্দেহ হ'ল, তার ঘরে গিয়ে দেখলুম রাতে সে বিড়ানায় শোয় নি। তখন যে আলমারিতে জমিদারীর পুরানো হিনেবের খাতা থাকে সেটা খুলে দেখলুম—গত চার বছরের হিসেবের খাতা নাই। গত চার বছর থেকে অনেক বড় বড় প্রজাদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা চলছে, সন্দেহ হল এ তাদেরই কারসাজি। জমিদারীর হিসেবের খাতা শত্রু-ক্ষের হাতে পড়লে তাদের অনেক স্তম্ভিত হয়; বুকলুম চরিত্রী তাহলেই গুপ্তচর, মাস্টার সেজে জমিদারীর ভরসী দলিল চুরি করণার জন্য এসে চুকেছিল। পুলিশ খবর পাঠালুম। কিন্তু তখনো জানি না যে হিন্দুক থেকে ছ'হাজার টাকাও লোশটি হয়েছে।' এট পঞ্চস্থ বলিয়া দেওয়ানজী খামিলেন, তারপর ইষৎ কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, 'নানা কারণে কিছুদিন থেকে তহবিলে টাকার কিছু টানাটানি পড়েছে। সম্প্রতি মোকদ্দমায় খরচ ইত্যাদি বাদে কিছু টাকার দরকার হয়েছে, তাই মহাজনের কাছ থেকে ছ'হাজার টাকা হাওলাত নিয়ে হিন্দুকে রাখা হয়েছিল টাকাতা পুঁটলি বাঁধা অবস্থায় হিন্দুকের এক কোণে রাখা ছিল। ইতিমধ্যে অনেকবার হিন্দুক খুলেছি কিন্তু পুঁটলি খুলে দেখবার কথা একবারও মনে হয় নি। আজ সন্ধ্যা থেকে উকিল টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। পুঁটলি খুলে টাকা বার করতে গেলুম; দেখি নোটের তোড়ার বদলে কংকণলো পুরনো খবরের কাগজ রয়েছে।' দেওয়ান নারব হইলেন। অন্তিতে অন্তিতে বোমকেশ আবার চিং হইয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল, ক'ড কাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, 'তাহলে হিন্দুকের তালি ঠিকই আছে? চাবি কার কাছে থাকে?' দেওয়ান বলিল, 'হিন্দুকের ছুঁটা চাবি; একটা আমার কাছে থাকে, আর একটা হিমাংশু বাবাজীর কাছে। আমার চাবি ঠিকই আছে, কিন্তু হিমাংশু বাবাজীর চাবিটা শুনি ক'দিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

হিমাংশু বাবু শুক মুখে বলিলেন, 'আমারই দোষ। চাবি আমার কোনো কালে ঠিক থাকে না, কোথায় রাখি ভুলে যাই। এবারেও কয়েকদিন থেকে চাবিটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু সেজন্য বিশেষ উদ্বেগ হই নি—ভেবেছিলুম গোপাও না কোথাও আছেই—' হুঁ,—বোমকেশ উঠিয়া বসিল, হাসিয়া বেরিকে নিজের কোলের উপর বসাইয়া বলিল, 'মালম্ভার মাস্টারটি জুটছিল ভাল। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া

যাচ্ছে না এই আশ্চর্য। ভাল করে খোঁজ করা হচ্ছে তো?’ দেওয়ান কালীগতি বলিলেন, ‘যতদূর সাধ্য ভাল করেই খোঁজ করানো হচ্ছে। পুলিশ তো আছেই, তার ওপর আমিও লোক লাগিয়েছি কিন্তু কোন সংবাদই পাওয়া যাচ্ছে না।’ বেবি পুতুল রাখিয়া বোমকেশের গলা জড়াইয়া ধরিল, জিজ্ঞাসা করিল, ‘আমার মাস্টার মশাই কবে ফিরে আসবেন?’ বোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল—‘জানি না। বোধ হয় আর আসবেন না।’ বেবির চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল; তাহা দেখিয়া বোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, ‘তুমি মাস্টারমশাইকে খুব ভালবাসো—না?’ বেবি ঘাড় নাড়িল—‘হ্যাঁ খুব ভালবাসি। তিনি আমাকে কত অঙ্ক শেখাতেন।—আচ্ছা বল তো, সাত-নঙ, কত হয়? বোমকেশ বলিল, ‘কত? চৌষটি?’

বেবি বলিল, ‘দুঃ! তুমি কিছু জান না। সাত-নঙ, তেষটি। আচ্ছা, তুমি মা কালীর স্তব জানো?’

বোমকেশ হতাশভাবে বলিল, ‘না। মা কালীর স্তবও কি তোমার মাস্টারমশায় শিখিয়েছিলেন নাকি?’

‘হ্যাঁ—শুনবে?’ বলিয়া বেবি স্তব করিয়া আরম্ভ করিল—‘নমস্তে কালিকা দেবী করাল বদনী—’ কালীগতি ঈষৎহাস্তে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন ‘বেবি, তোমার কালীস্তব আমরা পরে শুনব, এখন তুমি বাগানে খেলা কর গে যাও।’

বেবি একটু ক্ষণকালে পুতুল লইয়া প্রস্থান করিল। কালীগতি আন্তে আন্তে বলিলেন, ‘লোকটা মাস্টার হিসেবে মন্দ ছিল না। বেশ যত্ন করে পড়াত—অথচ—’ বোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, ‘চলুন. মাস্টারের ঘরটা এবার দেখে আসা যাক। বাড়ির সম্মুখস্থ লম্বা বারান্দার একপ্রান্তে একটি প্রকোষ্ঠ; ঘরের তালো লাগানো ছিল, দেওয়ানজী কশি হইতে চাবির গুচ্ছ বাহির করিয়া তালো খুলিয়া দিলেন। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি আয়তনে ছোট, গোটা-দুই কাঠের কপাটযুক্ত আলমারি, টেবিল চেয়ার তরুপোষেই এমনভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে যে মনে হয় পা বাড়াইবার স্থান নাই। ঘরের বিপরীত দিকে একটা ছোট জানালা ‘ছল, মেটা খুলিয়া দিয়া বোমকেশ ঘরের চারিদিকে একবার চোখ ফিরাইল। তরুপোষের উপর বহুখানাটা অবিকলভাবে পাট করা রহিয়াছে; টেবিলের উপর সূক্ষ্ম একপুঙ্খ ধূলায় পলেপ পড়িয়াছে; ঘরের অন্ধকার একটা কোণে দড়ি টাঙাইয়া কাপড়-চোপড় রাখিবার ব্যবস্থা। একটা আলমারির কপাট ঈষৎ উন্মুক্ত; দেওয়ালে লিখিত একখানি কালীঘাটের পটের কালীমূর্তি হরিনাথ মাস্টারের কালী-প্রীতির পরিচয় দিতেছে।

বোমকেশ তরুপোষের নিচে উঁকি মাঝিয়া একজোড়া জুতা টানিয়া বাহির করিল বলিল, ‘তাই তো, জুতোজোড়া যে একেবারে নতুন দেখছি ও—আপনারাই কিনে দিয়ছিলেন বুঝি?’

কালীগতি বলিলেন, ‘হ্যাঁ।’

‘আশ্চৰ্য! আশ্চৰ্য!’ জুতা বাধিয়া দিয়া বোমকেশ দড়িৰ আলনাটোৱা দিকে গেল। আলনাৰ কয়েটো কাচা-আকাচা কাপড়-জামা বুলিতেছিল, সেৱলিকে তুলিয়া তুলিয়া দেখিল, তাৰপৰি আবার বলিল, ‘ভাৱি আশ্চৰ্য।’

হিমাংসুবাবু কোতুলী হইয়া জিজ্ঞাসা কৰিলেন, ‘কি হয়েছে?’

জবাব দিবায় ভক্ত মুখ কিয়াইয়া বোমকেশ থামিয়া গেল, তাহাৰ দৃষ্টি ঘৰেৰে বিপৰীত কোণে একটা কুলুজৰ উপৰ গিয়া পড়িল। সে ক্ষতপদে গিয়া কুলুজৰ ভিতৰ হইতে কি একটা তুলিয়া জানালাৰ সম্মুখে আনিয়া দাঁড়াইল, সবিস্ময়ে বলিল, ‘মাস্টাৰ কি চশমা পৰত?’

কালীগতি বলিলেন, ‘ওটা বলতে তুল হুয়ে গেছে—পৰত বটে। চশমা কি কৈলে গেছে নাক?’

চশমাৰ কাঁচৰ ভিতৰ দিয়া একবাৰ দৃষ্টি প্ৰেৰণ কৰিয়া সহাস্তে সেটা আমাৰ হাতে দিয়া বোমকেশ বলিল, ‘হ্যা, আশ্চৰ্য নয়?’

কালীগতি ভক্তকিত কৰিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা কৰিয়া বলিলেন, ‘আশ্চৰ্য বটে। কাৰণ বাৰ চোখ খাৰাপ তাৰ পক্ষে চশমা কৈলে যাওয়া অস্বাভাবিক। এৰ কি কাৰণ হতে পারে আপনার মনে হয়?’

বোমকেশ বলিল, ‘অনেক বকম কাৰণ থাকিতে পারে। হয়তো তাৰ সতি চোখ খাৰাপ ছিল না, আপনাদেৱ ঠকাবাব ভক্ত চশমা পৰত।’

ইত্যবসৰে আমি আৰু কুমাৰ ত্ৰিদিব চশমাটা পৰীক্ষা কৰিতেছিলাম। ষ্টিল ক্ৰেমৰ নড়বড়ে বাহ্যিক চশমা, কাঁচ পুৰা। কাঁচৰ ভিতৰে দিয়া দেখিবায় চেষ্টা কৰিলাম কিন্তু দেখা চাড়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কুমাৰ ত্ৰিদিব বলিলেন, ‘বোমকেশ-বাবু, আপনাৰ অন্তৰ্ধান বোধহয় ঠিক নয়। চশমাটা অনেকদিনেৰে বাৰহাৰে পুৰনো হুয়ে গেছে, আৰু কাঁচৰ শক্তিও খুব বেশী।’

বোমকেশ বলিল, ‘আমাৰ তুল হতে পারে। তবে, মাস্টাৰ আৰু কাৰুৰ পুৰানো চশমা নিয়ে এসেছিল এটাও তো সম্ভব। যা হোক, এবাৰ আলনাৰটো দেখা যাক।’

গোলা আলমাৰিটোৰ কপাট উন্মোচিত কৰিয়া দেখা গেল, তাৰ মধো থাকে থাকে খেৰো বাধানো স্কুলকাৰ হিমাংসুবাবুৰ খাতা সাজানো বাহিয়াছে—বোধহয় সবছ পঞ্চাশ-ষাট খানা। বোমকেশ উপৰেৰে একটা খাতা নামাইয়া ছ’হাতে ওজন কৰিয়া বলিল, ‘বেশ ভারী অচেনেৰ চাৰেকৰ কম হবে না। প্ৰত্যেক খাতায় বুলি এক বছৰেৰে হিমেল আছে।’ কালীগতি বলিলেন, ‘হ্যা।’

বোমকেশ খাতাৰ গোড়ালি পাতা উলুটাইয়া দেখিল, পাঁচ বছৰ আগেকাৰ খাতা, ইহাৰ পৰ হইতে শেষ চাৰ বছৰেৰে খাতা চুৰি গিয়াছে। আৰো কয়েকখানা খাতা বাহিৰ কৰিয়া বোমকেশ হিসাব বাধিবাবুৰ প্ৰণালী মোটামুটি চোখ বুলাইয়া দেখিল প্ৰত্যেকটি খাতা দুই অংশে বিভক্ত—অৰ্থাৎ একধাৰে জাব্দা ও পাকা খাতা। এক

অংশে দৈনন্দিন খুচরা আয় বায়ের হিসাব লিপিত হইয়াছে—অল্প অংশে মোট দৈনিক খরচ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ জমিদারী খাতা এরূপভাবে লিপিত হয় না, কিন্তু এরূপ লেখার সুবিধা এই যে অল্প পরিশ্রমে জাব্বান ও পাকা খাতা মিলাইয়া দেখা যায়। গোড়া হইতে বোমকেশ ব্যাপারটা খুব হাল্কাভাবে লইয়াছিল। অতি সাধারণ গতানুগতিক চুরি ছাড়া ইংরাজ মতো আর কোনো বৈশিষ্ট্য আছে তাহা বোধহয় সে মনে করে নাই। কিন্তু ঘর পরীক্ষা শেষ করিয়া যখন সে বাহিরে আসিল তখন দেখিলাম তাহার চোখেঃ দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। ও দৃষ্টি আমি চিনি। কোথাও সে একটা গুরুতর কিছুই ইঙ্গিত পাইয়াছে; হয়তো যত তুচ্ছ মনে করা গিয়াছিল ব্যাপার তত তুচ্ছ নয়। আমিও মনে মনে একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। ঘরের বাহিরে আসিয়া বোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কৃকিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাৎপর্য হিমাংশুবাবুর দিকে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘আমি এ ব্যাপারের তদন্ত করি আপনি চান?’

মূহূর্ত্তকালের মধ্যে হিমাংশুবাবু যেন একটু দ্বিধা করিলেন, তারপর বলিলেন, ‘হ্যা—চাই বৈকি। এতগুলো টাকা, তার একটা কিনারা হওয়া তো দরকার।’

বোমকেশ বলিল, ‘তাহলে আমাদের দু’জনকে এখানে থাকতে হয়।’ হিমাংশুবাবু বলিলেন ‘নিশ্চয় নিশ্চয়। সে আর বেশী কথা কি।’ বোমকেশ কুমার ত্রিদিবের দিকে করিয়া বলিল, ‘কিন্তু কুমার বাহাদুর যদি অনুমতি দেন তবেই আমরা থাকতে পারি। আমরা তাঁর অতিথি।’ কুমার ত্রিদিব লজ্জায় পড়িলেন। আমাদের ছাড়িবার ইচ্ছা তাহার ছিল না। কিন্তু বোমকেশের ইচ্ছাটাও তিনি বুঝতে পারিতেছিলেন। বোমকেশ হিমাংশুবাবুর কাজ করিয়া কিছু উপাঙ্গন করিতে চায় এরূপ সম্বন্ধে হয়তো তাহার মনে আগিয়া থাকিবে। তাই তিনি কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, ‘বেশ তো আপনারা থাকলে যদি হিমাংশুর উপকার হয়।’

বোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘তা বলতে পারি না। হয়তো কিছুই করে উঠতে পারবো না। হিমাংশুবাবু, আপনার যদি এ বিষয়ে আগ্রহ না থাকে তা বলুন—চক্কলজ্জা করবেন না। আমরা কুমার ত্রিদিবের বা ভতে বেড়াতে এসেছি, বিষয় চিন্তাও কলকাতায় ফেলে এসেছি। তাই আপনি যদি আমার সাহায্য দরকার না মনে করেন, তাহলে আমি বরঞ্চ খুশীই হব।’ কুমার বাহাদুর সচকিত হইয়া বলিলেন, ‘তাই নাকি। কিন্তু আমার তো অতটা মনে হ’ল না। অবশ্য অনেকগুলো টাকা গেছে—টাকা বাওয়াটা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর।’

‘তবে?’

বোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ‘আমার বিশ্বাস হরিনাথ মাস্টার বেঁচে নেই।’

আমরা দু’জনেই চমকিয়া উঠিলাম। কুমার বলিলেন, ‘সে কি?’

বোমকেশ বলিল, ‘তাই মনে হচ্ছে। আশা করি একথা শোনবার পর আমাকে

সহজে কমা করতে পারবেন।’

‘কুমার উষ্মমুখে বলিলেন, ‘না না, কুমার কোনো কথাই উঠছে না। আপনাকে ছেড়ে দেওয়া আমার কষ্টব্য। একটা লোক যদি খুন হয়ে থাকে—’

বোমকেশ বলিল, ‘খুনই হয়েছে এমন কথা আমি বলছি না। তবে সে বেঁচে নাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যা হোক, ও আলোচনা আরও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মূলত্ব বি থাক। আপনি কাল আসবেন তো? তাহলে আমাদের স্ট্রটকেনগুলোও সঙ্গে করে আনবেন। আচ্ছা আজ বেড়িয়ে পড়ুন—পৌছতে অঙ্ককার হয়ে যাবে।’

কুমারের মোটর বাহির হইয়া ঘাইবার পর আমরা বাড়ির দিকে ফিরিলাম কটক হাতে বাড়ির সরর প্রায় একশত গজ দূরে, বিস্তৃত বাবদান নানা জাতীয় ছোট বড় গাছপালায় পূর্ণ। মাঝে মাঝে লোহার বেঁকি পাতিয়া বিশ্রামের স্থান করা আছে।

দেওয়ালের ক্ষুদ্র বিতল বাড়ি দক্ষিণে রা থিয়া আমরা বাসানে প্রবেশ করিলাম। সীতকালের দীর্ঘ গোবুলি তখন নামিয়া আসিতেছে। অবসর দিবার শেষ বক্তিম আভা পশ্চিমে জলের মাথায় অলক্ষ্যে সঙ্কচিত হইয়া আসিতেছে। বোমকেশ চিন্তিত নত মুখে পকেটে হাত পুরিয়া ধারে ধারে চলিয়াছিল চিন্তার দ্বারা তাহার কোন মপিল পথে চলিয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। হঠাৎ মাষ্টারের ঘরে সে এমন কি পাঠিয়াছে বাহা হঠাৎ তাহার মৃত্যু অনুমান করা যাইতে পারে—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমিও একটু অন্তমনস্ক হইয়া পড়িলাম। নিখুঁত পাড়া গাঁয়ের নিস্তরঙ্গ জীবন-যাত্রার মাঝখানে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটয়াছে অন্তর হইতে যেন গ্রহণ করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু তবু কিছুই বলা যায় না—গৃহনর হ্রদের উপরিভাগ বেশ প্রশস্তই দেখায়। বোমকেশের সঙ্গে অনেক বহুসময় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে মুখ দেখিয়া মানুষ চেনা যেমন কঠিন, কেবলমাত্র বচিবায়ন দেখিয়া কোনো ঘটনার গুরুত্ব নির্ণয় করাও তেমনি দুঃসাধ্য। একটা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় দাঁড়াইয়া বোমকেশ সিগারেট ধরাইল, তারপর উষ্মমুখে চাহিয়া কহকটা আমন্ত্রণ ভাবেই বলিল, ‘জুতো পরে না যাবার একটা কারণ থাকতে পারে, জুতো পরে ইটলে শব্দ হয়। যে লোক দুপুর রাত্রে চুপি চুপি করে পালাচ্ছে তার পক্ষে খালি পায়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সে জামা পরবে না কেন? চশমাটা কেলে যাবে কেন?’

‘আমি বললাম, ‘চশমা সম্বন্ধে তুমি বলতে পার, কিন্তু জামা পরেনি একথা জানলে কি করে?’

বোমকেশ বলিল, ‘গুণে দেখলুম সবগুলো জামা রয়েছে। কাজেই প্রমাণ হল যে জামা পরে যাননি।’

‘আমি বলিলাম, ‘তার কতগুলো জামা ছিল তার হিসাব তুমি পেলে কোথেকে?’

বোমকেশ বলিল, ‘দেওয়ানজীর কাছ থেকে। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করনি, ভাগ্য

থেকে মাস্টারকে ছুটো গেঞ্জি আর ছুটো জামা দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া সে নিজে একটা ছেঁড়া কামিজ পরে এসেছিল। সেগুলো সব আলিনায়া টাডানো রয়েছে।’ আমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, ‘তাহলে তুমি অসুস্থমান কর যে...’

বোমকেশ পশ্চিম আকাশের ক্ষীণ শশিকলার দিকে তাকাইয়া ছিল, হঠাৎ সেই-দিকে অভুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, ‘ওহে, দেখেছ? সবে মাত্র সুরূপক্ষ পড়েছে। সে বাজে কি হিথি ছিল বলতে পারো?’

তিথি নক্ষত্রের সঙ্গে কোনো দিনই সম্পর্ক নাই, নীরবে মাথা নাড়িলাম। বোমকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, ‘বোধহয়—অমাবস্তা ছিল। না, চল পাঁজি দেখা যাক।’ তাহার কণ্ঠস্বরে একটা নূতন উত্তেজনার আভাস পাইলাম।

চাঁদের দিকে চাইিয়া কবি এবং নবপ্রণয়ীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে জানিতাম; কিন্তু বোমকেশের মতো কবিত্ব বা প্রেমের বাস্পটুকু পর্যন্ত না থাকা সত্ত্বেও যে চাঁদ দেখিয়া এমন উত্তলা হইয়া উঠিল কেন বুঝিলাম না। বা হোক, তাহার ব্যবহার অধিকাংশ সময়েই বুঝিতে পারি না—এটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তাই সে যখন কিরিয়া বাড়ির অভিমুখে চলিল তখন আমিও নিঃশব্দে তাহার সহগামী হইলাম।

আমরা বাগানের যে অংশটায় আসিয়া পৌঁছিরাছিলাম, সেখান হইতে বাড়ির ব্যবধান পঞ্চাশ গজের বেশী হইবে না। সিধা ঘাইলে মাঝে কয়েকটা বড় বড় ঝাউয়ের ঝোপ উত্তীর্ণ হইয়া ঘাইতে হয়। ঝাউয়ের ঝোপগুলো বাগানের কিয়দংশ ঘিরিয়া ঘন পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ঘাসের উপর দিয়া নিঃশব্দপদে আমরা প্রায় ঝাউ ঝোপের কাছে পৌঁছিরাছি, এমন সময় ভিতর হইতে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ পাইয়া আমাদের গতি আপনাই হইতেই বন্ধ হইয়া গেল। বোমকেশের দিকে চাইয়া দেখিলাম, সে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া আমাকে নীরব থাকিবার সঙ্কেত জানাইতেছে। কান্নার ভিতর হইতে একটা ভাঙা গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম—‘বাবু, এই অনাদি সরকার আপনাকে কোলে শিঠে মাস্তব করেছে—পুবনো চাকর বলে আমাকে দয়া করুন। মা-ঠাকরুণ ভুল বুঝেছেন। আমার মেয়ে অপরাধী—কিন্তু আপনার পা ছুঁয়ে বলছি ও মহাপাপ আমরা করিনি।’ কিছুক্ষণ আর কোনো শব্দ নাই, তারপর হিমাংশুবাবু কড়া কঠিন স্বর শুনা গেল—ঠিক বলছ? তোমরা মাঝোনি?’

‘ধর্ম জানেন হজুর। আপনি মালিক—দেবতা, আপনার কাছে যদি মিথো কথা বলি তবে যেন আমার নাথায় বজ্রাঘাত হয়।’ আবার কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ নাই, তারপর হিমাংশুবাবু বলিলেন, ‘কিন্তু রাগাকে আর এখানে রাখা চলবে না। কালই তাকে অস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা কর। একথা যদি জানাজানি হয় তখন আমি আর দয়া করতে পারবো না—এমনিতোই বাড়িতে অশান্তির শেষ নেই।’

অনাদি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, ‘আজ্ঞে হজুর, কালই তাকে আমি কানী পাঠিয়ে দেব;

সেখানে তার এক মানী থাকে।’

‘বেশ যদি খরচা চালাতে না পারো—’

বোমকেশ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। পা টিপিয়া টিপিয়া আমরা সব্বিয়া গেলাম। মিনিট পনেরো পথে অল্প দিক দিয়া ঘুরিয়া বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বারান্দার উপরে দাঁড়াইয়া কালীগতিবাবু একজন নিম্নতম কর্মচারীর সহিত কথা বলিতেছিলেন, বেবি তাঁহার হাত ধরিয়া আঙ্গারের স্তরে কি একটা উপরোধ করিতেছিল—তাঁহার কথার খানিকটা শুনিতে পাইলাম, ‘একবারটি ডাকো না—’

কালীগতি একটু বিব্রত হইয়া বলিলেন, ‘আঃ পাগলি—এখন নয়।’ বেবি অল্পনয় করিয়া বলিল, ‘না দেওয়ানদাহ, একবারটি ডাকো, ঐ ওঁরা শুনবেন।’ বলিয়া আমাদের নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

কালীগতি আমাদের দেখিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন, যে আমলাটি দাঁড়াইয়া ছিল তাহাকে চাঁলিয়া বাইতে ইঙ্গিত করিয়া প্রশান্ত হাতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বাগানে বেড়াচ্ছিলেন বুঝি?’

বোমকেশ বলিল, ‘হ্যাঁ।—বেবি কি বলছে? কাকে ডাকতে হবে?’ কালীগতি ঘূমের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, ‘ওর যত পাগলামি। এখন শেয়াল ডাক ডাকতে হবে।’

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, ‘সে কি বকম?’

কালীগতি বেবির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ‘এখন কাজের সময়, এখন বিরক্ত করতে নেই। বাও—মা’র কাছে গিয়ে একটু পড়তে বসো গে।’ বেবি কিন্তু ছাড়িবার পাজী নয়, সে তাঁহার আঙুল মুঠি করিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, ‘না দাহু, একবারটি অগত্যা কালীগতি চুপি চুপি তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, ‘তুমি এখন ঘূমতে বাবে তখন শোনার কেমন? এখন যাও লক্ষ্য দিদি আমার।’

বেবি খুশী হইয়া বলিল, ‘নিশ্চয়। কত। তা না হলে আমি ঘূমব না।’

‘আচ্ছা বেশ।’

এই প্রশ্নান করিলে কালীগতি বলিলেন, ‘এইমাত্র থানা থেকে খবর নিয়ে লোক ফিরে এল—মাষ্টারের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি।’

‘ও!’ বোমকেশ একটু খামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘অনাদি বলে কোনো কর্মচারী আছে কি?’

‘আছে। অনাদি জমিদার বাড়ির সরকার।’ বলিয়া কালীগতি উৎসুক নেত্রে তাঁহার পানে চাহিলেন।

বোমকেশ যেন একটু চিন্তা করিয়া বলিল, ‘তাকে দেখছি বলে মনে হচ্ছে না। সে কি আমাদের পাড়াতেই থাকে?’

কালীগতি বলিলেন, ‘না, সে বহুকালের পুরনো চাকর। বাড়ির শিছন দিকে

আস্তাবলের লাগাও কতগুলো ঘর আছে, সেই ঘরগুলো নিয়ে সে থাকে।’

‘না, তার এক বিধবা মেয়ে আর স্ত্রী আছে। মেয়েটি ক’দিন থেকে অসুখে ভুগছে, অন্যদিকে বললুম ডাক্তার ডাকো, তা সে রাজী নয়। বললে, আপনি সেবে যাবে।—কেমন বলুন দেখি?’

‘না—কিছু নয়। কাছে গিঠে কারা থাকে জানতে চাই। অগাধ আমলারা বুঝি হাতার বাইরে থাকে।’

‘হ্যাঁ, তাদের জন্তে একটু দূরে বাসা তৈরী করিয়ে দেওয়া হয়েছে—সব শুদ্ধ শাত-আটি ঘর আমলা আছে। শহর থেকে ঘালাঘাত করলে সুবিধা হয় না, তাই কর্তার আমলেই তাদের জন্তে একটা পাড়া বসানো হয়েছিল।’

‘শহর এখান থেকে কতদূর?’

‘মাইল পাঁচেক হবে। শামনের বাস্তাটা সিঁধা পুরানকে শহরে গিয়েছে।’ এই সময় হিমাংশুবাবু বাড়ির ভিতরে আসিয়া মহাস্তম্ভে বলিলেন, ‘আগুন বোম্বকেশবাবু, আমার গ্রন্থাগার আপনাকে দেখাই।’

আমরা সাগ্রহে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, দেওয়া আফ্রিক করিবার সময় উপস্থিত বলিয়া খডম পায়ে খন্ডকে প্রস্থান করিলেন।

হিমাংশুবাবু একটি মাঝারি আয়তনের ঘরে আমাদের লইয়া গেলেন। ঘরের মাঝখানে টোবলের উপর উজ্জল আলো জ্বলিতছিল। দেখিলাম, মেঝের বাধ ভালুক ও হারিণের চামড়া বিছানো হইয়াছে; দেওয়ানের ধারে ধারে কয়েকটি আলমারি লাগানো। হিমাংশুবাবু একে একে আলমারিগুলি খুলিয়া দেখাইলেন, নানাবিধ বন্দুক পিগুল ও রাইফেলের আলমারিগুলি ঠাসা; এই হিংস্র অস্ত্রগুলির প্রতি লোকটির অদ্ভুত স্নেহ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গলাম। প্রত্যেকটির গুনাগুন—কোনটির দ্বারা কবে কোন জন্ত বধ করিয়াছেন, কাহার পাল্লা কতবার, কোন রাইফেলের গুলি বারনিকে ঈষৎ প্রক্ষিপ্ত হয়—এ সমস্ত তাঁহার নখদর্পণে। এই অস্ত্রগুলি তিনি প্রাণান্তেও কাহাকেও ছুঁইতে দেন না; পরিষ্কার করা, তেল মাখানো সবই নিজে করেন। অস্ত্র দেখা শেষ হইলে আমরা সেই ঘরেই বসিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিলাম। নানা বিষয়ের কথাবার্তা হইল। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একই মানুষকে এত বিভিন্ন রূপে দেখা যায় যে তাহার চরিত্র দৃষ্টিতে একটা অসামান্য ধারণা করিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু কচিং স্বভাবছদ্মবেশী মানুষের মত অসামান্য অন্তরঙ্গভাবে আত্মপরিচয়াদয়্য ফেলে। এই ঘরে বসিয়া আয়তনহীন অনাড়ম্বর আলোচনার ভিতর দিয়া হিমাংশুবাবুর চিন্তাভিও যেন স্বতঃপ্রসূত হইয়া ধরা দিল। লোকটি যে অতিশয় সরল চিন্তা—মনটিও তাঁহার বন্দুকের গুলির মত একান্ত সিঁধা পথে চলে, এ বিষয়ে অনন্ত আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না। আমাদের সঙ্করমান আলোচনা নানা পথ ঘুরিয়া কখন অজ্ঞাতসার

বিষয় সম্পত্তি পরিচালনা, দেশের জমিদারের অবস্থা ইত্যাদি প্রসঙ্গের মধ্যে গিয়া পড়িয়া ছিল। হিংসাশূন্য এই ক্ষেত্রে নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। প্রজাদের সঙ্গে গণ কয়েক বৎসর পরিয়া নিম্নত সঙ্ঘর্ষ তাঁহার মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদারীর খায় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অথচ মামলা মোকদ্দমার খরচের অন্ত নাট; ফলে, এত কষ্টের পরেও প্রায় লক্ষের কোঠায় ঠেকিয়াছে। নিজের বিষয়ে সম্পত্তির সম্বন্ধে এই সব গুহ্য কথা তিনি একপটে প্রকাশ করিলেন। দেহিলাম, জমিদারী নাক্রান্ত অশান্তি তাঁহাকে বিষয় সম্পত্তির প্রতি আরো বঁতকা করিয়া তুলিয়াছে। বশবর্তের গুরুত্ব অনতিজ্ঞতাবশতঃ তিক্ত বৃত্তিতে পারিতেছেন না, মাঝে মাঝে অনিদ্রা থাকে মন শঙ্কিত হইয়া উঠে; তখন সেই শঙ্কাকে তাড়াইবার জন্য প্রিয় বাননা শব্দের পুনরাবৃত্তি আরো আগ্রহে সূঁকিয়া পড়েন। তাঁহার মনের অবস্থা বর্তমানে বৈরাগ্য অব্যবহারিণী বা সাধে আতীত বা জিয়া ফেল। মস্তকপরে অন্ধ হইতে আহািরে ডাক আসিল। এটি শব্দ অন্যদিকে কোরকো দেহিলাম; সে আশ্রয়ের ডাককে না মেনে ছিট। লোকটির বসন্ত চরিত্রা; এতদেব; অনন্ত লেগে কোলকুঁজা চেহারা। পাতা বাসে চুপচুপ অতঃপর কোল হইল গল্পের অঙ্গ হইয়া গিয়াছে, কী কথা কোল ওয়াপে নজর করিয়া। চিত্তের কাছে আশ্রয় পাতা ছে, চোখে মন। অমলক উৎসাহিত দৃষ্টি—যেন কোন দিকের দৃষ্টি বাক্যের মধ্য পড়িবার ভয়ে দমন লক্ষ হইয়া আছে, বোমকেশ তাঁহাকে একবার তাড়ন দৃষ্টিতে আপাতনস্তক দেহিয়া লইল। তারপর আমরা তিনজনে তাহাকে অনুসরণ করিয়া অন্ধর মহলে প্রবেশ করলাম। আহািরের পর একজন ভূনা অমানের পথ দেহিয়া শয়নকক্ষে লইয়া গেল। ভূনাটির নাম ভূনা—সেই হিংসাশূন্যবুধ হাম বয়স। শয়নকক্ষে হাঁজিয়েয়া বসিয়া আমরা নিঃশব্দে ঘাইলাম। ভূনা মশারি ফেঁচা জলের কঁজা হাতের কাছে রাখিয়া ঘরের এটা-ওটা ব্যাডিয়া ব্যাডন স্বন্ধে প্রস্থান করিতেছিল, বোমকেশ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'তুমি তো হারনাথ মাস্টারকে ছ'মাস ধরে দেখেছ, সে কি সব সময় চণমা পরে থাকত?'

আমরা যে চূড়ির দমন করিতে আশ্রিয়াছি তাহা ভূনা বাধ কর জানিত, তাই কথা ক'হবার সুযোগ পাইয়া সে উৎকণ্ঠা ভাবে বলিল—

'আজ্ঞে হ্যাঁ, চব্বিশ ঘণ্টাই তো চণমা পরে থাকতেন, একদিন চণমা না পরে স্বান করতে থাকিলেন, হোঁট খেয়ে পড়ে গেলেন। বন্য চণমায় তিনি এক পা চলতে পারতেন না বাবু।'

বোমকেশ বলিল, 'উহঁ। আচ্ছা, তার জুতো ক'জোড়া ছিল বলতে পার?' ভূনা হাসিয়া বলিল, 'জুতো আবার ক'জোড়া থাকবে বাবু. এক জোড়া। তাও সবকার থেকে কিনিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে-তোড়া পরে তিনি এসেছিলেন সে তো এমন ছোঁড়া যে কুহুবেও খায় না। আমরা সেইদিনই সে জুতো টান মেয়ে আন্তা কুঁড়ে

কেলে দিয়েছিলুম।’

‘বটে! আচ্ছা, মাস্টারের ঘরের দেয়ালে যে একটি মা কালীর ছবি টাঙানো রয়েছে সেটা কি মাস্টার সঙ্গে করে এনেছিল?’

‘আজ্ঞে না হজুর, মাস্টারবাবু একটি খড় কাঠিও সঙ্গে করে আনেন নি ও ছবি দেওয়ানজীর কাছে থেকে মাস্টারবাবু একদিন এনে নিজের ঘরে টাঙিয়ে ছিলেন।’

‘বুঝেছি।’ বোমকেশ একটু চূপ কাঁরয়া থাকিয়া বলিল, ‘আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।’ ভুবন জিজ্ঞাসা করিল, ‘আর কিছু চাই নু হজুর?’

‘না। ভাল কথা, একটা কাজ করতে পার? বাড়িতে পাঁজ আছে নিশ্চয়, একবার আনতে পার? ভুবন বোধকরি মনে মনে একটু বিস্মিত হইল কিন্তু সে অমিদার বাড়ির লেফাফাদুস্তর চাকর, সে তার প্রকাশ না কাঁরয়া বলিল, ‘এখনি কি চাই হজুর?’

‘এখনি হলে ভাল হয়।’

‘যে আজ্ঞে—এনে দিচ্ছি।’

ভুবন বাহির হইয়া গেল। আমরা নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলাম।

পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল। তারপর হঠাৎ অতি সন্নিহটে একটানা বিকট একটা আর্তনাদ শুনিয়া আমরা ধড় মড় করিয়া সোজা হইয়া বলিলাম।

কিন্তু তখন বুঝিলাম, অনৈসর্গিক কিছু নয়—শেয়াল ডাকিতেছে। পাঁচ ছয়টা লুগাল একজু হইয়া নিকটেরই কোনো স্থান হইতে সন্মিলিত উল্লসেরে বাম ঘোষণা করিতেছে। এত নিকট হইতে শব্দটা আসিল বলিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। এই সময় ভুবন পাঁজ হাতে ফিরিয়া আসিল। আমি বলিয়া উঠিলাম, ‘ওক্ হে! বাড়ির এত কাছে শেয়াল ডাকে?’

শেয়ালের ডাক তখন থামিয়াছে, ভুবন হাসি চাপিয়া বলিল, ‘আসল শেয়াল নয় হজুর। বেবিদিদি আজ সন্ধ্যা থেকে বায়না ধরেছিলেন দেওয়ান ঠাকুরের কাছে শেয়াল ডাক শু-বেন। তাই তিনিই ডাকছেন।’

আমি বললাম, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ আজ সন্ধ্যাবেলা বেবি বল ছল বটে। কিন্তু আশ্চর্য ক্রমত তা দেওয়ানজীর! একেবারে অবিকল শেয়ালের ডাক, কিছু বোঝাবার জো নেই।’

ভুবন বলিল, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ হজুর। দেওয়ান ঠাকুর চমৎকার জন্তু-জানোয়ারের ডাক ডাকতে পারেন।’ বলিয়া পাঁজ বোমকেশের পাশে টেবিলের উপর রাখিল। বোমকেশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যেন হঠাৎ পাথরের মূর্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে; চোখের দৃষ্টি স্থির, সর্বজনের পেশী টান হইয়া শক্ত হইয়া আছে। আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, ‘কি হে?’

বোমকেশের চমক ভাঙিল। চোখের সম্মুখে দিয়া হাতটা একবার ঢালাইয়া

বলিল, ‘কিছু না।—এই যে পাঁজি এনেছ? বেশ, তুমি এখন যেতে পারো।’

ভূবন প্রস্থান করিল।

ঘোমকেশ পাঁজিটা তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা উন্টাইতে লাগিল। বানিকপুরে একটা পাণ্ডায় আসিয়া তাহার দৃষ্টি রুদ্ধ হইল। সেই পাতাটা পাড়িয়া সে পাণ্ডা আমার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, ‘এই ছাপ।’

মনে হইল, তাহার গলার স্বর উত্তেজনায় ঈষৎ কাশিয়া গেল।

পাঁজর নিষ্টি পাতাটা পড়িলাম। দেখিলাম, যে বাক্সে মাস্টার নিকৃৎশন হইয়া যায় সে বাক্সটা ছিল অমাবস্থা।

পাঠান দল পাতার সময় গাজোখান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সন্মানান্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—যেনো সমস্ত বাড়িটা রক্ত। একজন ভূতা বারান্দা কাঁচি দিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে নাতকালে বেলা আটটার পূর্বে কেহ শব্দ শ্রবণ করে না। ইহা শুনি বাড়ির বৈশ্যদ্বয় এক দেড় ঘণ্টা সময় কি করিয়া কাটানো যায়? প্রকাশে একটু কুয়াশার আভাস ছিল, সুবের আলো ভাল করিয়া ফুটে উঠে না। তাহার মন উদ্বিগ্ন করিয়া উঠিল, বলিলাম, ‘চল ঘোমকেশ, এখন তো আমাদের কোন কাজ হবে না, রক্তের গিয়ে চাঁচাটে পাখী মাঝি থাক। তারপর পদের খুম ভাঙতে ভাঙতে ফিরে আসা যাবে।’

প্রথম বন্দুক চালাইতে শিখিয়া আগ্রহের মাত্রা কিছু বেশী হইয়াছিল, মনে হইতেছিল যখন পাঠী তাহাই দিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়া দিই। বিশেষতঃ কাল বন্দুক দুইটি কুমার বাহাদুর এখানেই রাখা গিয়াছিলেন, টোটাও কোটের পকেটে কয়েকটা অবশিষ্ট ছিল।

ঘোমকেশ ফলক চিন্তা করিয়া বলিল, ‘চল।’

দুন্দ কাখে কয়েক বাহির হইলাম। যে চাকরটা কাঁচি দিতেছিল তাহাকে প্রশ্ন করিয়া সে জব্বলে বাইবার রাস্তা দেখাইয়া দিল, বলিল, ‘এই পথে দিখা গেলে বালির পাশ দিয়া জব্বলে প্রবেশ করতে পারিব।’ আমরা সবুজ ঘাসে ভরা চারণভূমির উপর দিয়া চলিলাম। কুয়াশার স্তম্ভ ঘাসে শিশির পড়ে নাই, জুতা ভিজল না। চলিতে চলিতে দেখিলাম, সম্মুখে এক মাইল দূরের বনের গাছগুলি গাঢ় বর্ণে আঁকা বহিরাচ্ছে, তাহার কারণে কাছে শিশি বেলা অর্ধচন্দ্রাকারে পড়িয়া আছে—দূর হইতে অস্পষ্ট আনন্দকে লোকেরা বনে হয় যেন একটা লক্ষ্য বাল জব্বলের পাদমূল বেঁটন করিয়া পড়িয়া আছে। আমরা যখন চলে যাচ্ছিলাম সেইদিকে উহার দক্ষিণ প্রান্তটা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া একটা স্তম্ভ পাতের কাছে আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঝখানে আন্ধার পনেরো হাত চওড়া একটা প্রণালী একদিকের সবুজ ঘাসে ভরা মাঠের সহিত অপর দিকের বালুর চড়ার সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। আমরা নিকটতম টিবিটার উপর উঠিলাম। সম্মুখে নিচের দিকে চাহিয়া।

গোয়েন্দা (প্রথম) — ৩

দেখিলাম গজা-ঘমুনা সন্ধ্যার মত একটা ক্ষীণ রেখা ঘাসের সীমানা নির্দেশ করিয়া দিতেছে—তাহার পথেই অনিশ্চিত ভয়ঙ্কর বালুর এলাকা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঠিক কোন খানটার সেই ভয়ানক চোরাবাঁল কে বলিতে পারে? বাঁধের উপর উঠিয়া যে বস্তুটি প্রথমে চোখে পড়িয়াছিল তাহার কথা এখনো বলি নাই। স্টি একটি অতি জীর্ণ ক্ষুদ্র কঁড়ে ঘর। বাঁধের ভাঙ্গনের দক্ষিণ মুখটি আগুলিয়া। এটি কুটির পড়ি পড়ি হইয়া কোন মতে দাঁড়াইয়া আছে—উচ্চতা এত কম যে পাড়ের আড়াল হইতে তাহার মইকা দেখা যায় না। ইতি এড়ায় দেওয়াল, মাটি লোম্বা জলপুষ্টি নিবারণের চেষ্টা হইয়াছিল, এখন প্রায় সর্বত্র মাটি খসিয়া গিয়া জীর্ণ উইথরা হাড়-পাঁজর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উপরের ছুচালার ঘরের চালটিও প্রায় উলঙ্গ—খড় পাঁচরা করিয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা গলিত শব্দায় মুক্তি পোছে। বোধকরি চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ইহাতে কহ বালু কবে নাই। বনের ঘরে লোকালয় হইতে বহুদূরে এইরূপ নিঃসঙ্গ এমটি কুটির দেখিয়া আমাদের ভাবি বসন্ত বোধ হইল। বোমকেশ বলিল, 'তাই তো। চল, ঘরটা দেখা যাক।'

আমরা ফিরিয়া বাঁধ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় আকাশ পর্শাই পর্শাই শব্দ শুনিয়া চোখ তুলিয়া দেখি একঝাঁক বা পাখরা মাঝার উপর দিয়া ডাওয়া বাইতেছে। বোমকেশ কিম্বদন্তে বস্তুকে তোটা ভরসা কাষার কাবল। আমরা একটু দেরী হইয়া গেল, এখন বস্তুক তুলিলাম এখন পারবার ঝাঁক পাঞ্জার বাঁধের চলিয়া গিয়াছে। বোমকেশের আঙুলে একটা পাখর। বসন্ত বালুর উপর পড়িয়াছিল। সেটাতে উদ্ধার কববার ক্ষমতায় দিয়া নামতে দিয়া দেখিলাম সে-পথে নামা নিরাপদ নয়—এত বেশী তালু যে পা হাড়গাটয়া পড়িয়া যাবার সম্ভাবনা। বোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'এত ভাড়া হাড়ি মেরে হে! মরা পাখ তো আর উড়ে পালাবে না। চল, এই দিক দিয়া ঘুরে যাওয়া যাক—কুঁড়ে ঘরটাও দেখা হবে। তখন যে পথে উঠিয়াছিলাম সেই পথে নামিয়া বাঁধের ভাঙ্গনের মুখে উপস্থিত হইলাম। কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটি দ্বার আছে, যেটা দিয় প্রবেশ করিলাম তাহার কবাত নেই, কিন্তু যেটা বালুর দিকে সেটাতে এখনো একটা বাখারির আগড় লাগিয়া আছে। ঘরের মধ্যে মস্তস্ত্রের ব্যবহারের উপযোগী কিছুই নাই। মেঝে বোধহয় পূর্বে গোময় লিপ্ত ছিল, এখন তাহার উপর ঘাস গজাইয়াছে—পচা খড় চাল হইতে পড়িয়া স্থানটাকে আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ঘরটি চণ্ডায় ছয় হাতের বেশী হইবে না কিন্তু দৈর্ঘ্য দুই বাঁধের মধ্যবর্তী স্থানটা সমস্ত জুড়িয়া আছে। এদিক হইতে বালুর দিকে বাইতে হইলে ঘরের ভিতর দিয় বাইতে হয়; অস্ত্র পথ নাই। বোমকেশ ঘরে অপরিষ্কার মেঝে ভাল করিয়া পথবেক্ষণ করিয়া বলিল, সম্প্রতি এ ঘরে কোন মানুষ এসেছে। এখানে খড়গুলো চেপে গেছে—দেখি? এই কোণে কিছু একটা টেনে সরিয়েছে। এ ঘরে মানুষের বাতায়ত আছে।' মানুষের

বাভায়াত থাকা কিছু বিচিত্র নয়। বাখাল বালকেরা এদিকে গরু চরাটিতে আসে, হয়তো এই ঘরের মধ্যে খেলা করিয়া তাহারা বিপ্লবের বাশন করে। 'তা হবে' বলিয়া আমি অল্প ঘাবের আগল খুলিয়া বালির দিকে বাহির হইলাম। মনটা পাখীর দিকেই পাড়য় ছিল। কিন্তু প্লাথী কোথায়? পাখীটা সম্মুখেই পড়িয়াছিল, লক্ষ্য করিয়াছিলাম; অথচ কোথাও তাহার চিহ্ন মাত্র বিজ্ঞান নাই। আমি আশ্চর্য হইয়া বোমকেশকে ডাকিয়া বলিলাম, 'ওহে, তোমার পাখি কৈ? সত্যিই কি মরা পাখি উড়ে গেল নাকি?' বোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। সেও চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল, কিন্তু পাখীর একটা পালকও কোথাও দেখা গেল না। বোমকেশ আশ্বে আশ্বে বলিল, 'তাই তে'।'

'একটু এগিয়ে দেখা যাক, হয়তো আশে পাশে কোথাও আছে।' বলিয়া আমি বাহির উপর পদার্পণ করিতে যাইব, বোমকেশের একটা হাত বিহাষণে আসিয়া আমার কোটের কলার চাপিয়া ধরিল।

'খামো—'

'কি চল?' আমি স্ববাক হইয়া তাহার মুখের দানে তাকাইলাম। 'বালির ওপর পা বাড়িও না।'

সময় ছোড়া কাচুজের পুণ্ড খোলটা বোমকেশ পকেটেই রাখিয়াছিল, এখন সেটা বাহির করিল। সম্মুখদিকে প্রায় বিশ হাত দূরে বাখাল উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'ভাল করে লক্ষ্য কর'। চাপা উত্তেজনায় তাগার স্বর প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। লাল বরের পালটা পরিষ্কার দেখা যাউতেছিল। সেইদিকে দ্বিধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। স্থিতিতে দৃষ্টিতে আমার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। 'কি দরদার! কাচুজ খোলার ভারী নিকটা নামিয়া গিয়া, এটা পাড়া হইয়া পাড়াইয়া উঠিল, তারপর নিঃশব্দে বালির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। এই চোরাপালি! এবং ইহাতেই আমি পবেটের মত এখন পদার্পণ করিতে বাইতেছিলাম। বোমকেশ বাধা না দিলে আজ আমার কি হইত! ভায়া শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া গেল। বোমকেশ উত্তেজনায় জলদ্রব করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল, তাহার গষ্ঠীর বিকৃত হইয়া দাঁতগুলি অন্ধকারে অল্প দেখা গেল। সে বলিল, 'দেখলে! উঃ, কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!' আমি ক্রমশঃ ঘাবের বলিলাম, 'বোমকেশ, তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।' আমার কথা শুনিতেই শব্দ নাই এমন ভাবে সে কেবল অশ্রুট স্বরে বাসতে লাগিল, 'কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!' দেখিলাম, তাহার মুখের রং ফ্যাকাসে হইয়া গেলেও চোখের দৃষ্টি ও চেহেরার হাড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর বোমকেশ কুটীরের চাল হইতে কয়েক টুকরা বাধাবি ভাঙিয়া আনিল, একটি একটি করিয়া সেগুলি বালুর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেখা গেল ঘাসের সীমানার প্রায় দশ হাত দূর হইতে চোরাপালি আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে তাহা জানা গেল না, কারণ বতদূর পর্যন্ত বাধার কেলা

হইল সব বাখারিই ডুবিয়া গেল। পুরাতন বাঁধের অর্ধচক্রাকৃতি বাহুবৈঠন এই চোরাবালিকেই ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অতীত যুগের কোনো সদাশয় অমিদার হয়তো প্রজাদের জীবন বক্ষার্থেই এই বাঁধ করাইয়াছিলেন, তারপর কালক্রমে বাঁধও ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যই লোকে ভুলিয়া গিয়াছে

—চোরাবালির পরিধি নির্ণয় যথাসম্ভব শেষ করিয়া আমরা আবার কুটীরের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিলাম। বোমকেশ বলিল, ‘অজিত! আমরা চোরাবালির সন্ধান পেয়েছি, একথা খেন ঘুগাফেরে কেউ না জানতে পারে। বুঝলে?’

আমি ঘাড় নাড়িলাম। বোমকেশ তখন কুটীরের সম্মুখে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ‘বাঃ! ঘরটি কি চমৎকার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেখেছ? শিহনে পনের হাত দূরে চোরাবালি, সামনে বিশ হাত গভীর বন—ছধারে বাঁধ। কে এটি তৈরী করেছিল জানতে ইচ্ছে করে।’

কুয়াশা কাটিয়া গিয়া বেশ ধোঁয়া উঠিয়াছিল। আমি বনের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, গাছের ছায়ায় নিচে দিয়া একজন হাফ-শাট পরিহিত লোক, কাঁধে বন্দুক লইয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে আমাদের দিকে আসিতেছে। গাছের ছায়ায় বাহিরে আসিলে দেখিলাম, হিমাংশুবাবু। হিমাংশুবাবু দূর হইতে হাঁকিয়া বলিলেন, ‘আপনারা কোথায় ছিলেন? আমি জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে বেড়াছি।’

বোমকেশ মুহূর্তে বলিল, ‘অজিত, মনে থাকে যেন—চোরাবালি সম্বন্ধে কোনো কথা নয়।’ তারপর গলা চড়াইয়া বলিল,—‘অজিতের পাল্লায় পড়ে পাখী শিকারে বেরিয়ে পড়েছিলুম। পাখীরা অবশ্য বেশ অক্ষত শরীরে আছে, কিন্তু আর্মস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে অজিত ধেরকম অভিযান আরম্ভ করেছে, শীগ্রির পুলিশের হাতে পড়বে।’

আনি বললাম, ‘এবারে কলকাতায় গিয়েই একটা বন্দুকের লাইসেন্স কিনব।’

হিমাংশুবাবু আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বন্দুক নামাইয়া বলিলেন, ‘তারপর কিছু পেলেন?’

‘কিছু না। আপনি একেবারে রাইফেল নিয়ে বেরিয়েছেন যে!’ বলিয়া বোমকেশ তাঁহার অস্ত্রটির দিকে তাকাইল। হিমাংশুবাবু বলিলেন, ‘হ্যাঁ—সকালে উঠেই শুনলুম জঙ্গলে নাকি বাঘের ডাক শোনা গেছে। তাই তাড়াতাড়ি রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। চাকরটা বললে আপনারা এদিকে এসেছেন—একটু তাবনা হল। কারণ, হঠাৎ যদি বাঘের মুখে পড়েন তাহলে আপনারাদের পাখামারা বন্দুক আর দশ নম্বরের ছরুকা কোনো কাজেই লাগবে না।’

বোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, ‘বাঘ এসেছে কার মুখে শুনলেন?’

হিমাংশুবাবু বলিলেন, ‘আনি বৈকি। চলুন, যেতে যেতে বলছি।’

তিনজনে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। হিমাংশুবাবু চলিতে চলিতে বলিলেন, ‘বহর চার-পাঁচ আগে—ঠিক ক’বহর হল বলতে পারছি না, তবে বাবা মারা যাবার

পর—হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে এক বিরাট তান্ত্রিক সন্মেলনী এনে হাজির হলেন। ভয়ঙ্কর চেগারা, মাথায় জটীর মত চুল, অজস্র গৌকনাড়ি, পাঁচ হাত লম্বা এক জোয়ান। পরণে স্বেচ্ছ একটি নেংটি, চোখ দুটো লাল টক্টক করছে—আমার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত রুচভাবে ‘তুই-তোকারি’ করে বললেন যে তিনি কিছুদিন আমার আশ্রয়ে অতিথি থেকে সাপনা করতে চান।

‘সাধু-সন্ন্যাসীর উপর আমার বিশেষ ভক্তি নেই—এ সব বুজুক আমার সম্বন্ধ হয় না; বিশেষতঃ ভেদধারীদের ঐক্যতা আর স্পর্ধা আমি বরদাস্ত করতে পারি না, আমি তৎসংগে তাঁকে দূর করে দিচ্ছিলাম; কিন্তু দেওয়ানজী মাঝ থেকে বাধা দিলেন। তার বোধহয় তান্ত্রিক ঠাকুরকে দেখেই খুব ভক্তি হয়েছিল। তিনি আমাকে অনেক করে বোঝাতে লাগলেন, প্রত্যাশায় অভিশম্পাত প্রভৃতির ভয়ও দেখলেন। কিন্তু আমি ঐ উল্লঙ্ঘ্য লোকটাকে বাড়িতে থাকতে দিতে কিছুতেই রাজী হলাম না। তখন দেওয়ানজী তান্ত্রিক ঠাকুরের সঙ্গে মোকাবিলা করে ঠিক করলেন যে তিনি আমার জমিদারীর মধ্যে কোথায় কুপড় বেঁধে থাকবেন—আর ভাতার থেকে তাঁর নিয়মিত সিঁধে দেওয়া হবে। দেওয়ানজীর আগ্রহ দেখে আমি অপত্যা রাজী হলাম।

‘বাবাজী তখন এই জায়গাটি পছন্দ করে কুঁড়ে বাঁধলেন। মাস ছয়েক এখানে ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তবে দেওয়ানজী প্রায়ই বাতায়িত করতেন শেষ পর্যন্ত তাঁর ভক্তি এতই বেড়ে গিয়েছিল যে শুনতে পাই তিনি বাবাজীর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছিলেন। অবশ্য উনি আগেও পন্ডিত ছিলেন কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না।

‘যা হোক, বাবাজী একদিন হঠাৎ সবে পড়লেন। সেই থেকে ও ঘরটা খালি পড়ে আছে।’ গল্প শুনিতে শুনিতে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলাম। চায়েব সরঞ্জাম প্রস্তুত ছিল। বাবাজীর টেবিল পাতিয়া তাহার উপরের চা, কুচুরি পাখীর মাংসের কাটলেট, ডিমের অমলেট ইত্যাদি বহুবিধ লোভনীয় আহাৰ্য্য ভূবন খানদামা সাজাইয়া রাখিতেছিল। আমরা বিনা বাক্যবাহ্যে চেয়ার টানিয়া লইয়া উক্ত আহাৰ্য্য বস্তুর লংকারে প্রবৃত্ত হইলাম। সংস্কার কাঁচ অল্প দূরে অগ্রসর হইয়াছে। এমন সময় বাবাজীর লম্বা মোটর আনিয়া খানিল। কুমার হ্রিদিব অবতরণ করিলেন। মোটরের পশ্চাতে আমাদের স্টটকেস কয়টা বাধা ছিল, সেগুলো নামাইবার হুকুম দিয়া কুমার আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন। বোমবেশের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কদুর?’

বোমবেশ অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘বেশী দূর নয়। তবে দু’একদিনের মধ্যেই একটা হেফজেন্ড হয়ে যাবে আশা করি। আজ একবার শহরে বাওয়া দরকার। পুলিশের কাছ থেকে কিছু খোঁজখবর নিতে হবে।’

কুমার হ্রিদিব বলিলেন, ‘বেশ তো, চলুন আমার গাড়িতে ঘুরে আসা যাক। এখন বেকলে বেলা বায়োটার মধ্যে কেয়া যাবে।’

বোমকেশ মাথা নাড়িল, ‘আমার একদিন সময় লাগবে। সন্ধ্যার আগে ফেরা হবে না। একেবারে খাওয়া দাওয়া করে বেললে বোধহয় ভালো হয়।’

কুমার বলিলেন, ‘সে কথা মন্দ নয়। হিমালয় তুমি চল না হে, খুব খানিক হৈ-হৈ করে আসা যাক। অনেকদিন শহরে যাওয়া হয়নি।’

হিমালয়বাবু কুষ্ঠিতভাবে বলিলেন, ‘না ভাই, আমার আজ আর যাওয়ার সুবিধা হবে না। একটু কাজ।’...

বোমকেশ বলল, ‘না, আপনার গিয়ে কাজ নেই। অজিতও থাকুক আমরা ছুঁজনে গলেই যথেষ্ট।’ বলিয়া কুমারের দিকে তাকাইল। তাহার চাহনিতে বোধহয় কোনো ইশারা ছিল, কারণ কুমার বাহাজুর পুনরায় কি একটা বলতে গিয়ে খামিয়া গেলেন।

বেলা এগারটার সময় বোমকেশ কুমারের গাড়িতে বাহির হইয়া গেল। বাইবার আগে আমাকে বলিয়া গেল, ‘চোখ দুটো বেশ ভাল করে খুলে রেখো। আমার অবর্তমানে যদি কিছু ঘটে লক্ষ্য করো।’

তাহাদের গাড়ি ফটক পার হইয়া বাইবার পর হিমালয়বাবু মুখ দেবিয়া বোধ হইল তিনি যেন পরিত্রাণের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা তাঁহার বাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হওয়ার্তে তিনি যে সুখী হইতে পারেন নাই, এই সন্দেহ আমার আমাকে শোঁড়া দিতে লাগিল।

দেওয়ান কালীগতিও উশস্থিত ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি; আমাদের সুখের ভাব হইতে মনের কথা আন্দাজ করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি আমাকে ডাকিয়া লইয়া বারান্দার চেয়ারে উপবেশন করিয়া নানা বিষয়ে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। হিমালয়বাবুও কথাবার্তায় যোগ দিলেন। বোমকেশ সবদেই আলোচনা বেনী হইল। বোমকেশের কীতিকলাপ প্রচার করিতে আমি কোনদিনই পশ্চাৎপদ নই। সে যে কতবড় ডিটেক্টিভ তাহা বহু উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিলাম। তাহার সাহায্য পাওয়া যে কতখানি ভাগ্যের কথা সে ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িলাম না। শেষে বলিলাম, ‘হরিনার মাটির যে বেঁচে নেই একথা আর কেউ এত শীঘ্রির বার করতে পারত না।’

ছুঁজনে চমকিয়া উঠিলেন—‘বেঁচে নেই!’

কথাটা বলিয়া ফেলা উচিত হইল কিনা বুঝিতে পারিলাম না। বোমকেশ অবশ্য ব্যয়ণ করে নাই, তবু মনে হইল, না বলিলে বোধহয় ভাল হইত। আমি নিজেকে সতর্ক করিয়া লইয়া রহস্যপূর্ণ শিরঃসঞ্চালন করিলাম, বলিলাম, ‘যখন সময় সব কথা জানতে পারবেন।’

অতঃপর বাবোটা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমরা উঠিয়া পড়িলাম। কালীগতি ও হিমালয়বাবু আমার অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া আর কোনো প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু

হরিনাথের মৃত্যুসংবাদ যে তাঁরপক্ষে দুঃসংকেই বিশেষভাবে নাজা দিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। তপ্তববেনাটা বোপ করি ঘরে বসিয়াই কাটাতে হইত; কারণ হিমাংসুব আহাবের পর একটা জরুরী কাজের উদ্দেশ্য করিয়া অন্দরমহলে প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু বোব আসিয়া আমাকে সজ্ঞান করিল। সে আসিয়া প্রথমেই বোমানকেশের খোজ খবর লইল এবং সফলবেলা মেনির সন্ধান প্রসবের জন্য আহ্বিতে পারে নাই বলিয়া যথোচিত দুঃখ জ্ঞাপন করিল। তারপর আমাকে নানাপ্রকার বিচিত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিজন্দের পারিবারিক বহু গুপ্ত বহুস্ত প্রকাশ করিয়া গল্প জমাটয়া তুলিল। হঠাৎ একসময় বেবি বলিল, ‘মা আজ তিনদিন ভাত বাননি।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘তার অস্তপ করেছে বুঝি?’

মাথা নাড়িয়া গজার মুখে বোবি বলিল, ‘না, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।’ এই বিষয়ে তাহারে প্রশ্ন করিয়া আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা ভুলে চিত হইবে কিনা ভাবিতেছি এমন সময় খোলা জানালা দিয়া দেখিলাম একটা সবুজ রঙের সিডান মোটর গ্যারেজে বন্ধ হইতে। অন্তর্ভুক্ত বাহির হইয়া যািতেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালায় সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম গাড়িখানি সাবধানে কটক পার হইয়া শহরের দিকে মোড় লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। দেখিলাম চালক স্বয়ং হিমাংসুবাবু গাড়ির অভ্যন্তরে কেহ আছে কিনা দেখা গেল না।

বেবি আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, ‘আমাদের নতুন গাড়ি’ কিরিয়া আসিয়া বসিলাম। হিমাংসুবাবু ঠিক যেন চোবের মতন মোটর লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কোথায় গেলেন? সঙ্গে কেহ ছিল কি? তিনি গোড়া হইতে আমাদের কাছে একটা কিছু লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের আগমন তাঁহার কোনো কাজে বাধা দিয়াছে, তাই তিনি ভিতরে ভিতরে অধার হইয়া পড়িয়াছেন অথচ বাহিরে কিছু করতে পারিতেছেন না—এই ধারণা ক্রমেই আমার মনে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তবে কি তিনি হরিনাথের অস্থান্যের গুচ বস্ত্র কিছু জ্ঞানেন? তিনি এক আনিয় নুনিয়া কাহাকেও আড়াল করিবার চেষ্টা করিতেছেন? তাঁত দৃষ্টি রূপকায় অনাদি শরকারের কথা মনে পড়িল। সে কাল প্রভু পায়ে ধরিয়া কাদিতেছিল ‘ক জ্ঞে?’ ‘ও মহাপাপ করিনি—কোন মহাপাপ হইবে নৈজেকে আসন করিতে চেষ্টা করিতেছিল। বেবি আজ আবার একটা নতুন খবর দিল—হিমাংসুবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলিতেছিল। ঝগড়া এতদূর গড়াইয়াছে যে স্ত্রী তিনদিন আহার করেন নাই। কি লইয়া ঝগড়া? হরিনাথ মাষ্টার কি এই কলহ বহস্তের অন্তবালে লুকাইয়া আছে?

‘তুমি ছবি আঁকতে জানো?’ বেবির প্রশ্নে চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল। অন্ত-মনস্বভাবে বলিলাম, ‘আনি।’

ঝামর চুল উড়াইয়া বেবি ছুটিয়া চলিয়া গেল। কোথায় গেল ভাবিতেছি এমন

সময় সে একটা খাতা ও পেন্সিল লইয়া ফিরিয়া আসিল। খাতা ও পেন্সিল লইয়া ফিরিয়া আসিল। খাতা ও পেন্সিল আমার হাতে দিয়া বলিল, 'একটা ছবি এঁকে দাও না। খুব—ভাল ছবি।'

খাতাটি বেবির অঙ্কের খাতা। তাহার প্রথম পাতায় পাকা হাতের লেখা রহিয়াছে, শ্রীমতী বেবিরানী দেবী।

জিআমা কাবলাম, 'একি তোমার মাঠার মহাশয়ের হাতের লেখা?'

বেবি বলিল, 'মাঠারমশাই! তিনি খালি আমার পাতায় অঙ্ক করতেন।' দেখিলাম মিথ্যা নয়। পাতার অবিকাংশ পাতাই মাঠারের কঠিন দীর্ঘ অঙ্কের অক্ষরে পূর্ণ হইয়া আছে। কি বাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একটা ছোট মেয়েকে গণিতের গোড়ার কথা শিখাইতে গিয়া কলেজের শিক্ষিতবা উচ্চ গণিতের অবলম্বনের মার্বত্তা কি?

খাতার পাতাগুলো উন্টাইয়া পাঠাইয়া দেখিতে দেখিতে এক স্থানে দৃষ্টি পড়িল—একটা পাতার আধময়লা কাগজ এক ছিঁড়িয়া লইয়াছে। একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে মনে হইল যেন পেন্সিল দিয়া খাতার উপর কিছু লিখিয়া পরে কাগজটা ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কারণ খাতার পদের পৃষ্ঠায় পেন্সিলের চাপা দাগ অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। আলোর সম্মুখে ধরিয়া দেখিবার মত দাগগুলি পড়িবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু পড়িতে পারিলাম না।

বেবি অধীরভাবে বলিল, 'ওকি করছ। ছবি এঁকে দাও না।' ছেলেবেলার স্বপ্ন ইহুতে পড়িতাম তখন এই ধরনের বর্ণনায় চিহ্ন কাগজের উপর ফুটাইয়া তুলিবার কৌশল শিখিয়াছিলাম, এখন তাহা মনে পড়িয়া গেল।

বেবিকে বলিলাম, 'একটা মাজিক দেখবে?'

বেবি খুব উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'হ্যাঁ দেখব।'

তখন খাতা হইতে একটুকরো কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া তাহার উপর পেন্সিলের শিথ অঙ্কন লাগিলাম; কাগজটা স্বপ্ন কালো হইয়া গেল তখন তাহা সতর্পণে সেই অদৃষ্ট লেখার উপর বুলাইতে লাগিলাম। কটোগ্রাফের নেগেটিভ যেমন বাদ্যযন্ত্রের জলে যৌত দ্বিধিতে করিতে তাহার ভিতর হইতে ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে, আমার বহু ঘর্বণের ফলেও তেমনি কাগজের উপর দীর্ঘ ধীরে অক্ষর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সবগুলি অক্ষর ফুটিল না, কেবল পেন্সিলের চাপে যে অক্ষরগুলি কাগজের উপর গভীরভাবে দাগ কাটিয়াছিল সেইগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

ও হ্রী ক্রীঃ...

দাঁড়ি ১১...৫... অম...পড়িবে।

অসম্পূর্ণ ভূবোধ অক্ষরগুলোর অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ও হ্রীঃ ক্রীঃ—বোধহয় কোনো মন্তব্য হইবে। কিন্তু সে বাহাই

হোক, হস্তাক্ষর যে হরিনাথ মাষ্টারের তাহাতে সন্দেহ রহিল না। প্রথম পৃষ্ঠার লেখার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম, অক্ষরের ছাঁদ একই প্রকারের।

বেবি ম্যাজিক দেখিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হয় নাই, সে ছবি আঁকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন তাহার পাতায় কুকুর বাঘ বান্ধা প্রভৃতি বিবিধ জন্তর চিত্রাকর্ষক ছবি আঁকিয়া তাহাকে খুশী করিলাম। মন্ত্র-লেখা কাগজটা আমি ছিড়িয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিলাম।

বেলা সাড়ে তিনটার সময় হিমাংশুবাবু কিরিয়া আসিলেন। মোটর তেমন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া বাড়িতে পশ্চাতে গারেজের দিকে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে হিমাংশুবাবুর গলার আগুয়াজ শুনতে পাইলাম। তিনি ভুবন ব্যাঘ্রাকে ডাকিয়া চায়ের বন্দোবস্ত করিবার জুম দিতেছেন।

বোমকেশ যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। কুমার পাড়ি হটতে নামিলেন না, বোমকেশকে নামাইয়া দিয়া শরীরটা তেমন ভাল ঠেকিতেছে না বলিয়া চলিয়া গেলেন। তখন বোমকেশের অনারে আর একবার চা আসিল। চা পান করিতে করিতে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। দেওয়ানজীও আসিয়া বসিলেন। বোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কি হল?’

বোমকেশ চায়ে চুমুক দিয়া বলিল, ‘বিশেষ কিছু হল না। পুলিশের ধারণা হরিনাথ মাষ্টারের প্রজারা কেউ নিজের বাড়িতে লুকিয়ে বেঁচেছে।’

দেওয়ানজী বলিলেন, ‘আপনার তা মনে হয় না?’

বোমকেশ বলিল, ‘না। আমার ধারণা অন্তরকম।’

‘আপনার ধারণা হরিনাথ বেঁচে নেই?’

বোমকেশ একটু বিস্মিতভাবে বলিল, ‘আপনি কি করে বুঝলেন? ও অজিত বলেছে। হ্যা—আমার তাই ধারণা বটে। তবে আমি ভুলও করে থাকতে পারি।’

কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না। আমি অত্যন্ত যত্নপূর্ণ অশ্রুতব করিতে লাগিলাম। বোমকেশের মুখ দেখিয়া এমন কিছু বোধ হইল না যে সে আমার উপর চট্টাচ্ছে, কিন্তু মুখ দেখিয়া সকল সময় তাহার মনের ভাব বোঝা যায় না। কে জানে তখনো কথাটা ইত্যাদের কাছে প্রকাশ করিয়া অগ্রায় করিয়াছে, বোমকেশ নির্জনে পাইলেই আগার মুণ্ড চিবাইবে।

কালীগতি হঠাৎ বলিলেন, ‘আমার বোধ হয় আপনি ভুলই করছেন বোমকেশবাবু। হরিনাথ সম্ভবতঃ মরেনি।’

বোমকেশ কিছুক্ষণ কালীগতির পানে চাহিয়া বহিল, তারপর বলিল, ‘আপনি নতুন কিছু জানতে পেরেছেন?’

কালীগতি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ‘না—তাকে ঠিক জানা বলে না; তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে ঐ বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে।’

বোমকেশ চমকিত হইয়া বলিল, 'বনের মধ্যে ? এই দারুণ শীতে ?'

'হ্যাঁ। বনের মধ্যে কাপালিকের ঘর বলে একটা কুঁড়ে ঘর আছে যাতে বাবুজীকেই ভয়ে সম্ভবতঃ সেই ঘাটায় লুকিয়ে থাকে।'

বোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'স্পষ্ট কোনো প্রমাণ পেয়েছেন কি ?'

'না। তবে আমার স্থির বিশ্বাস সে এখানেই আছে।'

বোমকেশ আর কিছু বলিল না।

যাত্রা শয়ন করিতে আসিয়া বোমকেশ বলিল, 'চোরাবালির কথাটাও চাবিথিকে স্মৃতি করে দিয়েছো তো ?'

'না-না আমি শুধু কথায় কথায় বলেছিলুম যে—'

'বুঝেছি।' বলিয়া সে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি তো ওকথা বলতে বাধ্য করনি।'

'তোমার মনের ভাব দেখছি রবিবাবুর গানের নায়কের মত—যদি বাধ্য কর তবে গাহিব না। এবং বাধ্য না করিলেই তারঃস্বরে গা হব। যা হোক আজ ছুপুরবেলা কি করলে বল।'

দেখিলাম বোমকেশ সত্যসত্যই চটে নাই, বোধহয় ভিতরে ভিতরে তাহার ইচ্ছা ছিল যে ও কথাটা আমি প্রকাশ করিয়া ফেলি। অন্ততঃ তাহার কাণের যে কোনো বাঘাত হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহ।

আমি তখন বিপ্রহরে বাহা বাহা জানিতে পারিয়াছি নব বলিলাম, মস্তলেশঃ কাগজটা দেখাইলাম। কাগজটাও বোমবেশ মন দিয়া দেখিল, কিন্তু বিশেষ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিল না। বলিল, 'নতুন কিছুই নয়—এসব আমার জানা কথা। এই লেখাটার দ্বিতীয় লাইন সম্পূর্ণ করলে হবে—'

'রাতি ১১ টা ৪৫ মিঃ গতে অব্যবস্থা পড়িলে অর্থাৎ হরিমাণ্ড পাজি দেখেছিল।'

হিমাংসুবাবুর বহির্গমনের কথা শুনিয়া বোমকেশ মুচকি হাসিল, কোনো মন্তব্য করিল না। আমি তখন বলিলাম, 'স্বাধ বোমকেশ, আমার মনে হয় হিমাংসুবাবু আমাদের কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন। তুমি লক্ষ্য করেছ কি না জানি না, কিন্তু তিনি আমাদের অতিথিরূপে পেয়ে খুশী হন নি।'

বোমকেশ মুহূর্ত্তাবে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'ঠিক ধরেছ। হিমাংসুবাবু যে কত ডুঁচু খেজাজের লোক তা ওঁকে দেখে গারণা করা যায় না। সত্যি অজিত, ওর মতন লজ্জদয় প্রকৃত ভয়লোক খুব কম দেখা যায় যেমন করে হোক এ ব্যাপারে একটা বকা করতেই হবে।'

আমাকে বিষয় প্রকাশের অবকাশ না দিয়া বোমকেশ পুনশ্চ বলিল, 'অনাদি লরকারের বাবা নামে একটি বিধবা মেয়ে আছে ওনেছ বোধহয়। তাকে আজ দেখলুম।'

আমি বোকার মত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বহিলাম, সে বলিয়া চলিল, ‘পতের-আঠার বছরের মেয়েটি — দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু ছুঁতাপের পীড়নে আর লজ্জায় একেবারে মুগ্ধ পড়েছে।—দেখ অজিত, যৌবনের উদ্বোধনায় অপরাধকে আমরা বড় কঠিন শাস্তি দিই বিশেষতঃ অশরাদ্দী যদি দ্ব্যলোক হয়। প্রলোভনের বিরাট শক্তিকে হিঙ্গাবের মধ্যে নিই না, যৌবনের স্বভাবিক অপরিণামদর্শিতাকে ও হিঙ্গাব থেকে বাধ দিই। ফলে যে বিচার করি তা সুবিচার নয়। আইনেও grave and sudden provocation বলে একটা সাক্ষ্য আছে। কিন্তু সমগ্র কোনো সাক্ষ্য মানে না; আশুনের মত সে নির্ধন, যে হাত দেবে তার হাত গুড়বে। আমি সমাজের দোষ দিচ্ছি না—সাধারণের কল্যাণে তাকে কঠিন হতেই হয়। কিন্তু যে লোক এই কঠিন তার ভিতর থেকে পাথর ফাটিয়ে করুণার উৎস খুলে দেয় তাকে শ্রদ্ধা না করে থাকার আর না।’

বোমকেশকে কখনো সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে লেকচার দিতে শুনি নাই; অনারি লরকারের কন্ঠ্যকে দেখিয়া তাহার ভাবের বস্তা উল্লিয়া উঠিল কেন তাহা বোধগম্য হইল না। আমি কালকাল করিয়া কেবল তাহাকে নির্দোষ করিতে লাগিলাম। বোমকেশ কিছুক্ষণ দেওয়ানের দিকে তাকাইয়া বহিল, তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, ‘আর একটা আশ্রয় দেখছি, এসব বাপায়ে মেয়েবাই মেয়েদের সব চেয়ে নিষ্ঠুর শাস্তি দেয়। কেন দেয় কে জানে!’

অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না; শেষে বোমকেশ উঠিয়া পারের মোজা টানিয়া খুলিতে খুলিতে বলিল, ‘রাত হল, শোয়া থাক। এ বাপাশরটা যে কিভাবে শেষ হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। যা কিছু জাতবা সবই জানা হয়ে গেছে—অথচ লোকটাকে ধরবার উপায় নাই।’ তারপর গলা নামাইয়া বলিল, ‘ফাঁদ পাততে হবে, বুঝেছ অজিত, ফাঁদ পাততে হবে।’

আমি বলিলাম, ‘যদি কিছু বলবে ঠিক করে থাকো তাহলে একটু স্পষ্ট করে বল। জাতবা কোনো কথাই আমি এখনো বুঝতে পারিনি।’

‘কিছু বোঝানি?’

‘কিছু না।’

‘আশ্রয়! আমার মনে যা একটু সংশয় ছিল তা আজ শহরে গিয়ে বুট পেছে। লম্বা ঘটনাটি ব্যস্ততাপের ছবির মত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।’

অথবা সংশয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘শহরে সারাদিন কি কলে?’

বোমকেশ আমার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল, ‘মাত্র দুটি কার। ইষ্টপনে অনাদি সরকারের মেয়েকে দেখলুম—তাকে দেখবার জন্যেই সেখানে লুকবে বলেছিলুম। তারপর যেজিটি অফিসে করে কটি দলিলের সন্ধান করলুম।’

‘এইতেই এত দেবী হল?’

‘হ্যাঁ যেজিটি অফিসের খবর সহজে পাওয়া যায় না—অনেক তথ্য করতে হবে।’

‘তারপর ?’

‘তারপর ফিরে এলুম।’ বলিয়া বোমকেশ লেপের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বুঝিলাম, কিছু বলিবে না। তখন আমিও রাগ করিয়া শুটগান পড়িলাম আর কোনো কথা कहিলাম না।

ক্রমে তন্দ্রাবেশ হইল। নিশাদেবীর ছায়া-ময়ীর মাথার মধ্যে ঝুঁঝুঁঝুঁ করিয়া বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় দরজার কড়া খুটখুট করিয়া নড়িয়া উঠিল। তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

বোমকেশের বোধ করি তখনো ঘুম আসে নাই, সে বিচিনার উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘কে ?’

বাহির হইতে মুহূর্তে আওয়াজ আসিল, ‘বোমকেশবাবু, একবার দরজা খুলুন।’ বোমকেশ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, দেওয়ান কালীগতি একটি কাপোরে বড়ো কবল পায়ে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

কালীগতি বলিলেন, ‘আমার সঙ্গে আসুন, একটা জিনিস দেখাতে চাই।— অজিতবাবু জেগে আছেন নাকি? আপনিও আসুন।’

বোমকেশ ওভারকোট পায়ে দিতে দিতে বলিল, ‘এত রাতে। বাপাব কি ?’ কালীগতি উত্তর দিলেন না। আমিও লেশ পরিত্যাগ করিয়া একটা শাল ভাল করিয়া পায়ে জড়াইয়া লইলাম। তারপর দুইজনে কালীগতিতে অনুসরণ করিয়া বাহির হইলাম।’

বাড়ি হইতে নিজস্ব হইয়া আমরা বাগানের ফটকের দিকে চলিলাম। অন্ধকার ঘাতি বহুপূর্বে চন্দ্রাস্ত হইয়াছে। চুঁচের মত তীক্ষ্ণ অধঃ মন্ডর একটা বাতাস ঘন অলসভাবে বস্ত্রাচ্ছাদনের ছিন্ন অস্তদৃশ্য করিয়া কিরিতেছে। আমি ভাবিতে লাগিলাম যুদ্ধ এহেন রাতে আমাদের কোথায় লইয়া চলিল। কতদূর বাইতে হইবে। বোমকেশই বা এমন ‘নিবিচারে প্রসন্নমাজ না করিয়া চলিয়াছে কেন।

কিন্তু কটক পর্বত পৌছবার পূর্বেই বুঝিলাম, আমাদের গন্তব্যস্থান বেশী দূর নয়। কালীগতির বাড়ির সদর দরজার একটি দ্বারকেন লঠন কৌণ্ডাবে জলিতছিল, সেটিকে জ্বলিয়া লইয়া তাহার বাতি উদ্ধাইয়া দিয়া কালীগতির বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, ‘আসুন।’

কালীগতির বাড়িতে বোধহয় চাকর-বাকর কেহ থাকে না, কারণ বাড়িতে প্রবেশ করিয়া জনমানবের সাড়াশব্দ পাইলাম না। লঠনের শিখা বাড়ির অংশমাত্র আলোকিত করিল, তাহাতে নিকটস্থ দরজা জানালা ও ঘরের অন্তঃস্থ ধাপে টিঠিয়া কালীগতি লঠন কমাইয়া রাখিয়া দিলেন। দেখিলাম, আলিশেষের পোলা ছাদে উপস্থিত হইরাছি।

‘এদিকে আসুন।’ বলিয়া কালীগতি আমাদের আলিশার ধারে লইয়া গেলেন; তারপর বাহিরের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, ‘কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?’

উচ্চস্থান হইতে অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি গ্রাহ্য হইয়াছিল বটে কিন্তু গাঢ় অন্ধকার দৃষ্টির পথরোধ করিয়া দিয়াছিল। এই চারিদিকে অভেদ্য তমিস্রা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কেবল কালীগাতর অকুলি নির্দেশ অস্পষ্ট করিয়া দেখিলাম বহুদূরে একটি মাত্র আলোকের বিন্দু চক্ৰাংশায়ী মঙ্গলগ্রহের মত আবাক্তম ভাবে জ্বলিতেছে।

বোমকেশ বলিল, 'একটা আলো জ্বলছে? কিয়া আগুনও হতে পারে।

'কোথায় জ্বলছে?'

কালীগতি বলিলেন 'জ্বলনের ধারে যে কুঁড়ে ঘরটা আছে তারই মধ্যে।' 'ও-বাতে সেই কার্ণালিক মহাপ্রভু ছিলেন।' 'তা তিনি কি আবার ফিরে এলেন নাকি? বোমকেশের বাজহাসি শুনা গেল।'

'না—আমার বিশ্বাস এ হরিনাথ মাটার।'

'ওঃ!' বোমকেশ যেন চমকিয়া উঠিল—'আজ সন্ধ্যাবেলা আগুন বলছিলেন বটে।' 'কিন্তু আলো জ্বলে সে কি ধরছে?'

'বোধহয় দীপ্ত স্রষ্টা করতে না পেরে আগুন জ্বলেছে।'

বোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবল, শেষে মুহূর্তের বলিল, 'হতেও পারে যদি সে বেঁচে থাকে—অসম্ভব নয়।'

কালীগতি বলিলেন, 'বোমকেশশ্রাবু, সে বেঁচে আছে—ঐ আগুনই তার প্রমাণ মনুষ্য সমাজ থেকে সে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, সে ছাড়া এই রাতে ওখানে আর কে আগুন জ্বালবে?'

'তা বটে!' বোমকেশ আবার কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'হরিনাথ মাটার হোক বা না হোক, লোকটা কে জানা সবকার অজিত। এখন ওখানে যেতে রাজী আছ?'

আমি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'এখন? কিন্তু—'

কালীগতি বলিলেন, 'সবদিক বিবেচনা করে দেখুন। এখন গেলে যদি তাকে ধরতে পারেন তাহলে এতনি যাওয়া উচিত। কিন্তু এই অন্ধকারে কোনো বকন শেষ না করে কুঁড়ে ঘরের কাছে এগুতে পারবেন কি? খালো নিয়ে যাওয়া চলবে না, কারণ আলো দেখলেই সে পালাবে। আর অন্ধকারে বন-বাদাড় ভেঙে যেতে গেলেই শঙ্ক হবে। কি করবেন, ভাব করে ভেবে দেখুন।'

তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম। সব দিক ভাবিয়া শেষোক্তর হইল যে আজ রাতে যাওয়া নিরাপদ হইবে না; কারণ আশ্রয়ী যদি একবার ঢের পায় তাহা হইলে আর ওষয়ে আসিবে না। বোমকেশ বলিল, 'দেওয়ানজীর পরামর্শই ঠিক, আজ যাওয়া সম্ভব নয়। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। আশ্রয়ী যদি কড়কে না যায় তাহলে কালও নিশ্চয় আসবে। কাল আমি আর অজিত আগে থাকতে গিয়ে

এ হবে লুকিয়ে থাকব—বুঝেছেন? তারপর সে যেমনি আসবে—’

কালীগতি বলিলেন, ‘এ হস্তাব মন্দ নয়। অবশ্য এর চেয়েও ভাল মডেল বহি কিছু থাকে তাও ভেবে দেখা যাবে। আজ তাহলে এই পর্যন্ত থাক।’

ছাদ হইতে নামিয়া আমরা নিজেদের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। দেওয়ানজী আমাদের ঘর পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া গেলেন। বাইবার সময় বোমকেশের মুখে দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ‘বোমকেশবাবু, আপনি তাত্ত্বিকেরে বিশ্বাস করেন না?’

বোমকেশ বলিল, ‘না, এসব বুজকাঁক। আমি বত তাত্ত্বিক দেখেছি, সব বেটা মাতাল আর লম্পট।’

কালীগতির চোখের দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য কেমন যেন ঘোলাটে হইয়া গেল, তিনি মুখে একটু ক্ষীণ হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, ‘আচ্ছা, আজ তবে শুয়ে পড়ুন। ভাল কথা, হিমাংশু বাবাজীকে আপাতত এসব কথা না বললেই বোধহয় ভাল হয়।’

বোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ‘হ্যাঁ, তাঁকে এখন কিছু বলবার দরকার নেই।’

কালীগতি প্রস্থান করিলেন।

আমরা আবার শয়ন করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে বোমকেশ বলিল, ‘ব্রাহ্মণ আমার ওপর মনে মনে ভরসার চটেছেন।’

আমি বলিলাম, ‘ধাবার সময় তোমার দিকে য় রকম ভাবে তাকালেন তাতে আমারও তাই মনে হল। তাত্ত্বিকদের সহজে এসব কথা বলবার কি দরকার ছিল? উনি নিজে তাত্ত্বিক—সাজেই ওঁর আঁতে ঘা লেগেছে। বোমকেশ বলিল, ‘আমিও কখনোবাকো তাই আশা করছি।’

তাহার কথা ঠিক বুলিতে পারিলাম না। কাহারও দর্মবিধানে আঘাত দিয়া কথা কহিয়া তাহার অভিমান নয়, অথচ এক্ষেত্রে সে আনিয়া বুলিয়াই আঘাত দিয়াছে। বলিলাম, ‘তার মানে? ব্রাহ্মণকে মিছিমিছি চট্টয়ে কোন লাভ হল নাকি?’

‘সেটা কাল বুঝতে পারব। এখন বুঝিয়ে পড়।’ বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া গেল। পরদিন সকাল হইতে অপরাহ্ন পর্যন্ত বোমকেশ অলসভাবে কাটাইয়া দিল। হিমাংশুবাবুকে আজ বেশ প্রফুল্ল দেখিলাম নানা কথাবার্তায় হাসি তামাসায় শিকারের গল্পে আমাদের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। আমরা যে একটা গুরুতর রহস্যের মর্ষোদঘাটনের জন্য তাঁহার অতিথি হইয়াছি তাহা যেন তিনি ভুলিয়াই গেলেন; একবারও সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করিলেন না।

বৈকালে চা-পান সমাপ্তি করিয়া বোমকেশ কালীগতিক একান্তে লইয়া গিয়া কিসকিন করিয়া ‘জজালা করিল, ‘কালকের প্ল্যানই ঠিক আছে তো?’

কালীগতি চিন্তা বৃত্ত ভাবে কিছুক্ষণ বোমকেশের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, ‘আপনি কি বিবেচনা করেন?’

বোমকেশ বলিল, ‘আমার বিবেচনায় বাওয়াই ঠিক, এর একটা নিশ্চিন্তি হওয়া

দরকার। আজ এত দশটা নাগাদ চম্ভান্ত হবে, তার আগেই আমি আর অজিত
গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকব। যদি কেউ আসে তাকে ধরবে।

কালীগতি বললেন, 'যদি না আসে?'

'তাহলে বুঝব আমার আগেকার সম্মানই ঠিক, হরিদাস নাটার বেঁচে নেই।'

আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কালীগতি বললেন, 'বিশ্ব কিছু ঘণ্টা এখন একবার
দেখে এসে ডাক হত।' চলুন, আপনাদের নিয়ে যাই।'

বোমকেশ বলল, 'চলুন।' ঘরটা বেলাবেলি দেখে না রাখলে আগার ঘরে
সেখানে ঘাবড়ানোর অবস্থা হবে।'

ঘরটা যে আমার আগে দেখিয়েছি তাহা বোমকেশ ভাঙল না। বাকসময় তিন-
জনে ঘরের দ্বারে দাঁড়িয়ে উপস্থিত হইলাম। কালীগতি আমাদের কুঠির দ্বার
লইয়া গেলেন। দেখিলাম, মেয়ের উপর একশূণ্য হাট পড়িয়া আছে। তা ছাড়া ঘরে
আর কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

কালীগতি পিছনের কবচ খুলিয়া বালুরদিকে লক্ষ্য গেলেন। বালুর উপর তখন
সম্ভার মলিনতা নামিয়া আসিয়াছে। বোমকেশ দেখিয়া বলল, বাঃ! এতটুকু
তা বেশ, খোঁচা প্যাঁচল দিয়ে ঘেরা।'

আমিও দাঁড়ানোর বললাম 'চম্ভকার।'

কালীগতি বললেন, 'আপনারা আজ এই ঘরে থাকিবেন বটে কিন্তু আমার একটু
হুঁতবনা হচ্ছে।' অন্তে পাচ্ছি, একটা বাঘ নাকি সম্প্রতি জন্মে এসেছে।'

আমি বললাম, 'তাতে কি, আমরা বন্দুক নিয়ে আসব।'

কালীগতি মুহূর্তের মধ্যে মাথা নাড়িলেন, 'বাঘ যদি আসে, অন্ধকারে বন্দুক কোনো
কাজেই লাগবে না। যা হোক, প্রশ্ন করি যাদের গুজবটা মিথ্যা—বন্দুক আনবার
দরকার হবে না; তবে সাধানের দাব নাট আপনাদের সতর্ক করে দেই। যদি বাঘে
বাঘের ডাক শুনে পান, ঘরের মধ্যে থাকবেন না, এই দিকে বেবিয়ে এসে আগুন
লাগিয়ে দেবেন, তারপর ঐ বালুর উপর দিয়ে দাঁড়াবেন। যদি বা বাঘ ঘরে ঢাকে
বালির উপর যেতে পারবে না।'

বোমকেশ খুশী হইয়া বলল, 'এই ভাল বন্দুকের হাঙ্গামার দরকার নেই। অজিত
আবার নতুন বন্দুক চালাতে শিখেছে, হয়তো বিনা কারণেই আগুয়াজ করে বসবে;
কলে পলায়নের আর এদিকে ঘেঁষবে না।'

তারপর বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। মনটা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর হিমাত্তবাবুর অস্থানে বসিয়া গল্পগুজব হইল। একসময় বোমকেশ
হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা হিমাত্তবাবু, মনে করুন কেউ যদি একটা নিরীহ
নির্ভরশীল লোককে ছেনেতনে নিজের বার্ষসিদ্ধির জন্যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে
দেয়, তাঁর শাস্তি কি? হিমাত্তবাবু হাসিয়া বলিলেন 'মৃত্যু। A tooth for a

tooth, an eye for an eye !'

বোমকেশ আমার দিকে ফিরল—'অজিত তুমি কি বল ?'

'আমিও তাই বলি।'

বোমকেশ অনেকক্ষণ উদ্বিগ্ন মুখে বসিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া গিয়া দরজার বাইরে উঁকি মারিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। মুহূর্ত্তে বলিল, 'হিমাংশুবাবু, আজ রাত্রে আমরা ছুঁড়নে গিয়ে কাপালিকের কুঁড়ের লুকিয়ে থাকব।'

বিস্মিত হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'সে কি। কেন ?'

বোমকেশ সংক্ষেপে কারণ ব্যক্ত করিয়া শেষে ক'হিল, 'কিন্তু আমাদের একলা যেতে লাহস করে না। আপনাকেও যেতে হবে।'

হিমাংশুবাবু সাংসাহে বলিলেন, 'বেশ বেশ নিশ্চয় যাব।'

বোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আপনি যাচ্ছেন একথা যেন আকারে ইঙ্গিতে কেউ না জানতে পারে! তা হলে সবই ভেঙে যাবে। শুহুন, আমরা আন্ডাজ সাড়ে নটার সময় বাড়ি থেকে বেরুব; আপনি তার আধঘণ্টা পরে বেরবেন, কেউ যেন জানতে না পারে। এমনকি, আমাদের যাবার কথা আপনি জানেন সে ইঙ্গিতও দেবেন না।'

'বেশ।'

আর আপনার সবচেয়ে ভাল রাইফেলটা সঙ্গে নেবেন। আমরা শুধু হাতেই যাব।' রাজি নটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া আমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। সাজগোজ করিয়া বাহির হইতে ঠিক সাড়ে নটা বাজিল।

বাগান পার হইয়া মাঠে পদার্পণ করিয়াছি এমন সময় চাপা কণ্ঠে কে ডাকিল, 'বোমকেশবাবু!'

পাশে ডাকাইয়া দেখিলাম, একটা গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া কাদীগতি আসিতেছেন। তিনি বোধহয় এতক্ষণ আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতোছিলেন, কাছে আসিয়া বলিলেন, 'যাচ্ছেন। বন্দুক নেননি দেখছি। বেশ মনে রাখবেন, যদি বাঘের ডাক শুনেতে পান, বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াবেন!'

'হ্যাঁ—মনে আছে।'

চন্দ্র অস্ত বাইতে বিলম্ব নাই, এখনি বনের আড়ালে ঢাকা পড়িলে। কাদীগতির মুহূর্ত্ত কথিত 'ছুর্গা, ছুর্গা' শুনিয়া আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম।

কূটীরে পৌছিয়া বোমকেশ পকেট হইতে টচ বাহির করিল, নান্নেমেষের অস্ত্র একবার আলিয়া ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইল। তারপর নিজে মাটির উপর উপবেশন করিয়া বলিল, 'বোসো।'

আমি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সিগারেট ধরাতে পারি ?

'পারো। তবে দেশলাইয়ের আলো হাত দিয়া আড়াল করে রেখো।'

ছুঁড়নে উকলুপে দেশলাই জ্বলাইয়া সিগারেট ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিলাম।

আধঘণ্টার পরে বাহিরে একটু শব্দ হইল। বোমকেশ ডাকিল ‘হিমাংশুবাবু আসুন।’ হিমাংশুবাবু রাইফেল লইয়া আসিয়া বসিলেন। তখন তিনজনে সেই কুঁড়ে ঘরের যেখানে বসিয়া দীর্ঘ প্রতীক্ষা আরম্ভ করিলাম, মাঝে মাঝে মুহূৰ্ত্তে ছ’একটা কথা হইতে লাগিল। হিমাংশুবাবুর কজিতে বাঁধা ঘড়ির রেডিয়ম ছাতি সময়ে সময়ে নিঃশব্দ সত্যের জ্ঞাপন করিতে লাগিল। বারোটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিটের সময়ে একটা বিকট গম্ভীর শব্দ শুনিয়া তিনজনেই লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বজ্র বাঘের স্মার্ত ডাক আগে কখনো শুনি নাই—বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। হিমাংশুবাবু চাপা গলায় বলিলেন, ‘বাঘ।’ তাহার রাইফেলে খুট করিয়া শব্দ হইল, বুঝিলাম তিনি রাইফেলে টোটা ভরিলেন। বাঘের ডাকটা বনের দিক হইতে আসিয়াছিল। হিমাংশুবাবু পা টিপিয়া টাণিয়া খোলা দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার গুড়তর দেহ-রেখা অঙ্কবাবের ভিতর অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইল। আমরা নিশ্চয়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। হিমাংশুবাবু ফিস ফিস করিয়া বলিলেন ‘কিছু দেখতে পাচ্ছি না।’

‘শব্দভেদা’—বোমকেশের স্বর যেন বাতাসে মিলাইয়া গেল।

হিমাংশুবাবু শুনেতে পারিলেন কি না জানি না, তিনি কুটিরের বাহিরে দুইপদ অগ্রসর হইয়া বন্দুক তুলিলেন।

এই সময় আবার সেই দীর্ঘ হিংস্র আওয়াজ যেন মাটি পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিল। এবার শব্দ আরো কাছে আসিয়াছে, বোধহয় পক্ষাশ গজের মধ্যে। শব্দের প্রতিধ্বনি মিলাইয়া যাইতে না যাইতে হিমাংশুবাবুর বন্দুকের নল হইতে একটা আগুনের রেখা বার্ষ্য হইল। শব্দ হইল—কড়াৎ।

সঙ্গে সঙ্গে দূরে একটা গুঁকভাব পতনের শব্দ। হিমাংশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, ‘পড়েছে। বোমকেশ বাবু টর্চ বার করুন।’

টর্চ বোমকেশের হাতেই ছিল, সে বোতাম টিপিয়া আলো জালিল; ঘর হইতে বাহির হইয়া আগে যাইতে যাইতে বলিল, ‘আসুন।’

আমরা তাহার পশ্চাতে চলিলাম। হিমাংশুবাবু বলিলেন, ‘বেশী কাছে যাবেন না; যদি শুধু জখম হয়ে থাকে—’

কিন্তু বাঘ কোথায়? বনের ঠিক কিনারায় একটা কালো কঞ্চল-ঢাকা কি যেন পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে গিয়া টর্চের পরিপূর্ণ আলো তাহার উপর ফেলিতেই হিমাংশুবাবু চীংকার করিয়া উঠিলেন, ‘একি! এ যে দেওয়ানজী।’

দেওয়ান কার্লাগতি কাত হইয়া ঘাসের উপর পড়িয়া আছেন। তাহার রক্তাক্ত নয় বন্ধ হইতে কঞ্চলটা সরিয়া গিয়াছে। চক্ষু উন্মুক্ত; মুখের একটা পাশবিক বিকৃতি তাহার অন্তিমকালের মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে। বোমকেশ ঝুঁকিয়া তাহার বুকের উপর হাত রাখিল, তাবপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ‘গতান্ন। যদি প্রেতলোক বলে কোনো দাঙ্গা থাকে তাহলে এতক্ষণে হরিনাথ মাষ্টারের সঙ্গে দেওয়ানজীর গোয়েন্দা (প্রথম)—৮

মূলকাত হয়েছে।’ তাহার মুখে বা কণ্ঠস্থের মর্মশীড়ার কোনো আভাস পাওয়া গেল না।

হিসাবের খাতা কর্তা হিমাংশুবাবু দিকে ঠেলিয়া দিয়া বোমকেশ বলিল, ‘এগুলো ভালো করে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন, ‘এক লক্ষ টাকা দেনা কেন হয়েছে।’ আমরা তিনজনে বৈঠকখানার ফরাসের উপর বলিয়াছিলাম। কালীগতির স্বভাব পর আরও অনেক দলিল বোমকেশ বাহির করিয়াছিল। হিমাংশুবাবু চম্ হইতে বিভীষিকার ছায়া তখনে সম্পূর্ণ তিমোহিত হয় নাই। তিনি করতলে চিবুক রাখিয়া বলিয়াছিলেন, বোমকেশের কথার মুখ তুলিয়া বলিলেন, ‘এখনো যেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না। ভাবতে গেলেই সব গুলিয়ে যাচ্ছে।’

বোমকেশ বলিল, ‘আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থায় গুলিয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। আমি টুকরো টুকরো প্রমাণ থেকে এই রহস্য কাহিনীর যে কাঠামো খাড়া করতে পেরেছি তা আপনাকে বলছি, শুধুন কিছু। তার আগে ওই রেজেষ্ট্রি দলিলগুলো নিন।’

‘কি এগুলো?’ বলিয়া হিমাংশুবাবু দলিলগুলি হাতে লইলেন।

বোমকেশ বলিল, ‘আপনি যে-মহাজনের কাছে তমস্ক লিখে টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেই মহাজন সেই সব তমস্ক রেজেষ্ট্রি করে কালীগতিকে বিক্রি করে। এগুলো হচ্ছে সেইসব তমস্ক আর তার বিক্রি কবাল।’

‘কালীগত এইসব তমস্ক কিনেছিলেন?’

‘হ্যাঁ, আপনারই টাকায় কিনেছিলেন; যাকে বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা।’ হিমাংশুবাবু উদ্ভাস্তভাবে দেয়ালের পানে তাকাইয়া রহিলেন। বোমকেশ বলিল, ‘ওগুলো এখন ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, কারণ কালীগতি আর আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আসবেন না। তিনি ঋণের দায়ের আপনার আন্ত জমিদারীটাই নিলাম করে নেবেন ভেবেছিলেন—আরো বছর দুই এইভাবে চালালে করতেনও তাই, কিন্তু মাঝ থেকে ঐ গালাখাপা অন্ধ পাগলা মাস্টারদা এসে সব ভুল করে দিলে।’ আমি বলিলাম, ‘না না, বোমকেশ, গোড়া থেকে বল।’

বোমকেশ ধীরভাবে একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, ‘গোড়া থেকেই বলছি, হিমাংশুবাবুর বাবা মারা যাবার পর কালীগতি যখন দেখলেন যে নূতন জমিদার বিবর পরিচালনায় উদাসীন তখন তিনি ভারি সুবিধা পেলেন, হিসাবের খাতা তিনি লেখেন, তাঁর মাথার ওপর পরীক্ষা করবার কেউ নেই—সুতরাং তিনি নির্ভয়ে কিছু টাকা তছরপ করতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে কিছুদিন চলল। কিন্তু গল্পে সুখমস্তি—ও প্রবৃত্তিটা ক্রমশঃ বেড়েই চলে। এদিকে জমিদারীর আয়-ব্যয়ের একটা বাঁধা হিসেব আছে, বেশী গরমিল হলেই ধরা পড়বার সম্ভাবনা। তিনি তখন এক যত চাল চাললেন, বড় বড় প্রজাদের সঙ্গে মোকদ্দমা বাধিয়ে দিলেন। খরচ আর বাঁধা-বাঁধির মধ্যে রইল না;

আদালতে স্ত্রী এবং স্ত্রী-বহির্ভূত ছই বকমই খরচ আছে স্ত্রীরাং গোঁজামিল দেওয়া চলে। কালীগতি চুরির খুব সন্দিগ্ধ হল।

‘প্রথমটা বোধহয় কালীগতি কেবল চুরি করবার মতলবেই ছিলেন, তার বেশী উচ্চাশা করেনি। কিন্তু হঠাৎ একদিন এক তাত্ত্বিক এসে হাজির হল—এবং আপনি প্রথমই তার বিষ নজরে পড়ে গেলেন। কালীগতি তার কাছ থেকে মন্ত্র নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কুমন্ত্রণা গ্রহণ করলেন। আমার বিশ্বাস এই কাপালিকই জমিদারী আত্মসাৎ করবার পরামর্শ কালীগতিক দিয়ে, কারণ হিসেবের খাতা থেকে দেখতে পাচ্ছি, সে আসবার পর থেকেই চুরির মাত্রা বেড়ে গেছে।

‘স্বাভাবিক লোভ ছাড়াও একটা ধর্মান্ধতার ভাব কালীগতির মধ্যে ছিল। ধর্মান্ধতা মানুষকে কত নৃশংস করে তুলতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয়। কালীগতি গুরু প্ররোচনায় স্বয়ংসিদ্ধতার সর্বনাশ করতে উদ্বৃত্ত হলেন। তিনি যে কৌশলটি বার করলেন সেটি যেমন সহজ তেমনই কার্যকর। প্রথমে আপনার টাকা চুরি করে তহবিল খালি করে দিলেন, পরে খরচের টাকা নেই এই অজুহাতে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়া হলেন, এবং শেষে মহাজনের কাছ থেকে আপনারই টাকায় সেই তমস্কর কিনে নিলেন। কালীগতি বিনা খরচে আপনার উত্তমর্ষ হয়ে দাড়ালেন। আপনি কিছুই জানতে পারলেন না।

‘এইভাবে বেশ আনন্দে দিন কাটছে, হঠাৎ একদিন কোথা থেকে হরিনাথ এসে হাজির হল। আপনি তাকে বেবির মাস্টার রাখলেন। বড় ভাল মানুষ বেচারী, ছুঁচুর দিনের মধ্যে কালীগতির ভক্ত হয়ে উঠল, কালীগতি তাকে তাত্ত্বিক ধর্ম-মহাত্মা শেখাতে লাগলেন। কালীমূর্তির এক পট হরিনাথ তাঁর কাছে থেকে এনে নিজের ঘরের দেওয়ালে ভক্তিতরে টাঙিয়ে রাখলে। কিন্তু শুধু ধর্মে তার পেট ভরে না—সে অর্থ-পাগল। বেবিকে সে যোগ বিয়োগ শেখায়, আর নিজের মনে বেবির খাতায় বড় বড় অঙ্ক কষে। কিন্তু তবু নিজের কলিত অঙ্কে সে সুখ পায় না।

‘একদিন আলমারি খুলে সে ‘হিসেবের খাতাগুলো দেখতে পেল, অঙ্কের গন্ধ পেলে সে আর স্থির থাকতে পারে না—মহা আনন্দে সে খাতাগুলো পরীক্ষা করতে আরম্ভ করে দিলে। যতই হিসেবের মধ্যে ঢুকতে লাগল, ততই দেখলে হাজার হাজার টাকার গরমিল। হরিনাথ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

‘কিন্তু এই আবিষ্কারের কথা সে কাকে বলবে? আপনার সঙ্গে তার বড় একটা দেখা হয় না, উপরন্তু আপনার সঙ্গে উপসর্গচক হয়ে দেখা করতে সে শাহস করে না। এ সবস্বায় বা সবচেয়ে স্বাভাবিক মে তাই করলে—কালীগতিক গিয়ে হিসেব গরমিলের কথা বললে।

‘কালীগতি দেখলেন—সর্বনাশ। তাঁর এতদিনের ধারাবাহিক চুরি ধরা পড়ে যায়। তিনি তখনকার মত হরিনাথকে স্তোকবাক্যে বুঝিয়ে মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যে

হরিনাথকে সরাতে হবে, এবং এই সঙ্গে ঐ খাতাগুলো। নইলে তার দুষ্কৃতির প্রমাণ থেকে যাবে : এতদিন যে সেগুলো কোনো ছুতোয় নষ্ট করে ফেলেননি এই অত্যাচারী তাকে ভীষণ নিষ্ঠুর করে তুললো।

‘এইখানে এই কাহিনীর সবচেয়ে ভয়াবহ আর রোমাঞ্চকর ঘটনার আবির্ভাব। হরিনাথকে পৃথিবী থেকে সরাতে হবে, অথচ ছুরি ছোঁবা চালানো বা বিষ-প্রয়োগ চলবে না। তবে উপায় ?

‘যে চোরাবালি থেকে আপনার জমিদারীর নামকরণ হয়েছে সেই চোরাবালির সন্ধান কালীগতি জানতেন। সম্ভবতঃ তাঁর গুরু-কাপালিকের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন ; পাখী মারতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সেই ভয়ঙ্কর চোরাবালির সন্ধান পেয়েছিলুম।

‘কালীগতি মাস্টারকে সরাবার এক সম্পূর্ণ নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন। চমৎকার উপায়। হরিনাথ মাস্টার মরবে। অথচ কেউ বুঝতে পারবে না যে সে মরেছে। তাঁর উপর সন্দেশের ছায়াপাত পর্যন্ত হবে না, বরঞ্চ খাতাগুলো অন্তর্ধানের বেশ একটা স্বাভাবিক কারণ পাওয়া যাবে।

‘গত অমাবস্তার দিন তিনি হরিনাথকে বললেন, ‘তুমি যদি মন্ত্রশিক্ত হতে চাও তো আজ রাতে ঐ কুঁড়ে ঘরে গিয়ে মন্ত্র সাধনা কর।’ হরিনাথ রাজী হল, সে বেবির খাতায় মন্ত্রটা লিখে কাগজটা ছিঁড়ে নিজে নিজেই কাছে রাখল।

‘রাতে সবাই ঘুমুলে হরিনাথ নিজের ঘর থেকে বার হল। সে সাধনা করতে যাচ্ছে, তার জামা জুতো পরার দরকার নেই, এমন কি সে চশমাটাও সঙ্গে নিলে না—কারণ অমাবস্তার রাতে চশমা থাকা না থাকা সমান।

‘কালীগতি তাকে কুটার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এলেন। আসবার সময় বলে এলেন— ‘বদি বাঘের ডাক শুনেতে পাও ভয় পেও না, পিছনের দরজা দিয়ে বালির ওপর গিয়ে দাঁড়িও ; সেখানে বাঘ যেতে পারবে না।’ হরিনাথ অপেক্ষে বসল। তারপর বধ্যাসময় বাঘের ডাক শুনেতে পেল। সে কি ভয়ঙ্কর ডাক। কালীগতি জন্তু জানোয়ারের ডাক শুনে নকল করতে পারতেন। প্রথমদিন এখানে এসেই আমরা তাঁর শেয়ালের ডাক শুনেছিলুম। ‘বাঘের ডাক শুনে অভাগা হরিনাথ ছুটে গিয়ে বালির উপর দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোরাবালির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল। একটা চীৎকার হয়ত সে করেছিল কিন্তু তাও অর্ধপথে চাপা পড়ে গেল। তার ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা ভাবলেও গা শিউবে উঠে।’ একটু চুপ করিয়া ব্যোমকেশ আবার বলিতে লাগিল, ‘কালীগতি কার্য সুসম্পন্ন করে ফিরে আসে এবং বলে সেই রাতেই হরিনাথ ঘর থেকে খাতা চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।

‘হরিনাথের অন্তর্ধানের কৈফিয়ৎ বেশ ভালই হয়েছিল কিন্তু তবু কালীগতি সন্তুষ্ট

হতে পারলেন না। কে জানে যদি কেউ সন্দেহ করে যে হরিনাথ শুধু খাতা নিয়ে পালাবে কেন? নিশ্চয় এর মধ্যে কোন গুঢ় তত্ত্ব আছে। তখন তিনি দিম্বুক থেকে ছ'হাজার টাকাও সরিয়ে ফেললেন। এই সময়ে আপনার চাবি হারিয়েছিল, স্বয়ং সন্দেহটা সহজেই কালীগতির ঘাড় থেকে নেমে গেল—সবাই ভাবলে হারানো চাবির সাহায্যে হরিনাথই টাকা চুরি করেছে। কালীগতির ডবল লাভ হল, টাকাও পেলেন, আবার হরিনাথের অপরাধও বেশ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠলো।

‘তারপর আমি আর অজিত এলুম। এই সময়ে বাড়িতে আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল যার সঙ্গে হরিনাথের অন্তর্ধানের কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা আমাদের সমাজের একটা চিরন্তন ট্রাজেডি বিধবার পদাঙ্কন, নূতন কিছুই নয়। অনাদি সরকারের বিধবা মেয়ে রাধা একটি যুত সন্তান প্রসব করে। তারা অনেক যত্ন করে কথাটা লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু শেষে আপনার জ্ঞা জানতে পারেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে এসে বলেন যে, এসব অনাচার এ বাড়িতে চলবে না, ওদের আজই বিদেয় করে দাও।—কেনন, ঠিক কি না?’

শেষের দিকে হিমাংশু বাবু বিফারিত নেত্রে বোমকেশের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, এখন একবার ঘাড় নাড়াইয়া নীরবে জানালার বাহিরে চাহিয়া বহিলেন।

বোমকেশ বলিতে লাগিল, ‘কিন্তু আপনার মনে দয়া হল, আপনি ঐ অভাগী মেয়েটাকে কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারলেন না। এই নিয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটু মনোমালিঙ্গও হয়েছিল। যা হোক, আপনি যখন বুঝলেন যে ওরা জগৎ হত্যার অপরাধী নয়, তখন রাধাকে চুপি চুপি তার মাসীর কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। পাছে আপনার আমলা বা চাকর-বাকরদের মধ্যে জানাজানি হয়, এই জন্তে নিজে গাড়ি চাপিয়ে তাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এলেন। অনাদি সরকারের ভাগ্য ভাল যে সে আপনার মত মনিব পেয়েছে; অত্যাধিকারী মালিক এতটা করত বলে আমার মনে হয় না।

‘সে যা হোক, এই ব্যাপারের সঙ্গে হরিনাথের অন্তর্ধানের ঘটনা জড়িয়ে গিয়ে সমস্তটা আমার কাছে অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছিল। তারপর অতি কষ্টে জট ছাড়ালুম; রাধাকে দেখবার জন্তে ষ্টেশনে গিয়ে লুকিয়ে বসে বইলুম। তার চেহারাটা দেখেই বুঝলুম এ ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই—তার ট্রাজেডি অত্যাধিকারী নয়। তখন আর সন্দেহ রইল না যে কালীগতিই হরিনাথকে খুন করেছেন। লোকটি কতবড় নৃশংস আর বিবেকহীন তার জলন্ত প্রমাণ পেলুম যেজেন্সি অফিসে। কিন্তু তাঁকে ধরবার উপায় নেই; যে খাতাগুলো থেকে তাঁর চুরি, অপরাধ প্রমাণ হতে পারত সেগুলো তিনি আগেই সরিয়েছেন। হয়তো পুড়িয়ে ফেলেছেন, নয়তো হরিনাথের সঙ্গে ঐ চৌরাখালিতেই ফেলে দিয়েছেন। কালীগতি প্রথমটা বেশ নিশ্চিন্তেই ছিলেন। কিন্তু যখন অজিতের মুখে শুনলেন যে হরিনাথের মৃত্যুর কথা আমি বুঝতে পেরেছি তখন

ভয় পেয়ে গেলেন। প্রথমে তিনি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, যে হরিনাথ মরেনি, প্রমাণস্বরূপ নিজেই কুঁড়ে ঘরে আগুন জেলে রেখে এসে ছপুর রাতে আমাদের দেখালেন। আমি তখন এমন ভাব দেখাতে লাগলুম যেন তাঁর কথা সত্যি হলেও হতে পারে। আমরা ঠিক করলুম রাতে গিয়ে কুঁড়ে ঘরে পাহারা দেব। তিনি রাঙা হলেন বটে কিন্তু কাউকে একথা বলতে বায়ণ করে দিলেন। আমাদের মারবার কন্দি প্রথমে কালীগতির ছিল না; তাঁর প্রথম চেষ্টা ছিল আমাদের বোঝান যে হরিনাথ বেঁচে আছে। কিন্তু যখন দেখলেন যে আমরা হরিনাথের অন্তে কুঁড়ে ঘরে গিয়ে বসে থাকতে চাই, তখন তাঁর ভয় হল যে, এইবার তাঁর সব কলাকৌশল ধরা পড়ে যাবে। কারণ হরিনাথ যে কুঁড়ে ঘরে আসতেই পারে না, একথা তাঁর চেয়ে বেশী কে জানে? তখন তিনি আমাদের চোরাবালিতে পাঠাবার সঙ্কল্প করলেন। আমিও এই স্বযোগই খুঁজছিলুম, আমাদের খুন করবার ইচ্ছাটা যাতে তাঁর পক্ষে সহজ হয় সে চেষ্টারও ক্রটি করিনি। তাত্ত্বিক এবং তত্ত্ব ধর্মকে পালাপালি দেবার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

‘পরদিন বিকেলে তিনি আমাদের কুঁড়ে ঘর দেখাতে গেলেন। সেখানে গিয়ে কথাগুলো বললেন, রাতে যদি আমরা বাঘের ডাক শুনেতে পাই, তাহলে যেন বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াই। এই হল সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত যা ঘটেছিল তার বিবরণ। তারপর যা যা ঘটেছে সবই আপনি জানেন।’ ব্যোমকেশ চুপ করিল। অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না। তারপর হিমাংশুবাবু বলিলেন, ‘আমাকে সে রাতে বাইকেল নিয়ে যেতে কেন বলেছিলেন ব্যোমকেশবাবু?’

ব্যোমকেশ কোনো উত্তর দিল না। হিমাংশুবাবু আগার প্রশ্ন করিলেন ‘আপনি জানতেন আমি বাঘের ডাক শুনে শঙ্কভেদী গুলি ছুঁড়ব?’

মুহূ হাসিয়া ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, বলিল, ‘সে প্রশ্ন নিস্পয়োজন হিমাংশুবাবু, আপনি স্মৃক হবেন না। মৃত্যুই ছিল কালীগতির একমাত্র শাস্তি। তিনি যে ফাঁসি কাঠে না ঝুলে বন্দুকের গুলিতে মরেছেন এটা তাঁর উদ্দেশ্য—আপনি নিমিত্ত মাত্র। মনে আছে, সেদিন আপনিই বলেছিলেন—a tooth for a tooth, an eye for an eye!’ এই সময় বাইরের বারান্দার সম্মুখে মোটর আসিয়া থামিল। পরক্ষণেই ব্যস্ত সমস্তভাবে কুমার জিদিব প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে একখানা খবরের কাগজ। তিনি বলিলেন, ‘হিমাংশু, এসব কি কাণ্ড। দেওয়ান কালীগতি খবরের কাগজ। তিনি বলিলেন, ‘হিমাংশু, এসব কি কাণ্ড। দেওয়ান কালীগতি বন্দুকের গুলিতে মারা গেছেন?’ বলিয়া কাগজখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘আমি কিছুই জানতাম না : ইনস্পেক্টর পড়েছিলুম তাই কদিন আসতে পারিনি। আজ কাগজ পড়ে দেখি এই ব্যাপার। ছুটতে ছুটতে এলুম। ব্যোমকেশবাবু, কি হয়েছে বলুন দেখি।’ ব্যোমকেশ উত্তর দিবার আগে কাগজখানা হাতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাতে লেখা ছিল—‘চোরাবালি নামে উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদারী হইতে একটি শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। চোরাবালির জমিদার কয়েকজন

বন্ধুর সহিত রাজিকালে নিকটবর্তী জঙ্গলে বাঘ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। বাঘের ডাক শুনিতে পাইয়া জমিদার হিমাংশুবাবু বন্দুক ফায়ার করেন। কিন্তু মৃতদেহের নিকট গিয়া দেখিলেন যে বাঘের পরিবর্তে জমিদারীর পুরাতন দেওয়ান কালীগতি ভট্টাচার্য গুলির আঘাতে মরিয়া পড়িয়া আছে। বৃদ্ধ দেওয়ান এই গভীর রাতে জঙ্গলের মধ্যে কেন গিয়াছিলেন এ রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারিতেছে না। জমিদার হিমাংশু বাবু দেওয়ানের মৃত্যুতে বড়ই মর্মান্বিত হইয়াছেন, পুলিশ তদন্ত দ্বারা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে এই দুর্ঘটনার জন্ত হিমাংশুবাবু কোন অংশে দায়ী নহেন—তিনি ষথোচিত অবলম্বন করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিলেন।

কাগজখানা রাখিয়া দিয়া বোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। আলস্ত ভাঙ্গিয়া কুমার জিদিকে বলিল, ‘চলুন, এবার আপনার রাজ্যে ফেরা যাক, এখানকার কাজ আমার হয়েছে। পথে যেতে যেতে কালীগতির শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী আপনাকে শোনাও।’

*

*

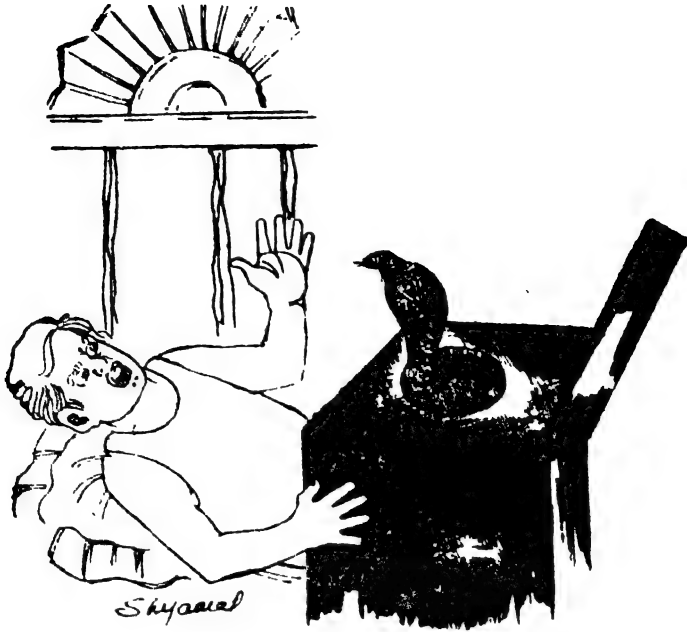
*

॥ শরদ্দিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বাংলা ডিটেক্টিভ গল্প ও রহস্য গল্পের ক্ষেত্রে শরদ্দিন্দুবাবু হুমকি অসাধারণ। এই সংকলনের অন্তর্গত “চোরাবালি” গল্পটি তাঁর বিশিষ্ট উদাহরণ। এই লেখকের ‘জাতিস্মরণ’, ‘চুয়াচন্দন’, ‘বামেদাং’ প্রভৃতি গল্প সংগ্রহ এবং ‘বন্ধু’, ‘ডিটেক্টিভ’ উল্লেখযোগ্য। অতিপ্রাকৃত এবং গোয়েন্দা গল্প রচনায় শরদ্দিন্দু বাবু এক অন্তর্গত স্বাদ-বৈচিত্র্য এনেছেন। তাঁর অতিপ্রাকৃত রসপ্রধান গল্প সংকলন ‘কল্পকুহেলী’, বাংলা অতিপ্রাকৃত গল্পের ক্ষেত্রে স্বকীয় মহাদায় ভান্বর। তাঁর ‘বোমকেশ’ এবং বরদা অপূর্ব সৃষ্টি। শরদ্দিন্দুবাবু ১৯২২ সালে একালতী ছেড়ে সম্পূর্ণ সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন ও ১৯৩৮ সালে বোম্বাই থেকে হিমাংশু রায়ের আহ্বানে ‘সিনারিও’ লেখার কাজে সেখানে যান। ১৯১২ সালে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পুনরায় পুণায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন ও সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন। বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে শরদ্দিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেহভাজী ভাবে প্রথম লেখক যিনি সাহিত্যিক রসবিচারে উন্নতমানের গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে প্রয়াসী ও সক্ষম হন। এই শক্তিশ্বর লেখক ৩০শে মার্চ ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সালে পরলোক গমন করেন।

*

*

*



হরবিলাসের মৃত্যু রহস্য

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে ! এ মৃত্যু স্বপ্নের অথবা হৃৎস্বের, তাহার বিচার নীতিবিদেরা করিবেন । একদল নীতিবিদ বলিবেন, যে পাষণ্ড পর-স্বামী হরণ করিয়া কেবল টাকাব ঘোরে সমাজের বুকে এতদিন বসিয়া তাহার দাড়ি উপড়াইতেছিল, তার মৃত্যুতে ভূ-ভার লাঘবীকৃত হইয়াছে । আর একদল বলিবেন (ইহারাও নীতিবিদ) যে, আইনতঃ ললিতা হয়তো পর-স্বামী ছিল, কিন্তু ধর্মতঃ হরবিলাসই তাঁহার স্বামী, কারণ ললিতা যতদিন জীবিত ছিল, হরবিলাস নিখুঁত নিষ্ঠার সহিত স্বামীর সমস্ত কর্তব্য পালন করিয়াছে । আইনতঃ যিনি ললিতার স্বামী ছিলেন তিনি ছিলেন একটি মনুষ্যরূপী দানব । ললিতার পিঠের উপর তাঁহার কত ভোড়া জুতা যে চিঁড়িয়াছে, তাহার হিসাব কেহ রাখে নাই ; রাখিলে তাহা নিঃসন্দেহে ভবলোকমাত্রেয়ই চিত্তে বিশ্বয়, আতঙ্ক ও মহান্নভূতির উদ্রেক করিত । মোটকথা ললিতার স্বামী বক্তব্য বক্সী অত্যন্ত ক্রোধী, ক্রুর ও নিচমনা ব্যক্তি ছিলেন । উহার কবল হইতে ললিতাকে উদ্ধার করিয়া হরবিলাস সংসাহসেই পরিচয় দিয়াছেন । তাঁহার এই সংকল্পের অন্ত কেহই তাঁহাকে বাহবা দেন নাই, আত্মীবন তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে একঘরে হইয়া বাস

কমিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁর কর্মটি যে একটি অসাধারণ বকম সংকর্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজ-সংস্কারের জন্য হরবিলাসের মতো সাহসী লোকেরই তো প্রয়োজন। এরূপ লোকের তিরোভাব নিতান্তই দুঃখের।

হরবিলাসের একমাত্র বন্ধু সিদ্ধেশ্বর কিন্তু এসব লইয়া মাথা ঘামাইতেছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল, হরবিলাসের মৃত্যুর কারণ কি। লোকটা কাল রাত্রি দশটা পর্যন্ত সুস্থ ছিল, খোসমেজাজে কতবকম গল্প করিল, সহসা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কি হইল। অশ্রুপের কোনও লক্ষণ তো তাহার মধ্যে সে লক্ষ্য করে নাই। ব্যাপারটা বেশ একটু রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। বিশেষতঃ হরবিলাসের একটি কথা মনে হওয়াতে সিদ্ধেশ্বরের ধারণা হইল যে এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। হরবিলাস কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে একদিন বলিয়াছেন : “ললিতাকে নিয়ে যখন এখানে চলে আসি, তার কিছুদিন পরে বকেশ্বরবাবু আমাকে একটা চিঠি লেখেন। কি লিখেছিলেন জান? লিখেছিলেন,—এর প্রণিশাপ আমি নেবই। জীবন দিয়ে আপনাকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দূরে পালিয়ে গিয়ে নিস্তার পাবেন না। আদালতে নালিশ করে ললিতাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি। কিন্তু ও কুলটার মুখ-দর্শন করবার ইচ্ছে নেই। ওকেও আমি শাস্ত দেব, দেখে নেবেন।”

হরবিলাসের স্নান হামিটা সিদ্ধেশ্বরের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। তাঁত স্নান হামি সহসা তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যুটাও ঠিক স্বাভাবিক ভাবে হয় নাই। কে একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া কি একটা প্রসাদ তাহাকে সহস্রে খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সেইদিনই কলেব্রা হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। সত্যিই কি তাহার কলেব্রা হইয়াছিল? সেই সন্ন্যাসী যে বকেশ্বরের চর নয়, তাহাও তো নিশ্চয় কাঁধে বলা যায় না। হয়তো প্রসাদের সহিত বিষ ছিল……

বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে সিদ্ধেশ্বর শোকাবুল হইয়াছিল, এসব কথা চিন্তা করিয়া একটু উত্তেজিত হইল। তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও তদন্ত করিবার কথা কাহারও মনে হয় নাই। কিন্তু হরবিলাসের এই রহস্যময় মৃত্যুতে যখন তাহার মনে খটকা লাগিয়াছে তখন তদন্ত না করিয়া সে ছাড়াবে না। হরবিলাসের আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই। তাহাকেই সব করিতে হইবে। উত্তেজনাভরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। যে ভৃত্যটি হরবিলাসের মৃত্যু সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিল : “তুই যা আমি আসছি এখনি। বাড়িতে আর কোনও লোক যেন না ঢোকে। বুঝলি?”

ভৃত্য সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। একটু পরে সিদ্ধেশ্বরও বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই গেল খানায়।

শব-বাবাচ্ছেদ করিয়া বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। হৃদযন্ত্র বিকল হইয়া হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই ডাক্তারদের অভিমত হইল। হরবিলাসের হৃদযন্ত্র

যে দুর্বল ছিল, তাহা আর একজন ডাক্তারও বলিয়াছিল। ইহা লইয়া হরবিলাসের খুঁতখুঁতানিবও অস্ত ছিল না। সামান্য একটু কিছু হইলেই তাহার বুক খড়খড় করিত। কিন্তু এতদিন তো ওই হৃদযন্ত্র লইয়াই সে বেশ বাঁচিয়াছিল। সহসা এমন কি হইল...। খানার দারোগা হরবিলাসের যত্নে সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। সিদ্ধেশ্বরের কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না। সে বাড়ির চাকরটাকে প্রহর করিতে লাগিল।

“ভূই প্রথমে কি করে টের পেলি যে বাবু মারা গেছেন :

“বাবু বোজ ভোরে ওঠেন, কিন্তু সেদিন যখন বেলা দশটা পর্যন্ত উঠলেন না, ডাকাডাকি করেও নাড়া পেলাম না, তখন জানলার সেই কোকরটা দিয়ে উঁকি মেয়ে দেখলাম...”

“ও—”

কোকরটার ইতিহাস সিদ্ধেশ্বরের মনে পড়িয়া গেল। হরবিলাসের দেশ হইতে একজন ঘুর সম্পর্কের আত্মীয় আসিয়াছিলেন। হরবিলাস তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি যখন আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন তখন তাঁহাকে বাড়িতে স্থান দিতে হইল।

ভ্রমলোক ব্যবসায়-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, হরবিলাসের বাড়িতে দিন সাতেক ছিলেন, সেই সময় তিনি নাকি লক্ষ্য করেন যে ঘুমের ঘোরে হরবিলাস প্রত্যহ গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করে, মনে হয় যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হরবিলাসের ব্যাপারটা তত গ্রাহ্যের মতো আনেন নাই, ভ্রমলোক কিন্তু ইহাতে খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন ডাক্তারই ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধেশ্বরের এখনও মনে আছে। একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন : নৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এখানে। ইনি পশ্চিমে প্রাকটিশ করেন, এখানে একজন মাড়োয়ারী বোগীর কল পেয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল, তাই এঁকে ডেকে নিয়ে এলাম। ভূমি একবার বুকটা দেখাও তো এঁকে। রাত্রে ঘুমের ঘোরে যে রকম কর, ভয় হয়,—”

ডাক্তার ঘোষ হরবিলাসের বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন : “আপনার হার্ট খারাপ তাই শাস কষ্ট হয়।”

হরবিলাস বলিল : “আমি তো তেমন টের পাই না।”

“আর কিছুদিন পরে পাবেন।”

“কি করব তাহলে ?”

“মাথার কাছে জানলাটা খুলে শোবেন। সাত হাওয়া দরকার—”

“ও বাবা, আমি তাঁতু মাল্লব, তা পারব না মশাই।”

“আনলা সবটা খুলতে না পারেন, ছোট একটা কোকর করিয়ে নিন আনলায়। বাইরের অক্সিজেন ঘরে খানিকটা ঢুকলেই হল।”

হরবিলাস চূপ করিয়াছিল।

আত্মীয়টি বলিলেন, “আচ্ছা, সে আমি করিয়ে দিয়ে তবে যাব।”

হরবিলাসের মাথার শিয়রের আনলায় গোল ছিদ্রটি তিনিই করাইয়া দিয়াছিলেন। পরদিন নিজে গিয়া মিত্রা ডাকিয়া ছিদ্রটি করাইয়া তবে তিনি অস্ত্র কাছ করেন। তাহার পর বেশীদিন তিনি ছিলেনও না।

সিদ্ধেশ্বর জু কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল। ওই ছিদ্রপথেই মৃত্যু আসে নাই তো! কিন্তু কিরূপে?

“আচ্ছা, হরবিলাসের সেই আত্মীয়টি চলে যাবার পর আর কেউ কি এসেছিল?”

“আজ্ঞে না, তবে সেদিন একটি পাঞ্জাবী জ্যোতিষী এসেছিল।”

“পাঞ্জাবী জ্যোতিষী? কবে?”

“দিন পনের আগে।”

“কি বলল সে?”

“তাতে জানিনে বাবু। তবে অনেকক্ষণ ছিল।”

সিদ্ধেশ্বর জু-কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাসের মৃত্যু-বহুস্তের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে হরবিলাস একটি উইল করিয়াছিল। উইলে ছিল যে, মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হইবে। ‘ললিত বৃত্তি’ নাম দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নারী শিক্ষা-প্রসারের জন্য উক্ত টাকার সুদ হইতে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করবেন। তাহার মৃত্যুর পর সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে সিদ্ধেশ্বরই তাহার বিষয় প্রভৃতি বিক্রয়ের ভার লইবেন। সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত না থাকেন, গবর্ণমেন্টের উপর এই ভার অপিত হইবে।

বিষয় সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের খাতাপত্র দেখিতেছিল। সহস্র কতকগুলি ডায়েরি তাহার হাতে পড়িল। হরবিলাস যে এমন নিয়মিতভাবে ডায়েরি লিখিত, তাহা সিদ্ধেশ্বরের জানা ছিল না। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত হরবিলাস ডায়েরি লিখিয়া গিয়াছে।

ডায়েরির পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে একস্থানে সিদ্ধেশ্বরের দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। একস্থানে লেখা ছিল : আজ একজন পাঞ্জাবী জ্যোতিষী আসিয়াছিল। সে আমার হাতের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল—“আপনাকে যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রাগ করিবেন না তো?”

বলিলাম, “না রাগ করিব কেন, কি জানতে চান বলুন?”

সে বলিল, “আপনি কি কখনও পর-স্ত্রী হরণ করিয়াছিলেন?”

আমি প্রথমটা অবাক হইয়া গেলাম, তাহার পর মনে হইল এ খবর, কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। বলিলাম, “ধরুন যদি কবিতাই থাকি।”

জ্যোতিষী বলিল, “তাহা হইলে একটি বিষয়ে আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। সর্পাঘাতে আপনাব মৃত্যু হইবে। এখন স্থানে কখনও যাইবেন না, যেখানে সাপ থাকিতে পারে।”

এই কথাগুলি বলিয়া জ্যোতিষী চলিয়া গেল।

জ্যোতিষীর কথাটা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ললিতার ব্যাপারটা সে আমার হস্তরেখা হইতেই নির্ণয় করিয়াছে তাহা হইলে তাহার ক্রমতা আছে স্বীকার করতে হইবে। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ বাণীটি তুচ্ছ করিবার মতো নয়, সাবধানে থাকা উচিত। সাবধানে আছি, বাড়ি হইতে পারতপক্ষে কখনও বাহির হই না। নিজের ঘরটিতেই বসিয়া থাকি। কাল কিছু কার্বলিক এসিড আনাইব। শুনিয়াছি ঘরের চারিদিকে কার্বলিক লোশন ছিটাইলে সাপ আসে না।

সিদ্ধেশ্বর ডায়েরির পাতাটির দিকে চাহিয়া চূপ করিয়া রহিল। হরবিলাস কিছুদিন পূর্বে কার্বলিক এসিড আনাইয়া ঘরের চতুর্দিকে ছিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহা সিদ্ধেশ্বর জানিত। সহসা তাহার এ খেয়াল হইল কেন, জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল, কিন্তু কোনও উত্তর পায় নাই। হরবিলাস একটু হাসিয়াছিল মাত্র। সিদ্ধেশ্বর ভাবিতে লাগিল, জানলার ওই দ্বিত্রপথে সত্যিই কি সাপ ঢুকিয়াছিল? সর্পাঘাতে যদি তাহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে শব-বাবছেদের সময় কি তাহা ধরা পড়িত না? সিদ্ধেশ্বর ডাইরি বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল। যিনি শব-বাবছেদ করিয়াছিলেন, শোজা তাহার কাছে চলিয়া গেল।

“আচ্ছা ডাক্তারবাবু, হরবিলাসের যদি সর্পাঘাতে মৃত্যু হত, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন আপনি?”

“তা পারতাম বই কি। হঠাৎ একথা মনে হচ্ছে কেন এতদিন পরে?”

“না, এমন—”

সিদ্ধেশ্বর ব্যাপারটা ডাক্তারবাবুর কাছে ভাঙিল না।

“হার্ট ফেল করে মারা গেছেন শুভলোক, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর ও নিরে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভই বা কি।”

“তা বটে।”

একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া সিদ্ধেশ্বর চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহার মনে একটা খটকা লাগিয়াই রহিল।

মাস খানেক পরে।

হরবিলাসের বসন্তবাটি বিক্রয় করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বর তাহার চৌহদ্দিটি মাণিতেছিল

সেই সময় এক জিনিস তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জিনিসটি কিছুই নয়, একটি বড় কার্ডবোর্ডের বাস্ক। হরবিলাস যে ঘরে গুহিত সেই ঘরের পাশেই একটি ষোপের ভিতর বাস্কটি পড়িয়াছিল। খালি বাস্ক ভিতরে কিছুই নাট। তবে বাস্কের উপর একটা নম্বর এবং একটা দোকানের ঠিকানা লেখা ছিল। যোদে জলে অম্পট হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু পড়া বাইতেছিল। কি মনে করিয়া সিদ্ধেশ্বর বাস্কটি তুলিয়া লইল।

কি ছিল এ বাস্ক? নানারূপ আন্দাজ করিতে করিতে অবশেষে তাহার মনে হইল, বাস্কের গায়ে যে ঠিকানাটা লেখা আছে, বাস্কটা সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া যদি দেখা যায় যে, এট বাস্ক যাহা ছিল, ঠিক তেমনি একটি জিনিস ভি. পি. করিয়া আমার নামে পাঠাইয়া দিন, তাহা হইলে কি হয়? হয় তো কিছুই হইবে না। কিংবা হয় তো একটা পেন্সি বা কয়েক জোড়া মোজা বা ওই ধরনের কিছু একটা আসিয়াও পড়িতে পারে। দেখাই বাকি না কি হয়।...

সিদ্ধেশ্বর বাস্কটি পাক করিয়া এবং উপরোক্ত মর্মে একটি পত্রও তাহার ভিতর দিয়া সেটি পাঠাইয়া দিল। কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই সে যে এ কার্য করিল, তাহা নয় কেমন যেন নিখুঁত ভাবে তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এ বাস্কটির সহিত হয়তো হরবিলাসের মৃত্যুর কোনও সংশ্রব আছে।

দিন দশেক পর সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের বাড়িতে বসিয়া জিনিসপত্রের একটা কড় করিতেছিল। সমুখের দেওয়ালে টাঙানো ছিল ললিতার একখানি ছবি। পিণ্ডন আসিয়া প্রবেশ করিল।

“আপনার নামে একটা ভি. পি. আছে বাবু।”

“ভি. পি.? ক’টা কার?”

“দশ টাকা পনের আনা।”

সিদ্ধেশ্বর সবিস্ময়ে দেখিল সেই দোকান হইতেই ভি. পি. আসিয়াছে। ভি. পি. ছাড়াইয়া লইল। পিণ্ডন চলিয়া বাইবার পর সহর্ষে স্বগতোক্তি করিল: “দেখা যাক কি এসেছে।” অবিকল সেই বকম কার্ডবোর্ডের বাস্ক। বাস্ক খুলিয়া কিন্তু সিদ্ধেশ্বর লাফাইয়া উঠিল। বাস্কের ভিতর একটা সাপ রহিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ঘরের কোণে যে লাঠিটা ছিল সেই লাঠিটা আনিয়া দূর হইতে সাপটাকে স্পর্শ করিল। সাপ নড়িল না তখন সাহস করিয়া খোঁচা দিল একটা। খোঁচা দিতেই সাপটা আঁকিয়া বাঁকিয়া বাস্ক হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সাপটা যে রবারের এবং প্ৰিং—এবং একটা কারসাজি, তাহা বুঝিতে সিদ্ধেশ্বরের দেরি হয় নাই। তবু সে সাপটার দিকে সভয়ে চাহিয়া রহিল। অবিকল একটা গোকুরা।

নিমেষের মধ্যে হরবিলাসের মৃত্যুর রহস্যটা তাহার কাছে যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। হরবিলাসের সেই জ্যোতিষী সকলেই বক্তৃতা বকসীর লোক। সহসা একটা

শবে সিঁহের চমকাইয়া উঠিল। ঝাড় ফিরাইয়া দেখিল, ললিতার ছবিখানা মেঝেতে পড়িয়া চুবমার হইয়া গিয়াছে।

*

*

*

*

বনকুল (ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) : বনকুলের জন্ম বিহারের মনিহার গ্রামে, ১৮৯২ সালে। সাহিত্যের হাতে ঝড়ি তিনি কবিতা লিখেই শুরু করেছিলেন। প্রথম কবিতা ছাপা হইয়াছিল তাঁর কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত সম্পাদিত ‘মালক পত্রিকাতে’।

পরবর্তীকালে তিনি অসংখ্য উপন্যাস, পাঁচ-ছশো গল্প, শ’ দেড়েক প্রবন্ধ ও পনের কুড়িটার মত নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য সাধনায় ত্রতী হলেও, পেশায় তিনি ছিলেন ডাক্তার।

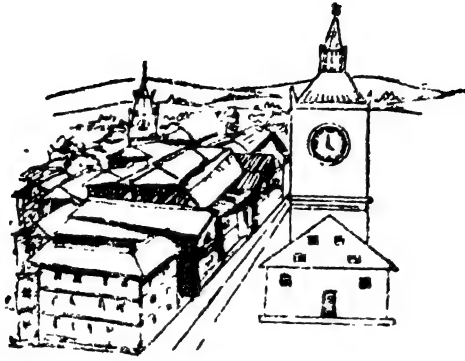
বিষয় বস্তুর অভিনবত্ব, ভাষার প্রাঞ্জল্য ও গল্প কথনের অসাধারণ দক্ষতা ববীন্দ্রোত্তর কালের বাঙলা ছোট গল্প তাঁকে অনন্ততা দান করেছে। বাঙলা ছোট গল্প তাঁর হাতের বাহুস্পর্শে ছোট বাধা ও ছোট কথার সার্থক রূপে ফুটে উঠেছে।

*

*

*

*



পরশর বর্মা ও ভাঙ্গা রেডিও

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কেন যে এমন ভুল করে ছিলাম ।

এসে অর্ধি এই ক'দিন ধরেই আফসোস করছি ।

এসেছি সেই শুক্রবার । আজ পরের শনিবার । এই আট দিনেই মন মেজাজ
বিগড়ে গেছে । এখন যেন পালাতে পারলেও বাঁচি ।

কিন্তু তার কি জো আছে ?

পরশরের খপ্পরে একবার পড়ল অহুন্নয় বিনয় চোখ রাঙানি—কিছুতেই কিছু কল
হবার নয় ।

সেকি ! এইতো সবে এল—এই তার ঝুলি । এমন মজার দিন কাটানো ছেড়ে
কেউ যে চলে যেতে চাইতে পারে, এ যেন তার বিশ্বাসই হয় না । বলে বোম্বাই শহর
কি দুদিনে দেখে সাঝা যায় ।

বোম্বাই আমি ঢের দেখেছি ।—একটু বিয়ক্তির সঙ্গেই আমি বলি হয়তো : তোমার
সঙ্গেই তো এই সে, বড় বোম্বাই চষে বেড়াতে হয়েছে সেই সাংঘাতিক শিশির
ব্যাপারে । বোম্বাই—এ আর আমার দেখবার আছে কি ।

আছে, আছে।—পরশর হেসে আশ্বাস দেয়, বোঝাই নিভানতুন। হরবোজ এখানে নতুন খেল হচ্ছে। তা না হলে তোমায় ট্রান্সফার করে আনাই। আর ক'টা দিন একটু মজা করো না, দুজনে একসঙ্গেই ফিরে যাব।

না—এবার শক্ত হয়ে বলি, তোমার সঙ্গে ফেব্রুয়ারী সৌভাগ্য আর আমার দরকার নেই। তুমি নতুন যে সব ইয়ার বন্ধু জুটিয়েছ, তাদের নিয়ে আর তোমার ভাড়া রেডিওর গান শুনেই যতদিন পারো কাটাও, আমি আজই রওনা হচ্ছি।

মুখে শাসালেও সেদিনই রওনা হওয়া সম্ভব হয়নি। পরশরের পিড়াপিড়িতে রবিবারটা থেকে যেতে হয়েছে। সে আশ্বাস দিয়েছে, সোমবারের পর আর আমার কিছুতেই ধরে রাখবে না।

সোমবার পর্যন্ত কি স্থখে যে সে থাকতে চাচ্ছে তা আমার বোকার ক্ষমতা নেই। ওর ভাড়া রেডিওটা অবশ্য সেদিন কেবলত আনবার কথা মেসামতের দোকান থেকে। দিয়েছে আজ—মাত্র শনিবার দুপুরে। রবিবার ছুটির দিন বাদ দিয়ে সোমবার সারানো অবস্থায় তা যে কেবলত পাওয়া অসম্ভব, তা তাকে বুঝাই বোঝাবার চেষ্টা করেছি। কি কামেরার মতো যন্ত্রণাতি যে একবার মেসামতের অস্ত্র গেলে তার তেরো মাসে বছর হয়ে দাঁড়ায়, সে অভিজ্ঞতা বোধহয় পরশরের নেই

আর ওই অথাত্ত ভাড়া রেডিও কি একদিনে সারাবার।

এসে অবধি সবচেয়ে জ্বালাতন করে মেবেছে ওইটাই। মেসামতের অস্ত্র না দিয়ে ওটাকে কোলাবা-র 'কজওয়ে' থেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিতে পারলে আমি খুলি হতাম। বোম্বে পৌছোবার পর প্রথম হোটেলে ঢুকে পরশরের আঠারো নম্বর ঘরের সামনের করিডরে গিয়ে দাঁড়ানোর পর থেকেই ওই রেডিওতে কান ঝালাপালা।

ওইটাই যে পরশরের কামরা বিশ্বাস করতেই পারিনি।

সঙ্গে হোটেলের খানসামা এসেছিল, সে ঘরটা দেখিয়েই চলে গেছে।

ভুল করেছি কিনা বুঝতে না পেরে দোমনা হয়ে দরজায় মূহু করাঘাত করেছি প্রথমে। তাতে কোন ফল হয়নি। না হবারই কথা। দরজা ভেদ করেও ককশ নিনাদ আসছে তা ছাপিয়ে কিছু শোনা যায়।

একটু জোরেই তাই বার কয়েক ঝা দিতে হয়েছে দরজায়।

দরজা খুললে স্বয়ং পরশরই এসে দাঁড়িয়েছে সহাস্ত বদনে।

এসো এসো। তোমার অন্তে কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি। ট্রেন তোমার লেট ছিল বোধ হয়?

তা—ছিল।—আমি ঠিক প্রসন্ন মুখে বলতে পারিনি। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে রিটার্ন টিকিট কেটে ফিরে যাওয়াই বোধ হয় উচিত ছিল। ওটা কি যন্ত্রণার ব্যবস্থা করেছ?

পরশরের পিছপিছ তখন তার হোটেলের কামরার ভিতর গিয়ে ঢুকেছি নেহাৎ

অপ্রাপ্ত নয়। তুমিও বয়স্ক বয়স্ক নও। আমিও বয়স্ক বয়স্ক নই।

ঘরের গান শুনে পলাশর প্রথম যেন আমার অভিযোগের ছেতুটা বুঝতেই পারেনি।

আজি হয়ে বসেছে, এখন কিদের ?

কিদের যজ্ঞবা বুঝতে পারছি না।—সুতরাং আর ফোর্সিও বাগতা একটা সোকার ওপর বেগে ঘরের কোণের বেড়িঘটার দিকে আঙুল দাঁপিছে বলেছি, এটা কি

ওঃ ওই বেড়িঘটা ? পলাশর বাপারটাকে কোন গুরুত্ব না দিয়েই বলেছে, আশ্রয়ভাটা একটা কনক বেগে ।

একটু বেগেও ! শুধু বয়স্কের দমন নয়, বেছাড়া বেড়িঘর থেকে থেকে দলুমে ওঠা বিদ্যুতে আশ্রয় ভাষণে যাশর ভগ্নে গলা চড়িয়ে বলেছে, স্বপ্ন ব্রহ্মস্বরও ও-আশ্রয়ভ ভুলে লজ্জা পাবে। বেড়িঘটা দয়া করে বাপের চাঞ্চল ঘটা ট্রেনে কাটিয়ে এসে আর অশান্তিতে কদমে শব্দ না।

বলছি যখন মন বন্ধ করে দিচ্ছি। পলাশর যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বেড়িঘটা তখনকার মন বন্ধ করে দিতে চলে।

একটা শব্দ পড়ে বলেছে, যা র ডলিট যোগাড় করলে কোথায় ?

যোগাড় করে মাধ্যমিক বসেছে কিনলাম। পলাশর একটু যেন ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছে

তুমি বোম্বাই এখানে র ডলিট কনলে ? আমি তাচ্ছব, আর এই রেডিও। আহা রেডিওটা এমন কি বাগাব। পলাশর নিজের সওদার হয়ে শুকালিতি করেছে, একটু মাঝে মাঝে বাগড়ে যায়। কিন্তু গানগুলো বুঝতে তো কষ্ট হয় না। বোম্বাই কিন্নোর গান শোনারবার ভগ্নেই তো নট কনলাম।

বোম্বাই কিন্নোর গান শোনারবার ভগ্নেই বেড়িও কিনলে। আমি তার দিকে চেয়ে হতভম্ব হয়ে বলেছি। তুমি কি বপানকার কিন্নোর গান লিখবে না ক ?

না না, সব ভগ্ন। পলাশর যেন নিজের অকমতোয় হুঃখিত হয়েছে, কিন্তু মাঝে মাঝে খুব অকৃত্রিম আচরণ পাওয়া যায়।

এবার আমার মনে দিয়ে অরকবা সরে নি।

শুধু বেড়িও বলেছে হয়ে ও বন্ধ ছিল।

পলাশর স্তবোধ পলেই যখন সেটা চালিয়ে দেয়, আমিও দ্বারে কাছে থাকলে তেমনি বন্ধ করে দিই ততক্ষণ।

আমার অনুপস্থিতিতে একলা থাকলে পলাশর যে বেগবোরা হয়ে প্রাণ হয়ে সে-বেড়িও চালায়, আমার ছুঁ মিন বাসেই তার প্রমাণ পেলাম।

আমাদের ঠিক পার্শ্বের কামরায় সেদিন সকালে নতুন একটি প্রৌঢ় দম্পতি ঢুকেছিলেন। দু'বে আমায় একটি নিজের কাজে বেরিয়েছিলাম। বিকেলে ফিরে এসে গোয়েন্দা (প্রথম) — ৯

দেখি তাঁরা এ কামরা ছেড়ে দূরের একটি কামরায় চলে যাচ্ছেন।

বাণেশ্বর তখন তেমন কিছু গুরুত্ব দিইনি।

কামরা বদলের বহুতর ইঞ্জিত পেলাম সন্ধ্যার পর। তখন পরাশরের ঘরে এ কদিন ধরে যা দেখেছি, সেই একই নিয়মিত তাসের আড্ডা বনোছে।

স্বয়ং মানেজারই অভ্যস্ত বিনীতভাবে অসুখাত নিয়ে ঘরে ঢুকে পরাশরকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে কি বললেন।

মানেজার চলে যাবার পর পরাশর যে রকম মুখ করে তাসের আসরে ফিরে এল, তা কারুর দৃষ্টি এড়াবার নয়।

এ আসরে মধ্যমণি মনুভাই তাঁর সুবিশাল পা ছুলিয়ে হেসে উঠে আধা হিন্দী আধা ইংরেজি বললেন, কি, বাণেশ্বর কি ভাষাসব। খোদ মানেজার এনে কানে কানে কথা বলে যাচ্ছে। খুব বড় গোছের শিকার বোধহয়।

উঁহ, শিকার হয়তো বড় গোছেরই ছিল। কিন্তু ফসকেছে। পাকানো দড়ির মত চেহারা জাহ্নমল বললে কাঁসির মত ঘ্যান ঘেনে গলায়, ভাষাশাহের মূখের চেহারা দেখছ না।

পরাশরই এবার বিরক্তির সঙ্গে কাঁকালো গলায় বললে, না, এ হোটেলের আর থাকব না।

সে কি। আসরের সবচেয়ে গম্ভীর মানুষ ভাবনানী এবার তাসের টেবিল থেকে চোখ তুললেন সরিয়ে, এ হোটেল ছাড়বেন কেন?

ছাড়ব না।—পরাশর পরম,—আমার এই রেডিও নিয়ে না কি নালিশ উঠছে। কারা না কি পাশের কামরা বদল করে চলে গেছে আমার রেডিওর জায়গায়। নিজের ঘরে আমি রেডিও বাজাতে পারব না।

এবার সবাই হেসে উঠল।

মনুভাই বললেন, কিছু যদি মনে না করো তো বলি ভাষাসব। আপনার পাশের কামরায় আমিও পারত পক্ষে থাকতে রাজি নই। এ করিডরে আসতে যেতে দু' একবার বা কানে গেছে তাতেই আসপিপিরিন দরকার হয়েছে মাথা ধরা সাবাতো।

আর একবার হাসি বোল গুঠবার পর ভাবনানী বললে, তা আপনার রেডিওটার কি গলদ হয়েছে দেখিয়ে নিলেই তো পারেন।

আচ্ছা তাই দেখাবো। পরাশর নিতান্ত অনিচ্ছায় প্রস্তাবটা মেনে নিলেও কিন্তু শান্ত হল না। জোর দিয়ে বললে, তবু এ হোটেল ছাড়তেই হবে।

কেন? কেন?—এবার হাসির বরলে সকলের বিস্মিত প্রশ্ন।

কেন।—পরাশর পকেট থেকে একটা কাগজ টেবিলের ওপর রেখে বললে, দেখুন দিকি এটা কি?

জাহ্নমলই সেটা প্রথম তুলে নিয়ে একটু পরীক্ষা করে বললে, আরে, এটা তো

বিলেতেব এক পাউণ্ডের নোট !

হ্যাঁ—পরশর স্বীকার করে আবার খান্না হয়ে উঠল, ম্যানেজার বলে কিনা আমি এ হস্তার চাক চুকিয়ে দেবার সময় এই নোটটা দিয়েছি। পাঁচ টাকার বদলে এক পাউণ্ডের নোট দেব, আমি কি এমন আহ্নক। এর ভিতর কোথাও একটা কারসাজি আছে।

পরশরের দিকে একটু চিন্তিত ভাবে চেয়ে জাভেরাই প্রথম জিজ্ঞাসা করলে, কি কারসাজি থাকতে পারে মনে করেন ?

সেইটে ঠিক বুঝতে পারছি না।—পরশর একটু বিব্রত ভাবে জানালে, কিন্তু তা না থাকলে আমার ঘাড়েই এটা চাপাবার চেষ্টা কেন ? ম্যানেজার বলে যে ক্যাসিয়ার তখন ছিল না বলে হোটেল-ক্লার্ক আমার দেওয়া টাকাটা নিয়ে একটা খামে আলাদা করে রেখেছিল। সেইখানেই ওটা পাওয়া গেছে।

আশ্চর্য। মমুভাই নোটটা জাস্তমলের হাত থেকে নিয়ে একটু উণ্টে-পাল্টে বললেন, আচ্ছা, আপনার কোন ভুল হয়নি তো ? আপনার কাছে এ ধরনের নোট আছে ?

আমার কাছে।—পরশর যেন একটু খতমত খেয়ে বললে, আমার কাছে এ ধরনের নোট থাকবে কোথা থেকে ? আর থাকলে এ নোট বেশি দামে বিক্রি না করে আমি পাঁচ টাকার নোটের বদলে দিই ?

ঠিক। ঠিক ! মমুভাই হাসলেন, কিন্তু এ নিয়ে এত ঘাবড়াবার কি আছে। আপনি কিছু বিদেশী টাকার চোরাই কারবারও করেন না, আর ম্যানেজারও এই একটা নোটের জন্তে আপনার নামে পুলিশে খবর দিচ্ছে না। আসুন, খেলতে বসুন। এ হোটেল ছেড়ে যাবেন কোথায় ?

বাওয়াটা মমুভাই জাস্তমল বা জাভেরাই পক্ষে অবশ্য বাস্তবীয় হওয়া উচিত।

তাসখেলা আমি বুঝি না। পরশরের কামবায় যে খেলা, তা তো আরো জটিল। পরশর যে এসব খেলায় অত পাকা, তা আমার জানা ছিল না। একটু-আধটু এক-আধ দিন হারলেও বেশির ভাগ দিনই সবাইকে সে বেশ মোহনই করে নেয় রাজ।

তার সঙ্গীদের তাতে অবশ্য ক্রক্ষেপ আছে বলে মনে হয় না। তিন জনেই বেশ শীশালো। হারের শোধ নেবার জন্তে জেগেটাই তাদের কাছে বড়।

পরশরকে হোটেল ছাড়তে দিতে না চাওয়াতে এটাও একটা কারণ।

পরশরের ভাঙা গেডিওটা তো বটেই, এবার বোম্বে অসহ লাগার আর একটা কারণ নিত্য সকাল-বিকেল এই তাদের আড্ডা।

মায়াব হিসাবে পরশরের সঙ্গীরা যে খায়াপ তা বলব না। সবাই বেশ মিত্তক অমায়িক ভদ্র। কিন্তু যত সজ্জনই হোক, দিনের পর দিন তাদের তাদের আড্ডায় সার্কী গোপাল হয়ে বসে থাকতে কাকুর ভালো লাগে।

তা-ও ণাম যদি আমার দু-চক্ষের বিষ না হয় তো কোন রকমে সেই পারতাম।

সব জনে শুনে আমার এ শান্তি দিতে বাগো শ মাইল ছুটিয়ে আনা কেন? তাও আবার ট্রাককলে।

ট্রাককলের কথাটা তুলতেই পরাশরকে কেমন একটু অবশ্য অপ্রস্তুত মনে হয়েছে।
তাসের আড্ডা এক বেলা বেশ কিছু জেগেই হঠাৎ খয়ালের মাধ্যমে সে যে এটা করে
কেলেছে, তাইয়া আমার সন্দেহ নই।

দু-চারবর এ খাঁচাটা দেবার পর তার ঈষৎ লজ্জিত অবস্থা দেখে মায়া করেছে
আর এ-প্রশ্ন জালিল। সোমবারে যাওয়ার সকলটা কিছু জোরের সঙ্গেই জানিয়ে
দিয়েছি।

সোমবারের আগে রববারটাও অবশ্য এক দিক দিয়ে একটু আগামেই কাটল।

পরাশরের স-রোডটাও উৎপাতে অতিষ্ঠ হতে হয়নি। শনিবার দুপুরে বেরিয়ে
পরাশর নিজেই সেটা দাবাবার সঙ্গে কোথায় নিয়ে এসেছে।

তার ধারণা সোমবারই সে সাবানো অধ্যায় বেড়ানটা ফেরত পাবে। দু-চারবার
তার এ হাতকর বিশ্বাস ভাঙতে গিয়ে বিফল হয়ে চূপ করে গেছি। সে তার দিব্যদৃষ্টি
নিজেই খার, আমাদের কিবে যাওয়াটা বন্ধ না হলেই হ'ল।

তাসের আড্ডার এ-নেশা ছেড়ে সোমবার আনার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সে যেতে পারবে
কিনা, এ বিষয়ে একটু সন্দেহ যেনে ছিল না এমন নয়।

সোমবার সকালে ভাগ্যতিক দেখে কিছু আশা হ'ল তার কথা সে রাখবে।
সকালেই তার জন্য একটি ট্রাভেল এজেন্সিকে ফোন করে আমাদের দুজনের বাক্সের
ব্যবস্থা করে কলকাতা জালাম। তারপর আমার নিয়ে দুপুরে পাওয়া দাওয়ায় পর
একটু কেনাকাটা করতেও বেরল।

কেনাকাটা সামান্যই। কিছু তা সেরে যখন হোটেলে ফিরলাম, তখন বেলা
প্রায় পাঁচটা।

আর দু-ঘণ্টা বাদেই ট্রেন। ধোঁ-জাং এর তৈরি করা যতে পাবে।
হোটেলে বসে ট্রেনে করে চা নিয়ে গেল। তা খেতে খেতে সেই কড়াই ভাবছি এমন
সময় পরাশর একেবারে যেন মাঝে পাতে হয়ে বসে পড়ল। এই ঘা:

হল কি পরাশরের মুখে চেপে পড়ে আমি রাতমত উদ্ভয়।

আমার রোডও—পরাশরের প্রায় আর্থানার, সেটা দোকান থেকে ফেরত
আনতে তুলে গিয়েছি।

তুলে আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেট এমন বৃক চাপড়ে আর্থানার করবার মত
ব্যাপার বলে ভাবতে পারলাম না। বললাম, তুলে যখন গেছো, তখন তো আর
উপায় নেই।

উপায় নেই মানে? পরাশর অধৈর্যের সঙ্গে বললে, দোকান তো এখন বন্ধ

হয় নি ?

দোকান বন্ধ হয়নি। কিন্তু সেটা এখন আনতে গেলে ট্রেন আর দগা যাবে ? বিরক্তির সঙ্গে বললাম।

খুব যাবে।—পরশুর অর্ধভুক্ত চায়ের পেয়ালার ফেলে উঠে দাঁড়াল, নাস্তিতে বাব আসিব। এসোনা।

খাচ্ছি। বাগ বরক্তির হাশা সব আমার গলায় তখন মেশানো, কিন্তু দোকানে যদি দেরি হয় তা হলে এই টাঙ্কিতেই আমি একলা চলে যাব বলে রাখছি। আমার হুটকেশ আমি নিজেই নিচ্ছি।

আধা শুধু তোমাটো কেন? আমার লাগেজও নিয়ে নাওনা। তাতে তো আপত্তি করা'ছ না কিন্তু ও রেডিও আর ফেলে যাওয়া যায় না।—পরশুর ঘেন্না নিকপায়।

ফেলে যাওয়া যায় না। এবার কক্ষার দিয়ে, কিন্তু রেডিও যদি মরামত না হয়ে থাকে, হ্যাঁ ফেরৎ রেজেক্ট। দোকানে তর্কাতর্কি করে সময় নষ্ট করবে না।

সময় নষ্ট আর কি! —পরশুর আত্মদাদলে।

সেই রেডিও নিয়ে এমন কামেলা প্রাপ্ত হবে ভারতেও পারি নি।

টাঙ্কিতে থাকলেও ভাড়া বা বাস্তব পদে পদে বাধা পেয়ে যেতে যেতে তো মনে মনে সারাক্ষণ ভাড়া রেডিও আর তার মালিকেরও মুণ্ডপাত করেছি।

প্রায় ঘটাবানেক বাদে বোম্বাই-এর অত্যন্ত বিস্তৃত দাবেকী বাবসায়র কাল একটা সন্ধ্যা গলির মতো যবাহরনে পৌঁছবার পর পরশুর প্রস্তাব শুনে একেবারে অলে উঠলান।

ব্রেগে উঠে বললাম, 'মানব তো একটা রেডিও কেতে! তাতে আমার সঙ্গে যাওয়ার দরকারই কি? না, মালপত্র টাঙ্কিতে ফেলে আমি যেতে পারব না। আমি টাঙ্কিতেই থাকব আর তোমার অকাণে দাঁড় হলে এই টাঙ্কি নিজেই সোনা স্টেশনে চলে যাব বলে রাখছি।

আহা, তাতে কি আমি আপত্তি বহুছি?—পরশুর নাছোড়বন্দা, কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে, কারণে না অকারণে দাঁড় সেটাতো ত্রিকমত বুঝতে পারবে। ও মালপত্রের জগ্রে ভাবনা নেই। এটা টাঙ্কিগুলো আমার চেনা।

তোমার চেনা? অবাক হয়ে ড্রাইনারের দিকে তাকাতে সহজেই বললে, হ্যাঁ মাল বাবভানেকা কুড় নেই। সময় হ'য়ে যাভাই বহুছে।

অগত্যা পরশুরের সঙ্গে দোকানের চেনা হই গেলাম।

দোকান দেহতে এমন কিছু শাজানো গোছানো চমকদার নয়। কিন্তু ভেতরে ঢুকলে সেটা যে একটা বড় আড়তের আদম তা বোঝা যায়।

ভেতরে তখন একটি কর্মচারী ছাড়া আর কেউ নেই।

পরশর গিয়ে তার রসিদটা দেখাতে সে একটু অবাক হয়ে বললে, এ রেডিও তো আজ ফেরত পাবেন না।

কেন? মেরামত হয়নি এখনো। —পরশর বেশ ক্ষুব্ধ।

আপনি ভুল করছেন।—কর্মচারী রসিদটা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে, পরের সোমবার এ রেডিও আপনাকে ফেরত দেবার কথা। তারিখটাই পড়ে দেখুন না ভালো করে। ও তারিখে মেরামত হওয়া অবস্থায় না পেলে বলবেন।

রসিদটা ভালো করে এতক্ষণে লক্ষ্য করে দেখলাম। কর্মচারীর কথাই ঠিক।

পরশর একটু অপ্রস্তুত হয়ে কি বলতে যাচ্ছিল। তাকে ধামিয়ে দিয়ে বিরক্তির সঙ্গেই বললাম, মিছে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা কোরো না। রেডিওটা যেমন আছে তাই ফেরত দাও।

পরশর যেন একটু দুঃখিতভাবে সেই কথা আনাবার পর কর্মচারী দূরের একটি শেলক থেকে রেডিওটা এনে কাউন্টারের ওপর রাখতে বাবে এমন সময় পেছন থেকে শোনা গেল,—এ কে মিস্টার ভার্মা না?

অবাক হয়ে চেয়ে দেখি পেছনে দিকের এক পাশের একটি দরজা থেকে স্বল্প মল্লভাই-ই বেরিয়ে আসছেন।

আরে, এটা আপনার দোকান নাকি।—পরশরকেও বীতিমত বিস্মিত মনে হ'ল।

হাসি মুখে সামনে এসে মল্লভাই বললেন, ই্যা আর আপনি বেছে আমার দোকানেই ও রেডিও মেরামত করতে দিয়ে গেছেন। কি আশ্চর্য বলুন তো।

তাই তো দেখছি। —পরশর হাসি মুখে বললে, কিন্তু মেরামত করানো আর হল না মল্ল ভাইজী। এখুনি গিয়ে আনাদের ট্রেন ধরতে হবে। রেডিওটা নিয়ে যাচ্ছি।

তা কি হয় ভার্মা সাহেব! মুখের হাসি সবেও মল্লভাই কেমন একটু অস্ত্র বকম গলায় বললে, আমার দোকানে সাব্বাতে দিয়েছেন, ও রেডিও এমনি আপনাকে ফেরত দিতে পারি? আহুন, আহুন আমার ঘরে। এত কষ্ট করে খুঁজে-পেতে এসেছেন, একটু বসে ধান।

কিন্তু ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকী।—এবার আমি উদ্বিগ্নভাবে না বলে পারলাম না।

মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকী কি বলছেন। ও ট্রেন এখন চাড়ে কিনা তাই দেখুন। আহুন আমার ঘরে।

এ সময়ে মল্লভাই-এর এ বকম ঠাট্টার স্রষ্টা আমার ভালো লাগল না। বললাম, তাহলে তুমি যাও পরশর। আমি স্টেশনে চললাম।

পরশর কিন্তু তখন বজ্রমুষ্টিতে আমার একটা হাত চেপে ধরেছে। মুখে কিন্তু হেসে বললে, আরে, ট্রেনের অস্ত্র তোমার তাবনা নেই। এই ট্রেন কেল করলে নাইট যেনে

তোমায় পাঠিয়ে দেব কথা দিচ্ছি। মমুভাইজী এত করে ডাকছেন, ওঁর ঘরে একটু না বসে পারি।

যে ভাবে পরাশর ছাতটা চেপে ধরে আছে, প্রতিবাদ করতে হলে তখন এই দোকানের মধ্যেই তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে হয়। রাগে মুখখানা কালো করেই তার সঙ্গে মমুভাই-এর ঘরে গিয়ে এবার বসলাম।

দোকানের পাশে ছোট একটা কুঠির। কিন্তু সামনের দোকানের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। ছোট ঘরটিতে সাজসজ্জা আসবাবে সৌখীনতার চূড়ান্ত পরিচয়।

মেহগনী কাঠের দার্মী টোবলের একপাশ মগমল-মোড়া চেয়ারে আমাদের সিলে মমুভাই অগ্র নিষ্কর টুচর এর কাঠের কাজ করা আসনে নিজে গিয়ে বসে প্রথমেই যা বললেন তাও আমি অগাক।

দরজাটা বন্ধ করে দাও রাজন।

রাজন নামে কর্মচারিটির হুকুম তামিল করতে গেরি হ'ল না। বিমূঢ় ভাবে পরাশরের দিকে তাকিয়ে দেখ তার মুখে কৌতূহলের হাস।

সেই একম হাসি মুখে পরাশর বললে, ভালোই করেছেন মমুভাইজী। আমাদের মত বন্ধুদের আলাপ একটু নিভৃত হওয়াই দরকার। কিন্তু আলাপটা কি নিয়ে শুরু করা যায় বলুন তো।

ধরুন, আপনার সেই এক পাউণ্ডের নোটটা নিয়ে,—মমুভাইয়ের মুখের চেহারা আর গলা দুই-ই এখন যেন আলাদা—যেটা তুলে হোটেলের ম্যানেজারকে দিয়েছিলেন।

ওঃ সেই নোটটা—পরাশর হেসে বললে, আপনি তাহলে ম্যানেজারের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন। জানতাম আপনি নেবেন।

জানতেন। মমুভাইয়ের মুখ এবার ঝটিন, জেনেশুনেই মিথো কথাটা আগায়ের বলেছিলেন।

তাইতো বলেছিলাম। পরাশর অগ্নান বদনে জানল, সত্যি সত্যি ও নোট তো ম্যানেজারকে আনি নিহ নি।

এরকম মিথো বলার উদ্দেশ্য? মমুভাই-এর গলা তাঁক।

উদ্দেশ্য তো জলের মত পরিষ্কার। প্রথমে তারা মকেল হিসাবে আপনার একটু কৌতূহল হবে, তারপর খোঁজ নিয়ে মিথোটা জেনে সন্দ্বিগ ও উদ্ভ্রা হয়ে উঠবেন। তারপর আমার সম্বন্ধে খোঁজপত্র নেবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু খোঁজপত্র যখন পাবেন, তার আগেই আমি কাজ হাসিল করে কেলছি। সবতো আজ সকালে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে আপনার টনক নড়েছে আর আমি তো দু-মাস আগে থেকে পায়তাদা করছি। আজ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা না বললে অগ্র ভাবেও আপনাকে উর্ভায় করবার ব্যবস্থা করতাম। এমন কি শেষ মুহূর্তে আপনার এই টনক নড়াবার ব্যবস্থাও না করে

ছাড়তাম না।

বটী।—মস্তভাই-এর গলাটা বজ্রগর্ভের, কি পায় লাড় সুনতে পাঠি ?

নিশ্চয়, নিশ্চয়। এক তাসের আড্ডায় বন্ধুদের মতো গোপনতা থাকা উচিত নয়। পরাশর যেন বন্ধু বৎসল হয়ে উচ্ছসিত : প্রথম এখানে এসে আপনার গতিবিধি স্বভাব চরিত্র সব কিছু তালিকা করে ফেলেছি। তা থেকে শুধোঁচ্ছি, নানা সং-অসং উপায়ে টাকার কুণী হয়ে উঠলেও প্রথম জীবনের জুয়ার মত আপনার কাটেনি। সেই নেশা এখন শুধু আশা-শাস-পেলা দিয়েই মেটান। আপনার যাদু সন্ধে সাধারণত মাটি টাকার পেলা চলছেন, তাদের সন্ধে ভাব করছেন। এ বিষয়ে ভাবনামাত্র সাধারণ অবস্থা সবচেয়ে দামী। আজ এক বছর ধরে আপনার মনঃস্থল বাবসায় এতদূর বলে নিজের প্রতিচয় কাম্যে মৌ করে মে একত্রি পুনঃপুনঃ হয়ে আপনার দশ নজর রাখছে। শুধু বটে হাতে প্রমাণের অভাবেই আপনার হাতে থাকা কটাটা পরাতে পারিনি। সেই প্রমাণ অকটা ভাবে পারার জগ্রে ভাবনামাত্র সাধারণ আমার হোটেলের ঘরে কটা তাসের আড্ডা বাসিয়ে চল। বন্ধু গাছের কবায় আর ভাবনামাত্র অল্পমোদনে আপনি লেখান এসে জমে গেছেন। জমে গেছেন পায় নিতা হয়ে বাঁধার দক্ষ। আমার জেল বাড়িতে আর আপনার কটাটা বাবসায়যোগ করাবার জগ্রে আমি নিজে বেশ ভাগ পেলাম জেনারার বাবসায় করেছি। আমি জেলার বন্ধলে বেশি গারলে গয়না আপনার সন্দেহ হতে পারবে, জমতে বাড়না।

কিন্তু এত পায় লাড়া ঘর জগ্রে কষা আমার হাটুড়া পরাশর মত সেই অকটা প্রমাণটা এটা তালিকাভুক্তই পেলেন না কি?—মস্তভাই-এর হাটুড়া, হাটুড়ার মত বীকা আর কামনি সাবাসো লায় গলায় বিদ্রুপ।

না, না, তা কেন?—পরশর যেন সবলভায়ে বাবসায় বাবসায় হয়ে উঠল।—ও তাসের আন্দর নো শুধু এটা ভাড়া বেড়িওটা আপনার বাবসায় রাখিয়ে শুনিয়ে বিশ্বাস করাবার জগ্রে। আসল প্রমাণ এটা ভাড়া বেড়িওর মধ্যে।

ভাড়া বেড়িওর মধ্যে।—মস্তভাই-এর প্রায় সন্ধে সন্ধে আমার মুখে দিয়েও বেরিয়ে গেল মস্তভাই-এর গলায় স্বরটা অবশ্য আলাদা।

হ্যাঁ, এটা বেড়িওটা সন্নিবিষ্ট বিকল বলে আপনাকে বুঝিয়ে এটা মেঘামোদের জগ্রে শনিবার আপনার এ লাকানে দিয়ে গেছি। শনিবারের সব গছে ছুটি পল দাঁড়বার, আর অল্প শনিবার। এই বিনিমারেই যা প্রমাণ দাঁড়বার সব সংগঠ হয়ে গছে এটা বেড়িওর দারকত

কি বকন?—মস্তভাই-এর গলাটা এবার অত্যন্ত শক্ত।

আপনাদের এ ঘরে দাঁড়বারে যে যে মেসেজে, আর যে যা বলেছে সব এটা জাল বেড়িওর নোনা হয়ে গেছে বলে। আমার ভাড়া বেড়িওটা নো নয়, তারই বাঁধাবের খোলসের ভেতরে একটা ঈশ্বর বেড আলোর কামোরা আর অত্যন্ত শক্তমান টেপ

রেকর্ডার বসিয়ে সারাগার নামে এখানে রেখে গেছি। বসিবার তো নয়ই, ছু-চার মিনিটের মধ্যে তাতে কেউ হাব দেবেনা জানতাম। আজ আপনি সন্ধিগ্ধ হয়ে উঠেছেন এমন নিশ্চিত হয়ে বিকেলে তাই শুটাও নিতে এসেছি।

আমায় সন্ধিগ্ধ করতে চেয়েছিলেন একথা তো জেনেই বসেছিলেন। তাতে আপনিও স্বীকার — ময়ূভাট-এর গলায় অবজ্ঞা না আক্ৰোশ কোনটা প্রধান বলা কঠিন।

স্বীকারে যেটা বোঝি টা ফের নিতে আমার সময় আপনাকে এই বকম উপস্থিত থেকে বাদ দিতে পারেন। তাতে অনেক ব্যাঙ্গ্য এসে যায়।

আমার ব্যাঙ্গ্য বাচাতে পেলে আমি বাধ্য — ময়ূভাট এবার কথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, — কল্প ও রেডিওর ভিতরকার কামেরা আর টিপ-রেকর্ডার কি অকটা প্রমাণ রাখতে মনে করেন?

সেইসঙ্গে আমার মুখ দিয়ে শুনে চান? — পরশুর চোখ উঠল দেখুন, আজ বকদিন ধরে এটা বসে থাকা থেকে লক্ষ লক্ষরকম বর্ষা বিদেশী মুদ্রার গোপন লেনদেন অনবরত চলেছে। পুনিশ হু একদমেরে পর-বাক্য করলেও আপনি চোখের দরবারমত সাক্ষ্য প্রমাণ না পেয়ে টানিয়ে যাচ্ছে। সত্যিকার লেনদেন কো'র নিশ্চিৎ বায়গার হয়না, কিন্তু কোথায় তা হয় তা ঠিক করার বেটী গোপন খাউট এই আপনার লোকানটি। বসিবার কোন একটি সময়ে যখন যে সকল আসে, তার সঙ্গে আপনি দেখা করেন পুনিশ সে সময়ে হানা দিয়েও কিছু করতে পারেন না। কারণ তারা এসে দেখবে তখন শুধু লোক নিঃশব্দ সাধারণ হয়েই থাকে। আলো করছেন মেহেজত আপনাকে বসে নিশ্চিত মনে গোপন আলোপ করেন, জবাবকার কথাবার্তা তার ছবি নোনার দরকার ছিল। এটা ভাড়া রেডিও শাট করেচে।

ভালো! ভালো! — নিজের দিকের ডুয়ার থেকে একটি পিস্তল বার করে আমাদের দিকে উঁচিয়ে এগিয়ে গেল ময়ূভাট যেন কেউই তা মিস না করেন। কিন্তু আমার এ গোপন কারবারের প্রমাণ ও বোডও এখন গলবস্ত্র হয়ে আপনার গায়ে তুলে দেব বলে আপনি আশা করেন।

তুলে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? অনর্থক খয়ের খবর হাতলে যনা। পরশুরের মুখে যা লেনদেন বাচাতে, আর দূরীত হতে চাই করে ফেলতে পারলেও এমন কিছু ক্ষতি হয়। ময়ূভাটের কথা ভেবেই আমার হঠাৎ বকম সাক্ষ্য হলেবে ধরে রেখেছি।

কালিদি পরন্তু কি না তার পরে আপনার আর আপনার এই সাক্ষ্যের লাগি হয়তো বাজারিক খাবো পুদ্র সমুদ্রের চড়ায় এসে লাগবে। পারা, সে খা'কি ভেবেছেন? ময়ূভাট-এর গলায় গায়ে মিলেই।

না, না আপনি — পরশুর যেন লজ্জিত না হয়ে আসার করলে, কারণ আমাদের মারলেও আপনার এখন পরিচয় নেই। দরজানী এখন না থাকলে দেখতে পাতেন

পুলিশ এসে সমস্ত দোকান আর তার চারধার পাহারা দিচ্ছে।

এত কথা শোনার পর সত্যিই সেই মুহূর্তে মজোরে দরজা ঠেলে পুলিশ এসে ঘরে ঢুকবে ভাবতে পারিনি।

মহুড়াই অবশ্য শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বিনা ব্যস্তাটেই ধরা গিলে।

খানিকক্ষণের অন্তরে কেমন মুহূর্ত ঘটেছিল। মহুড়াইকে পুলিশ ভ্যানে নিয়ে যাবার পর ট্যাক্সিতে উঠে হঠাৎ হাত বাড়ির দিকে তাকিয়ে আর্থনাম করে উঠলাম, একি এখন যে আটটা বাজে।

তাতে বাজবেই। নির্বিকার ভাবে বললে পরাশর, ট্রেন অনেকক্ষণ ছেড়ে গেছে। তবে তোমার ভাবনা নেই। ট্রেনের রিজার্ভেশন কানসেল করে নাইট প্রেন্সে ছুটো সিটের ব্যবস্থা করে রেখেছি। এখনতো রেডিওটাকে কানে দান করে যাব তাই ভাবছি।

ভাড়া রেডিওটা যে সেই ইতিমধ্যে দোকান থেকে এনে মোটরে তুলেছে তা খেয়াল করিনি।

অবাক হয়ে বললাম, সেকি। দান করবে কি। ওর মধ্যে অত বড় প্রমাণ। পুলিশে জমা দিতে হবে না?

জমা দেব। পরাশর হাসল, এই ভাড়া রেডিও।

ভাড়া রেডিও মানে? ওর ভেতরকার ইনফ্রায়েড আলোর ক্যামেরা, চেন-রেকর্ডার।

একটা রেডিওর ভেতরে অতকাণ্ড সম্ভব বলে তো জানি না—পরাশর হাসল, অন্তত এদেশে ওরকম যন্ত্র এখনো কেউ দেখেনি। মহুড়াইকে ভয় পাঠিয়ে নিজমুঠি ধরাবার অন্তরে এই ভাঁওতা দিয়েছিলাম। ওই ভাঁওতায় আসল যা কাজ তা হয়ে গেছে। অকাটা প্রমাণ আছে বিশ্বাস করে মহুড়াই নিজেই এখন সব কবুল করবে।

আচ্ছা,—একটু বাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যিই মহুড়াই-এর কথার সাক্ষী হবার অন্তরে কি আমাকে কলকাতা থেকে ট্রান্সফর করে আনিয়েছিল?

না, না, তা কেন,—পরাশর হেসে বললে, তোমায় আনিয়েছি শুধু ভাড়া রেডিওতে আলাতন হবার অন্তরে। নিজের লোকও তিতিবিরক্ত না হলে ওরা বিশ্বাস করবে কেন?

শুধু তিতিবিরক্ত হবার অন্তরে? মুখ চোখ লাল করে আমি পরাশরের দিকে তাকিলাম।

পরশরের কোন ক্রন্দনই নেই। তাক্ষিলাভাবে বললে ভালো মানুষ পোছের কাকেও-যন্ত্রণা দেওয়া যায় ভাবতে গিয়ে তোমার নামটাই মনে পড়ল।

আমি গুম হয়ে গেলাম।

শ্রেমেন্দ্র মিত্র কবি শ্রেমেন্দ্র মিত্র গল্পকার ও ঔপন্যাসিক তবে এক ধরনের পাঠকের নিকট শ্রেমেন্দ্র মিত্রের সব থেকে বড় পরিচয় তিনি রহস্য ও গোয়েন্দা গল্পের লেখক। বিদেশী ধাঁচে গোয়েন্দাধর্মী গল্প ও উপন্যাস লেখার যে ধারা চৈনেন্দ্রনাথ রায়ের হাতে আরম্ভ হয়ে শ্রেমেন্দ্র মিত্রের হাতে পুষ্ট হয়েছে; শ্রেমেন্দ্র মিত্র তাকে লম্বা লালিত ও পালিত করেছেন। তাঁর ঘনানা ও পরশর গোয়েন্দা গল্প হিসাবে অনবদ্য। লেখকের ভূপুর ও পরশর বর্মা ও ভাড়া বেড়িও রহস্য ও বোমাঝে অনন্ততার দাবী রাখে। কল্লোলকালের সাহিত্যিকদের পুর্বে ধা হিসাবে শ্রেমেন্দ্র মিত্র আজ হতে পাঁচ দশক পূর্ব হতেই বাঙালী পাঠকদের এক অতি প্রিয় নাম, আপনজন।

অস্থির পৃথিবীর দুর্বল্য তিরিশের দশকের লেখক হওয়া সত্ত্বেও কল্লোল আশ্রয়ী শ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম জীবনে সাহিত্য করেন সাহিত্যের ক্ষেত্রে। স্বাধীনতা আন্দোলনের অটল আবর্ত হতেও কল্লোল কালের সাহিত্যিকগণ দূরে থাকেন। তবে পরবর্তীকালে লাবরণ সব সমস্যা আর সবটীকাকে স্পর্শ করে।



হারা মণি ।

ডঃ শুকুমার সেন

প্রতিদিনের মতো যেদিনও কালিদাস সকাল সকাল উঠেছেন। মুখ হাত ধুয়েছেন। স্নান করেছেন। প্রাতঃসন্ধ্যা বসেছেন। সন্ধ্যা-বন্দনা অঙ্কনের মধ্যেই সারা হ'ল। আদম থেকে উঠে কালিদাস গলা ঝাড়লেন।

অমনি দামী পাশের ঘরে উঁচু-নীচু হাথান চৌকি পেতে দিয়ে উঁচু চৌকি উপর প্রাতঃবাসের সাজানো থালা পাটি বেগে গেল। আয়োজন বেশ কিছু নয়। থালায় কিছু শুক জাফা, অন্ন পড়জুঁর, গুটি চারেক শর্করাপুণ্ড, দুটি তিলমোদক। বাটিতে গরম দুধ।

পাশের ঘরে গিয়ে কালিদাস নীচু চৌকিতে বসে বসে প্রাতঃরাশ সারলেন। খেলেন কিসমিসগুলি, তিলের মোণা দুটি আর চুটুফ। ইতিমধ্যে দামী এসে পাশে একঘটি জল ডাবের আর গামছা বেগে দেছে।

ডাবের মুখ ধুয়ে গা-ছায় হা-মুখ মুছে কালিদাস ধীরে স্বস্তে বাইরের অলিন্দে চলে এলেন। সেখানে একান্তে পাতা বয়েছে চত্র বাঁচত্র মাত্রে, তার উপর নেতের আশ্রয়ণ—তার মাঝে স্তম্ভের স্তম্ভকাঠে পরাট এক পদকুল। পদকুলের মাঝখানে আসন শিঁড়ি, তার সামনে উঁচু চৌকি ডব্ব। চৌকির উপর একতাড়ী পুঁথি, তার সঙ্গে কিছু সাদা তালপাতা, কালির দোয়াত, তুলি-কলম আর কালি চোপমাণার জুড় একটি সাদা নেকড়ার স্ক্র শালিতরা থুঁপি।

কালিদাস পদ্মাসনে বসলেন। তখন মেঘদূতের মাজনা চলছে। তিনি পুঁথির

তাড়াটি খুললেন। উপরের পাতাটি তুলে নিয়ে লেখা গুনগুন করে পড়লেন।

“জ্যোতির্বিদ্যার লিপিঃ যজ্ঞ বর্জ্য পানী

পুত্রপৌত্র কনকময় প্রাপি ...।”

তাবপর ভারতে লাগলেন, “পুত্রপ্রাপ্তি” নামে ঠিকছেন “পুত্রপ্রেমণ” ভালো হবে। “পুত্রপ্রেমণ” লসনার ফল তুলে লিখাটা ঠিকঠিক নিয়ে এনে দিয়ে বধ্যাঘায়ে শ্রবধনি হ'ল। সে আশ্বিনে বাস্মা পেল রাজপ্রাসাদের ডাক নিয়ে চকরা এসেছে। লেখা আরম্ভ করার মুখে বড় বান্দা পেরে কা'ন্দাসের মন অপ্রসন্ন হ'ল। মাড়া দেবেন কিনা ভাবছেন অমনি আবার ডাক আসলেন বাস্মারটা জরুরি। একটু ক্রম্বরেই বললেন ‘পবনহু’ অর্থাৎ ‘ভন্দে আসুন’

নাচ-দরজার তোরণ বারোয়, চুপাশের পা'জো'ন্দার অর্থাৎ পালিতামাদার সাহেব পরে ঠেলে উঠানো লসাবতানের মাথখান দিয়ে মধ্যম চেনার পথ বেয়ে অলিন্দে এসে উঠলেন এক শব্দ শ্রবণ প্রকৃষ্ট — মধুর কায়াবিশালবক্ষ প্রসন্নমুর্তি। তাঁর প্রকোষ্ঠ স্বর্ণচক্রে, নারী উত্তরায় উড়ানো বোতা ববাক বক্রমানিতো কক্কুকা, অর্থাৎ প্রধান এ ৩৩৩

তাঁকে দেস্টে কা'ন্দাসের প'রক মুখে ... পা'জে উঠে হাত ছোঁড় করে নমস্কার করলেন। বললেন, ‘আজ্ঞা, আসুন।’

ইতিমধ্যে নাম একটি খানসামান এসে দাঁড়। কা'ন্দাসের হাজত পেয়ে বক্ষুরাত উপবেশন করে সেই পাড়ু খানসামান তাঁর নিম্নে লসাবতান উঠে পুয়ে মুছিয়ে দিলে।

বিক্ষুরাত বললেন, ‘এ অতঃপর আশ্রয় হ'লেন ... এখান উঠতে হবে।’

কালিদাস বললেন, ‘আজ্ঞা ... হাজত ...?’

‘তোরাবারে ছেড়ে দেবে ... হুঁর খাবার ... নেই ... হাজত ... আছে ...’

‘হুঁর কখন ... আসুন ... হুঁর ... উঠান অগো-
ছালো ... কাটা-খোঁচা ... হুঁর ...’

‘কালিদাসের কা'বুড়ে ... হুঁর ...’

‘কিন্তু ... হুঁর ...’

‘কিছুই ... আসুন ... হুঁর ...’

‘হুঁর ...’

‘হুঁর ...’

‘হুঁর ...’

বোকা যাচ্ছে না। বোজাই মহাদেবী সজ্জার আগে প্রসাধন করে তাঁর মহলের উত্তানে গিয়ে কিছুক্ষণ থাকেন। কাল সজ্জার পর উদ্যান থেকে ঘরে এসে দর্পণে মুখ দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করলেন এক কর্ণকুণ্ডলের বড় লাল পাথরটি নেই। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ তলাস হ'ল। সাজ করে মহাদেবী যেখানে সেখানে পাদচারণ করেছিলেন, সর্বত্র ধুলো-বালি মাটি-কাঁটা সব তন্ন-তন্ন করে চেক করে ফেলা হয়েছে। চুনি পাওয়া যায় নি।

‘চেড়ীদের কাউকে সন্দেহ হয়। পড়বার মাত্র লক্ষ্য করে কেউ যদি কুড়িয়ে নিয়ে থাকে ?’

‘অসম্ভব। তারা সবাই পুরানো লোক, বিশ্বস্ত। মহাদেবী নিজেকে সন্দেহ করবেন তবু তাদের নয়।’

‘সামান্য একটা চুনির জন্তে এত ব্যাকুলতা কেন? রাজভাণ্ডারে মহামূল্য মণি-মাণিক্যের তো অপ্রতুলতা নেই—যতখুশি নিতে পারেন।’

‘তাহলে তো গোল মিটেই যেত। বাপার অত সহজ নয়। মণিকুণ্ডল তো রাজভাণ্ডারের দ্রব্য নয়। সেখানকার দ্রব্য তো বলতে গেলে দেবার জন্মেই আছে। এ কুণ্ডল মহাদেবার মায়েব দেওয়া তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মায়েব কাছে। মহাদেবীর কাছে এ কুণ্ডলের মর্যাদা তাঁর মঙ্গলস্থত্রেব চেয়ে কম নয়, হয়ত বেশি! মণিহারী হয়ে মহাদেবী সেই থেকে দাঁতে কুটোটি পঞ্চস্থ কাটেননি। চুনি না পাওয়া গেলে বুঝি প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করবেন, এমন ধারা।’

‘নগরপালকে জানানো হয়েছে?’

‘হালালেন আপনি। নিজের লেখা ভুলে যাচ্ছেন? নগরপালেরা কেমন তা কি আপনি জানেন না? আপনি কি বলতে চান স্বস্তঃপুর্বেব হারামণি উদ্ধার করবে জাহ্নক-সূচকদের রাউত? তাছাড়া স্বস্তঃপুর্বেবরা তো তাদের ঢুকতেই দেবে না।’

‘তাহলে এখন?’

‘এখন—পতিত্বং পতিত্বং ত্বমেব কবীন্দ্রঃ। দেবপাদেব ধারণা হয়েছে, এ মণি যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে তো সে কালিদাস। আর কারো সাধ নয়। আমাদের বললেন কাতরভাবে, “মহাদেবীর প্রাণ রক্ষা করতে চাও তো কালিদাসের বাড়ী ধরনা দাও, তাকে নিয়ে এস, সে বিহিত করবেই।”

রাজার কাতর বিশ্বাস কালিদাসের মনে উষ্মেগ জাগালে। উঠানের গাছপাতার দিকে চোখ রেখে কালিদাস ভাবতে লাগলেন। একটু পরে বললেন, ‘কতকগুলো জ্ঞাতব্য আছে। যদি আপনার কাছে তা পেয়ে যাই তবে আমাদের হয়ত অকুস্থলে যেতে হবে না। রাজাস্তঃপুর্বেব নিবিড় ভূমিতে পদক্ষেপ কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়।’

‘কী জ্ঞাতব্য বলুন।’

‘মহাদেবীর প্রসাধন-কক্ষ থেকে তাঁর উদ্যান কতদূর?’

‘প্রসাধন-কক্ষের কাছেই। দুটি কামরা পোরয়ে অলিন্দ। অলিন্দ থেকে দু-তিন

সোপান নামলেই মহাদেবীর ক্রীড়োদ্যানের পক্ষদ্বার ।'

'ওখানে যায় কাণ্ডা ? যাবার অধিকারই বা আছে কাদের ?'

'ওখানে যান মহাদেবী ভর্তৃন্যবিকারা প্রতীহারী সহচরী চেড়ীরা । দেবপাদেব
বাধা নেই । তবে তিন বড় একটা যান না ।'

'স্বতরাং ভিন্নকার কারো উপর আপনাদের সম্মেহ নেই ?'

'একেবারেই না ।'

'মহাদেবা কাল উত্তানে যা যা আচরণ করেছিলেন তা খুঁটিয়ে বলতে পারেন ?'

'ইং, পারি — অনন্ত ধ্যামসম্বব । উত্তানে গিয়ে তিন কিল্লক্ষণ পুষ্পবীথিতে পাশ্চাৎ
করেছিলেন । তারপর বহুবিকার্য বসে সখীদের সঙ্গে গল্প করেছিলেন । ময়ূকে খই
দিয়েছিলেন চড়িয়ে । তারপর সুলনায় ওঠে খানিকক্ষণ দোল খেয়েছিলেন । সন্ধ্যায়
বন্দ্যার গান উঠলে পর তিনি অঙ্কলি করে সন্ধ্যা-প্রণাম করেছিলেন । তারপর সখীদের
সঙ্গে কথ' কথতে কথতে ঘরে গিয়ে এসেছিলেন । তারপর দর্পণে মুখ দেখতে গিয়ে
দেখলেন একটি চুনি ।'

'ক্রীড়োদ্যানের ভূমি ভালো করে খোঁজা হয়েছে ?'

'তন্নতর করে ।'

'মহাদেবার অলিন্দের নীচে পক্ষদ্বার ছাড়া ক্রীড়োদ্যানের আর কোন প্রবেশ পথ
আছে ?'

'না ।'

'কোনরকম নির্গমন পথ আছে ?'

'অলনির্গম পথ আছে । কিন্তু তা বাইরের দিকে নয়, অন্তঃপুরের দিকে ।'

'উদ্যানের প্রাচীর কত উঁচু ?'

'বিশ-বাটশ হাত হবে ।'

'তাই তো !' — কালিদাস চোখ বুঁজে ভাবতে লাগলেন । বিষ্ণুগাত তাঁর ক্ষুধ
কোন ভাণ্ডার হয় কিনা লক্ষ্য করতে লাগলেন ।

অর্ধশতকাল বাদে কালিদাস চোখ খুললেন । বললেন, 'ভয় নেই । চোর
পালারনি, পাওয়া যাবে বোধ করি । আপনি তাড়াতাড়ি গিয়ে মহাদেবীকে প্রকোষ
দিয়ে অনশন ছাড়তে বলুন । আমার ওখানে যাওয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক । সমস্তার
সমাধান করে ফলেছি ।'

বিষ্ণুগাতের মুখে কাল ছায়া নেমে এল । বললেন, 'আপনি না গেলে দেবপাদেব
মনোস্তব্ধ হবে । মহাদেবীও কারো কথা শুনবেন না । তখন আমার অবস্থাটা কী
হবে একবার ভেবে দেখুন ।'

'আমার উপর আপনাদের দেখছি অগাধ আস্থা । অথচ আমার কথা মানছেন না ।
আমি কি তামাশা করছি ? বেশ, আমি সমাধান লিখে দিচ্ছি । দেবপাদেব হাতে দেবেন ।

তিনি ঠিক বুঝে যাবেন : আপনাকে মন্দস্থ হতে হবে না । পুণ্ড্র-ই হলেন ।’

এই বলে একপাশা লাগা তা-পাতা টেনে নিয়ে কালিদাস নিশেধ তুলি বলে
ছ-ছত্রাকহু লিখ দিলেন—তার হনু-চুটিগেশনু রিপোট বলা বাহুল্য চনাটি স্লোক ।
স্লোকটি এই—

দাড়িষ্বজ্জব্রতৈবানশখিনা গ্রামিতো নগঃ ।

অন্ত খো বা হনু-চুটি বচস্তনু অহু-চস্তামম্ ।

(অর্থাৎ, দাড়িষ্বের বাজ মনে করে ময়ূর চূনটিকে উদবস্থ করেছে । আজকালের
মধ্যেই তা শেট থেকে বেরিয়ে যাবে । তাই বসিষ্ঠা ভাল করে লক্ষ্য করা হয় যেন ।)

লেখা পাতাটি পাতল ছুটি সন্ধান কাঠের মাঝখানে রেখে কালিদাস পটুডোর দিয়ে
বাঁধলেন । বোধ কক্কুরীর হাতে দিলেন ।

বিষ্ণুগাত বললেন, ‘খুসে একবার দেখতে পারি কি ?’

‘অবশ্য, অবশ্য । আপনি আসুন ও নন, আসামার সাহায্যকারী ও নন । আপনার
কাছে পোপনের কি আছে ?’

কক্কুরী ডোর খুলে পাতাতে চোখ বোলালেন আর তখন ষাড় নেড়ে ডোর দিয়ে
দিলেন । বললেন, ‘কক্কুরী বোঝা গেল না ।—কুটিন্দি ।’

‘আপনিক এরই মধ্যে ঘরনানা তুলে গেছেন ? আসব ! দেবপাদ নিচ্ছই
তোলেননি । তুলেও তার ঘরনা অক্ষরক্ষিণী পড়ে দেবে । শব্দ ষাড় তুলে গিয়ে
থাকে তাহলে তখন আমাকে যেতে হবে ।’

বিষ্ণুগাতের মুখ উজ্জ্বলিত হ’ল । অভিমান করে বিনায় নিলেন । কালিদাস লেখায়
মন দিলেন । * * * *

ডঃ সুকুমার সেন : বর্ধমান জেলার বায়নার জেলার পোদান গ্রামে বঙ্কিম
সহস্রান্ত পরিবারে ভ্রমগ্রহণ করেন । বাল্যে বর্ধমান শহরে লেখা-ড়া সমাপ্ত করে
কলকাতার উচ্চাশ্রমার্থে আসেন ও লিঙ্গবজ্রী ভাষা-বৈদ্য হিন্দাবে প্রতিষ্ঠা লাভ ।
আন্তর্জাতিক ব্যাতিসম্পন্ন পাণ্ডিত্য, অধ্যাপক ও বৈদ্যকরণ । তবে পশ্চাত প্রাবৃত্তিক
বে গল্পকার ও বিশেষ করে গোস্বামী গল্পের অমুবাগা পাঠক, তা তার ঘনষ্ঠ মজলেও
বৈবহর অনেকেই জানেন না । ডঃ সুকুমার সেন “কালিদাস তার কালে” গ্রন্থে
তৎকালীন জীবন ও পারিবারিক প্রায় প্রেক্ষাপটে বিচিত্র ও বিভিন্ন বসন্তিক বেশ কিছু
গোস্বামী-ধর্মী গল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন । সুকুমারবাবুর নিজের কথায় বলি,
“আমি কালিদাসকে ডিটেকটিভ কল্পনা করে কয়েকটি গল্প পাড়া করেছি ।” কালিদাসের
কাল বলতে লেখক সাধামাটা ভাবে আজ হতে প্রায় দেড় ছই হাজার বছর পূর্বের জন-
জীবনকে প্রেক্ষাপটে একে গল্পকি বিব্রাস সৃষ্টি করেছেন । গল্প কানো হলও গল্প-
জলির অধিকাংশ ইতিহাস আশ্রিত তার উদ্ভট নয় ।



ডিকটিকটিভ

মনোজ বসু

কলমটা হেঁটে সোনারি দামি কলম—এ জিনিস বড় দুর্লভ এখনকার দিনে। সকলের বড় কথা, কলমটা বড় মেনে দিয়েছিল, অভাবের গুণেই হয়তো—এ কলম হাতে নিয়ে বদলে ধরবার করে লেখা বসিয়ে আসে! ভাবতে হয় না মোটে, কলমই যেন বানিয়ে লিখ যায়।

এ হেন কলমটা গেল সাধা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজছি। লেখা-টেখা মাথায় উঠে গেছে—হাত মুচড়ে ঘ্রোশে করে দিল, লিখব আর কি করে?

শাখা আর খান-তক্তনের সাধার। আর ছোকর একটি চাকর বঞ্চিত। হেন অবস্থায় খাব মাতে লোকে ন্যাংড়ানর প্রত্যাশা করে। ঠিক উঠে। বগং দেখি ভাবি শাখার : এক সোনারি গুলে করল তুমি? ন্যাংড়ান ক?

চোর—

ঠাণ্ডে খাব বদলে হবে না। ক কে সন্দেহ করছ, শুনতে চাই—

মোট-টি তক্তন তো আমবা। আমার জিনিসটা নিজে আমি চুরি করতে বাই নি। আর টাকাকড়ির বাপার হলে না হয়—

টোক গিলে বাল, মানে নিজের জন্ত নয় ভাবতে পারতাম, সংসার খরচের দায়ে নিয়েছ তুমি। কলম কেন তুমি নিতে যাবে?

গোয়েন্দা (প্রথম)—১০

শাস্তা এগিয়ে দিল : তিন জনের ভিতর দুজন তবে বাদ হয়েছে গেল। বইল গিয়ে—

বলতে বলতে আশুন হয়ে উঠল : সে জানি। বজ্রিত হু চোখের বিষ হয়েছে তোমার। ‘মা’ বলে ঐ যে আমার কাছে কেঁদে এসে পড়েছিল, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছি। অন্য গরীব মানুষ—সে চোর না হয়ে অন্য কে হতে পারে?

তা বলে কলম টেবিল থেকে পাখনা মেলে উড়ে পালাতে পারে না। গড়ে উঠল শাস্তা : তুমি সবিয়েছ দোষটা বজ্রিতের ঘাড়ে পড়বে বলে। তাড়ানোর অভ্যুত্থান।

কুরুক্ষেত্রের উন্মোচনপর্ব। এমন সময় যাকে নিয়ে ব্যাপার সেই বজ্রিত কেঁদে এসে পড়ল : সর্বনাশ হয়েছে মাগো। ঘুমিয়েছিলাম দুপুরবেলা, বালিশের তলায় চাবি দিয়ে বাঁধ খুলে দশটাকার নোটখানা নিয়ে নিয়েছে। আর বাবু যে সেই ক্রমাল দিয়েছিলেন—

আবো জিনিস নিয়েছে হয়তো। কিন্তু ক্রমালের কথায় সবকিছু হয়ে বজ্রিত আর বলতে পারে না। বসে থেকে আমার এক বন্ধু ডজন পানেক ছাপা ক্রমাল পাঠিয়েছিল, একটা তার মধ্যে বখশিস করেছিলাম বজ্রিতকে; মানে শাস্তাই দিয়েছিল তাকে। লামনের ফাস্তান বজ্রিতের বিয়ে—বিয়ে করতে যাবার সময় বুকপকেট থেকে শৌখিন ক্রমালের একটা কোণ বের করে দেবে, বরের বাহার খুলবে তাতে। ক্রমাল পরম বস্তু সে বাক্সে রেখে দিয়েছিল।

শাস্তা চোখ পাকাল আমার দিকে। অর্থাৎ বজ্রিতকে বস্তু যে সম্বন্ধ করেছিল—এবার? নেহাৎ বজ্রিত সামনের উপর বলে কথগুলো বলল না তোলা বইল জানি, নিরীহবিলিতে হৃদে-আসলে শোধ নেবে। আমি সাস্তা দিই : তাই কেন বজ্রিত? ক্রমাল আরও আছে, আর একটা দেবো। টাকা দশটাও দিয়ে দেবো বিয়ের লাভটা মাস মাত্র বাকি—টাকা এখন তোমার কাছে দশ মাহরের সমান। তোমার টাকা-ক্রমাল যে নিয়েছে সেই লোকই আমার লেখার ঘরে ঢুকে কলম চুরি করেছে। দিন দুপুরে ঘরে ঢুকে চুরি করেছে। ছাড়ব না আমি, ডটেকটিভ লাগিয়ে চুরির আঁকরা করব।

ধাক্কা নয়। একেবারে হাতের কাছেই ডটেকটিভ—দুর্গাদাস। আমার খুব খাতির করে। বজ্রিতের বস্ত্রকণ বজ্রিত মাত্র ছিল, ডটেকটিভের নামোচ্চারণের উপায় ছিল না, শাস্তা আস্ত বাপত না তা হলে আমার। তৃতীয় লোক এসে পড়ায় এখন আর বাধা নেই।

কলমটা চাই দুর্গাদাস, তবে বুঝব তোমার ক্ষমতা।

দুর্গাদাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আভোপান্ত স্তনল। বলে, তদন্ত আমরা বাড়ি থেকে শুরু করি। আপে চাকর-বাকর—

লিউয়ে উঠে বাধন করি : দাদা বলে মাত্র করো, আমার কেন বিপদে ফেলবে।

চাকর নামে যিনি এ বাড়িতে বিচরণ করেন, আসলে তিনি গুরুঠাকুর—

যাতির দুর্গাদাস পক্ষান্ত বন্দায়। বলে, ডুয়ার থেকে কলম নিয়ে গেছে। বাকি ডুয়ার শুদ্ধ হাতিয়েছে নিশ্চয়? যেমন আছে ঠিক তেমন থাকবে, আপনার কি বউদির কারো হাতের ছাপ না পড়ে।

রজিতকে ডেকে সেই কথা, তোমার খোলা ট্রাক যেমনটি আছে, বেধে দাও। হাতটা থাকুক এমনি, সকালবেলা আমাদের লোক আসবে।

পরের দিন কিষ্কার প্রিন্ট বিশেষজ্ঞরা এসে গেল। ম্যানিকাইং মাস যুরিয়ে এখানে-ওখানে বিস্তরক্ষণ প্রাণধান করে দেখে। টেবিলের উপর আর রজিতের বাস্তব গুঁড়ো মতন ছড়িয়ে সন্তর্পণে মুছে দেয়। ক্যামেরা নিয়ে এসেছে টুকটুক করে কোটো তুলল বিস্তর। দলবল নিয়ে বিদায় হয়ে গেল।

কদিন পরে দুর্গাদাসের আবির্ভাব।

হমিস পেনে কিছ ?

তাজিলোর স্তরে দুর্গাদাস বলে, পাব না মানে ? এই বিজ্ঞানের যুগে চোর ধরা তো ভাল-ভাতেই সামিল। চুরি করতে এসে চোর নাম-ধান লিখে রেখে যায়। লেখা সব নিয়ে এসেছি, শুধু পড়ে নেবার অপেক্ষা। আঙুলের ছাপের একগাল কোটোগ্রাফ বাগ থেকে বের করল। দুখানা বাতাই করে নিয়ে মেলে ধরল সামনে : দেখুন—

আমি কি বুঝব ? তুমি পড়তে জানো পড়ে দেখে যা বলবার বলো। কিছু বিরক্ত হয়ে দুর্গাদাস বলে, কেন বুঝবেন না ? কানা মানুষেও বুঝতে পারবে। কোটো হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, মিলিয়ে দেখুন। এই ছাপ আপনার টেবিলের উপরের, আর এটা রজিতের বাস্তব। কি দেখছেন বলুন এবারে ?

দেখাচ্ তো অঙ্কারই শুধু কিছু সে কথা প্রকাশ করে বলা যায় না। দুর্গাদাস সদয় হয়ে বুঝিয়ে দিল : কার্ড মিলিয়ে দেখুন, হব্ব এক। একই হাতের আঙুলের ছাপ। দুটো মানুষের মূখের আলল কিছ হাতের লেখা যেমন এক হয় না, আঙুলের ছাপও তেমন একরকম হবার জো নেই। চাক্ষুষ প্রমাণ দেখিয়ে দিই, আহুন।

বাগের মধ্যে দেখছি কালির পাড়ও রয়েছে। সত্যতির অপেক্ষা মাত্র না করে পাড়ের কালি আমার বুড়ে। আঙুলে মাখিয়ে দুর্গাদাস ছাপ তুলে নিল। রজিতকে ডাকে : তুমি এসো। তারও আঙুলের ছাপ নিল।

দুটো ছাপ চোখের সামনে নিয়ে ভাল করে দেখে আমার হাতে দিল : একেবারে আলাদা দেখছেন ? হুঃই হবে। সিদ্ধান্ত তা হলে কি দাঁড়াচ্ছে ?

আনাড়ির মতো বলে ফেলি, আমার কলম আর রজিতের কলম একই লোক নিয়েছে।

সায় নিয়ে দুর্গাদাস আরও জুড়ে দেয় : সেই লোক আপনি নন, রজিতও নয়। যেহেতু ছাপ আলাদা। চোর হ'ল বাইরের, দিন দুপুরে বাইরে থেকে এসে ঢাকে—

পরলা নব্বয়ের ঘুঘুচোর লে মাহুয়—

কিন্তু মাহুয়টা কে, ধরো।

হুর্গাদাস তাক্কিলোর হয়ে বলে, তদন্তের পনের আনা সেরেছি তো ঐ এক আনাও বাকি থাকবে না দাদা। মাহুয় ধরব, দেখিয়ে নিয়ে যাবো।

অবাক হয়ে বলি, একআনা কি বলছ হুর্গাদাস? আরও তো বাড়ল গোলমাল— ঘর নাকচ করে অজানা সমুদ্রে দাপাদাপি।

হুর্গাদাস বলে, অজানা নয়, সমুদ্র নেই আর। ঘুঘুচোর বলেই স্বাবধা, পুতুরের মাছের নতুন তারা সব আমাদের কাছে জিয়ানো থাকে।

রেজেক্সি-পাতায় নামধাম কাজকর্মের ফিরিস্তি, লাইব্রেরীতে ফিংগার-প্রিন্টের বিপুল সংগ্রহ। ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে হাত কড়া পড়ানোর কাজটুকু মাত্র বাকি এখন। মাহুয় আমি আন্দাজে ধরছি একজন দু-জন নয়—ভারী-সারি দিবা একটি দল। একলা তোমার বাড়ি নয় দাদা, পাড়ায় পাড়ায় এমন বহুসংখ্য চুরি হচ্ছে।

করিয়াক্ষা বটে হুর্গাদাস। পরের দিনই হাতকড়া পরানো একটি লোক নিয়ে আমার বাড়ি হাজির। চোর দেখতে সকলে বারান্দায় এসে জুটোঁছি। ককালসার চোরকে সামনে থেকে টানছে এক কনস্টেবল, পিছন থেকে ধাক্কা দেছে আর একজন। দুই ইঞ্চি চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে, নইলে মুখ খুবড়ে পড়ে যেত নিশ্চয়।

হুর্গাদাস রঞ্জিতকে বলে, চিনতে পারো কিনা দেখ। এ বাড়ির আশেপাশে কিবা পাড়ায় মধ্যে ঘুরে বেড়াতে দেখছ কিনা?

রঞ্জিত একনজরে আবিষ্ট হয়ে দেখছিল। খতমত খেয়ে বলে উঠল, কই না।

হুর্গাদাস হুকার দিয়ে শুঠে: ঠাহর করে দেখে বলা চোর হট্ করে ঘরে ঢোকে না। আগে থেকে ঘোরাঘুরি করে হালুক সন্ধান নেয়। তখন বুড় দিবাক্তানের উদয় হয়: হঁ, দেখেছি বটে।

চেঁচা লোকটা কাদো-কাদো হয়ে বলে, দেখেছ আনায়, কোথায় দেখেছ? ধর্মকথা বলা।

সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে হুর্গাদাস তার চুলের মুঠি ধরল: আবার চালাকি খেলাঁচস? খেলা করে পার পাবেনে, মাতা জিনিস সঙ্গে ভাবে স্বীকার কর।

লোকটা তটস্থ হয়ে বলে, যে আজ্ঞে। এই বাস্তব এই বাড়ি থেকেই নিয়েছি আমি। টিনের বাস্ক থেকে টাকা নিয়েছি, টেবিলের খোপ থেকে কলম।

প্রশ্ন করি, কি রকম টেবিল আমার বড় না ছোট? কি বড়ের? টেবিল আছে কোন্ ঘরে।

হুর্গাদাস আহত কণ্ঠে বলে, ঐটা কিন্তু আপনার জুলুম দাদা।

অত্যাচারই বলব। টুক করে এসে কাজ সেরে চলে গেছে তার মধ্যে ফিতে মেপে টেবিলের মাপজোখ করবে? ঘর নিরীক করে রাখবে। এত সময় ছিল কোথা?

জেরা করবেন না, জেরায় হেরে যাবে।

লোকটাও কবুল জবাব দিল : আজ্ঞে না, জেরায় পেরে উঠব না। বেশ, জেরা বন্ধ। পায়ের উপর ছড়া ছড়া দাগ কিসের বাপু? এটা কিছু মাপ-ছোপের ব্যাপার নয়, এটা বম্বো।

দুর্গাদাস হেসে বলে, জবাব দেবে। সত্যি কথাই বলবি। দাদা কত কি সম্বেহ করছেন হয়তো। এত পেটে মরি, বদনামের তবু অস্ত্র নেই। কি হয়েছিল, পায়ের উপর কিসের দাগ শুভলো?

একবার দুর্গাদাসের নিকে তাকিয়ে লোকটা বলে, মশা বড় লক আপে, পানিকটা আপন মনে দুর্গাদাস বলে, এতদূর বুঝতে পারিনি। আজকেই মশারির বন্দোবস্ত হবে, মশা আর কানড়াতে পারবে না।

আমি বললাম, তাই তো উচিত গড় গড় করে সবটাই স্বাকার করে গেল, এর উপরে আর মশা নিয়ে কানড়ানো উচিত হবে না। কিন্তু আসলে কিছু হয়নি দুর্গাদাস। চোরের গরজ নেই, আমি চাই কলম। অমন কলম একটা বই দুটো হয় না।

দুর্গাদাস মাথা চুলকে বলে, সেই তো মুশকিল দাদা। বামাল চোরের সঙ্গে পাচার করে দেয়। খুন করে ফেললেও তারপরে আর খোঁজ নিতে পারে না। চোর ধরে এনে লেখিয়ে গেলাম, কলম আনতে পারব কিনা কথা দিতে পারি নে।

সবেরজমিন তদন্ত করে চোর নিয়ে দুর্গাদাসের দলটা চলে গেল। এতক্ষণের নির্বাক দর্শক শাস্ত্র এইবারে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, তুমি যেন খুশি নও, মনে হচ্ছে? রঞ্জিত কসকে গেল সেই ভূঁয়ে? সংসারের মালিক হলে তুমি আমায় মা বলতে অজ্ঞান, সেই দোবে রাখতে না চাও স্পষ্টাস্পষ্ট বলে দিলেই তো হয়। নির্দোষীকে কলহ দিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা কেন?

রঞ্জিত জানতাম সিঁড়ির ঘর মুছতে চলে গেছে। তা নয়, হতভাগাটা ওঁত পেতে দাঁড়িয়েছিল, দেরি ঠেলে হঠাৎ নাটকীয় ভাবে ঢুকল। বলে, এখন চলে গেলে সম্বেহ আসবে সেই ভক্ত আছি নয় তো সেই চুরির দিনই বিদায় হয়ে যেতাম। গুণগোল মিটে গলে তারপর একটা দিনও আর থাকব না, এই আমার বলা বইল। শাস্ত্রা কটমট করে তাকাচ্ছে! বিগলিত কণ্ঠে বলে উঠি : এটা কি হল বাবা রঞ্জিত, আমাদের দু'জনের কথাবার্তার মতো ছেলে হয়ে কেন আড়ি পাতবে? শাস্ত্রা বকাবকি করে সেই সঙ্গে তুমিও যদি লাগো, বাড়ি ছেড়ে আমি বেরিয়ে পড়ব। মায়ে ছেলের মতো চালাওগে তোমাদের সংসার।

তবু নড়ে না দেখে আচ্ছা এক তাড়া দিয়ে উঠলাম : যাও, দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। চেতরাখানা ক দাঁড়িয়েছে, আয়না ধবে দেখ চানটান করে পেতে বসো'গ এবার।

রঞ্জিতকে ঠাণ্ডা করলাম : তবু শাখা ভ্রুটি করে : গোড়া কেটে আগায় জল,

লবাই বুঝতে পারে। মুখেই ছেলে ছেলে করছ—বিশ্বাস করো ওকে? তা যদি হত, লেখার ঘরে তাল দিলে বেরুতে না অমন।

সেটা বাচ্চুর অত্যাচারে। সেদিন দেখলাম, ঘরে ঢুকে টেবিল হাতুল-পাতুল করছে।

বাচ্চা হ'ল পাশের ক্যাটের। আসে সে প্রায়ই, কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জেঠা-জেঠা করে আমার।

শাস্তা তাই বলল, বাচ্চার অত্যাচার তো নতুন নয়। কলম চুরি ঘাবার পর থেকেই তুমি তাল দাঁটাটাই করছ। রজিত কি মানে বোঝে না এর?

তারপর ঠাণ্ডা মাথার আত্মপাস্ত ভেবে নিয়ে শড়ার চাবি রজিতকেই দিয়ে দিলাম। দেখ বাবা, চাবি হারানো আমার যোগ। কত যে চাবি হারিয়েছে, গোনো গুণতি নেই। সখচ ঘর খুলে রাখবারও জো নেই বাচ্চাটা ইদানীং বড় বাড়িয়েছে। তুমি দেখে দাঁও চাবি, আমি এলে খুলে দিও।

এই মাত্র নয়, ক'দিন পরে আলমারির চাবি গুঁজে দিই তার হাতে। যে আলমারিতে আমার টাকা পয়সা থাকে : এই ভারটাও নিতে হবে বাবা। তোমার মা ধরচে মাল্টি, এক হস্তার খরচা করে ফেলে সারা মাস উপোষ করাবে। আর আমিই বা লেখাপড়া ফেলে এক টাকা দু-টাকা করে কাঁহাতক বের করে দিই। তোমাকেই সব দেখেগুনে বিলিব্যবস্থা করতে হবে। চাপটা বেশি হয়ে যাচ্ছে জানি, কিন্তু উপায় নেই বাবা।

চাবি হাতে নিয়ে রজিত ক্রমশ এক আচ্ছন্নভাবে ডাকিয়ে থাকে। চোখ ছলছল করে যেন তার। শাস্তাই তখন বলে, বাড়াবাড়ি তোমার। যিচ্ছে সন্দেহ করবে না—তা বলে কি অমনি ঢেলে বিশ্বাস করতে হবে। এমনি ব্যবস্থার ভিতরেও আমার চুরি হ'ল। হাতঘড়ি আমার। সন্দেহ পাছে রজিতের উপর পড়ে, সেই শঙ্কায় আমিই শতকণ্ঠে নিজের দোষ বলছি : ভুলো স্বভাব যে আমার। ঘড়িটা হাতে করে নিয়ে বাইরের বেঞ্চিতে বসে ছিলাম। কথায় কথায় পরতে আর মনে নেই, ওখানে ফেলেই চলে গিয়েছি। তারপর দফাদার এসেছে, ডাকশিগুন এসে চিঠি দিয়ে গেছে—পেশাদারি চোরও হতে পারে। দুর্গাদাসকে ডাকি। বেকির ওদিকটা কেউ তোমারা যেও না—সে এসে হাতের ছাপ চাপ নিয়ে তদন্ত করুক।

ঠোট উন্টে অবজ্ঞা করে রজিত বলে, করবে কচু আর ধোঁচু। ডাঁওতা দিয়ে গুচ্ছেব টাকা নেবার কিকির।

তা বললে হবে কেন রজিত। কলমের চোর ওই তো ধরল। বাড়ি এনে দেখিয়েও গেল চোরকে।

রজিত বলে, কলম দিল কই?

আরো কঠিন ব্যাপার সেটা। চেষ্টা করছে। তবলা দিল এই মাসের ভিতরেই

পাওয়া যাবে।

রঞ্জিত বলে, ছোড়ার ডিম।

মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে আমার পায়ের উপর অঁছড়ে পড়ে : আমি নিয়েছি কলম।
মারতে হয় মাকুন, কাটতে হয় কাটুন। আমারই দোষে একটা লোক মিছামিছি
মারগুতোন খেয়ে গেলো।

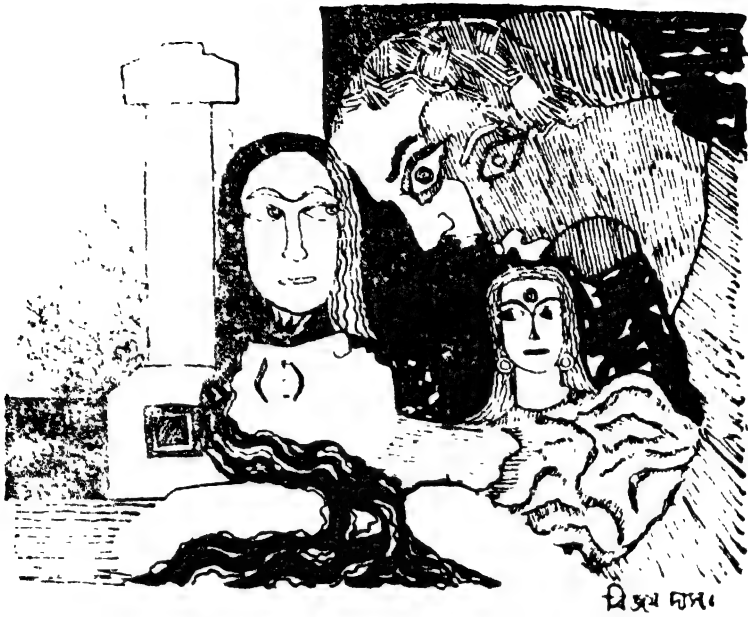
দু-চোখে জল পড়ছে তার, ভুলে ধরে আমি হাসছি। রঞ্জিত বলে, গিয়েই জন্ত
ধরেছে তো সকলে—দনেরো টাকার দরকার। লোভে পড়ে নিয়েছিলাম। কলম
আবার আমি বাড়ি এনে রেখেছি। আপনি ধরেছিলেন ঠিকই। আপনার দুর্গাদাস
কিছু জানেন না, ঠিক জানা অনর্থক।

হাসতে হাসতে বলি, না, আনব না। পড়ি আমি নিজে নিয়েছি। এবারের চোর
আমি।

শাস্তা কখন এসে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে চেয়ে বলি, শুনেছ সব?

দুর্গাদাসের চেয়ে বড় ডেকটিভ তবো আমি—কি বলো?

মনোজ বসু : জন্ম ১৯০২ সালে যশোহর জেলার ডাকাঘাটা গ্রামে। বাগেরহাট
ও কলকাতায় কলেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত। কলকাতার বাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ফাঁকে
ফাঁকে সাহিত্য অন্তর্দীপন লেখককে অনতিবিলম্বে অবিভক্ত বাংলার এক বংশীয়
সাহিত্যোক্তের মর্যাদা দেয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা অস্বাভাবিক
গ্রন্থ “ভুল নাই” একদা জনপ্রিয়তার ঝড় তুলেছিল। “চীন লেখে এলাম” লেখকের
নবীন চীন ভ্রমণের এক জনপ্রিয় মনোজ্ঞ বৃত্তান্ত। এছাড়া শিক্ষক সম্ভার অভিজ্ঞতা
অভিজ্ঞান “মাগুয় গড়ার কাঁচগর” লেখকের অন্ততম বহুল প্রচারিত গ্রন্থ। তবে
প্রথম জীবনে বুদ্ধপূর্ব ও মুক্তোত্তর কালের ঝড় বিক্ষুব্ধ জগৎ ও জীবনের হতাশার দীর্ঘ
নিঃশ্বাসের মধ্যেও লেখক রোমান্সের “বনময়র” ধরিতে আমাদের আন্দোলিত
করেছেন। পরবর্তীকালে বাস্তবাত্মক পটভূমিকায় তাঁর সম্ভারণ তাঁকে এক বিশেষ
মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। লেখকের সৃষ্ট গল্প, উপগল্প, ভ্রমণকথা ও নাটকের বিরাট
ও বিচিত্র সম্ভারের মধ্যে গোয়েন্দা ও রহস্য গল্পও একটি নির্দিষ্ট স্থান করে নিয়েছে।
তাঁর “ডিকোটভিভ” গল্পটি কল গোয়েন্দা গল্পই নয়। গোয়েন্দা গল্পও যে সার্থক
গল্প হয়ে ওঠে তার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত।



দ্বিতীয় চিত্র

কুয়াশায় ঢাকা মুখ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

পারিজাত বস্তু সব দরজায় পা দিয়েছেন, এমন সময় ফোনের শব্দ।

এ সময়ে আবার কে ফোন করছে? অবশ্য পারিজাত বস্তুর কাছে ফোন করার সময় অসময় নেই। থাকতে পারে না। মাহুসের মরপদ তো আর দিনক্ষণ বুঝে আসে না। পারিজাত বস্তু ফিরে গেলেন।

ক্রান্তির থেকে ফোনটা তুলে ফোনের কাছাকাছি নিয়ে যেনই বাজ খাট কর্তৃক শুনে পেলেন, পারিজাত-দাবু আছে—?

চেনা কর্তৃক। এ কর্তৃক ফোনের ভিতর দিয়ে সবসময় যেতে দেওয়া হয় না।

আজি এবং কথা বলছি—পারিজাত বস্তুর মোলায়েম ঘর।

কোথায় থাকেন মশাই? আশ্চর্যটা ধরে ফোন বেজ হাঙে

যাঁর কর্তৃক তঁনি ডুবানীপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জ মাহিম রুস্তা এমন সার্বক-
পদবী লোক সচরাচর দেখা যায় না।

প্রশ্নটা এড়িয়ে পারিজাত বস্ত্রি বললেন, কি ব্যাপার বলুন ?

ব্যাপার গুরুতর। আসতে পারেন একবার ?

একটু দেরী হবে।

কত দেরী ?

একবার ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট-এ যাব। অসিতবাবু তলব করেছেন। কতক্ষণ লাগবে জানি না।

যতক্ষণ লাগুক, আমি অপেক্ষায় থাকব। চলে আসবেন।

পারিজাত বস্ত্রি জানান, ফোনে মহিম কহু এর বেশী একটি কথাও বলবেন না। কেমের সর্ষকোইনি সামান্য-সামান্য ছাড়া কিছু বলেন না।

ফোন নামিয়ে বেগে পারিজাত বস্ত্রি বোরয়ে পড়লেন।

ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট থেকে পারিজাত বস্ত্রি ছাড়া পেলেন বাবোটা নাপ্রাদ। সেখান থেকে সোজা ভবানীপুর থানা।

চুকেইই সন্ধ্যা সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা হ'ল। চালের চোরাকারবারীদের নিয়ে ব্যস্ত।

কলাগ সোম মহিম কহুের সহকারী। কিন্তু স্বভাবে একেবারে বিপরীত।

পারিজাত বস্ত্রিকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যান, স্ত্রীর আপনার জন্ত অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছেন।

একেবারে ভিতরের ঘরে গিয়ে দেখল, মহিম কহু অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন। হাতছুটো পিছনে।

আমি এসে গেছি মিঃ কহু।

বলার অপেক্ষা না করে পারিজাত বস্ত্রি নিজেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন।

উদ্ধার করেছেন। বলেই কহু নিজেকে সামলে নিলেন। গলার স্বর খাঙ্গে নামিয়ে বললেন, একেবারে বসে কথাবার করে এলেন।

পারিজাত বস্ত্রি কেন উত্তর দিলেন না।

মহিম কহু নিজের চেয়ারে বসলেন। সামনের টেবিলের ওপর ততো হাত রেখে বললেন—আপনার তেঁতে বছর কাটিয়ে দিতে পারলে বাঁচি মশাই। আমার আর এক্সটেনশনে দরবার নেই।

কি বল ?

কি হ'ল না তাই বলুন। বায় বাহাজুর মতুল সংস্কারে হয়ে নারী গেছে। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট বলছে, ১৫ বছর কয়লায় মৃত্যু, কিন্তু বিষ এল কোথা থেকে, কে দিল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

মেয়েটির বয়স কত ?

বছর বারো।

তাহলে বার্ষ প্রেমের প্রসঙ্গটা অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়।

অবশ্য আজকালকার মেয়েরা বারোতেই কাছ হরে যাচ্ছে, কিন্তু এ মেয়েটি খুবই কীণজীবী। সে বরম কিছু বলে মনে হচ্ছে না।

মাত্র পয়ত্ত ব্যাপারটা ঘটেছে, এর মধ্যে সহকারী কমিশনারের তিনবার ফোন এসেছে কেসটার সম্বন্ধে। অতুল সিংহের সঙ্গে কমিশনারের আবার খুঁই দহরম মহরম, আচ্ছা কামেলা।

কেসটা গোড়া থেকে আমাদের বলুন তো।

পারিজাত বস্ত্র চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজলেন।

তখন তাহলে, মহিম রুত্র ব্যাক থেকে একটা ফাইল টেনে নিয়ে চোখ বুঁজিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল, অতুল সিংহের বাড়ী টার্ক রোডে। এক সময়ে অভ্রাণতি ছিলেন। লোকে বলে মাইকা কিং। নিজেই সব দেখাশোনা করতেন। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটি বিলাতে কেটিং করতে গিয়ে বরফ ফেটে মারা গেল। সেই শোকে, এক মাসের মধ্যে অতুল সিংহের স্ত্রী মারা গেলেন। অতুল সিং বাতে পড়ু হলেন। কারবার এক গুজরাটিকে বিক্রি করে বাড়ীতেই বসে রইলেন সবল ওই মেয়েটি। মেয়েটিকে দেখবার জন্য নব্বাণ থেকে দূর সম্পর্কের এক বোনকে নিয়ে এলেন। বিধবা বোন।

একটা কথা, মেয়েটি লেখাপড়া করত না?

না, স্কুলে যেত না, বাড়ীতে এক দ্বিগ্নিমণি পড়িয়ে যেত।

তারপর?

তারপর রোজ সকালে অতুল সিংহ ছু-পায়ে বাগের চাঁবি মাঝতেন বাতের জন্য সেই সময়ে মেয়ে রোজ কাছে বসে থাকে, সেদিন মেয়েকে দেখতে পেলেন না।

বোনকে ডাকলেন, নীহার মলিকে দেখতে পাচ্ছি না।

খুঁচ্ছে।

এখনও খুঁচ্ছে।—অতুল সিংহ দেয়াল ঘড়ির দিকে দেখল। ন'টা বেজে গেছে।

ন'টা বেজে গেছে, এখনও খুঁচ্ছে? শরীর বারাপ হ'ল নাকি?

চেয়ারের পাশ থেকে মোটা লাঠিটা তুলে নিয়ে অতুল সিংহ বোনের সঙ্গে মেয়ের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

দরজার আশে আশে ধাক্কা দিয়ে বললেন, মলি, মলি, অনেক বেলা হয়ে গেছে মা উঠে পড়।

কোন লাড়া নেই।

নিহার মলির পাশের ঘরে গুত্ত। ছু-ঘরের মধ্যে বাওয়া আশার দরজা আছে। অতুল সিংহ সেই দরজা দিয়ে মেয়ের ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

মলি বিছানায় শুয়ে। তার শোয়ার ভর্জীটা অতুল সিংহের ভাল মনে হ'ল না। তিনি মেয়ের কাছে এসে একটু খুঁকেই চাঁৎকার করে উঠলেন।

ডাক্তার এল। পাড়ার ডাক্তার। জানিয়ে দিল, মলি আর বেঁচে নেই। তারপর ঝান্ন খবর এল। আমরা গেলাম। আমাদের করণীয়া লব করলাম।

এখানে পারিজাত বক্সি বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল, অতুল সিংহের বাড়ীতে কে কে থাকে?

অতুল সিংহ, মেয়ে মলি, বোন নীহার। বাইরের লোকের মধ্যে একজন বাহার লোক, একটা ঝি, একজন ড্রাইভার। ড্রাইভার নেপালী। নাম জং বাহাদুর। সে আউট হাউসে থাকে।

পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা একবার দেখতে পারি।

এই তো ফাইলেই আছে। মহিম কত্র পোটা ফাইলটা পারিজাত বাক্সির দিকে এগিয়ে দিলেন।

পারিজাত বাক্সি মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

তুধু পোস্টমর্টেম রিপোর্টই নয়, সকলের জবানবন্দী।

এই সময়ে মহিম বেরিয়ে গেলেন। ওপরেই তাঁর কোয়ার্টার। সেখানে উঠে গেলেন। একটু পরে বখন নেমে এলেন, তখন পারিজাত বক্সির ফাইল পড়া শেষ। তিনি দু'হাত কপালে চেপে চুপচাপ বসে আছেন।

মহিম কত্র পিছনে ট্রে নিয়ে একজন চাকর ঢুকল। ট্রে ওপর গ্রেটে লুচি তরকারী, ধুমায়মান চায়ের কাপ।

চায়ের আগুয়াজে পারিজাত বক্সি মুখ তুলে দেখলেন।

দেখেই চোঁচিয়ে উঠলেন, আবে এসময়ে এঁকি করেছেন?

মহিম কত্র হাসলেন। আমাদের আবার সময় অসময়। নিন, মুখে তুলে দিন।

খেতে খেতে পারিজাত বাক্সি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা ওই মেয়েই তো অতুল সিংহের একমাত্র অধিকারিনী ছিল তাই না?

মহিম কত্র ঘাড় নাড়লেন, হ্যাঁ তাই।

লব হত্যাকাণ্ডের পিছনে একটা মোটিভ থাকে। এক্ষেত্রে মলির মৃত্যুতে লাভবান কে হবে?

যানে?

যানে মলি না থাকতে অতুল সিংহের সম্পত্তি কার পাবার সম্ভাবনা?

মহিম কত্র প্রশান্ত হাসলেন।

সেদিকটা যে আমি তাবি নি, তা মনে করবেন না। খোঁজ নিয়ে জানলাম অতুল সিংহের ডাইনো সম্পত্তি পেতে পারে। কিন্তু সে থাকে পাটনায়। ব্যবসা করে। আজ দু-বছর এদিকে আর্দে নি।

ঠিক আছে, খাওয়া শেষ করে পারিজাত বস্ত্র উঠে দাঁড়ালেন, আজ বিকেলে একবার অতুল সিংহের সঙ্গে দেখা করতে চাই। সুবিধা হবে?

মহিম রুদ্র বললেন, আলবাৎ হবে। কটা নাগাদ?

ধরুন পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা।

ঠিক আছে, আপনি সাড়ে চারটে নাগাদ এখানে চলে আসুন। এক সঙ্গে যাওয়া বাবে আমি বলে দিয়েছি, আমার হুকুম ছাড়া ও বাড়ীর কেউ শহর ছেড়ে যেতে পারবে না।

পারিজাত বস্ত্র চলে এলেন।

খাওয়া লাওয়ার পর নিজের পাইত্রেরীতে বসে 'টক্সিন' সম্বন্ধে মোটা মোটা গোটা চারেক বইয়ের পাতা ওন্টালেন। গোটা তিনেক ফোন করলেন।

যখন ভবানীপুর থানায় পৌঁছলেন তখন কাঁটার কাঁটার সাড়ে চারটে।

মহিম রুদ্র তৈরী হয়েই অপেক্ষা করছিলেন। পারিজাত বস্ত্রের মোটরে এসে উঠলেন।

মোটর যখন সিংহ লজ্জ-এর সামনে এসে থামল, তখন প্রায় পাঁচটা, সাদা রংয়ের আধুনিক ডিজাইনের বাড়ী। সামনে বাগান। বড় লোহার গেট। মোটর গেট পার হয়ে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

কলিং বেল টিপতেই একটা লোক এসে দাঁড়াল।

মহিম রুদ্রকে দেখেই তার মুখ শুকিয়ে গেল। বোকা গেল এর আগে জেয়ার জেয়ার হয়েছিল।

বাবু আছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ধরুন নাও, আমরা একটু দেখা করতে চাই।

চাকর ভিতরে গিয়ে একটু পরেই বেরিয়ে এল।

আসুন।

চাকরের পিছন শিছন দুজনে বসবার ঘরে এল।

মেকের ওপর লামৌ কার্পেট, বৃহৎ আকারের সোফা সেট, গুদুস্ত পেলমেট শুধু গৃহস্থারীর অবস্থা নয়, তাঁর কচিরও নিদর্শন।

একটু পরেই অতুল সিংহ ঘরে ঢুকলেন। মাথায় কাঁচার পাকায় বেশানো চুল, চোপে হাই পাওয়ার চশমা, হাতে লাঠি। বিষয় মুখের চেহারা। ভুল্ললোক ঘন বিধ্বস্ত।

মহিম রুদ্র পারিজাত বস্ত্রের পরিচয় দিতেই অতুল সিংহ এগিয়ে এসে পারিজাত বস্ত্রের জুটো হাত আঁকড়ে ধরলেন, আপনার কথা খুব শুনেছি। আপনি আমার মেয়ের স্বত্বের ব্যাপারটার একটা কিনারা করে দিন। ফুলের মতন মেয়ে। তার এ সর্বনাশ

কে করবে ? মেয়েকে আর কিরে পাব না জানি, কিন্তু তবু আততায়ীকে আমি চিনতে চাই।

অতুল সিংহ বে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, সেটা আর কথাবার্তাতেই বোকা গেল।

পারিজাত বক্সি চাপা অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার হাকে সন্দেহ হয় ?

আমার ? কাকে সন্দেহ হবে ? নিজের কপাল ছাড়া আমি কাউকে দায়ী করি না।

আপনার ভাইপোর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ?

ভাইপো ? মানে সুনাল, যে পাটনায় থাকে ? তার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। এমন কি চিঠিও নেই।

তিনি তো ব্যবসা করেন ?

হ্যাঁ, সুনেন্দি সিকেশ্বরী ব্যবসা।

আপনাকে একটা বিনিময় প্রশ্ন করছি, কিছু মনে করবেন না। এখন যা অবস্থা, আপনার অবর্তমানে আপনার স্বাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির মালিক তো হুনালবাবুই হবেন ?

তখনই অতুল সিংহ কোন উত্তর দিলেন না। লাঠির ওপর মূখ রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে বসেছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আইন অনুশাসনে অবস্থা তাই হবার কথা, কিন্তু তা হবে না। আমি স্থির করেছি আমার সব কিছু আমি এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে দান করে থাকো।

ভাইপোকে বঞ্চিত করবেন ?

পারিজাত বক্সি এ প্রশ্নের উত্তরে অতুল সিংহ নিজের দুটো হাত জোড় করল, মাফ করবেন। এ নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না।

পারিজাত বক্সি আর মহিম কত্বে দৃষ্টি বিনিময় করলেন, তারপর পারিজাত বক্সি বললেন, একবার নাহার দেবার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

অতুল সিংহ বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, ভুবন, ভুবন

ভুবন বোধহয় কাছাকাছিই ছিল। শুকনো মুখে এসে দাঁড়াল।

বাবু

পিসিমাকে একবার আসতে বল।

মিনিট পনের পরেই নাহার এসে দাঁড়াল। বয়সের তুলনায় অনেক শক্ত সমর্থ চেহারা। ফিফেন ধুতি, সফ্র কাল পাড়। ধবধবে সাদা ব্লাউজ। শোকার্ত কিন্তু একেবারে মুখের পড়া নয়। ঘরের মধ্যে ঢুকে একবার মহিম কত্বের দিকে আর একবার পারিজাত বক্সির দিকে দেখল।

কোণের একটা চেয়ার দেখিয়ে পারিজাত বসি বললেন, বসুন।

নৌহার বসল। কোলের ওপর দুটি হাত রেখে।

পারিজাত বসি প্রশ্ন করলেন, আপনি তো মলির পাশের ঘরেই থাকতেন।

পাশের ঘর কেন বলছেন, বলুন একই ঘর। মাঝখানে শুধু একটা কাঠের পার্টিশন।

ভাল। মলি কি ভাবে মাঝা গেল, তা আপনি কিছু টের পান নি?

একেবারেই না।

সেদিন মলির কাছে কে কে এসেছিল মনে আছে?

ইয়া, মনে আছে বই কি। দাদা আর আম তো গেছিই। তুবন আর জং বাহাদুরও একবার গেছে।

বাইয়ের কেউ?

না, বাইয়ের কেউ আসে নি।

তুবন কেন গিয়েছিল?

ওভালটিন দিতে। মলি ঘুমছে দেখে ওভালটিন ফিয়ারে নিতে গিয়েছিল।

আর জং বাহাদুর?

জং বাহাদুর মোটরে করে অপেক্ষা করাচ্ছিল। ভোরবেলা মলি বেড়াতে যায়। তার দেবী দেখে খোঁজ করতে এসেছিল।

আচ্ছা নৌহার দেবী, শুনেছিলাম মলির ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, এরা ভিতরে গেল কি করে?

আমার ঘরের মধ্যে দিয়ে। আমি খুব ভোরে উঠে ঠাহুর ঘরে বাই। আমার দরজা খোলাই থাকে।

আপনি তো শুনেছেন মলির বিবিক্রয়ার কথা হয়েছে।

দাদার কাছে শুনেলাম।

এদের ওপর আপনার সন্দেহ হয়?

মোটাই না। এরা প্রায় বাড়ীর লোকের মতন। তুবন বহু বছর বায়ার কাজ করছে, ড্রাইভার জং বাহাদুরও খুব বিশ্বাসী।

মহিম কত্রেব দিকে কিরে পারিজাত বাক্স জিজ্ঞাসা করল, একজন কি আছে না এ বাড়ীতে? নৌহার উত্তর দিল, শোভার মা। ঠিক কি। সে ছুবেলা বাসন মেজে, ঘর কাঁট দিয়ে চলে যায়। তাকে এখন পাওয়া যাবে না।

পারিজাত বসি উঠে দাঁড়ালেন, আজ তাহলে চল। দরকার হলে পরে একদিন আসবো।

মহিম কত্রেব জিজ্ঞাসা করল, তুবন আর জং বাহাদুরের সঙ্গে কথা বলবেন না।

আজ থাক। অন্য একটা কাজ আছে।

পাৰিজাত বন্ধি বেৰিয়ে এলেন। শিছন শিছন মহিম কল্প।

দবঙ্গ পাব হতে সিয়েই পাৰিজাত বন্ধি নামলে নিলেন। আৰ একটু হলেই হোঁচট খেতেন।

ছোট আকাৰেৰ কুঁহৰ চৌকাঠেৰ পাশে শুয়ে। কুচকুচে কালো কুণ্ডলি পাকানো লোম। ঠিক যেন কালো তুলোৰ বস্তা। এত বড় বড় লোম যে চোৰঙলোও ঢাকা পড়ে গেছে।

বেশ কুঁহুটি তো!

পাৰিজাত বন্ধি কুঁহুৰেৰ ওপৰ খুঁকে পড়লেন।

অতুল সিংহ বললেন, কবি মালিৰ খুব ফেবাৰিট ছিল। ওর কাছেই থাকত। ওই এয় দেখাশোনা করত। মলি চলে যাবার পর থেকে বেচাৰি কি বকন নিঃস্বুম হয়ে গেছে।

পাৰিজাত বন্ধি কবিৰ লোমে হাত বোলাতে বোলাতে একবার জু কুণ্ডিত কৰলেন, তারপর বললেন, মনে হচ্ছে খুব শক্ত হয়েছে। চলুন যাই।

পাৰিজাত বন্ধি বাড়ি গেলেন না। ভবানীপুর থানায় এসে নামলেন। মহিম কল্পকে বললেন, মিষ্টাৰ কল্প, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

কি?

কাল অতুল সিংহ আৰ নীহাৰ দেবীকে কোন ছত্ৰোয় থানায় ডেকে এনে ষষ্ঠী দুয়েক কথাবার্তায় আটকে রাখতে হবে।

কারণ?

কারণ আমি একবার এদের ঘরগুলো সার্চ করতে চাই।

সে তো মাজা ভাঙেই হতে পারে।

তা হয়তো পারে কিন্তু এটা আমি এদের আনতে সিত চাই না। পারবেন তো?

না পারার কি আছে? কিন্তু বাড়ীতে তো আরও লোক থাকবে।

ভূবন আর জং বাহাদুর তো?

হ্যাঁ।

অতুল সিংহ আৰ নীহাৰ দেবী নিশ্চয় মোটেৰে আসবেন। জং বাহাদুর সঙ্গেই থাকবে। ভূবনকে আমি ম্যানেজ করে নেব।

তাই ঠিক হ'ল।

পরের দিন মহিম কল্প অতুল সিংহকে ফোন করল, নীহাৰ দেবীকে নিয়ে ছপুৰের দিকে একবার আসতে হবে।

আবার কি হ'ল?

এলে জানতে পারবেন। জং বাহাদুরকেও আনবেন।

মোটেরে যখন যাব, তখন জং বাহাদুর তো সঙ্গে থাকবেই। ঠিক আছে বায়োটা নাগাদ যাব।

খবরটা মহিম ক্রম পরিচািত বন্ধিকেও ফোনে আনিয়ে দিল।

ঠিক সাড়ে বারোটা।

পুলিশের পোশাক পরা, পাকানো গৌর, চোখে কালো চশমা এক ডব্রলোক অতুল সিংহের বাড়ীতে ঢুকলেন।

কে?

ভুবনের প্রশ্নের উত্তরে লোকটা বললেন, আমি থানা থেকে আসছি। অতুলবাবু তাঁর শোবার ঘরের টেবিলে একটা কাগজ ফেলে গেছেন, সেটা নিতে এসেছি।

আহ্ন।

ভুবন লোকটিকে নিয়ে অতুলবাবুর শোবার ঘরে ঢুকল।

কোন কাগজ?

ভুবন আর কথা বলতে পারল না। লোকটা তার নাকে একটা ক্রমাল চেপে ধরল।

শরীর কিম্বিকিম করে উঠল। হুচোখে অন্ধকার দেখে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

লোকটা দ্রুতপায়ে নীহারের শোবার ঘরে ঢুকে খাটের তলা থেকে ছোটো স্টেকেশ টেনে বের করলেন। পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে একটার পর একটা লাগিয়ে ছোটো স্টেকেশই খুলে ফেললেন। খুঁজে খুঁজে কাগজ পত্রগুলো পড়তে লাগলেন, তারপর একসময়ে নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়লেন।

বিকালের দিকে অতুল সিংহ আর নীহার থানা থেকে ছাড়া পেলেন। কেন যে ডেকেছিল বুঝতেই পারলেন না। মামুলি কতকগুলো প্রশ্ন।

বাড়ী কিরতেই ভুবন হাঁটমাউ করে উঠল, সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবু। ডাকাতি হয়ে গেছে।

সে কিরে?

ভুবন সব বলল।

কি হারিয়েছে খোঁজাখুঁজি শুরু হ'ল। অতুল সিংহের একটা ঘড়ি পাওয়া গেল না। আর সব ঠিক আছে।

আশ্চর্য কাণ্ড, তুচ্ছ দামের একটা ঘড়ির জন্য এত কাণ্ড!

নীহার নিজের আলমারি স্টেকেশ সব খুঁজে দেখল। না, কিছু হারায় নি, সব ঠিক আছে।

দিন চারেক পর—

নীহারই বলল, দাদা, মলি বাবার পর থেকে কবিটা কেমন মনমনা হয়ে আছে। ভাল করে খায় না। কেবল বাবার ওপর মুখ রেখে চূপচাপ হয়ে থাকে।

অতুল সিংহ উত্তর দিলেন, কবি মলিকে খুবই ভালবাসত। কুসুরটা বাঁচলে হয়।

ভূমি একবার ডেকে আদর কর।

ডাকৰ ? অতুল সিংহ বাইবেৰ দিকে চোথ ফিৰিয়ে ডাকলে-: কবি, কবি এদিকে
আয়।

কবি চাকারের কাছেই শুয়ে ছিল। প্রভুর ডাকে প্রথমে মুখ তুলে দেখল তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এল।

আয়, আয় অতুল মিঃ মাধনের দিকে খুঁকে পড়লেন।

ধর্মি আবেগে এগিয়ে এল! মুখ তুলে আবার দেখল তারপর লাফিয়ে অতুল
সিংহের কোলে উঠে পড়ল।

তার পানের মধ্যে হাত বোলাতে বোলাতে অতুল সিংহ চমকে উঠলেন, এ কিবে,
কি হয়েছে

শোণালী মধ্যস্থত নিয়েই অহুল সিংহ বেহে গেলেন। বাইরের জানলায় পাঁচিঙা বাক্সকে দখল গল।

अः लवानु, भावधानं ।

অতঃপর তিনি উল্লিখিত কবির নাম কাল থেকে লিখিয়ে নাচে নেমে পড়েন।

মতে 'মে' শব্দের ঘরে নাহা'র অর্থনাদ ।

অতঃপর ঐ দুটি পাশের বরে গিয়ে দখলেন, মহিম রক্ত নাড়িয়ে। ছজন পূর্ণল
নৌহাবের দু পাশে

কি ৩৯? অতুল মিঃ টেডিয়ে উঠলেন। এলিকে আসুন, আমি বলছি।

অতঃপর সাং. ফি.র. মেসার্স, পাণ্ডিত্য বজ্র কোলে ক'ব।

ସାତ୍ୟକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ-ନିହାରକେ ନିୟେ ଶାମ୍ଭେ ଓଲଟେ ।

অতঃপর তাৎক্ষণিক বন্ধকে দিয়ে বসবার ঘরে এলেন।

প্রশ্নের একটি ছিনস আপনাকে দেখাই।

পার্বত্য বান্ধা ঋষির লোমগুলো ফাঁক করে দেখান। খুঁসক একটা কিত্তে দিয়ে বাঁধা একটা কাঠের বান্ধা।

এই ব্যক্তির মধ্যে হাইড্রোশ্যানিক গ্যাস ভরা। যেই কবিকে কালে নেবে, সেই কৌতুহলঃ বশ্যতঃ হয়ে ব্যক্তের ডালাটা খুলবে আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু বরণ করবে; এই ভয়েই খাশনার মধ্যে মানব মৃত্যু হয়েছে।

କହୁ, ଏ କାହା କବଳ ?

যে করেছে ম'হম্মাদ তাকে আবেদন করে থানায় নিয়ে গেছেন।

ଆଧ୍ୟ ବାଧାଦେ । କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧତେ ମାର୍ବହି ନା ।

তখন আমি তাড়লে বুঝিয়ে বলছি। নীহারদেবী আপনার নাম সম্পর্কে বোন। তার খণ্ডিত জীবন খুব কলকম্বুত নয়। তাঁর সঙ্গে আপনার হাইপো হনীলবাবুর খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সেলাইয়ের ক্লাসে খাবার নাম করে নীহারদেবী যে বাইরে যেতেন, এ শুধু হনীলবাবুর সঙ্গে দেখা করার অজ্ঞ।

ডাকাত সেজে একবার এ বাড়িতে হানা দিবেছিলাম। নীহারদেবীর বাস ভলান্টী
গোয়েন্দা—১১

করে ছুটো 'চিঠি উদ্ধার করেছি। অবশ্য পাছে নীহারদেবী সম্মেহ করেন বলে সে চিঠি ছুটো আঁচ নিয়ে যায়নি। শুধু ফোটোস্ট্যাট কপি করে নিয়েছিল। এই হাইড্রো-নায়নিক গ্যাসের জোপানটা সুনীলবাবুই নিয়েছিলেন প্রয়োগ পদ্ধতিও তাঁর।

অতুল সিংহ প্রশ্ন করলেন, কিস্তি এর আগে পুলিশ তো সবাকিছু সার্চ করে গেছে, তখন তারা এ চিঠি ছুটোর সন্ধান পায় নি?

তখন নীহারদেবী চিঠি ছুটো সরিয়ে ফেলেছিলেন, তারপর পুলিশের হাজামা মিটে যেতে চিঠি ছুটো আবার বাস্কে রেখে দিয়েছিলেন। এ চিঠি ছুটোই তাঁর পরম অস্ত্র। এ ছুটো চিঠির ভয়ে সুনীলবাবু তাঁর প্রতিশ্রুত টাকা নীহারদেবীকে দেবেন।

তারপর যখন সুনীলবাবু কান্তে খবর পেল আপনি সম্পত্তি কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান করে দেবেন, তখন আপনাকে সরাবার প্রয়োজন হ'ল। দানপত্র করার আগে আপনার মুহূর্ত হলে উত্তরাধিকার আইন মার্কফ সম্পত্তি সুনীলবাবুর পাবার পথে কোন বাধা থাকবে না। সেইভাবে ক্রমিক আপনার কোলে তুলে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

স্কাউটেল : তার কি ব্যবস্থা করছেন আপনারা?

আজ সকালে বিহারের পুলিশ সুনীলবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে। এতক্ষণ বাংলার দিকে বন্দী হয়ে গেছে।

অতুল সিংহ পারিভ্রাজ্যে বন্ধির ছুটো হাত আঁকড়ে ধরলেন, আপনি এক গভীর বড়বড় থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন। আপনার স্বপ্ন জীবনে শোধ করতে পারব না।

পারিভ্রাজ্যে বন্ধ মুচকি হাসলেন।

চলি অতুলবাবু, একবার খানায় যেতে হবে। মহিম কদ্র অশ্রু ফাটল।

*

*

*

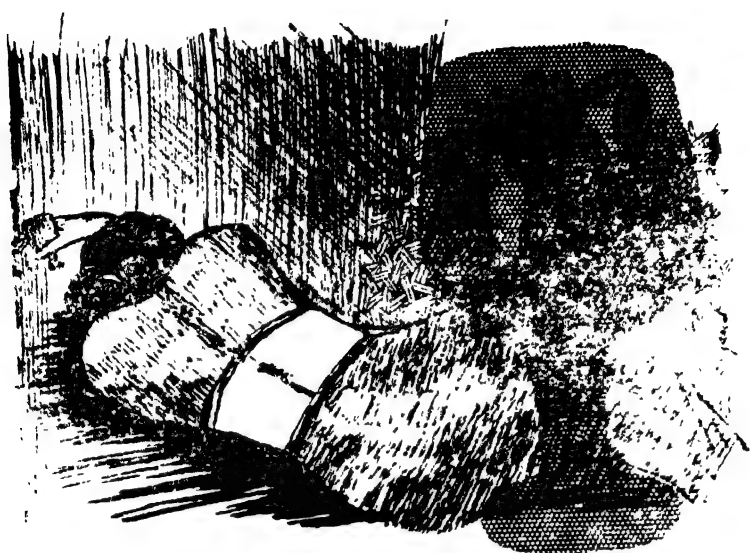
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় : জন্ম ১৯১৬ সালে বেঙুনে। হরিনারায়ণবাবুর পিতা ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ সরকারের একজন পদস্থ রাজপুরুষ ছিলেন। বেঙুনে আইনের স্নাতক হওয়ার পর ভারতে আগমন। কলকাতায় কোন এক আধামকোবী সংস্থায় উচ্চপদে আসীন থেকে অবসর গ্রহণ করে সর্বক্ষণের সাহিত্যিকমণী। দক্ষিণ অঞ্চলের স্তম্ভোভিত হর্ম্যমালায়।

তিনি দেশ কাল পাত্রের সীমায়িত পরিধি অতিক্রম করে সীমাহীন বিশ্বচরাচরে তাঁর সৃষ্টি চরিত্র ও প্রেক্ষাপটকে ছড়িয়ে দিয়েছেন ও ছিটিয়ে রেখেছেন। তাঁর রচনায় গল্পের গল্প এক বিশেষ আকর্ষণ। মানুষের প্রতি অপর ভালবাসা, অপরিণাম অতৃপ্তি ও যমস্ব তাঁকে মনুষ্য চরিত্রের দুজোঁয় বহুমোহ অধেষণে ব্রতী করেছে। ফলে তাঁর গোয়েন্দা গল্পগুলিও শুধু গোয়েন্দা গল্প নয়। তাঁর হাতে বহুতর ওনাও সার্থক গল্পের এক অসাধারণ মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাংলা কিশোর সাহিত্যের দুর্বল শাখাকেও তিনি তাঁর অকুপন দানে ধন্য করছেন।

*

*

*



একটি লক্ষ্য তিনটি খুন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

॥ ৭৮ ॥

নামকরা অপরাধ-তরঙ্গের এ বকন সাদামাটা হাব-ভাব আর স্পষ্ট বিশ্লেষণ আই বি. আদিস্টাট কমিশনার যদিও আশা করেননি। বুকের চমক না হোক, অভ্যুদয়ানী চৌধুরী তেমন ধারণাও কিছু রাখেন না। অথচ ভূতলোকটির এ জারগায় অবস্থানকালে দুর্ঘটনার খবরটা পেয়ে এ সি. বেল একটি উৎসাহ নিয়ে একেবারে তাঁকে সঙ্গে করে ঘটনাস্থলে এসেছিলেন। কিন্তু প্রবেশের নামকরা ক্রিমিনোলজির প্রোফেসরের বৈশিষ্ট্য বা চটপট কিছু চোখে পড়ল না। একবার অবশ্য মনে হয়েছিল, অবসরপ্রাপ্ত জীবনে এ-সব নিয়ে খার হুয়ত মাথাই ঘামাতে চান না উক্তির বাবুলাল। কিন্তু জাতের বাবা বক্তের গদ্ধ পলেস একটি চন্দ্রনিয়ে উঠবে না—এই বা কেমন!

এ-সবনের হতা শুধু তারকপুরে নয়, এই দেশেও নতুন। খবরের কাগ জও তাই লিখেছে। পাণির ঝড় মটকানো বা ঠাকুরার ঝুলতে বাক্স থে কন্দের ঘাড় মটকানোর কথাই শোনা ছিল। কিন্তু শুধু হাতে মাহুষ অবলালাক্রমে মাহুষের ঘাড় মটকাতে পারে, সে নাজর এই প্রথম। এটা অবশ্য মাহুষের ঘাড় মটকানো নয় মেয়েমাহুষের। ঘাড়ের দিক থেকে তাতে কতই বা তফাত!

গোবিন্দপুর থানা থেকে মাইল চারেক দূরের এক আবাসিক হোটেলে ঘটনাটা। অনেক মাসকাবারী বাসিন্দা থাকেন সেখানে। হোটেলের কোণের দিকের একটা ঘরে মেয়েটি থাকত। কোন এক হাসপাতালের নার্স। এক মাসের ছুটিতে ছিল এবং সেই এক মাসের জন্ত এখানে ঘর ভাড়া করে ছিল। এমনি সাম্প্রতিক ছুটির দিনেও নার্সি সে হাসপাতালের নার্স-কোয়ার্টারে থাকত না—কোথাও না কোথাও বেড়িয়ে পড়ত। প্রাথমিক তদন্তে এইটুকুই প্রকাশ।

ডক্টর বাবুলালকে সঙ্গে করে এ. সি. সেই হোটেলের সেই ঘরেই এসেছিলেন। মেয়েটি তখনো দরজার কাছেই মেঝেতে পড়েছিল। তদন্তগত প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর দরকারী ডাক্তার নেভেচেড দেখেছেন, ঘাড়-মটকানো পাখীর মতই মাথাটা ফুলে পড়েছে। মেয়েটিকে পোস্টমর্টেমের জন্ত সরিয়ে নেওয়ার পর ডক্টর বাবুলাল বারকতক শুধু ঘরটাকে দেখেছেন, কাউকে একটি প্রশ্নও করেন নি। সেদিক থেকে স্থানীয় থানা অফিসার বরং এ-দেখী তদন্তের ঠাট কিছু দেখিয়েছেন। হোটেলের মালিকজার থেকে শুক করে পানসানা পর্ষদ সকলকে জবাব জবাব জারী করে ছেড়েছেন।

কোরব পবে এ সি জিজ্ঞাসা করেছেন—কি বুঝলেন?

জবাবে মানন্দে মাথা ঝাঁকিয়েছেন বৈটেখাট ভুল্লোলকটি—ইয়েস, বড় বেবসিক লোকের হাতে প্রাণ গেছে মেয়েটার। ‘কলিং হুড বি মোর সোবার—খাত্ দিস্ট কর এ ফ্রেন্ড ভিকটিম।

এ সি. হেসেই ফলেছিলেন। ভুল্লোলকের কর্কশতা বাচাইয়ের শুধোগ হয়নি এখানে, কিন্তু তাঁর সবস বাকপটুতা উপভোগ করার মতই। রোজ সন্ধ্যায় কথা শোনার অন্তেই তাঁর বাড়িতে ঘান তিন।

এরপর টনি পরামর্শ দিয়েছেন। মেয়েটি মৃত্যুতে সব থেকে বেশী লাভ কার খোঁজ করুন, খাব তার সঙ্গে যত লোকের চেনা পরিচয় আছে তার একটা দিস্ট করুন।

এবারে এ. সি. মনে মনে হেসেছেন। এই পরামর্শটুকু দেবার জন্তা বন্দেশের ছাপ-মারী অপরাধ বজ্রের প্রয়োজন ছিল না। এ কাজটুকু এনেশে কটিন মা ফকট করা হয়। ‘বশায়ের আগে কথায় কথায় ডক্টর বাবুলাল অনুবোধ করলে—বিকলে পোস্ট মর্টেমের রিপোর্ট আর ওই ডাক্তারকে সঙ্গে করে একবার নিয়ে আসুন না, আলাপ-সালাপ করি।

এ সি. তাও এনেছিলেন। মৃত্যু নেক-বোন ভাচার সঙ্গে সঙ্গে—মৃত্যুকণ আগের দিন সন্ধ্যারাতের কোন সময়।

—হোটেল সেই সময়েই শুধিবে নিম্নসূহ মন্তব্যের পর ডক্টর বাবুলাল জিজ্ঞাসা করেছেন—ও কাজটা করতে হাওয়ার জোর চাই কতটা?

ডাক্তার বুঝিয়েছেন—জোর মন্দ লাগে না, তবে তার থেকেও বেশী দরকার ঠিক জায়গাটিতে ঠিকমত থাকা দেওয়া—অ্যাকুইশি অ্যাণ্ড অ্যাকশন—ফাঁসিতে যেমন হয়।

কিন্তু শুধু হাতে সেটা যে সম্ভব, তাই বায় না। আশ্চর্য কাণ্ড বলতে হবে।

এ. সি. আনালেন, মেয়েটির মৃত্যুতে একমাত্র লাভ দেখা যাচ্ছে পেমেন্টদের—নার্সের গুণাবলী তার কমই ছিল, দশবার ডেকেও দর্শন মিলে না। রোগী আর সহকর্মীরা সকলের সঙ্গেই খিটিখিটি লেগেই থাকত। হাদপাতালের কর্তৃপক্ষও তার ওপর খুব খুশি ছিলেন না।

এই কেস নিয়ে ডক্টর বাবুলাল হয়ত আর মাথাই ঘামানেন না। কলকাতা শহরের মাথায় শোরধপুবে বিজ্ঞান চমক লাগল। এবারের দুর্ঘটনা শহরের উল্টো মাথায় এক পার্কের মধ্যে। পার্কের বেঞ্চিতে একটি চিত্রশিল্পী বহুদূর থেকে মৃত অবস্থায় দেখা গেছে। সেটাই একটা ঘাড়-মটকানো বাপার—কোনরকম ব্যতিক্রম নেই।

তবে বাবুলাল লক্ষ্যে উঠেছিলেন—এ ডাম ডাউট প্লেন, আর বেজানার মত নেই। আমার মাথায় এসে যাওয়া আছে, আমি পালানো দ্বারা।

এ. সি. ঠাট্টাই করলেন—এবারের ভক্তিম তো ফিল্ম নয়, মেল তত নৃশংস লাগছে না বোঝেন?

বাবুলাল সংক্ষিপ্ত অত্মোদয় করেছেন—রাইট, দিস টাইম ইট লুকস মানাল, কিন্তু লোকটার চোখে—আই থিংক, নো ওমান কান ডু দিস—তার চোখে পুরুষ-বর্ণী ভেদাভেদ নেই। বাট হি হ্যাড প্রাকটিস্‌ড এ গুড ডিল—অনুশীলন করেছে, খুনের মৌলিকতা আছে।

এ. সি-র মাথায় চিন্তা, মাস্টারী মস্তবা ভালো লাগল না। সেটাই একটু খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন—ওদেশের থেকেও বেশী মৌলিকতা?

মজার কথা খেন, আধবুড়ো ভুললোকটি ছোরেট হেসে উঠলেন—না, তা কি করে হবে, ওদেশগুলো আর্টিষ্টিক কিলিং-এ স্পেশালাইজ করেছে—সে আর লেস লাউড—সো ডিটেকশান ইজ মোর থ্রু লিং দেয়ার। সব কেসে মাথা ঘামিয়েও সুখ।

এবার এ. সি-র স্পটে টিপ্পনি—এখানকার এই সব স্থল হত্যায় ওই খিল আর সুখ নেই বলেই হুঁসি পাচ্ছেন না বোধহয়। এরা বোকায় মত খুন করে বলেই যত মুশকিল—

—আপনি ঠাট্টা করছেন—তেননি খোস-মেজাজে আছেন ডক্টর বাবুলাল—আমি যে মাথা ঘামাইনি, কিন্তু খবর কটন হবে বলে আমার মনে হয় না। এরকম হত্যার কোন উদ্দেশ্য বা অর্থ খুঁজে না-ই পান, তাহলে সেটাই 'ক্রু' বলে ধবে মিন। মেন ওয়েট অ্যাগু সা।

পরে টেলিফোনে ডক্টর বাবুলাল এ. সি-কে কথায় কথায় শুধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ-লোকটার মৃত্যুতে সমূহ লাভ কী? বিদেশের অপরাধ-বিজ্ঞানীর প্রতি এ. সি-র আর বোধহয় তেমন আস্থা ছিল না। জবাব দিয়েছেন—ওব নিজেই। লোকটা

বেকার ছিল, দিনরাত চাকরির খোঁজে খোঁজে ঘুরে বেড়াতো, শহর ছাড়িয়ে একটা ভাড়া বাড়িতে বুড়ি দিমিমা আর গুটিয়েক নাবালক পোয়া নিয়ে থাকত। অতএব দেহ-পিন্ধের থেকে এ-ভাবে খালাস পেয়ে লাভ ওর। নজর থেকে বেশী আর কার ?

বাবুলাল হেসে রসিকতার তারিফ করেছে, আর সেই এক কথাই বলেছেন,— ওয়েট আও সা।

আলোচনা যত হালকা বকমেরই হোক, পর পর এ দরনের ছুঁছুটো হত্যাকাণ্ডে শহরে চাকলা বড় কম দেখা গেল না। এই বিচিত্র হত্যা-পদ্ধতি নিয়ে কাগজে অনেক লেখালেখি হল। অনেকে অনেকভাবে মাথা ঘামাতে লাগলেন। কারো কারো ধারণা, কোন কিপ্ত উম্মাদ নিজস্ব পদ্ধতিতে হত্যার মহড়া দিয়ে বেড়াচ্ছে—যার তাই যদি হয়, সেটা গুরুতর ভয়ের কারণ।

॥ দুই ॥

রাত তখন প্রায় সাড়ে আটটা। মালপত্র সহ যশোবন্তকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ট্যাক্সিতেই বাড়ি ফিরে চলল কৃষ্ণকুমার। মুখখানা তেমন প্রশন্ন নয়, ক্লান্ত ও লাগছে। বাড়ির কাছে এসে দেখে পাশের একতলা বাংলা বাড়ির উৎসব তখনও শেষ হয়নি। বাড়ির দরজায় তখনো দল-বারোখানা ঝকঝকে মোটর দাঁড়িয়ে। আলোয় আলোয় লামনের বড় হলঘরটা দিনের বেলায় থেকেও সাদা দেখাচ্ছে। পিছনের দিকের দেয়াল ঘেঁষে দোতলার একটা ঘরে থাকে কৃষ্ণকুমার। দোতলার তিনখানা ঘরই তার দখলে। একতলাটা বছরের মধ্যে এগারো মাসই তালাবদ্ধ থাকে। বাড়িওলা কখনো লখনো সপরিবারে এসে থাকেন। নোচের একটা কোণের ঘরে যশোবন্ত থাকে। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে বকাবকি করে বছরখানেক হল তার জন্য একটা ঘর ছাড়ায় করা গেছে।

কৃষ্ণকুমারের ঘরের জানালায় দাঁড়ালে পাশে জগদীশ ভাটের প্রাসাদের অন্দর-মহলের অনেকটাই দেখা যায়। ঘরে ঢুকে কি ভেবে আসে জ্বাল না। জানালা থেকে উৎসব মুখের হলঘরটা জোরাল আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হলের মাঝখানের একটা মখমল কুশনে গৌরী ভাট বসে—তার চারিদিকে লুপাকৃত ফুল আর উপহার। মেয়ে-পুরুষের হাসাহাসি দাপাদপিতে ঘরটাই যেন হাসছে। কিন্তু ওই মহিলাটির দিক থেকেই সহজে চোখ ফেরাতে পারল না কৃষ্ণকুমার। সবাকের ফুল-সাজে এমন সুন্দর ও দেখায় কাউকে জানত না। শুন্দরী বটে, কিন্তু এমন কিছু সুন্দরী নয়—তবু আজ যেন গৌরী ভাট উর্বশীরও ঈর্ষার পাত্রী।

প্রোচ জগদীশ ভাট এক একজনকে ধরে ধরে নিয়ে আসছেন, আর হাদি খুশিতে

ভগ্নমগিয়ে উঠছেন। স্বর্গের জন্মদিনের গোটা-আনন্দটা যেন তাঁরই। প্রতিবারই সাত দিন আগে থেকেই বোঝা যায় বাড়িতে বিশেষ উৎসবটি আসছে। মশলার ব্যবসাসে ভুল্লোলকের অটো টাকা। গোটা ভাট তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্বামী। তাঁর ভাগ্য দেখে অনেক বিবাহের সন্ধান গোপনে দাখিলখাম ফেলে ভাবেন হয়ত, তৃতীয় না হলে স্বামী হয়ে স্থপ্ন নেই।

কৃষ্ণকুমার মাঝে মাঝে ডাঙালায় দাঁড়িয়ে দেখে, মাঝে মাঝে বিছানায় এসে বসে। ভিতরে কিরকম অস্বস্তি একটা। ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল একসময়। কান দু'টা সজাগ। গাড়ি আনছে যাচ্ছে। শেষে যাচ্ছেই বেশী, আসছেও দুই একটা। ... এটা যাচ্ছে, এটাও যাচ্ছে ... এটা, না, এটা এলো ... এটা ...

বাইরের দিক একটা চাপা কলরবে চোখ মেলে দেখে পরবরে সকাল। দিচ্ছ ডাঙালা দিয়ে ও বাড়ির দিকে চাপ পড়লোই চক্ষু স্থির। বাস্তব লোকে লোকারণ্য, বাড়ির ভিতরে পুলিশ গিঁদগম করছে। বাস্তব লোক হটাৎবার তাকানায় পুলিশ হিমসিম খাচ্ছে। কৃষ্ণকুমার জামাটা টেনে নিয়ে নিচে ছুটল।

॥ ভিত্তি ॥

সাত সকালে ঘুম ভাঙানোর বিরক্তি ভুলে ডক্টর বাবুলাল লাক্ষ্মীয়ে উঠলেন। হরবে এবারে কৃষ্ণকুমার হাট্টাই—চলুন চলুন!

এ মিনিট আগেই ভিত্তি উঠে বসলেন তিনি। তারপর সন্ধ্যার সন্ধ্যা, সকালে মিত্র-মান চুপ দিকে এসে দরজা ঠেলতেই দরজা খুলে যায়, ভিতর থেকে বন্ধ ছিল না, ভেজানো ছিল শুধু। তারপর ভিতরে ঢুকেই দেখে জগদীশ ভাটের আগের কৃষ্ণকুমার মরে পড়ে আছে—ঘাড়টা উল্টো দিকে মটকানো। কারো সাড়া না পেয়ে শেষে ভাটের ঘরে উঁকি দিয়েই ভিত্তির চেষ্টামেচি। বাইরের লোক তখন টেলিফোনে খবরটা দিয়েছে। হাত-পা বাঁধা মুখে কাপড়গোঁজা অবস্থায় জগদীশ ভাট মেঝেতে অজ্ঞানের মত পড়ে আছে।

ডক্টর বাবুলাল চকিত প্রশ্ন করলেন—বাবুন খুলে ফেলা হয়েছে?

—না। আমি টেলিফোনে বারণ করেই ছুটছি, ভাবলাম আপনারাও ভুলে নিয়ে যাবেন।

—ওয়াটারফুল!

এ মিনিট ভাইভাকে সাড়া দিলেন আরো জোরে চালাতে, কারণ টেলিফোনে শুনেছেন গৃহস্থানীর শোচনীয় অবস্থা—এর মধ্যে যদি খতম হয়ে যায়, সমস্ত মত বাধন না খোলার দায়টা তাঁদের ঘাড়ে পড়তে পারে।

উৎসবের দিন গৃহকর্মী সকলকে একমাসের মাইনে এবং পয়সার সম্পূর্ণ ছুটি দিয়ে থাকেন। বাতের উৎসব শেষে সেই একটা দিন সকলেই ঘেঁষা ঘাড়ি যায়। পয়সার দিনটা ঈর্ষা এবং কড়ী বাইরে খানাপিনা করে থাকেন। কড়ী আগের দিন বিকেলে সকলকে টাকা দিয়েছেন, আর রাত ঠিক দশটা পনেরয় সকলকে ছুটি দিয়েছেন।

তাদের বিদায়াদয়ে এ.সি. ভাগ্যকে জেরা করতে এসলেন। বড় ভিড়শেষ কাছাকাছি বয়েস, শক্ত সমর্থ উচু লম্বা চেহারা। লোকটা খুব বুদ্ধিমান কি খুব বোকা—বোকা শুক।

—আপনি কাল রাতে কোথায় ছিলেন?

—খিয়েটারে।

—বাড়িতে উৎসব, আপনি খিয়েটারে ছিলেন কেন?

—এ ডিতে উৎসব বলেই তাড়াহা আমার পাটি ছিল।

—বাড়িতে এ পনের উৎসব আপনি পছন্দ করেন না?

ভাগ্যে চক্ষুমান সাক্ষ্যবাক্য বল—মামাকে আর আমার উৎসব পছন্দ করি না।

—কেন পছন্দ করেন না?

—ভালো লাগে না বলে।

ডক্টর বাবুলাল সকৌ হুকে নিরীক্ষণ করছিলেন তাকে। ঠোঁট জিজ্ঞাসা করলেন—
মামাকে ভালো লাগে আই মিন, লাগত?

চক্ষুমান—খুকালো একটু, তারপর বলল—লাগত।

এ.সি. প্রশ্ন করলেন—খিয়েটার কটায় ভেঙেছে?

—রাত, দশটা নাগাদ।

রাতে আপনি কোথায় ছিলেন?

—বন্ধুর বাড়ি অনেক বাড়িতেই বন্ধুর বাড়িতে থাকি।

ডক্টর বাবুলাল এ.সি.-র কানে কানে কি বলতে এ.সি. আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার মামা বাবসার কাছে বাইরে যান?

—মামার মতো দশ পনের দিন বাইরেই থাকেন।

—সেই সময় বন্ধুর বাড়িতে বাড়িতে থেকেছেন কান দিন?

—বেশে ৯, অথবা ১০ থেকে ছি।

এ.সি. এবারে একটি কঠিন স্বপ্নে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ড্রাক করেন?

—কর। নদীকার জায়গায় তারপর নিজে থেকেই বলল—মশায়, আমি খুনটুন কাউকে করতে পারবো, একটা আরশোলাও মারতে পারবো, এমটা—

এ.সি. ক্রুদ্ধপটে কি বলতে থাকলেন, তার আগেই ডক্টর বাবুলাল আলতো করে জিজ্ঞাসা করে বললেন—কেন পারবেন না, আপনারই তো লাভ বেশ মামা না থাকলে মামার অবর্তমানে তো আপনিই সব পাবেন?

অবাবে চোখ বড় বড় করে চন্দ্রমোহন খানিক চেয়ে বইল তাঁর দিকে, তারপর হতাশার স্বরেই বলল—মামী থাকলেও পেতাম, মামীর দরাজ হাত—কিন্তু বেছে বেছে তাঁকেই খুন করা হল কেন বুঝলাম না।

কোত্তের স্পষ্ট অর্থ, খুনটা বরং মামা হলে তার আপত্তি ছিল না। ডক্টর বাবুলাল মিটিমিটি হাসিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে ষ্টিভীয় লোকটিকে দেখছেন তিনি। কুকুমারকে। হল-এর ওধারে বিষয়মুক্তিতে বসে আছে চুপচাপ। জেরার কাজ চলছিল হল-এর এ-মাথায় বসে। চন্দ্রমোহনকে ছেড়ে দিয়ে তাকে ডাকা হল।

নাম জেনে নিয়ে এ. সি. জিজ্ঞাসা করলেন—আশনি পাশের বাড়িতে থাকেন?

—হ্যাঁ।

—কতকাল আছেন?

—অনেক কাল, চার-পাঁচ বছর।

—এঁদের সঙ্গে জানাশোনা ছিল?

—ছিল।

বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলেন—কাল এ-বাড়িতে আপনার নেমস্তন্ন ছিল?

একটু ইতস্ততঃ করে অববাসিল—ছিল।

—এসেছিলেন?

—না।

—কেন?

অবাবে জানালো, নিন্দ্রণে সে কোথাও বড় ঘোপ দেয় না। তাছাড়া সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিল। স্টেশনে যশোবন্তকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি ফেরা পর্যন্ত দিনের সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করল সে। প্রশ্নের অবাবে নিজের পেশারও ফির্গেস্তি করতে হল। কোটোগ্রাফের ব্যবসা, এখানকার ফোটো স্টুডিওর মালিক সে। খুব ছোট থেকে আরম্ভ করেছিল, দু'তি-বছর হল ব্যবসা ভালোই চলছে।

গৌরগপূর্বের পর্বের স্টেশনে স্টুডিওর ড্রাক আছে, মূর্ভ কামেরা দিয়ে যশোবন্তকে লেখানে পাঠিয়েছে—খুব সকালে সেখানকার একটা লোকাল ফাংশন করার করার আর্ডার আছে, তাই—।

—যশোবন্ত আপনার কোটোগ্রাফার?

—না, কর্মচারী বাতটা। স্টেশনে কাটিয়ে আজ খুব ভোরে লোকানে কামেরা পৌঁছে দেবে—বিকেলের মধ্যে তার ফিরে আসার কথা।

বাবুলাল জিজ্ঞাসা করলেন—মূর্ভ কামেরার দাম বেশ অনেক, তাকে দিয়ে পাঠিয়েছেন, বিশ্বাসী লোক খুব?

—হ্যাঁ।

এ. সি. প্রশ্ন করলেন—কতকাল আছে আপনার কাছে?

—বছর দেড়েক। বিশ্বস্ত লোক খুঁজছি জেনে মিঃ ডাট ওকে বেকমেণ্ড করেছিলেন। তাঁর বাইরের কোণার আড়তে একসময় কাজ করত, এখানে এলে চাকরির জগে তাঁকে ধরে পড়েছিল।

বাঁজে কথায় আর সময় নষ্ট না করে এ. সি. উঠে পড়লেন। একদিন অনেক জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে তাঁকে। পথে ডক্টর বাবুলালকে চূপচাপ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—ভাগ্যের কথা ভাবছেন?

তিনি অগ্রমুখের মত জবাব দিলেন—না, কৃষ্ণকুমারের কথা। বড় কালো, কিন্তু অসুস্থ মিস্ত্রি দেখতে, তাই না? আট এনটি হিম।

এ. সি. গত দু'শুটির মতো না হেসে পারলেন না। পঞ্চাশ উত্তীর্ণ-প্রায় বছরের নাচুন-মুচুন পর্বকার মূর্তিটি কোনদিক থেকেই রমণীয় নয়। তাঁকে হাসতে দেখে হাসলেন বাবুলালও, একটু যেন উচ্ছ্বাসই জ্বলন করলেন—কৃষ্ণকুমার—ওই চেহারায় আর কোন নাম হয় না—হি মাস্ট বি অ্যান্ আর্টিস্ট, এ রিয়েল আর্টিস্ট,—ওর সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছে করছে; বশোবস্ত এলে একবার নিয়ে আসুন না?

যশোঃওকে এ. সি. বিকেলেই নিয়ে এনেছিলেন। এলিকেই দেশ তার। একেবারে নিঃশ্রেণীর নয়; আবার ঠিক ভদ্রলোকও ঠিক বলা যায় না। হটপুট জোয়ান চেহারা। স্বল্পভাষী। জবাব দিতে পারলে হুই এক কথায় জবাব দেয়, নয়তো চূপচাপ মুখের নিকে চেয়ে থাকে। প্রশ্ন না বুঝলেও ফিরে জিজ্ঞাসা করে না কি বলা হচ্ছে। এ. সি.-র উল্টোপাল্টা জেরার মুখেই বাবুলাল ঈর্ষ প্রস্রবের ধারা বদলে দিলেন একেবারে। জিজ্ঞাসা করলেন কৃষ্ণকুমারবাবু, তোমাকে এখন কত মাইনে দেন বশোবস্ত?

—দেড়শ।

—বাঃ! আচ্ছা, বছরখানেক আগে কত পেতে?

—একশ।

—তাহলে বাবু তোমার ওপর খুব খুশি আছেন বলা?

যশোবস্ত নিকম্বর।

বাবুলাল কোন উত্তর আশাও করেননি যেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা যশোবস্ত অগম্য শ্রী ডাট যখন ব্যবসার কাজে বাইরে থাকেন, তোমার বাবুকে ওই মিসেস ডাটের সঙ্গে বাতেও গল্পগল্প করতে দেবতে তো?

যশোবস্ত নিকম্বর।

হঠাৎ তাঁর ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন এ. সি. পর্যন্ত—বাবুলালের এ কণ্ঠস্বর যেন ছায়ার ফলার মত।—কত রাত পর্যন্ত তোমার বাবু ও বাড়ীতে কাটাতে?

যশোবস্ত নিকম্বর। বাবুলাল নিজেও বিস্মিত একটু, ছায়ার ফলাটা যেন একটা নিশ্রাণ কিছুতে গিয়ে বিধল। যশোবস্ত নিবাক, নিরাসক্ত।

তুমি গলায় স্বৰ একেবারে কোমল স্বরে নামিয়ে বাবুলাল আবার বললেন—
জবাব না দিলে তোমার বাবুর তুমি কতিই করবে শশোবস্ত। আচ্ছা, ও কথা থাক,
তোমার বাবুকে দেখলে ও বাড়ির কুকুরটা ডাকাডাকি করতে কি না বলে তো।

এবারে শশোবস্ত সামান্য ঘাড় নাড়ল।

—ডাকত না? বাড়িতে দেখলে?

এ. সি. দেখলেন কণ্ঠস্বর নয়, এবারে বাবুলালের চোখ দুটি যেন ছুটির ফলা।

শশোবস্ত নীরব।

এ. সি. ভয় দেখিয়ে কথা আদায় করতে চেষ্টা করলেন—জবাব না দিলে তোমাকে
আমি থানায় নিয়ে যেতে বাধ্য হব শশোবস্ত।

বাবুলাল তুম্বুনি চন্দ্ররূপে বলে উঠলেন—ওকে থানায় নিয়ে গেলে আমি আপনার
বিক্রমে কেস করব। বাবু তোমাকে ভয় দেখাচ্ছেন শশোবস্ত, তুমি কিছু ভেব না।
আচ্ছা তুমি যাও এখন—তোমাকে কষ্ট দিলুম।

শশোবস্ত চলে গেলে এ. সি. ঠাট্টা করলেন—আপনি রোমান্টাইট বড় করে ভুলতে
চাইছেন দেখি।

বাবুলাল হাসতে লাগলেন। তারপর মস্তুরা করলেন—সিমস-ভাটের উৎসবের
লাজসজ্জা দেখে মনে হল, পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা তিনি খুব অপছন্দ করতেন না
—অ্যাণ্ড কুকুরমার ইজ পারফেক্টলি এ লোভ ম্যান।

এ. সি. টিঙ্গনী কাটলেন—তারে চন্দ্রমোহনকেও একটু-আধটু লেডিস ম্যান
ভেবেছিলেন।

জব্ব হয়েই যেন মুখপানা গোবেচারীর মত করে ফেললেন বাবুলাল।

। চার ।

গত দিনের সমস্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করে এ. সি. বাবুলালের বাড়ি এলেন পরদিন
সন্ধ্যার পর। রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত মর্ম, গৌরা ভাটের মৃত্যুর সময় সাড়ে দশটা থেকে
এগারটার মধ্যে—কুকুরেরও ভাট। একই ভাবে মৃত্যু-এর আগে ছজন যেনাবে মেরেছে
ঠিক সেইভাবে। তবে এবারে যে বা যাবা মেরেছে, শুধু তাতে ফেরেন—দেবোত্তর
পরমাপ্ত আর টাকাও নিয়েছে। জগদান ভাট নাসিং হোমেই আছেন, এখনো
অস্তিত্ব খুব। দশটা পনের নাগাদ শোবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন—
ঘরের আলোও তিনি নেভাননি, খুব সম্ভব জ্বা বা চাকর-বাকর কেউ নিভিয়েছে। এ.
সি. খোঁজ নিয়েছেন সন্ধ্যা থেকেই তত্ত্বলোক এক নাগাড়ে ড্রিক করেছেন, কাজেই
আলো নেভাবার ক্রমং পাননি।...কজন তাঁকে আক্রমণ করেছিল, তত্ত্বলোক বলতে

পারলেন না, শুধু গলা টিপে তাঁর নিশ্বাস বন্ধ করা হচ্ছিল এটুকুই মনে আছে। সমস্ত রাত ভাল করে জ্ঞান হয়নি, কিন্তু তারই মধ্যে একটা মৃত্যুঘটনা ভোগ করেছিলেন। ডাক্তারদের রিপোর্ট, ঠিকমত স্বপ্ন হয়ে উঠতে পাঁচ-সাতদিন লাগবে—ব্রাড-প্রেন্সারও হাই। জীব মৃত্যুর খবর শোনার পর আর একটা কথাও বলেন নি। বারকতক শুধু বাড়ী যেতে চেয়েছেন, আর কিছু না। ওই অবস্থায় তাঁকে খবরটা দেওয়া হয়েছে বলে ডাক্তাররা অনুভাগ করেছেন।

ডক্টর বাবুলাল ঈশ্বর বাস্তুভায় ঘরের মধ্যে বার দুই চকর দিয়ে শেষে বললেন—নো, হি মাষ্ট নট কাম, তাঁকে বাড়ি আসতে দেবেন না। ডাক্তারদের বলে রাখুন, তাঁকে যেন জরুরে নয় দেখিয়েই কিছুদিন আটকে রাখেন। হি মাষ্ট নট কাম বাক নাউ। আর একটা—কথা—ভাগে, কৃষ্ণচূড়ামা, বঙ্গবান্ধব, চাকর-বাকর কাউকে নাশিং-হোমে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেবেন না—একটা চেনা মাছিও যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না পারে।

এ সি একটা ঘণ্টা হলেন—কেন? ভয়ের কারণ আছে?

—ইয়েস, হুয়েন। হঠাৎ সব পালটে ফেললেন বাবুলাল, বেশ খুশি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—লেন্ডন মান ক বলে, যাও ছাটা খয়েটার ভাগে?

—পবর নইন। কোথাও যেতে বাবণ করে দিয়েছি, এই পযষ।

—আই উড ফিল ফর দেন—বিয়োলি আই ডু, আপনাকে আগেই বলেছিলাম, লেন্ডি ক্লিং হুড বি মোর সোবার—যমন একটি মহিলাকে ও-ভাবে যেতে হল বলে এই বয়সেও আমারই বুকটা শুকনো লাগছে—সি ওয়াক্ নট মেড ফর ছট!

এ সি কুল কিনারা না পেয়েই এসেছেন, নইলে এই কামেলার সময় হয়ত আসতেন না। রানিকতা বরদাস্ত করতে পারলেন না।—বললেন এবারের কেদটাও আপনার মাথা-না ঘামানোর মতট স্থূল মনে হচ্ছে বোধহয়?

—ও ইয়েস, একটুও না ভেবেই বাবুলাল জবাব দিলেন—ভেরি লাইড তবে, মাথা ঘামাতে বাজী আছি—লাইক অষ্ট্রেলিয়া প্রেইং ক্রিকেট এগেই আমেরিকা। কিন্তু তার আগে আপনি আমাকে সার্ফিসম্বালি ইন্ভেস্টিগেশনের তার দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, আই নাষ্ট নট বি র'ফউজড এনিহোয়াব।

এ. সি. অথাক—হত্যাকারী কে আপনি অনুমান করেছেন?

—অনুমান কেন, আর্ম তো জানি কে।

এ. সি. লাক্ষ্যে উঠেছিলেন প্রায়—যাদের দেখেছেন, তাদের মধ্যে কেউ?

—ও ইয়েস। কিন্তু আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।

যেন কোন সংশয় নেই। এ. সি. স্নেহের স্বরেই বললেন—কিন্তু এর আগেও দুটো খুন হয়েছে যাদের এই পরিবারের কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক নেই—আপনি ভোলেননি তো?

বাবুলাল হাসতেই লাগলেন—আপনি খুব বিচলিত দেখছি। যা বললাম তাই করুন, আর ভালো কথা মনে করিয়েছেন—যে হাসপাতালে সেই নার্স কাজ করত, ষিয়েটার ভায়ে, 'মাই মিন, চন্দ্রমোহন সেই হাসপাতালের পেশেন্ট ছিল কি না' কখনো, যা ওই নার্সের তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কি না' সবরটা মিন। আর তারপর যে লোকটা খুন হয়েছে, সে-ও চন্দ্রমোহনের কাছে চাকরির তদবির করতে কি না জানতে চেষ্টা করুন—টু-ডে দিল ফার।

মকছুমিতে ওয়েমিস দেখলেন যেন এ. সি.। পরদিন টেলিফোনে তাঁর উত্তেজিত গলা শোনা গেল। ডক্টর বাবুলালের ধারণা সবই ঠিক—এখুনি গ্রেপ্তার করা হবে কি না চন্দ্রমোহনকে সেটাই জানতে চান তিনি।

বাবুলাল সহাস্তে বাধা দিলেন—নো, মাই ডিয়ার নো। ইউ উইল হ্যাভ ইয়োর পেম, ডোন্ট ওয়রি।

কিন্তু ওয়রি না করেও পাবেন, না এ. সি.। এরপর এক নাগাড়ে দু'দিন আর বাবুলালের দেখাই নেই। সকালে এসে শোনে বেরিয়েছেন, বিকেলে এসে শোনে বাড়ি নেই। টেলিফোনেরও জবাব পান না—এ. সি. হতভম্ব। এদিকে কুকুর আর গৌরী ভাটের মৃত্যুর পর শহরে একটা ত্রাণ পড়ে গেছে। একলা ঘরে শুতেও লোকে যেন আর নিরাপদ বোধ করে না। আর সব কিছুই জের এই তদন্ত-বিভাগকেই লামলাতে হয়।

তৃতীয় দিনে রাতের দিকে দেখা মিলল। এ. সি. কিছু বলার আগেই ডক্টর বাবুলাল প্রস্তাব করলেন—চলুন, কৃষ্ণকুমারের সঙ্গে গল্প করে আসি।

অপ্রত্যাশিত আগন্তুকদের ওপরে শোবার ঘরেই বসালো কৃষ্ণকুমার। অল্প উপায়ও ছিল না, কারণ বাইরে থেকে সাড়া দিলে ভিতরে এসেই পড়েছেন ভয়লোকে। কোণের ঘর থেকে বশোবস্ত বেরিয়ে এসেছিল, এঁদের দেখে চূপচাপ আবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। বাবুলাল সহাস্তে বললেন—এলাম জালাতন করতে—আপনার মন খারাপ নিশ্চয়—বাট আই আম নট এ ব্যাড টকার।

মন খারাপ বলাতেই যেন কৃষ্ণকুমার হাসতে চেষ্টা করল। বাবুলাল পরম আগ্রহে কোটোগ্রাফিক্‌ই পাঠ নিতে শুরু করলেন তার কাছ থেকে শেষে তার তোলা কোটোগ্রাফিক্‌ দেখতে চাইলেন। কৃষ্ণকুমার ড্রয়ার খুলে একগোছা ছব বার করলে। সেট সঙ্গে হাতীর দাঁতের পাতের ওপর আঁকা স্বন্দর একটা নকশা বেরিয়ে পড়ল। নিচে নীল জল, ওপরে নীল আকাশ—মাঝে দুটি বলাকা তারি অন্তরঙ্গ ভাবে উড়ে চলেছে। প্রেটের নীচে শুধু তারিখ লেখা।

হাতীর দাঁতের প্রতিটাই সাগরে তুলে নিলেন ডক্টর বাবুলাল, মপ্রাণ নেত্রে দেখলে একটু।—ওয়াও! হাতীর দাঁতের প্রেটে এ তুললেন কি করে?

কৃষ্ণকুমার জানালো, ছবি তুলে পরে আর্টিস্ট দিয়ে আঁকিয়ে নেওয়া হয়েছে।

—হাউ নাইস। এ শিরদিকে তাকালেন বাবুলাল—আমি আপনাকে বলেছিলাম না, হি ইজ এ রিয়েল আর্টিস্ট।

কিন্তু স্ততি সবেও কৃষ্ণকুমারের মুখখানা শুকনোই দেখাতে লাগল। বাবুলালের হঠাৎই গ্যাবপটার দিকে চোখ গেল যেন, বলে উঠলেন—কবে করিয়েছেন এটা—এতে জো দেখছি মিসেস ভাটের জন্মদিন—মৃত্যুদিনও বলতে পারেন—সেই তারিখ। চট করে উঠে জানালার কাছে গাড়িয়ে অগ্নিশ ভাটের বাড়িটা ভালো করে একবার দেখে নিয়ে আবার এসে বসলেন। প্রেটের দিকে চোখ রেখে হাসছেন মুহু মুহু—‘হেথা নয়, হেথা’ নয় ‘অন্ত কোনখানে’—পড়েছেন? রবীন্দ্রনাথ...আমার নামটা বিদ্যুটে হলেও আমি বাঙালী জানেন তো?

হাসতে লাগলেন, যেন এটাটি খবর। তারপর কোমল গলায় সহাসরি ভিজ্ঞাসা করলেন—এটা মিসেস ভাটকে উপহার দেবার ইচ্ছে ছিল বোধহয়?

পাশমুখে কৃষ্ণকুমার মাথা নাড়ল শুধু। তার দিকে চেয়ে বাবুলাল তেমনি মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। —ছিল না? হাউ স্ট্রেঞ্জ। একটু ভেবে বলুন, নামটাঠমস্ লাহুং প্রভৃতি ভেব কষ্টলি—ভেরি, ভেরি। তাকে অবকাশ না দিয়েই আবার প্রশ্ন করলেন—‘আচ্ছা’, আপনার এই ফোটোগ্রাফির ব্যবসায় কত দিনের?

—চার পাঁচ বছর।

—হুবুহু আগে আগে ব্যবসার অবস্থা কেমন ছিল?

—খুব ভালো নয়।

—কিন্তু এখন তো খুব ভালো চলছে, জায়গায় জায়গায় ত্রাক করেছেন—কম করে লাখ টাকার আসেই তো হবেনই কি বলেন? কৃষ্ণকুমারের জবাব দেবার শক্তি নেই যেন, জবাবের প্রতীক্ষা করলেন না বাবুলাল। আবার প্রশ্ন ছুঁড়লেন—হঠাৎ এত মূলধন আপনি কোথায় পেলেন?

—ডকুমেন্ট আছে!

—না।

—ভেরি লাইবল। বাকি খোঁজ নিয়ে জানলাম গত দেড় বছরের মধ্যে মিসেস গৌরী ভাট সব মিলিয়ে আপনাকে প্রায় ষাট হাজার টাকার চেক দিয়েছেন—আপনার ধারণা তার কাছেই বোধহয়?

এবারে এ শি-ও হা-ভব। মুখ থেকে লম্বা বক্তৃতা সবে গেছে কৃষ্ণকুমারের, কাঁশছেও একটু একটু। এর উপর ডক্টর বাবুলালের আর একটা নির্মম প্রশ্ন—অগ্নিশ ভাটের কুকুর রাতে আপনাকে দখলে ডাকত। প্রীজ্—প্রীজ্ টেল মি ইয়েস অর নো।

কৃষ্ণকুমার মাথা নাড়ল—ডাকত না।

—থ্যাক ইউ! ডক্টর বাবুলাল এ. সি. কে উঠতে ইশারা করে সহাসরি নীচে নেমে এলেন। গাড়িতে উঠে এ. সি. বিষয়ে হেণ্ডে পড়লেন প্রায়—কি ব্যাপার?

আপনার ধারণা তো সবই ঠিক দেখছি—

মুহূর্ত্ত হেসে বাবুলাল বললেন ওখানেই শেষ নয়। ...আমার ধারণা সেই রাতে কৃষ্ণকুমার গারী ভাটের ঘরে এসেছিল।

—কিন্তু—

—হোয়াই কিন্তু? সকলেই জানে কজী চাকর-বাকরদের সকলকে নিজে বিদায় করেছেন, আর জগদীশ ভাটেরও মনে বেহাশ হয়ে থাকার কথা—কৃষ্ণকুমার আসবে না কেন।

এ. সি. অবাক—তাহলে ওকে আবেস্ট করেছেন না কেন?

—ওয়েট। আমার আরো ধারণা—সেই রাতে চন্দ্রমোহনও আমার কাছে এসেছিল—ম বি. টাকা নিতে—কিন্তু এসেছিল। রাত সাড়ে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে সে তার বন্ধুর কাছে ছিল না, আর্টিস্ট বন্ধু তার কাছে ছিল না—এগারটার পর বন্ধু বাড়ি এসে দেখে সে তার জন্ত অপেক্ষা করেছে—চন্দ্রমোহন তাকে বলেছে সে আধঘণ্টার ওপর অপেক্ষা করেছে।

এ. সি. অধৈর্য হয়ে পড়লেন। শেষে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন—তাহলে আমি কি করব এখন?

—সিম্পলি ওয়েট। খানিক চুপ করে থেকে হাসলেন হঠাৎ—হ্যাঁ হ্যাঁ এ সিলিয়ারি! এ. সি.-র নিকে তাৎপালেন—ওই কৃষ্ণকুমার সন্ধ্যায় আপনার কি ধারণা?

সি. জবাব দিলেন—চেনা লোক ভিন্ন ওভাবে কৃষ্ণকুমার কেউ মারতে পারে না।

এইট। কিন্তু মারল কেন?

—হুজুবে এ. সি. জবাব দিলেন—বোধ হয় আশ্রমের চোখে খুলো দেবার জন্ত, কৃষ্ণকুমারকে আশ্রমের বাগি ভেবে হত্যাকাণ্ডকে অপরিচিত লোক মনে করি।

হাতেইউ আর এ জেম, পারকেস্টল রাইট!

সি. জেম এবং রাইট হেসে হতভম্বের মতই বসে রইলেন এ. সি.।

ছুটির দিন। রেপুত কৃষ্ণকুমারের বাড়ির দোতালার উঠে যশোবন্তকে দেখে বিরক্ত মুখেই চন্দ্রমোহন জিজ্ঞাসা করল—বাবু আছেন?

জবাবে যশোবন্ত কৃষ্ণকুমারের ঘরটা দেখিয়ে দিল শুধু। চন্দ্রমোহন ঘরে ঢুকেই অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল—আর কাহাতক সন্ধ্যায় বসুন তো? এটা অভ্যাচার নয়।

কৃষ্ণকুমার শুয়ে ছিল, উঠে বসে জিজ্ঞাসা নেত্র তাকালে শুধু। চেয়ারটা টেনে বসে পড়ে চন্দ্রমোহন বলল—মামা হাসপাতালে, একবার দেখা পশ্চিম করতে দেবে না।

কিন্তু এদিকে বাড়ি চলে কি করে, হাতে তো একপয়সাও নেই।

কৃষ্ণকুমার নিশ্চয় জবাব দিল—সেকথা ঠিকের বলেন না কেন?

—বলিনি। ওই গোয়েন্দার বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া করেছিলাম আজ। সেখান থেকেই তো আসছি। খনে বলে—হাওয়া খান। বিছানায় পড়ে কাতবাচ্ছে অথচ বসিকতা দেখুন! সিঁড়িতে পা পড়লে আসুর দম, গিয়ে দেখি বস্ত্রণার ডাক্তারকে হাত ধরে অস্ত্ররোধ করছে, বাতে একলগে তিনটে ঘুমের গুঁড়ু দেবার জন্যে—অথচ আমার দেখেই যেন রোগশোক সব ভুলে গেল। আবার আশা দিল, মামীকে যে খুন করেছে, তুঁতিন ঘিনের মধোই ধরা পড়বে—তখন যেন পোলাও-কালিয়া খাট। লহু হয়? ইচ্ছে করছিল, একলগে তিরিশটা ঘুমের গুঁড়ু খাইয়ে জয়ের মত ঘুম পাড়িয়ে দিই।

কৃষ্ণকুমার চিন্তিত মুখে বলল—আপনার মামী ছাড়া আরো দু'জন বাইরের লোকও তো খুন হয়েছে—তিনি এদিকের কাউকে সম্বোধ করছেন কেন?

গোয়েন্দার অভাবে কৃষ্ণকুমারকেই খেঁকিয়ে উঠল চন্দ্রমোহন, কেন আবার বুদ্ধির ঢেঁকি না ওঁরা? মামী বলছিলেন—বলে কি জানেন? আসল খুন নাকি মামীর খুনটাই—ও ছোটো খুন পুলিশকে আর অন্য সব লোককে ভাঁওতা দেবার জন্য। আহা! মামে থাক, গোটা পঁচিশ টাকা দেবেন এখন? হাতে এক কানাকড়িও নেই।

চূপচাপ উঠে কৃষ্ণকুমার টাকা বার করে দিল। প্রাপ্তির কলে একটু খুশি দেখা গেল চন্দ্রমোহনকে। বলল—থাক বাঁচালেন, মামা না আসা পর্যন্ত কি যে করি—এদিকে তো মামার এমন অস্থগ যে আমাদের তাঁর সঙ্গে দেখা করাও হুকুম নেই, অথচ আমার সামনেই বাবুলাল পুলিশের চাইটাকে বলল,—মামাকে কাল একবার তার ওখানে নিয়ে আসতে, ঠাং ভালো থাকলে সে নিজেই যেত। মামার সঙ্গে কথাবার্তা বলা হলে কালকের মধোই যে খুনীকে ধরে দিতে পারবে আশা করছে। ওর মাথা আর মুণ্ড, কালকের মধো মামার সঙ্গে দেখা না করতে দিলে হাসপাতালের বিরুদ্ধে আমিই ফেল করব, মামাকে জোর করে স্মার্টকে মেখেছে ওরা—তাও না হয় রাখল, চেক লই করে টাকা পাঠাতে দিচ্ছে না কেন? না খেয়ে চাকর-বাকরগুলো শুদ্ধু খখন পালাবে—এমন একটা অসহ্য অববেচনার ক্ষোভে পরপর করতে করতে চন্দ্রমোহন গ্রহান করল। কৃষ্ণকুমার দ্বাষ্ট্রব মত বলে।

রাত্রি। অন্ধকারে লোক চলাচল থেমে গেছে। দু'দিকে গাছ আর ডাল পালার বাবুলালের বাসাটা আরো নিরু্যম মনে হচ্ছে। বাইরের বারান্দার সামান্য শব্দ হল একটু। দড়ির কাঁস লাগিয়ে সতর্পণে কেউ দোতলার বারান্দার নামল। পা টিপে ঘরের দরজার কাছে কান পাড়ল। ভেতরে ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ। পকেট থেকে ছোটো দস্তানা বার করে হাতে পরে নিল, তারপর আস্তে ঘরে ঢুকল। হুঁহাত বাড়িয়ে শব্দের দিকে এগোতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো বলমলিয়ে উঠল। আড়াল থেকে বিভলভার হাতে গোয়েন্দা (প্রথম)—১২

এসিয়ে এলো এ. সি. এবং আরো চার পাঁচ জন। ডক্টর বাবুলাল উঠে বললেন, নিম্নলিখ মূর্তির দিকে চেয়ে বললেন—এমন বোকা ভূমি যশোবন্ত! আঁা? ওযুথের বাড়ির ছুঁমটা আর যাতে না ভাঙে সেই ব্যবস্থা করতে এসে গেলো।

পুলিশ ততক্ষণে কর্তব্য সমাধান করেছে। বাবুলাল বললেন—ওর দস্তানা ছুটো দেখুন তো ভালো করে।

দেখা গেল ছুঁমিকে ছুটো লোহার খাবার মত আটকানো।

যশোবন্ত চিৎরাপিত।

বাবুলাল এ. সি.-কে বললেন—আপনাকে আরো একটা আ্যারেস্ট করতে হচ্ছে, এঙ্কুনি ধান।

এ. সি. সানন্দে জবাব দিলেন—সে এতক্ষণে করা হয়ে গেছে, এই মূর্তিটি বাড়ি থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকুমারকে আ্যারেস্ট করাও ইন্ট্রাকশন দেওয়া আছে।

—মাই গড! ছুঁচোখ কপালে তুলে ফেললেন বাবুলাল—বলেন কি মশাই! সে কি করল? স্বর্ণপ্রস্তু হাঁসকে বইয়ের মুখই মেয়ে থাকে, সত্যি সত্যি কি কেউ মাঝে? গৌরী ভাটের মুতুতে কৃষ্ণকুমারেরই তো ক্ষতি সব থেকে বেশি! নো নো, ইউ আর জোকিং—এঙ্কুনি হাসপাতালে গিয়ে যশোবন্তের আমল মনিবটিকে আ্যারেস্ট করুন—গো আও আ্যারেস্ট অপদীশ ভাট!...কৃষ্ণকুমার ওকে সত্যিই রাত আটটার স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। ও কিবে এসে সব কাজ সেবে আবার নাড়ে এগারোটার গাড়িতে ক্যামেরা নিয়ে গেছে। কি বলো যশোবন্ত?

সকলের নির্বাক মূর্তির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হঠকঠে বাবুলাল এ. সি.-র উদ্দেশ্যেই বললেন আবার—যাবার পথে ওই থিয়েটার-ভাঙে চন্দ্রমোহনকে আমার হয়ে একটা কম প্রমেন্ট দিয়ে যাবেন—কৃষ্ণকুমারের বাড়িতে তার ছপুয়ের অভিনয় ভালই হয়েছিল বলতে হবে। আচ্ছা, গুডনাইট অল অফ ইউ—গুডনাইট যশোবন্ত! আই অ্যাম রিয়েলি সবি, তোমার হাত মজবুত, কিন্তু মাথা বড় কাঁচা মি: ভাটেরও! ইউ স্পয়েন্ড এডরিথিং বাই কিলিং মি ডগ। আও মোরগুভার, বাইয়ের পেশাদার হত্যাকারী ঘরের পুরুষকে বেঁধে জাঁ হত্যা করে না, প্রথমেই পুরুষকে হত্যা করে, তারপর দরকার হলে জ্বীলোকের কথা ভাবে।

*

*

*

॥ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ॥ জন্ম ১৯১১ সালে কলকাতায়। আবাল্য শহর আশ্রিত লেখক জাত শিল্পীর কুশলভায় ও কারুকায়ে গল্প লেখেন। তাঁর মিষ্টি হাতের “সৃষ্টি” গুলি অনপ্রিয়তার সদাসর্বদা ভূঁজে।

লেখক তাঁর চিন্তা ও ভাবনাগুলিকে তাঁর অনবদ্য ভাষায় ষাটুমত্রে মস্কিত করে পরিবেশন করেন। তিনি মূলতঃ জীবনপ্রেমিক ও মানবপ্রেমী। তাই আশা নিরাশায় ভরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দলিল দস্তাবেজ তাঁর লেখায় মূর্ত হয়ে উঠলেও বিবাদ চেতনায় মগ্ন মানব-মানবীর অন্তিম উত্তরণ তাঁর লেখায় ল্পষ্ট। তাই তিনি নিঃসন্দেহে আশাবাদী ও মানবতাবাদী।

আত্মবাবু মানব-মানবীর হৃদয়ের অন্তলীন সংঘাত ও জন্মের কোষ্ঠিবিচারে যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োগ করেন তা তাঁর একমাত্র সার্থক এই সংকলিত গোয়েন্দা গল্পেও স্থম্পষ্ট। গল্পটি আজ হতে প্রায় এক দশক পূর্বে লেখা।

*

*

*



তরুণগুপ্তের বিচিত্র কীতিকথা

গজেন্দ্র নাথ মিত্র

তরুণ গুপ্ত ঢাকুরিয়ায় মামার বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। তা এ যে বলে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও খান্ তানিতে বাধ্য হয়, আমাদের তরুণেরও তাহাই হইল। বড় মামা সকালে চা খাইতে খাইতে বলিলেন—কি কাণ্ড হয়েছে শুনেছিন? তরুণ তখন দ্বিষ্ট খানেক লুচি লইয়া বড় বাস্ত। ষাড় নাড়িয়া অবাব দিল,—না।

—কাল রাতে যে গুড্‌স হৌনখানা ডায়মণ্ডহারবার থেকে কলকাতায় গেল তার মধ্যে থেকে একখানা গাড়ী চুরি গেছে।

কথাটা শুনিয়া তাগিনের বতটা আশ্চর্য হইবে মনে করিয়াছিলেন ততটা আশ্চর্য কিন্তু সে হইল না। তবুও কহিল, গাড়ী চুরি গেল কি রকম?

—কলকাতায় পৌঁছে দেখ গেল মধ্যের একটা গুয়াগিন নেই।

—তাহলে পেছনে ছিল, কি রকম করে খুলে পেছনে বসে গেছে।

—না যে বাখু না; একখানা ঠিক মারখানো ছিল; শিছনের গাড়ি যেমন ছিল তেমনিই আছে, প্রথমেই গাড়ীও তাই—মারখানো থেকে একখানা গাড়ি নেই।

এইবার তরুণ সভ্যই আশ্চর্য হইল। এত রকমের চুরির কথা সে শুনিয়াছে কিন্তু হৌন চুরি—এ যে বড় অদ্ভুত ব্যাপার। অবাক হইয়া কহিল—মারখানো থেকে গেল কি রকম? তার পরেরগুলো পৌঁচেছে?

—হ্যাঁ। তাইভেই এত বেশী অর্থাৎ হয়ে গেছে সকলে। গাড়ী সোনারপুর থেকে ছেড়ে একেবারে কলকাতায় গেছে, পথে কোথাও থামে নি। সোনারপুর থেকে যখন ছাড়া হয় তখনও সে গাড়ী দেখা হয়েছে এবং সব গাড়ী গুণে ছাড়া হয়েছে।

—যে পানী চুরি গেছে তাতে কি ছিল?

—তা বেশ দামী জিনিসই ছিল। মজিলপুরের চক্রবর্তীরা কংগ্রেস একজিবিসনে বানকডক গালচে পাঠাচ্ছিল। মুঘলদের আমলের গালচে সব, এক এক পানার দাম খুব কম করে আট দশ হাজার টাকা হবে। সব শুদ্ধ পঞ্চাশ পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল ছিল ঐ গাড়ীপানায়। রেল কোম্পানীর কাছে Consignment insure করা ছিল। বাদবপুর, বালীগঞ্জের ষ্টেশন-স্টাফ মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। চাকরী নিয়ে টানাটানি বটেই—জল খাটতে না হয়

তরুণ খাইতে খাইতে উঠিয়া পাড়াইল। কহিল চলুন দেখি, বাপারটা দেখা যাক।

মামা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন খেতে খেতে উঠলে কেন, কি মুশকিল! বাপরা শেষ করে গেলেই হ'ত। এল দুদিন জিবোতে, তোরা ওসব গোলমালে কাজ কি বাপু।

তরুণ হাসিয়া কহিল, আর আমি খাব না! সত্যিই অনেক খেয়েছি। এই যখন আমার পেশা, তখন কি আমি এমন তাজ্জব কাণ্ড শুনেও চুপ করে থাকতে পারি!

বড় মামা অনিচ্ছাসহেও উঠিলেন, কহিলেন, কোন্ দিকে যাবে? চুরি তো বালীগঞ্জের দিকেও হ'তে পারে।

তরুণ কহিল, তা হয়ত পারে, কিন্তু বালীগঞ্জের থেকে বাদবপুরের দিকে চুরি যাবারই সুবিধা বেশী।

কখনও ডায়মণ্ড হারবার লাইনে যাঁহারা যান নাই তাঁহাদের সুবিধার জন্য স্টেশনগুলির অবস্থান একটু বোঝাইবার চেষ্টা করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কলিকাতা, বালীগঞ্জ

ঢাকুরিয়া, বাদবপুর

গড়িয়া, সোনারপুর,

কলিকাতা হইতে সোজা দক্ষিণদিকে স্টেশনগুলি পরপর চলিয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে ঢাকুরিয়া ফ্লাগ স্টেশন। অর্থাৎ ইহার নিজস্ব সিগন্যাল কম বা সাইন্ডেল কিছুই নাই।

শুধু প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি যাত্রী লাইবার জন্য একবার করিয়া থামে মাত্র।

সুতরাং ঢাকুরিয়ায় কিছু করা সম্ভবপর নয়। হয় গড়িয়া, নয় বাদবপুর, নয় বালীগঞ্জের পর কিছু করা হইয়াছে। যেহেতু বালীগঞ্জের দিকে চুরি করিবার মত নিগুন স্থান অল্প সেহেতু সেখানেও কিছু করা কঠিন। সুতরাং তরুণ বাদবপুরের দিকে বা ওয়াই স্থির করিল। কিন্তু বেশীদূর যাইতে হইল না। পথেই ঢাকুরিয়ার স্টেশনমাস্টারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বড় মামাকে দেখিয়াই কহিলেন, মশাই, খালি গাড়ীখানা পাওয়া

সেছে, যানবপুয়ের সাইডিং-এ, কিন্তু গালচে একখানাও নেই। সর্বনাশ হয়ে গেল।...

বড়মামা তরুণের সঙ্গে স্টেশনমাস্টারের পরিচয় করাইয়া দিলেন : এটি আমার ভায়ে তরুণ, মধু ক'রে গোয়েন্দাগারি করে, নাম শুনেছেন বোধহয় ?

স্টেশনমাস্টার কহিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি বৈকি। আমাদের মৌভাণ্ডা যে এই সময়ে উনি এখানে এসে পড়েছেন। মশাই তরুণবাবু, যদি তাড়াতাড়ি এর একটা কিনারা করতে পারেন তা হলে আমরা এই কজন স্টেশনমাস্টার চান্না ক'রে আপনি যা চাইবেন তাই দেব।

তরুণ একটু হাসিয়া কহিল, চলুন তেঁা দেখা বাক--তারপর আপনাদের বরাত, আর আমার হাত বশ।

তিনজনে লাইন ধরিয়া যানবপুয়ের দিকে বণ্ডা হইলেন। খানিকটা দূর গিয়াই নজরে পাড়ল একখানা খালি মালগাড়া একটা সাইডিং-এ দাঁড়াইয়া—এবং তাহাকে ঘিরিয়া অনেকগুলি লোক জটলা করিতেছে।

ঢাকুরিয়ায় স্টেশন মাস্টার যানবপুয়ের স্টেশনমাস্টারের সহিত তরুণের পরিচয় করাইয়া দিলেন। একপালা নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের পর তরুণ কাজ আরম্ভ করিল।

যানবপু ছাড়াইয়া আসিয়াই আপলাইন হইতে যে সাইডিং বাহির হইয়াছে সেইটিতেই গাড়ীখানি কাটিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া...

সাইডিং যেখানে মেন লাইনের সহিত সহিত সংযুক্ত হয়, সেইখানটা তরুণ বহুকণ পরীক্ষা করিল। হাঁটু গাড়িয়া লাইনে বসিয়া খালি চোখে এবং লেন্সের সাহায্যে সবরকমেই পরীক্ষা করা হইল। শেষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তরুণ কহিল,—এ সাইডিং কি ব্যবহারের করা হয়? স্টেশনমাস্টার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, গত তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও ব্যবহার হয়নি বোধহয়—

তরুণ কহিল, হঁ। তাহ'লে এর জয়েন্টের মুখে যে তেল দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই আপনাদের কোন লোক দেখে নি?

নিশ্চয়ই না। বহুকাল ব্যবহার হয় নি, তা ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে ব্যবহারের সম্ভাবনাও নেই। শুধু শুধু কর্তব্যের খাতিরে ওয়া জয়েন্টের মুখে তেল দিতে যাবে এত ভাল মানুষ আমার পোটারবা নয়।

তরুণ কহিল, আপনাদের এখানে কাছাকাছি কারুর কাছে ক্যামেরা আছে?

স্টেশনমাস্টারের বড় ছেলেটি লাকাইয়া উঠিল, আমার কাছে আছে, নিয়ে আসছি।

সেই জয়েন্টের মুখে লাইনের উপর একটি তৈলমিস্রক ময়লা আঙ্গুলের ছাপ পড়িয়াছিল, তরুণ সাবধানে ক্যামেরার সাহায্যে তাহারই ছবি তুলিয়া লইল। তারপর রেলওয়ে পুলিশের ইন্সপেক্টরকে কহিল, এই আঙ্গুলের ছাপটা নিয়ে একবার হেড-অফিস খোঁজ ক'রে দেখুন দেখি কোনও পুরানো পাণী কিনা। আমার বিশ্বাস যে এমন কাজ যে করতে পারে, তার এই প্রথম কেস নয়।

আরপর স্টেশনমাষ্টারের দিকে ফিরিয়া কহিল, বহুদিন অব্যবহারে জয়েন্টটা পাছে ঠিকমত কাজ না করে এই ভয়ে ভাল দিতে গিয়েছিল। আবুলের ছাপটা উঠে গেছে—আচ্ছা আলি আম আন্ন, যদি কোনও খবর পান—আমায় জানাবেন।

পরের দিন ভোর হইতে না হইতে ইন্স্পেক্টর আসিয়া হাজির। আবুলের ছাপের প্রতিলিপি হেড অফিসের দপ্তরে মিলিয়াছে, লোকটার নাম মতীনাথ মহার আগ্রে ভীষণ ভাষণ চুর করিয়া পরা পাড়িয়াছে এবং বার দুই জেল খাটিয়াছে। বেঁটে, কৃষ্ণবর্ণ, মাথার মধ্যে কেবল একটু টাক আছে। নাকটা খাঁড়ার মত সোজা নামিয়াছে!... কিছুদিন আগে পর্যন্ত জানা গিয়াছিল যে সে যাদবপুর ও ঢাকুরিয়ার মাঝামাঝি বৈষ্ণব-ঘাটার থাকে।

তরুণ কহিল, চলুন একবার খোঁজ করে দেখা যাক!

দুই জনে বাহির হইয়া পড়িল। তরুণ কিছুদূর গিয়া কহিল, লোকটাকে শাস্তি দিতে চান না জিনিসগুলো কিবে চান?

ইন্স্পেক্টর কহিলেন, জিনিসগুলো আগে চাই—নইলে বেল-কোম্পানাকে কত টাকা খেদার দিতে হবে তার ঠিক আছে? ভালয় ভালয় যদি মালগুলো কেবল পাওয়া যায় তা' হলে ওকে ছেড়ে দিতেও রাজি আছি।

বৈষ্ণবটা বেশা দূর নয়। সাতটা বাজবার আগেই দু'জনে পৌঁছিলেন। একজন মুসলমান দাড়াওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বাড়ী দেখাইয়া দিল। তরুণ ইন্স্পেক্টরকে একটু আড়ালে থাকবার অহুয়োদ করিয়া খুব জোরে কড়া নাড়িতে লাগিল। প্রায় মিনিট পাচেক কড়া নাড়িবার পর ভিতর হইতে মোটা ভারী স্ত্রীকণ্ঠে জবাব আসিল—কে-র?

তরুণ কোনও কথা না কহিয়া কড়া নাড়িয়াই চলিল। তখন কম্পেটা ঈষৎ ফাঁকা করিয়া এক স্থানলোক উঁক মারিল। যেমন মোটা তেমনি বেঁটে এবং তেমনি কালো, তাহার উপর নাকটা খাবড়া। বেশ বিবল মাথার গুটিকতক চুল উপর খুঁটি করিয়া বাধা।

সে যেন বিচাইয়া মারতে আসিল: কি বকম লোক তুমি বাছা? আলি কড়া নেড়ে চলেছ। জবাব দাওনা কেন?

তরুণ সে সব কথা গায়ে না মাখিয়া কহিল, সাতানাথ আছে?

স্ত্রী লোকটি যে লাফাইয়া উঠিল। কহিল, আছে, কিন্তু সে কারো সঙ্গে দেখা করে না।

বলিয়াই সহস্র কপাট বন্ধ করিয়া দিতে বাইতে ছিল কিন্তু তরুণ তাহার পূর্বেই ডান পা-টা দরজার মধ্যে বাড়াইয়া দিয়াছে স্তম্ভবৎ বন্ধ করা গেলনা।

সে চৈচাইয়া কহিল, একি গো, জোর করে ঢুকবে নাকি?

তরুণ ধীরেধীরে কহিল, সেই বকমই তো হচ্ছে আছে। আছেন ইন্স্পেক্টর।

ইন্স্পেক্টর নামটা শুনিবামাত্র জীলোকটা একটা অশ্রুট শব্দ করিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার উদ্বেগ বুঝিয়া তরুণ নিমেষে পাশ কাটাইয়া জীলোকটার আগে চলিয়া গেল।

সীতানাথ একটা গোলমাল শুনিয়া বাহির হইতেছিল—কিন্তু তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল তরুণ এবং তাহার পিছনে ইন্স্পেক্টর হাতে শিক্ত লইয়া।

সে বিবর্ধমুখে পা পা করিয়া পিছাইয়া গেল। তরুণ ভিতরে আসিয়া ইন্স্পেক্টরকে ভিতরে টানিয়া লইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর গম্ভীর মুখে কহিল, তাহা পর সীতানাথ, গালচেগুলো কোথায় বল দেখি ?

সীতানাথ বিস্মিত হইবার ভান করিয়া কহিল, কি গালচে ? কোথাকার গালচে ?

ইন্স্পেক্টর চটিয়া উঠিলেন, ত্রাকামি করনা আমরা সব টের পেয়েছি, লাইন-জয়েন্টের মুখে তোমার আঙুলের ছাপ ধরা পড়েছে—চালাকি রাখ, কোথায় আছে বলে তো।

সীতানাথ লোকটা বোকা নয়। সে আর অবাধ হইবার চেষ্টা না করিয়া কহিল, আমি বলব না, যা খুশী করুন গে।

তরুণ ইন্স্পেক্টরকে চুপ করিবার ইচ্ছিত করিয়া কহিল, বাপু, ধরা তো পড়েইছে, তুমি কি মনে কর খুঁজে আমরা বেঁধে করতে পারব না ?

সীতানাথ কহিল, না—পারবেন না। সে যেখানে আছে পুলিশের চোখ পুকরের ক্ষমতা নেই তা বার করে।

ইন্স্পেক্টর একটা কটুক্তি করিয়া উঠিলেন, তহলোকের মত কথা বল।

সীতানাথ কহিল, বাগ হ'লে আপনার কথাই প্রায় ভুল লোকের মত থাকে কিনা। আমি তো ছোট লোক বটেই। ……

তা বাহ্যিক সে পারেন টাবেন না। জেলে টেলে যা দেবেন নিন। জেলেও দেবেন আর মালও আমি ছেড়ে দেবো এত কাঁচা ছেলে আমি নই।

—কিবে এসে তো বাঁচতে হবে, তখন টের পাবোনা আমরা ?

সীতানাথ তাহাতেও ধামিল না। কহিল, আমি জেলে গেলে অন্য লোক তার ব্যবস্থা করবে।

ইন্স্পেক্টরের চোখ জলিয়া উঠিল। কহিলেন, সেখানে গিয়ে যাবের চোটে কথা আদায় করে নেব।

তরুণ সীতানাথকে মনে মনে অজস্র বাহবা দিতে লাগিল। সে নিবিচার মুখে কহিল, আমি পুলিশের সঙ্গে এ বাড়ীর বাইরে পা দেবামাত্র তার ব্যবস্থা হবে। তখন আমারও আর বলবার উপায় থাকবে না। ইচ্ছে থাকলেও না।

তরুণ ইন্স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া কষ্টে হাসি দমন করিল। তাহার পর মোলারেন্ন কর্তে কহিল, যদি না ধরি, যদি ছেড়ে দিই।

লক্ষ্মী সীতানাথ সামনে কুঁকিয়া, আগ্রহ ভরে কহিল, দেবেন, দেবেন ছেড়ে ?..... জেলে দেবেন না ?... ..ছেলেটার বড় অসুখ বাবু—আমি জেলে গেলে দেখবার লোক থাকবে না।

তরুণ কহিল, বেশ, আমি কথা দিচ্ছি তুমি গাল্চেগুলো ফির্বিয়ে দিলে আমি আর এবার তোমার কেস উঠতে দেবনা। কিন্তু একটা মূচলেকা দিতে হবে।

সীতানাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, একটা মোহাং চান্দরের বাক্সের মধ্যে পুরে ধারগুলো ঝাল ক'রে পুতুরের মধ্যে ফেলে রেখেছি। জেলে ডেকে ভাল কেসে উঠাতে হবে। কাছেই আছে।

তরুণ কহিল, কিন্তু তুমি চুরি করলে কি ক'রে ?

সীতানাথ হাসিয়া কহিল, একলা পারিনি বাবু। আর একজন ছিল, তার নাম করব না। যখন সোনারপুর থেকে গাড়ী ছাড়ে তখন একটা শ্রমিকের ওপর লক্ষ্য দড়ি নিয়ে সে লুকিয়ে থাকে। গাড়ী ছাড়বার পরই কাজ আরম্ভ করে। যে গাড়ীর মধ্যে গাল্চে ছিল তার খাত ব গাড়ীর সঙ্গে তার পরের গাড়ী আগে অনেকখানি টিলে ক'রে বাঁধা হয়। তখন চুরির গাড়ীখানা এক নম্বর, আগেরটা দু'নম্বর আর পরেরটা তিন নম্বর। তিন নম্বর আর দু'নম্বরের বেঁধে এক নম্বর আর 'তিন নম্বরের জোড়টা খুলে দেওয়া হয়। লক্ষ্য দড়িটার আটকে বইল বটে কিন্তু অনেকটা মধ্যে ফাঁক বটল। তারপর দু'নম্বর আর এক নম্বরের বাধন হ'ল খোলা তখন এক নম্বর গাড়ীখানা দু'নম্বর আর তিন নম্বরের মধ্যে থাকে খেয়ে খেয়ে চলতে লাগল। এবারে আমি যাদবপুরের ঐ সাইডিংটার তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যেমন দু'নম্বর গাড়ীটা চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে সাইডিং-এ লাইন জয়েন ক'রে দিলুম, কলে এক নম্বরটা গড়াতে গেল তখন সাইডিং-এ চলে এল। আমিও সাইডিং-এর সঙ্গে যেন লাইনের মোড়া খুলে দিলুম। তিন নম্বর আর পিছনের গাড়ীগুলো আবার যেন লাইনে চলে গেল তখন দড়িটা খাটো ক'রে এনে গাড়ীর ছুটো ভাগ বেমানুম জুড়ে দেওয়া হ'ল।

তরুণ মস্তমস্তের মত শুনিতে ছিল। ইন্সপেক্টর শুধু একটা 'স-স' শব্দ করিয়া উঠিলেন। তাহর পর একটা মূচলেকা লিখাইয়া লইলেন! তরুণ প্রশ্ন করিল, তুমি টের পেলে কি ক'রে গাল্চের কথা ?

সীতানাথ কহিল, আপনাদের ভদ্র ঘরের কাণ্ড।... ..আর একজন জমিদার অনেক টাকা কবুলান, চক্রবর্তীদের ঐ গাল্চের ওপর বড় লোভ তাঁর।... ..তা অত পরিশ্রম বুঝি গেল। ছেলেটার বড় অসুখ, টাকার দরকার বলেই এমন অসীম সাহসিক কাজে লেগেছিলুম।

তরুণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া পকেট হইতে একগোছা নোট বাহির করিয়া হাতে দিয়া কহিল, এই পঞ্চাশ টাকা দিলুম আমার সঙ্গে আবার কথা ক'র। তোমার ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব এসব কাজ আর ক'র না। এই ঠিকানাটা রেখে যাও।

সীতানাথের চম্চু সজল হইয়া উঠিল।

বা হ'বে আসিয়া ইন্স্পেকটর কহিলেন, একে-তো এমনি ছেড়ে দিলেন, তার ওপর আবার টাকা ?

তরুণ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, যাব মাথায় এমন চুহির মতলব আসতে পারে তার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে, টাকা তো তুচ্ছ কথা।

*

*

*

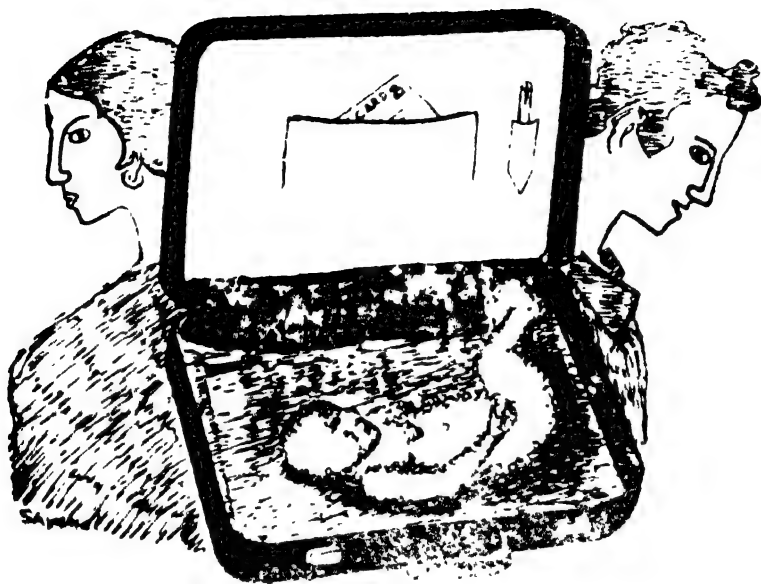
গজেন্দ্রকুমার মিত্র : সেই সমস্ত লেখকদের অন্ততম যারা সাহিত্য করেন, সাহিত্য ভালবাসেন ও কথাসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। গজেন মিত্র মশাই গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন সেই তিনের দশক হতে। বিচিত্রা ও শনিবারের চিঠিকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য-সাধক একদা যাত্রা আরম্ভ করেন, আটের দশকে পদার্পণ করে তিনি তাঁর শেষতম উপন্যাস পাঞ্চজন্ম প্রকাশ করেন। মহাত্মারতের কথা অমৃতসমান। তাই পাঞ্চজন্ম লেখকের অন্ততম বহুল প্রচাৰিত গ্রন্থ।

গজেন মিত্র নানা ধরনের গল্প লিখেছেন। গোয়েন্দাধর্মী ও রহস্য রচনাও নেহাৎ কম নয়। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমোদ্র মিত্র ব্যতীত আর কোন বিশিষ্ট সাহিত্য সেবী গোয়েন্দা গল্পের ভিতর দিয়ে সমাজ ও মানব মানবীর অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির অন্বেষণ করেন নি। সেই পাঁচকড়িদের যুগ হতেই রহস্য, রোমাঞ্চ ও গোয়েন্দা গল্প এক বিতীর্ণ শ্রেণীর আর্টের পর্যায়ভুক্ত হয়ে আছে। তবে গজেনবাবু প্রমুখ কিছু খ্যাতিমান কথাসিদ্ধান্ত শৈল্পিক প্রয়াসে গোয়েন্দা গল্পও ধন্য হয়েছে। তরুণ ওপের বিচিত্র কাহিনীকাহ গোয়েন্দা গল্প হিসাবে অনন্ততার দাবি রাখে।

*

*

*



হত্যার পরের ঘটনা

বিমল মিত্র

মা-জননীরা, আমাকে আশীর্বাদ করবেন। গল্প লেখা আমার নেশা।
আবার পেশাও এটে। কিন্তু তা বলে আমি আপনাদের কখনও গল্প শোনানোর
নাম করে মিথো কথা শোনাতে পারিনা। সে-কাজ আমার দ্বারা হয় না। প্রতিদিন
লেখবার আগে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র তেজস্বী কোটি দেবতা আর মাতা-বহুমতীকে
সাক্ষী রেখে আমি লিখতে শুরু কর, যাঁরা শোনেন, তাঁরা কেউ ভাল বলেন,
প্রশংসা করেন, আবার কেউ নিন্দে করেন। তা নিন্দে করুনগে, তাতে আমার
কোন ক্ষতি নেই। আমি আপনাদের গল্প শুনিয়ে খালাস। নিজের বাবকের কাছে
আমি ঋণী, এই আমার সবচেয়ে বড় সাক্ষী। এর চেয়ে বেশি স্বখ আমি চাই
না আপনারা বিশ্বাস করুন, আপনাদের আমি প্রজ্ঞা করি, আপনাদের আমি ভক্তি
করি। মায়ের জাতির ওপর আমার বিশ্বাসের অন্ত নেই।

এই গৌরচন্দ্রিকাটুকু এ-গল্পের পক্ষে অপরিহার্য। এটুকু না বললে আপনারা

আমাকে তুল বুঝতে পারেন, তাই বলছি। এবার আপনারা গল্পটা শুনুন।

*

*

*

ছোট গল্পের আগে নারক-নারিকার বা পাজ-পাজীর নাম বলা দরকার। কিন্তু এ গল্পের প্রধান চরিত্রের নাম আমি প্রথমে জানতাম না। শুধু আমি নয়, আমার সঙ্গে বসে লোক সেদিন ভবানীপুর থানায় ছিল, কেউই জানত না।

ভবানীপুর থানার দারোগাও বার বার মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করেছিল—আপনার নাম কী?

মহিলাটি কিছুই উত্তর দেন নি। চুপ করে ছিলেন শুধু।

—বলুন, আপনার নাম কী?

—আপনি কোথায় থাকেন?

—আপনার স্বামীর নাম কী?

কোন কথাই উত্তর সেদিন দেননি মহিলাটি।

ভবানীপুর থানা তখন মাদ্রাসের ভিড়ে ভেঙে পড়েছে। দু'নম্বর বাসে বসে লোক ছিল, প্রায় সবাই তখন এসে থানার ভেতরে ঢুক পড়েছে। বাবা ভেতরে ঢুকতে পারেনি, তারা বাইরে থেকে উকি মারবার চেষ্টা করছে। পুলিশ কন্সটেবলরা অনেক চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছে না আর।

—এখানে কী হয়েছে মশাই?

রাস্তার বেকার লোকের অভাব নেই কলকাতা শহরে। উত্তেজনার খোঁষাক চাই সকলের। রাস্তার বেড়াতে কোথাও কিছু মাদ্রাসের ভিড় দেখলেই উকি মেয়ে দেখি। কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে খুশি হই।

—কী হয়েছে মশাই এখানে? ভিড় কিদের?

—কে জানে মশাই, আমিও আপনার মত, কিছুই বুঝতে পারছি না।

—শশ থেকে একজন বললে, চেরে ধরেছে বাসে—

—চোর?

—হ্যাঁ মশাই, শুনি নাকি মেয়েমাদ্রাস চোর।

মেয়েমাদ্রাস চোর কথাটা বাকুদের মত হঠাৎ যেন বাতাসকে বিচলিত করে দিলো। বাবা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের কানে কথাটা যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তাদের দেখা দেখি আরো কয়েকজন। বাবা জরুরি কাজে বেরিয়েছিল, তারা কাজ পণ্ড করে ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করলো।

কয়েকটা কন্সটেবল তখন একেবারে থানার সামনে রুল উঠিয়ে হেঁকে এল—
ভাগো ভিড় হঠাৎ—ভিড় হঠাৎ—

কিন্তু কে আর তখন শুনেছে তাদের কথা। বাবা ভেতরে ঢুকেছে, একেবারে

মহিলাটিৰ কাছ ঘেঁৰে দাঁড়িয়েছে তাদেৱই বেশি সুবিধে। তাৰা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মহিলাটিকে। অনেকক্ষণ থেকেই দেখে আসছে। সেই বখন বোবাল্লাবে ছুঁনধৰ বাসে উঠেছিল। উঠে লেডিজ সীটে বসেছিল। অবশ্য তখন এমন করে তার দিকে নজর কৰবার সুযোগ আসেনি। অন্ততঃ ভত্ৰতাৰ পাতিবৈও কোনও মহিলাৰ মুখৰ দিকে ক্যাট-ক্যাট করে চেয়ে থাকা যায় না। চাওয়া উচিতও নয়। এমন কত মেয়ে বাসে উঠছে, বাস থেকে নামছে, কে আর তার হিলেব রাখছে।

—আপনি কোথা থেকে বাসে উঠেছিলেন?

ডল-ডেকাৰ বাসেৰ একতলায় ঢুকেই ছ'পাশে লম্বা লেডিজ সীট। একজন লেডী ওঠে তো আর একজন নামে। কখনও বাসে চাপাচাপি ভিড়। পুৰুষেৰা প্যাসেজৰ ওপৰ, পা-দানিতে সিঁড়িৰ ধাপে ধাপে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে দোল খাচ্ছে, থাকা খাচ্ছে, কুলছে। তখন হয়তো লেডিজ-সীটের ওপৰ একটি মেয়ে সব জাৱগাটা জুড়ে বসে আছে। সবাই পকেট সামলাচ্ছে, জামা-কাপড় জুতো বাঁচাচ্ছে। তার ওপৰে অফিসেৰ ছুটিৰ সময়। সে-সময়ে কাৰো জান ছিল না কোনও দিকে। এক-একটা স্টপেজ এসেছে আর যেন মন্তব্যকৃত কৰ হৈছে। কাৰো হাতে ছাতা, কাৰো পুঁটলি, কাৰো কাইল। জামা ছিঁড়ে এফোড় ওফোড় হয়ে গেল। সে সৰ্ব্ব্ব লেডিজ-সীটের দিকে নজর দেবার সময় ছিল না।

—আপনি ঠিক জানেন এটা আপনাব এটাচি কেস?

মন্তব্য আছে এক ভত্ৰলোক উঠেছিলেন ঠিক বোধহয় মোডিক্যাল কলেজের সামনে স্টপেজ থেকে। ট্রাউজাৰ—ওপন-ব্ৰেক্ট কোট পরা ছিল। খুব জৰুৰি কাজেই বোধহয় যাচ্ছিলেন। হাতে ছিল একটা এটাচি কেস। বাসেৰ হাওেল ধৰে বললেন—মশাই একটু লৱে যাবেন—

কে আর লৱে যাবে। কে আর অন্ত লোকেৰ ছুঁখ বোঝে। কাৰ এত মাথাবাখা।

কিন্তু তারই মধ্যে ভত্ৰলোক এক হাতে এটাচি কেস আর এক হাতে হাওেলটা ধৰে এক পা পা-দানিতে রাখবার ব্যবস্থা কৰেছিলেন কোনমতে। তারপর কুলতে কুলতে চলতে গিয়ে হাতটা একটু বাখা হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। তাড়া কাৰ নেই? সকলেই তো জৰুৰী কাজ। সকলেই তো কাজ কৰতে ছুটেছে। কেউ বাড়ী যাবে, কেউ আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা কৰতে যাবে, কেউ হাসপাতালে যাবে। নানান কথাকে সবাই জলছে। কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।

তবু মনে আছে, ভত্ৰলোক শেষ পৰ্যন্ত পা-দানি পেরিয়ে প্যাসেজ, প্যাসেজ থেকে একেবারে ভেতৰে ঢুকে পড়েছিলেন। তারপর একটা লেডিজ-সীট খালি দেখে বাতের বোকাটা খালি কৰবার জন্তে এটাচি কেসটা সেখানে এককোণে রেখে দিয়েছিলেন।

এ ঘটনা কেউ দেখেছে, অনেকে দেখেওনি।

আজকের দিনে কারোও এমন সময় নেই যে সব দিকে চোখ মেলে সব কিছু দেখবে। আর তাছাড়া বাসের মধ্যে কেউ কাউকে চেনে না। কে কার পাশে বসলো, তা দেখবারও সময় নেই। শুধু কোথায় কোন্ সীটটা খালি হলো কিংবা খালি হতে পারে, নেই দিকেই নজর। একটা সীট খালি হবার খুচনা হলেই দশজনে হাঁ হাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কে আগে বসতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলে। সেই পাইকপাড়া থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত এই-ই হচ্ছে প্রতিটি বাসের ভেতরের ইতিহাস। ভেতরের প্রাত্যহিক মর্যাদিক ইতিহাস।

ইলপেক্টর বললেন—তারপর ?

যে ভহ্লোক গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করে এসেছেন, তিনি বললেন—তারপর এলগিন রোডের কাছে আসতেই এক ভহ্লোক তাড়াহড়ো করে সকলকে ঠেলেঠুলে চিংকার করে বললেন, বাঁধকে—বাঁধকে—

বাস তখনও ভালো করে বাঁধেওনি। ভহ্লোক বাস থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। আর ভালো করে থামবার আগেই কণ্ঠের আবার বেল বাজিয়ে দিয়েছে, আর সামনে ট্রাফিক সিগন্যাল-ল্যাম্প গ্রীন ছিল, ড্রাইভারও স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে।

—তারপর ?

—তখন আমার পেরাল হলো ভহ্লোক তো এটাচি কেসটা ফেলে গেলেন। এই ট্রাউজার আর ওপন-ব্রেস্ট কোট পরা ভহ্লোকই তো মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে এটাচি কেসটা নিয়ে উঠেছিলেন, আঁত কষ্টে হ্যাণ্ডেল খেয়ে খুলতে খুলতে শেষকালে ভেতরে ঢুকে ওই খালি লেডিজ সীটটার ওপর এটাচি কেসটা রেখেছিলেন।

কথাটা কণ্ঠেরকে বলতেই সেও ঘটা দিলে।

সবাই মুখ বাড়িয়ে চিংকার করে উঠলুম—ও মশাই, আপনার এটাচি কেস ফেলে গেলেন, ও মশাই, শুনেচেন—

ভহ্লোক তখন কোথায় বাস্তায় নেমে কোন দিকে গেছেন, তার আর পাত্তা নেই। আর বাসটাও তখন পুরো স্পীডে এগিয়ে চলেছে। সবাই মলে আলোচনা কর। হলো ওটাকে বাসের ডিপোতে গিয়ে জমা দেওয়া ভালো। যদি বাড়ি গিয়ে মনে পড়ে, তাহলেও একবার খবর নিতে পারেন বাস-অফিসে।

কণ্ঠের, ওটা ডিপোতে জমা দিয়ে দেবেন। আহা, দামী জিনিস হয়তো ভহ্লোক ফেলে গেছেন।

কিন্তু এটাচি কেসটা নিতে যেতেই মহিলাটি কেমন অবাক হলো।

বললে—এটা তো আমার—

—আপনার ?

মহিলাটি বললে—হ্যা, আমার, এটা আমার জিনিস—

কণ্ঠ্যের প্রথমে একটু কিস্ত—কিস্ত করেছিল। বেশ ধোঁপ ছরস মহিলা। গলায় সফ্রো সোনার চেন-হার রয়েছে। হাতে সোনার বালা রয়েছে। ছাপা শাড়ি, লং-স্লিভ ব্লাউজ, ডোনাট খোঁপা। যেমন অল্প মেয়েদের থাকে, সেই রকমই। কোনও তফাৎ নই। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মহিলা। বেশ ছিমছাম গড়ন। বয়েস ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ হবে। কেমন যেন বেশ একটা মিষ্টি মাধুর্য মুখের আদলে।

কণ্ঠ্যের হাত বাড়িয়েও হাতটা শুটিয়ে নিলে। মহিলা ততক্ষণে এটাচি কেসটা নিজের কোলে তুলে নিয়েছে।

কিস্ত বাসের মধ্যে ছ-একজন জাঁদবেল প্যাসেঞ্জারও থাকে। তারা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। তারা সব সময় দুর্বলের পক্ষে। তারা ভয়হাতা, পতিত পাবন।

—আপনার কী বকন? ওটা তো ওই ভহ্লোক ফেলে গেলেন। আমি তো নিজের চোখে দেখেছি।

বাসভুক্ত লোক এতক্ষণে সচেতন হয়ে উঠেছে। সবাই চেয়ে দেখল মহিলাটির দিকে। সকলের দর্শনার বস্তুতে পরিণত হয়ে উঠেছে মহিলাটি।

—আপনি দেখেছেন ?

—হ্যা, মশাই, আমি নিজের চোখে দেখেছি। মেডিক্যাল কলেজের সামনে ভহ্লোক উঠলেন হাতে এটাচি কেসটা নিয়ে, শেষকালে কোথাও রাখবার জায়গা না পেয়ে ওট খালি ফায়ারায় রেখে দিলেন।

আর একজন পাশ থেকে বললেন, না, না, মশাই, আমিও দেখেছি, ভহ্লোকের হাতে এটাচি কেসটা ছিল।

—আহা, এতক্ষণ বোধ হয় সে ভহ্লোক বাড়িতে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বলে পড়েছেন।

—মশাই, বাসে এ-রকম কত লোক কত কী ফেলে যান।

উপদেশ দেবার লোকেরও অভাব হয় না। কণ্ঠ্যেরকে একজন বললে, আপনি কারো কথা শুনবেন না মশাই, আপনি ডিপোতে গিয়ে ওটা জমা দেবেন—

কণ্ঠ্যের মহিলাটির দিকে আবার হাত বাড়িয়ে দিলে—দিন, এটাচি কেসটা দিন—

—এটা আমার।

—আমার মানে ?

—আমার মানে আমার।

এতক্ষণ যারা কোন কিছুতেই মাথা ঝামায় না, সেই শান্তশিষ্ট শান্তিপ্রিয় ভহ্লোকের দলও মুখ ঘোঁরাই এবার।

—আপনার জিনিস বললেই হল। আমরা দেখলুম অল্প এক ভহ্লোক এটাচি কেস

নিরে ওখানে বেঁচে ছিলেন। আর আপনি বলছেন আপনার? আপনার বললেই আমরা ছেড়ে দেব?

বেশ গম্ব হয়ে উঠল ভেতরে। ড্রাইভার তখন ফুল-ফোর্সে গাড়ি চালিয়েছে। কণ্ঠাঙ্কুরের টিকিট কাটা খুঁচে গেল।

—আপনি জিনিসটা দেখেন কিনা বলুন?

মহিলাটি গম্ভীর গলায় বললে, আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাইনা।

—কথা বলতে আপনাকে কী বলছে? জিনিসটা দিয়ে চুপ করে থাকুন।

অগ্নি লোডজ-সীটে যে সব মহিলারা বসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও ব্যাপারটা সংক্রামিত হয়ে গেছে ততক্ষণে। একজন বুড় মতন মহিলা বললেন, কেন বাবা, তোমরা অমন করে বলছ? কেউ কি কারো জিনিস এমন করে নিতে পারে?

—নিতে পারে কিনা সে আমরা জানি। যা জানেন না, তা নিয়ে আপনি কথা বলতে আসবেন না।

আর একজন মাঝ-বয়সী মহিলা ওপাশে বসেছিলেন। বললেন আপনারা কেন ওঁকে অমন করে বলছেন? মেয়েদের সম্মান বেঁচে কথা বলতে পারেন না?

—আপনি আর এর মধ্যে কথা বলতে আসবেন না মা, আমরা যথেষ্ট সম্মান বেঁচে কথা বলছি।

এটাচি কেসটা হাতে নিয়ে ভ্রমহিলা এবার উঠল। স্টপেজ এলোছে একটা। একেবারে নেমে চলে যাবার চেষ্টা।

কণ্ঠাঙ্কুর, যেতে দেখেন না ওঁকে।

—কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

মহিলাটি বলে, আমি নামব এখানে, সফর।

—নেমে যাবেন যান। এটাচি কেসটা দিয়ে নেমে যান।

ভ্রমহিলা তবু নামবার উদ্যোগ করছে। কয়েকজন সামনে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল। বললে, জিনিস চুর করে নেমে যেতে পারবেন না।

ভ্রমহিলা বললে, জানেন, আপনাদের পুলিশ থেকে আবেদন করাতে পারি।

ওপাশ থেকে এক বৃদ্ধ ভ্রমলোক বললে, আঃ আপনারা যেতে দিন না ওঁকে। কেন বাস্তা আটকাচ্ছেন?

সে কথায় কান দিলে না কেউ। বললে, পুলিশের ভয় দেখাবেন না, তাতে আপনিই বিপদে পড়বেন—

একজন বললে, চলুন, ওঁকে ধরে নিয়ে থানায় চলুন, সব যিহ্নে হয়ে যাবে।

কথাটা তুলতেই হৈ-হৈ করে উঠল সবাই। বাস ছেড়ে দাঁড়িল। কতকগুলি আর দাঁড়িয়ে থাকবে। সবাই নামল। ভ্রমহিলা নামল। বাসভ্রম লোকই নামল। কিছু বাইরের লোকও ছুটল। সামনেই ভবানীপুর থানা। ভবানীপুর থানাতেই

নিয়ে চলুন মশাই। মুখোমুখি কয়লা হায়ে থাক।

—তারপর?

ইন্সপেক্টর এংফন ফোনও কথাই সঠিক জবাব পান নি। আবার বললেন, এঁরা সবাই দেখেছেন। এক ভদ্রলোক এটাচি কেস নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের সামনে থেকে উঠেছেন, আর আপনি বলেছেন আপনার?

চারিদিকের ভিডেও মধ্যে তখন তুমুল হৈ চৈ চলছে।

কনস্টেবল কয়েকজন ভিডু সন্নিবে ঘর খালি করে চেষ্টা করলে। কিন্তু কে বাইরে যাবে? এমন মুখবোচক দৃশ্য দেখতে পাওয়া কম মোতাম্যের কথা নাকি? তারা কল উঠিয়ে চাপিয়ে বল—হাতো, বাহার ঘাও সব—হাটু ঘাও—

—কথার জবাব দিন। চূপ করে আসছেন কেন?

ভদ্রমহিলা বললে, আপনি বিশ্বাস করুন, এ এটাচি কেস আমার—

—আপনি কোথা থেকে উঠেছিলেন?

—বৌবাজার থেকে।

—যে ভদ্রমহিলা হাতো এটাচি কেসটা নিয়ে উঠেছিলেন, তিনি কি আপনার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন এটা?

মহিলাটি বললে, আমি রাখতে দেবেন কেন? তাঁর জিনিস হলে তিনি তো যাবার সময় এটা নিয়ে যেতেন। এটা তো আমার

—আপনার বাড়ি কোথায়?

—ভবানীপুরের বান্দর বাড়ি।

—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ভদ্রমহিলা বললেন, বৌবাজারে আমার বোনের বাড়ি আমি পান থেকেই আসছি।

—এ এটা চ কেসের মধ্যে কী জিনিস আছে।

ভদ্রমহিলা বললে, আমার শাড়ি একটা আর টাকা কিছু আছে।

—কত টাকা আছে?

ভদ্রমহিলা বললেন, তা মনে নেই।

—মনে করার চেষ্টা করুন না। নিজের টাকা রেখে দিয়েছেন আর কত টাকা আছে মনে করতে পারছেন না?

ভদ্রমহিলা বললে, না।

—চারি। এর চারি আছে আপনার কাছে?

ভদ্রমহিলা বললে, না।

—সেকী? নিজের এটাচি কেস, আর নিজের কাছে এর চারি নেই?

ভদ্রমহিলা বললে, আমার বোনের বাড়িতে তুলে চারিটা ফেলে এসেছি।

গোয়েন্দা প্রথম) —১৩

—আপনার বোনের বাড়িতে টেলিফোন আছে ?

—ভ্রমহিলা বললে, না।

ইন্সপেক্টর হুঁস্কার লোক। বললেন, তাতে ক্ষতি নেই, আমার কাছে মাষ্টার কী আছে, তা দিয়ে সব খোলা যাবে।

বলে তিনি একজন কনস্টেবলকে মাষ্টার কী'র গোছটা আনতে বললেন। এক মিনিটের বৈধ পরীক্ষা। কিন্তু সকলের মনে হল, সেই এক মিনিটই যেন কল্পকালে রূপান্তরিত হয়ে গেল সেদিন, সেই ভবানীপুর পুলিশ স্টেশনের ভেতর। আর এটাচি কেসটা খালিবার সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সমস্ত পাপ, সমস্ত লজ্জা, সমস্ত কলঙ্ক যেন এক চাবির মোচড়ে চাঁ করে উঠল।

আশেপাশের জিড়ের মানুষ তখন উল্লাসে উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

ভ্রমহিলা আর থাকতে পারল না। যেন ভেঙে পড়ল। বললে, এটাচি কেস আমার নয়, আমি মিথ্যা কথা বলেছিলাম, বিশ্বাস করুন, এ আমার নয়, আমি এর বিদ্যুৎ বিসর্গও জানি না।

বলতে বলতে ভ্রমহিলা সেই অবস্থাতেই চম্বার থেকে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

—তারপর ?

মা-জননীরা, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি সত্য বই মিথ্যা জানি না। আমি প্রতিদিন লেখার আগে চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র তেত্রিশ কোটি দেবতা, মাতা-বসুমতীকে সাক্ষী রেখে কলম ধর। লেখা আমার দেশ, আমার দেশেও বটে। কিন্তু তা বলে গল্প শোনানোর নাম করে কখনও আমি আপনারদের মিথ্যা কথা বলতে পারিনি। আপনারা আমার শ্রদ্ধা-পাত্রী। আপনারা আমার ভক্তির পাত্র। আপনারদের মর্যাদাহানি আমার কল্লনার বাটরে। আমি আপনারদের আমার অন্তরে শ্রদ্ধা-ভক্তি-সম্মান জানাই।

যারা শুনছিল এতক্ষণ তারা অধৈর্য হয়ে উঠল।

বললে, ওসব কথা থাক, আপনার কী হল বলুন ? এটাচি কেসের ভেতর কী ছিল ?

সে কথাই তো বলছি। যুগ যুগ ধরে সাহিত্য মানুষের কলাগ বোধকেই লাগত করেছে, সাহিত্য জাতির মনের মুকুট.....

—ও সব কথা থাক, এটাচি কেসের মধ্যে কী পাওয়া গেল বলুন শীগ্গির ?

—একটা ছোট একদিনের নরী ছেলে।

সমস্ত লোক তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

—কিন্তু সেদিন যারা সেই থানার মধ্যে ছিল তাদের সকলেবই মনে হয়েছিল ও

যেন মরা চলে নয়, মানুষের দল মানুষের কীভূতিকে কেউ যেন খুন করে রেখে গেছে
একটা এটাচি কেসের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আশ্রয় গলা টিপে কেউ যেন
ওখানে হতা করে ঐ বকন করে তার সংকার করতে চেয়েছে।

*

*

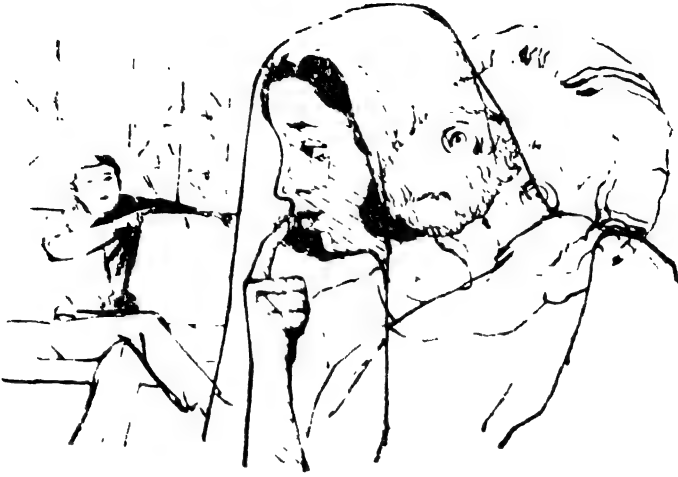
*

বিমল মিত্র : সাহিত্য ও ইতিহাসের তন্মিষ্ট পাঠক বিমল মিত্র মশাই সমকালীন
সাহিত্যে প্রবাদ পুরুষ। তাঁর বহুদায়কন ও এপিকধর্মী উপন্যাসগুলির অনেক চরিত্রই
আজ কিংবদন্তী হয়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মূর্ত্ত্তি বেনিয়ান শান্তি বাবু
কলকাতার ক্ষয়িষ্ণু জীবনের বিবস্ত্র প্রতিবিম্ব “সাহেব বিবি গোলাম” সমকালীন
সাহিত্যে এক অনল সংযোজন। তাঁর যা ইতিহাসে নেয়, আমি, পরজা, এর নাম
সংসার, বাগ ভৈরব ইত্যাদি গ্রন্থ বহু পঠিত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জন্মগ্রহণ
করেও লেখকের পূর্ববর্তী শতাব্দীর ইতিহাসবোধ ও ঐতিহাসিক চেতনার জীবন্ত
অমুভূতি আমাদের সম্মোহিত করে। অহুমত্বান ও অহুমত্বিংসা লেখকের যৌবনের
জীবন ও জীবিতার সাথে একাত্ম হয়ে আছে। ফলে সীমিত সংস্কার হলেও লেখকের
বহু ও গোয়েন্দাধর্মী লেখা আমাদের আকৃষ্ট করে, আমোদিত করে। লেখক আবাল্য
ও অযৌবন সঙ্গীতের অতরাগী বাদক। একদা গীতিকার ও সুরকার হিসাবে হিন্দুস্থানী
দুডিওর সাথেও যুক্ত ছিলেন। সাহিত্যের সাথে সাথে সাক্ষাতিক অহুমত্ব লেখকের
অপর এক রিপু। লেখক কলকাতার এক সমৃদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ১৯১২
শালে।

*

*

*



লাল নেশা

মুমতিনাথ ঘোষ

সত্যি কথা বলতে কি, মানস মল্লিক যে কি করেন, কি তাঁর জীবিকা কেউই তা জানে না। পরিচিত আশ্রয়স্থল সকলের কাছে সে একচলন বনোঁ বেকার। অবাং দীর্ঘদিন কোন কাজকর্ম না করে চুপচাপ ঘরে বসে শুধু বিধবা মায়ের অন্ন ধ্বংস করে চলেছে। এর জন্তে মাকে সবাই দায়ী করে। 'তিনিই নাকি অত্যাধিক আদর দিয়ে ছেলের মাথাটি খেয়েছেন। স্বামী ছিলেন বড়লোক। আলিপুর ফৌজদারী আদালতের সবচেয়ে বড় উকিল। যেমন প্রচুর উপাধন করেছেন তেমন কলকাতা শহরে বিপুল সম্পত্তি রেখে অকালে মারা যান। তিন ছেলের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি ভাগভাগি হয়ে গেলে বসতবাড়িটাই পড়ে মানস মল্লিকের অংশে। মায়ের সবচেয়ে প্রিয় ছোট ছেলেটি, তাই মাকে নিয়ে এই বাড়িতে থাকেন। সেকালের তিনমহলা বাড়ি। তার দুটো অংশ ভাড়া দিয়ে একটাতেই গুপে-সচ্ছন্দে মা ও ছেলের দিন কেটে যায়। ছেলে খার্ড ক্লাশ পেয়ে বি. এ. পাস করে লেখাপড়া ছেড়ে দিলেও বিষের জন্তে মেয়ের অভাব হয় নি। বড় বড় ঘর পেলেই তার সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু মা কিছুতেই রাজী কবাতো পারেন নি। ছেলে বলেছে, আমার বিষের জন্তে তোমায় মাথা খানাতো হবে না। আমি নিজেই নে-বাবস্থা করবো, যখন খুশী হবে।

কিন্তু চব্বিশ বছর থেকে বয়েসটা উন্নতলিঙ্গ পৌছে গেছে, আগলও তাঁর সেই খুশীর দিনটি এলো না। মা বলে বলে হয়রান হয়ে, তাই এখন একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য, বড়লোকের ছেলেদের ঘেমন অনেকের অনেক বকম উপসর্গ থাকে, কেউ মদ খায়, কেউ বেল খেলে, কেউ বা বাইরের মেয়েকে নিয়ে জীবন কাটায়। এ ছাড়া আরো কত বকমের বিকৃত ও অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে শোনা যায়। কিন্তু মানস মঞ্জিকের নামে এ-পন্থ কোন বদনাম, কোন কলঙ্ক কেউ দিতে পারে নি। এবং ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ বড়লোকের ছেলেদের মধ্যে যা কল্পনা করা যায় না, এমনি নির্মল চরিত্রের অধিকারী তিনি! জীবনে তাঁর একটি মাত্র নেশা, বই পড়া। তাও এক বিশেষ ধরনের বই। 'ক্রিমিনোলজি' বা অপরাধতত্ত্বের বই। অপরাধ-আইন, অপরাধীদের জবানবন্দী, বড় বড় সব হত্যাকাণ্ডের মামলা দলিল ও ঘটনাবলী ইত্যাদি। সাক্ষীমাবদ, বিচারের ধারা, জুরীদের মন্তব্য, প্রকৃত আসামী নির্বাচন ও দণ্ডাদেশ, তাদের চরিত্রের বিশ্লেষণ, সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব ইত্যাদি বিচিত্র মনস্তত্ত্বমূলক নানা ধরনের বই ও পত্র-পত্রিকা। কেবল ভারতবর্ষের নয়, ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আমদানি করা স্তূর্ণীকৃত বইয়ের মধ্যে তাঁর নস্বর কেটে যায়। বহু টাকা তিনি এর পেছনে ব্যয় করেছেন এবং এখনো নিয়মিত করেন। দেশ-বিদেশের প্রকাশকদের কাছে তাঁর স্থায়ী অর্ডার দেওয়া আছে, হত্যাকাণ্ড ও হত্যা সম্পর্কিত কোন নতুন বই প্রকাশ হওয়া মাত্র যেন তাঁকে তা পি. করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যখন তখন তাই ডাকঘরের পিএন মোটা মোটা বইয়ের ব্যাকেট নিয়ে আসে তাঁর কাছে।

এইভাবে অপরাধতত্ত্ব নিয়ে গভীরভাবে পড়াশুনা ও গবেষণা করতে করতে, ও সম্বন্ধে এমন জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ওঠেন যে কোথাও কোন জটিল হত্যাবহাণ্ডের মামলা নিয়ে যখন উকিল, ব্যারিস্টার ও ডিটেকটিভরা হিমসিম খেয়ে যায়, তখন তিনি ঘরে বসে কাগজ-কলম নিয়ে অঙ্ক করতে বসেন এবং সেই ধরনের হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর আর কোন দেশে, কবে সংঘটিত হয়েছে, আলমারি ঘেঁটে ঘেঁটে মোটা মোটা সব বই বার করে বাদী ও বিবাদী পক্ষের সওয়াল মামলার বিবরণ মিলায়ে লিপিবদ্ধ করতে করতে যখন প্রকৃত আসামীকে ধরে ফেলেন, তখন সেই ভাবে সমাধান পথ বাতলে দেন প্রাইভেট ডিটেকটিভদের গোপনে ঘরে ডেকে এনে।

এটাই মানস মঞ্জিকের পেশা, যে খবর শুটিকয়েক ডিটেকটিভ ছাড়া আর কেউ জানে না। অতি গোপনে, এই লেনদেনের কাজ চলে। এবং তাদের কাছ থেকে যে দিগ্নূল অর্থ তিনি পান, একটা বড় উকিল ব্যারিস্টারও তা উপভোগ করতে পারে না। এইসব টাকা তিনি ব্যয় করেন বই কিনতে। নিজেকে অনেক অতি সাধারণভাবে।

ওর দেওয়া প্রাণ অহুসরণ করে যত সাফল্য লাভ করে ডিটেকটিভরা, তত টাকার অঙ্কও বেড়ে যায় মানস মঞ্জিকের। ঘরে যেচে যখন এত টাকা আসে তখন কার ইচ্ছা হয় বাইরে ছুটোছুটি করার। তা ছাড়া এসব কাজে বিপদও আছে অনেক। ডিটেকটিভদের প্রাণের আশঙ্কা যে পদে পদে তা তিনি ভাল করেই জানেন। তাই কোন

ধরাছোঁয়ার মধ্যে নেই মানস মল্লিক ! তিনি সত্যি সত্যি কি কাজ করেন, কি তাঁর পেশা এ নিয়ে আত্মীয়স্বজন মহলে নানা কল্পনা সৃষ্টিও কেউ জানে না তাঁর আসল পরিচয় । গুরুত্ব যেমন মহাগুরু, কোথায় কোন দুর্গম অরণ্যে, কিংবা অন্ধকারে পর্বত-গুহায় ধ্যানমগ্ন, কেউ তা ধারণা করতে পারে না তেমনি বইয়ের পাহাড় তুলে তার মধ্যে একাকী দিন কাটান এই জ্ঞানতপস্বী মানস মল্লিক, তাঁর আসল পরিচয়ও সকলের কাছে অজ্ঞাত !

বড় বড় জটিল সব হত্যা রহস্য, যার কোন হিন্স করতে পারে না ডিটেকটিভরা, গভীর রাতে গোপনে আসে ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে । মানস মল্লিক একটা ‘প্ল্যা-’ তৈরি করে দেন প্রচুর টাকার বদলে । এর জন্তে ‘কেস’ হিসেবে এবং সময়ও নেন এক মাস, দেড় মাস পর্যন্ত । আবার বিশেষ কোন ক্ষেত্রে মীমাংসা করার আগে, নিজেই গোপনে তথ্য সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়েন ।

সেদিন সংবাদপত্রে এক চাকলাকর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ পড়ে সবাই শিউরে উঠলো । নিউ আলিপুরে তালপুকুরের জমিদার দর্পনারায়ণের একমাত্র পুত্র শুভনারায়ণকে তাঁর নবনির্মিত বিরাট অট্টালিকায় চারতলার শয়নকক্ষে রক্তাক্ত কলেবরে মৃত অবস্থায় দেখা যায়, ঘর বন্ধ অথচ দুটি দরজাই ভিতর থেকে চাব দেওয়া । সে ঘরে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না । তাঁর নববিবাহিত স্ত্রী সেইদিনই সকালের বিমানে বিদ্রোহে মায়ের কাছে চলে যাওয়ায়, কুমার শুভনারায়ণ রাতে একাই শয়ন করেন ঘরে !

সবচেয়ে বিস্ময় যেমন নতুন বাড়ি, তেমনি ভারী ভারী মজবুত সব লোহার গ্রীল খাঁটা জানলায় জানলায় । বিশেষ করে দরজা দুটোতে সবচেয়ে দামী গোদবেজের ঘে, ‘ডেডলক’ লাগানো, ভেতর থেকে চাবি দিয়ে শুলে বাইরে থেকে দরজা ভেঙ্গে না ফেলা পর্যন্ত কান্না পক্ষেই ঢোকা সম্ভব নয় । তাহলে কে হত্যা করলে ? এবং কেমন করে ? ভোরে ‘বেডটি’ দিতে এসে, বেল টিপে চাকরটি মনিবের কোন শাড়া না পেয়ে অবশেষে জানলার কাছে গিয়ে, পর্দা ফাঁক করেই ‘চংকার করে ওঠে খুন খুন বলে !

সঙ্গে সঙ্গে চাকর, দারোগান ও বাড়ির ঘে ঘেখানে ছিল ছুটে এলো । খবর শুনে পাড়াপ্রতিবেশীরা ভেঙ্গে পড়লো !

একটু পরেই পুলিশ এসে, বাইরে থেকে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে চারিদিক তন্ন-তন্ন করে খুঁজে, কোথা দিয়ে আসামী এলো গেলো—কিছু চরিত্র করে না পেরে লাল-বাজাবে খবর পাঠাতে তখন রাত । মিতা দুই কুকুরকে নিয়ে অচুসঙ্গানী দল এসে হাজির হলো । ওসিকে কোয়েন্সিক ডিপার্টমেন্ট থেকেও অফিসাররা এসে ঘরের ভেতর থেকে নানা জায়গার কটো তুলে এবং ঘরের মধ্যে টুকরো-টাকরা কাগজ ও অন্যান্য অনেক কিছু জিনিস তুলে নিয়ে চলে গেলেন ।

আশ্চর্য, পুলিশ থেকে সব রকমের তদন্তী চালিয়ে কোন কিছু করা সম্ভব হলো না । কুকুর দুটো ঘরের জানলাগুলোর কাছে গিয়ে শুঁকে শুঁকে কিরে এলো । ফোরেনসিক

অফিস থেকেও কোন তথ্য পাওয়া গেল না।

শুভনারায়ণের স্বা ভ্রাতা খামার মূহুর সংবাদ পাওয়া মাত্র কলকাতায় ফিরে এমন কান্নাকাটি শুরু করলো যে কেউ আর তাকে থামাতে পারে না। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে থাকে যেন।

শুভনারায়ণের মা অর্থাৎ ভদ্রার শাস্ত্রী, শোকে সবচেয়ে অধীর হয়ে পড়ার কথা ধীর, এমন কি তিনিও যখন খাওয়া-দাওয়া করতে লাগলেন তখনও ভদ্রার মুখে ভাত বোচেনা। কেবল কাঁদে আর চোখের জল ফেলে।

শাস্ত্রী কন্ঠার মত স্নেহে নিজে হাতে ভাতের গ্রাস তুলে ধরেন বৌমার মুখের কাছে। বলেন, যা হবার তা হয়ে গেছে মা, তাকে তো আর ফিরে পাবো না। ভূমি যদি একটু বৈষ্য না ধরো, তাহলে আমি কার মুখ দেখে বাঁচবো।

ভদ্রা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলে, আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো মা। আমাকে আল্লাহ বরকত যেন আপনার ছেলের কাছে যেতে পারি। যত লাগ্নির সম্ভব! বললে বটে ভাড়া গলায় কাঁদতে থাকে, কে আমার এই সবনাশ করলো মা? আমি তো কারো কোন ঘনিষ্ঠ করিনি। আপনার ছেলেকে তো সবাই ভালবাসে। এত লোকজন নিয়ে তাঁর কারবার, সকলেই তো ছোটবাবু বললে অজ্ঞান।

শাস্ত্রী কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলেন, আমি গোয়েন্দা লাগিয়েছি। কাউকে বলিস নি যেন, দাঁখি কে আমার মুখের গ্রাস এমন করে কেড়ে নিলে?

গোয়েন্দা লাগিয়েছেন? কবে? কই আমায় তো বলেন নি সেকথা।

পাঁচ কান করতে নেই মা! পাছে শোকের জ্বালায় ও কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে আর পাঁচজনে জানাজানি হয়ে পড়ে, তাই বলি নি মা। তোমার ঘেমনি স্বামী, আমার তেমনি ছেলে। ওই একটা ছেলের মা আমি, আমার বুকের ভেতরটায় যে তার সেই চিতার আগুন জ্বলছে দিনরাত, কেউ কি তা জানে? তাই যে এ-কাজ করেছে, তাকে ধরতে পারলে, আমি বলোছি, গোয়েন্দাকে লাখ টাকা বকশিশ করবো।

লাখ টাকা! অবোধ বালিকার মত এবার প্রশ্ন করে ভদ্রা, সত্যি সত্যি তাকে ধরতে পারবে মা?

গোয়েন্দাদের কাজই তো এই মা! পুলিশেরা যার কোন হানি করতে না পেরে হাল ছেড়ে দেয়, গোয়েন্দারা নিঃশঙ্কে সেইখানে প্রবেশ করে খুব চুপ চুপ ওরা কাজ করে। তাই পাঁচজনে যদি ছেনে যায় যে গোয়েন্দা লগেছে, তাহলে সাবধান হয়ে যাবে।

দেখতে দেখতে একটি বছর কেটে গেছে, পুলিশের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে মনে করে হয়ত সবাই এখন নিশ্চিন্ত হয়েছে।

তিনটি জুট মিল ও দুটি কোন্ড স্টোরের একমাত্র মালিক এই শুভনারায়ণ বছরে

প্রায় লক্ষাধিক টাকা হিসাবপত্রে ইনকাম ট্যাক্স দিলেও বেহিসেবী মায়ের কত টাকা যে তিনি সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে জীব নামে বাকের লকারে লুকিয়ে রেখেছিলেন তা একমাত্র ভদ্রা আর তার স্বামী ছাড়া আর দ্বিতীয় কান প্রাণা জানতো না। কেবল কলকাতার বাবু-এ নয়, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় শহরের ব্যাঙ্কেও লকার ছিল।

প্রাইভেট ডটেকটিভ আদিত্য কুমার এই কেসটা নিয়ে অনেক দিন ধরেই অতন্তান চালা করলেন। আত্মবিশ্বাস ছিল তার খুব বেশি। কোন লেগেছিলেন শুভনারায়ণের অপিসের কয়েকজন খুব বিশ্বাসী কর্মচারীর পিছনে। অন্য তার দায়িত্ব, তিনি গোপনে যে জাল পেতেছেন তাতে অনেক কষ্ট কামলা দগা পাবে। তারা জানেব মধ্যে এসে গেছে প্রায়। কিন্তু পুরোপুরি এখনো ধর পাচ্ছে না। দের হয়ে যাচ্ছে বলে একদিন কাগজপত্র সব কিছু তৈরী করে নিয়ে ওতার বাবে মানস মল্লিকের সঙ্গে দেখা করলেন।

কেসটা আগাগোড়া সব শুনে এবং মিঃ কুমারের যতদূর যাকছু অতন্তান ও দায়িত্ব দায়িত্ব সবকিছু কাগজে লেখে নিয়ে তিনি দুমাস সময় চাটলেন।

দুমাস লাগবে স্যার! একটু তাড়াতাড়ি খাট করেন। এনা বড় উপকার হতো। তাড়াতাড়ি হবে না, দাক বলে দিলেন মানস মল্লিক। কারণ আদিত্য যতদূর অগতঃ হয়েছেন এবং চাবছেন দাঁড় জলে পড়েছে, এখন খেলিয়ে তুললে হয়, আমার দায়িত্ব কিন্তু সম্পূর্ণ উন্টো, আপনার পক্ষে ঠিক বিশদীঃ।

কি বলছেন স্যার?

মানস মল্লিক শুধু একটু চুপ হাসলেন। তারপর বললেন, এক আর একে দুই হয় সবাই জানে, অতি সহজ কথা! কিন্তু এক আর একে তিন হয় এমন, অতঃ এখন জটিল রূপ নেয়, বুঝেছেন স্যার? কুমার?

আহামকের মত কালকাল করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মিঃ কুমার বললেন, না স্যার কিছুই বুঝতে পারলুম না এ ঠেয়ালির।

বুঝবেন, তবে একটু দেরি হবে! হ্যাঁ, এ-কেসটার জন্তে আমার কিন্তু পকাশ হাজার টাকা চাই।

পকাশ কেন স্যার, 'আই উটল পিড ইউ মোর'—দিল্লী! কিন্তু তাড়াতাড়ি কেসটা চাই!

তাড়াতাড়ি সম্ভব নয় মিঃ কুমার। আমাকে এই কেস-এর জন্তে এখন দিল্লী যেতে হবে।

এই কেন-এর জন্তে দিল্লী কেন স্যার?

শুভনারায়ণের স্বী ভদ্রাদেবী গো দিল্লীর মেয়ে, সেখানেই গো ছেলেবেলা থেকে মাহুব, লেখাপড়া খেলাধুলো সবই তো সেখানে। ওর বাপ ছিলেন একজন কেন্দ্রীয়

সরকারের হোমরা-চোমরা অফিসার।

হ্যাঁ স্যার—তা ঠিক। কিছু—

ও একটু আনার, আপনার নয়। ওটা আনার ওপর ছেড়ে দিন।

আচ্ছা তাহলে এখন আমি। বলে পকেট থেকে পঁচিশ হাজার টাকার নোটের তাড়া ওঁর হাতে গুঁজে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মিঃ কুমার। বাস্তব তীর পুরনো 'মরিস মাইনর'টা অপেক্ষা করছিল। চারি ঘুরিয়ে দরজা খুলে উঠেই গাট দিয়ে দিলেন।

পাঁচ মিনিট পরে মানস মল্লিক দিল্লী থেকে ফিরে এসে মিঃ কুমারকে ডেকে পাঠালেন। উল্লসিত মনে কুমার ছুটে বাসতে মানসবাবু বললেন, আমি একবার ওই ভদ্রাদেবীর সঙ্গে নবিবাবল সাফাত করতে চাই। সাধারণতঃ আমি নিজে 'ফিল্ড-ওয়ার্ক' কর না কিন্তু এক্ষেত্রে আমাকে করতেই হবে! বিশেষ প্রয়োজনে।

মিঃ কুমার ভদ্রার শান্তিভীর সঙ্গে চুপিচুপি দেখ করে বললেন, আপনার বোমাকে কয়েকটা কথা বলতে পারা আছে, আপনারই সহকর্মী একজন নিজের ঘরে তার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলবেন।

বেশ বেশ। মজলসার তপুর্ন বলে ঠিক দুটোর সময় তাঁকে নিয়ে আসবেন, ওই সময় চাকর-বাকরগণ সব ঘুমিয়ে থাকে।

মানসবাবুকে সঙ্গে করে গিন্নীমা তিনতলার একটা কক্ষান্তর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর নিজে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, বোমাকে এখন পাঠিয়ে দিচ্ছি বাবা, একটু অপেক্ষা করুন।

সাদা ধবধবে লঙ্কো চিকনের শাড়ির আঁচল অল্প মাথায় টানো ঘাড়ের দু পাশে বক করা কক্ষ চুলের গুচ্ছ, কাজল টান, বাক্য ভ্রূর মাঁচে বিক্ষারিত ছটি চোখ নিয়ে বীর দে ঘরের ভেতরে এসে ঢুকলেন ছিপছিপে তরী, গৌরাঙ্গী ভদ্রা, শুভনারায়ণের বিধবা স্ত্রী।

মনসবাবু হুঁহাক জোড় করে নমস্কার করলে ভদ্রাদেবীও হাত তুলে প্রতিনমস্কার করে সামনের সোফাটায় বসে পড়লেন। মানসবাবু বললেন, কিছু বদ মনে ন' করেন, দরজাটা ভেঁজিয়ে দিয়ে আসুন। কারণ আমাদের কথা বাইরের কারুর কানে না যায়, আমি তাই চাই।

নিঃশেষে উঠে দরজাটা ভেঁজিয়ে তার ওপর পর্দাটা টেনে দিয়ে আবার আগের জায়গায় এসে বসে ভদ্রা জিজ্ঞেস করে, আপনি কে? আপনি কি আমাদের কেস করছেন? গোয়েন্দা?

মানসবাবু বললেন, আমি গোয়েন্দা নই, তবে গোয়েন্দার বাবা!

তার মানে?

তার মানে গোয়েন্দারা যেগুলো বুঝতে পারে না ধরতে পারে না, আমি সেগুলো

ধরিয়ে দিই।

নিমেষে ভদ্রার চোখের দৃষ্টি যেন ভয়াবহ হঠাৎ মত দেখায়। একটু টোঁক গিলে জিজ্ঞাস করেন, আচ্ছা আমাদের এই ব্যাপারে কোন আসামীকে কি ধরতে পেরেছেন?

আম্বে আম্বে মানসবাবু তাঁর চোখ দুটো ভদ্রাদেবীর চোখের ওপর বেখে বলেন, পেয়েছি।

পেয়েছেন? কে, কে বলুন না? আগ্রহ ও আতঙ্ক মিশ্রিত এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর।

সহসা মানসবাবু তাঁর চোখ দুটো ভদ্রাদেবীর চোখের মধ্যে বিঁদিয়ে দিয়ে বলেন, যদি বলি তিনি আমার সামনে?

আঁ! শিউরে ওঠে ভদ্রা! তারপর চোখ দুটো মানসবাবুর চোখের ভেতর থেকে টেনে বার করে নিয়ে বলে, কাকে কি বলছেন, জানান?

জানি! দাঁতের ওপর দাঁত চেপে হিস হিস করে মানসবাবু বলেন, শঙ্কর-দয়াল শরীকে চেনেন?

চকিতে যেন তার দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে। ভদ্রা বলে, না। ও-নাম জীবনে শুনি নি কখনো।

বশু করে পকেট থেকে একখানা ফটো বার করে, তাঁর সামনে তুলে ধরেন মানসবাবু। তাতে লেখা, 'এস্তার ইয়োরস'—ভদ্রা।

ভদ্রা তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে ফটোটা কেড়ে নিতে গেল, ছবিটা পকেটের মধ্যে পুবে কেললেন মানসবাবু!

কোথা থেকে পেয়েছেন আমার এ ছবি, বলুন শীগগির?

চুরি করেছি, শঙ্করদয়ালের ঘর থেকে!

চুরি করেছেন কি করে?

হুঁ আঙুলে টাকা বাজ্রাবার ভঙ্গী করে মানসবাবু বলেন, টাকা দিয়ে কি না করা যায় ভদ্রাবতী। আপনি একটা মানুষের জীবন নষ্ট করেছিলেন, আর এতো সামান্য একটা ফটো। তারপর সংঘত কণ্ঠে বলেন, দেখুন ভদ্রাদেবী, আমার কাছে মিথ্যা বলার চেষ্টা করলে আপনারই বেশী অনিষ্ট হবে। শুধু ওই একখানা ছবি নয়, আরো অনেক কিছু তথ্য আছে আপনার কাছে, যা প্রমাণ করে যে আপনি ভালবাসতেন শঙ্করদয়ালকে। আপনার লাভার ছিল সে। মৃতকুল ভেঙে বিয়ে আপনার বাবা একটা অর্ডিনারী কেরানীর সঙ্গে না দিয়ে, বড়লোক স্বভাবটি ছেলের সঙ্গে দিয়েছিলেন, তাই এইভাবে প্রতিহিংসা নিলেন বেচারী নির্যাঁহ ভাল মানুষ শুভনাগায়কের ওপর। তিনি আপনাকে এত ভালবাসতেন এবং আপনি তাঁর সঙ্গে যে এইভাবে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে প্রেমের অতিনয় করে এসেছেন, কেউ তা কল্পনাও করতে পারে নি, সাবান

অভিনেত্রী আপনি !

যা কেউ কল্পনা করতে পারে নি, আপনি তা কেমন করে করবেন ! ভদ্রাদেবীর কণ্ঠে মুহূ অল্পষোগের স্বর।

বললুম তো আপনাকে, আমি বাবার বাবা। ডিটেকটিভরা কেউ কল্পনা করতে পারে না যা, আমি তাই পারি। ভগবান সবাইকে দুটো চোখ দিয়েছেন কিন্তু কাউকে কাউকে কেন আরো একটি বেশী—যার নাম তৃতীয় নয়ন। তারপর মোলায়েম স্বরে মানসবাবু বললেন, আমি আপনার বাবা ছিলেন অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির মানুষ। তাঁর ভয়ে তখন শুড়শুড় করে ভালো মেয়ের মত শুভনারায়ণের গলায় মালা দিতে ইতস্ততঃ করেননি। কিন্তু বিয়ের দুটো বছর যেতে না যেতেই, আপনার বাব করনারি থ্রুঘোসিস-এ যেট মাঝে গেলেন, আপনি স্বপ্তুর নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন তাহ নয় কি ?

এবার হাত জোড় করে ভদ্রাদেবী বলে উঠলেন, 'প্রজ্ঞ, ক-সব বাক্তিগত কথা আর তুলবেন না।

বাক্তিগত কথাই বেশ আমি জানতে চাই আপনার কাছে। যে সব কথা কেউ জানে না, আপনার একেবারে মনের গভীরে ছিল লুকনো, সেই কথাই আমি শুনে চাই আপনার মুখে। তবে একথা আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ জানতে পারবে না। আমি আপনার কাছে প্রমিস করছি। এই বলে গলায় স্বর একেবারে পানো নামিয়ে এনে মানসবাবু বললেন, শব্দদয়াল বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল এবং তিন দিন পরে হাসপাতালে যখন জ্ঞান করে আসে তখন ডাক্তারকে বলে, কেন আমায় বাঁচালেন—আমাকে মেরে ফেলুন। আমি মরতে চাই। তত্ৰাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না কিছুতেই। এ কি সত্য ?

এবার আচ্ছড়ে পড়লেন ভদ্রাদেবা মানসবাবুর পায়ের ওপর। বললেন, দোহাই আপনার, একথা আর দ্বিতীয়বার মুখে উচ্চারণ করবেন না। কেউ যেন না জানতে পারে। আপনি যত টাকা চান, লাশ টাকা আমি দেবো। শুধু কোন প্রশ্ন করবেন না ভগবানের দিবি। বলুন, একথা যেন দুনিয়ার আর দ্বিতীয় শ্রাণী জানতে না পারে পা ছাড়ুন। আচ্ছা আমি কথা দিচ্ছি।

আপনি ভগবানের নামে শপথ করুন আগে। তবে পা ছাড়বো।

মানসবাবু বললেন, আচ্ছা শপথ করছি। কিন্তু আমার আর যা ভিজ্ঞাস্ত রয়েছে সেগুলো সবল ও সত্যভাবে আমায় বলতে হবে এবং তার ভেত্রে আপনাকে ও ভগবানের নামে দিবি করতে হবে।

ভদ্রাদেবী ঘাড় হেঁট করে নীরবে যখন চোখের জল ফলতে লাগলেন তখন মানসবাবু ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, যে আপনার সম্বন্ধে এত সব জেনেছে তার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না, নিশ্চিত জানবেন। তবে আরো কিছুদিন বেশী সময় লাগবে এই যা।

এবার আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে, মানসবাবু দিকে তাকালেন ভদ্রাদেবী।

আচ্ছা, আপনার স্বামী শরৎচন্দ্রের এই আত্মহত্যার বাণ্যটা কি শুনেছিলেন?

না। আশ্চর্য উত্তর দিলেন ভদ্রাদেবী। তবে সেটদিন থেকে আমার স্বামী আমার চোখে অনেক নমে গেলেন, শরৎের প্রেমটা বড় হয়ে উঠলো।

বেশ তো, তখন ডিভোর্স করে দিলেই পারতেন আপনার স্বামীকে। তা করলেই তো সবদিক থেকেই শোভন হতো।

যদি তা সম্ভব হতো তাহলে সেই পথেই যেতাম। কিন্তু আমার স্বামী আমার এত ভালবাসতেন যে তিনি যখন তখন বলতেন, যদি কোন দিন আর কান্নার দিনে মুখ ফেরাতে দেখি তাহলে সেই মুহূর্তে তোমায় গুলি করে আমি ফাঁস খাবে ভেবে দেখো।

মানসবাবু মুচকি হেসে বললেন, তাই, না অনেক টাকা হাতছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কা বলেই হয়ত একেবারে প্রমাণ প্রদর্শন করে গেলেন। আচ্ছা ভদ্রাদেবী, নিজস্ব দৃষ্টান্তে দেখে এলুম শরৎচন্দ্র নিজে গ্রেটার কৈলাসে গুলির এক অট্টালিকা তৈরী করেছেন। এত টাকা তিনি পেলেন কোথায়?

কেন, শুনেছি তিনি এখন অনেক টাকা ইনকাম-ট্যাক্স দেন সরকারকে, বি.সি.সি. ট্যাক্সের বিজনেস করছেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ করে হেসে উঠলেন মানসবাবু। লোকের জানে বটে কিন্তু আমি জানি অল্প কথা। যে মোটা টাকা সরকারকে ইনকাম-ট্যাক্স দেন তিনি সেটা আপনারই টাকা। ভূমি বিজনেস দেখিয়ে শরৎচন্দ্রের ওইভাবে সরকারের চোখে খুলে দেয়। যাতে এত বড় বাড়ি কোথা থেকে কেন্দ্রভাবে করা সম্ভব হলো, সরকারের নানা প্রদান ভাগে।

আবার ঘাড় ঝেঁট করে বইলেন ভদ্রাদেবী। অথ্যাৎ যা কিছু তথ্য মানসবাবু জেনেছেন সব সত্যকে কোনটাই মিথ্যা নয়। মৌনঃ স্মৃতি লক্ষণম্।

বাঁকা হাসি স্টোটার কোণে এনে মানসবাবু এবার বললেন, বুঝতেই পারছেন আমার অমুসন্ধান কতদূর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে? কিন্তু একটা হিসাব আমি আরও মেলাতে পারছি না। বন্ধ চান্দ-খাঁটা ঘরের মধ্যে থেকে আসামি কি করে কোন পথে অদৃষ্ট হলো! একমাত্র আপনি ছাড়া যত্নের কারো সাধা নেই সে-পথের সন্ধান জানা! বলুন! চূপ করে থাকবেন না।

এ আর এক কাহিনী। বলে মুখ তুললেন ভদ্রাদেবী। শোবার ঘরের পায়ের দিকের জানালাটার গ্রাল-এ যে জু খাঁটা আছে, সেটা সম্পূর্ণ জু নয়। শুধু জু নাপাটা দেওয়া আছে—নীচেটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল আমারই টেক্স। এখানে একটা বাধাক্ষেপ ডিজাইন বসাবো বলেছিলাম। তাই মিস্ট্রী বলেছিল, যা এটা তাহলে আলাপা করে রেখে দিলুম, যাতে চট করে খুলে ওটা বসানো যায়। কিন্তু সেটা হয় নি। স্বামী ঠাকুরদেবতা পছন্দ করেন না বলে ওকেই বলেছিলুম, তুমিই এসে এটা

मा म ने शा

বসিয়ে দিলে যেয়ো বাবা। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সেই ছোকরা মিজিটাকে ধরে নিয়ে এলো পুলিশ আবার কাছে। সে না কি খুনী। নবশাস দলের লোক। ছোকরা আমার হাতে পায়ে পড়ে কানতে লাগল। বললে, মিথ্যে কথা। আমি তো আপনার বাড়িতে কতদিন কাজ করোছি, আপনি জানেন। কথাটা যে সত্যি আমার জবাববন্দী লিখে নিয়ে চলে গেলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর।

মানসবাবু প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ওই যে আনন্দের গ্রানটায় শুধু জুর মাপ লাগানো রয়েছে, আপনার স্বামী যখন বাণাকৃষ্ণের ডজাইনশলা গ্রান দেখানে পাতে নমের করলেন, তখন একবারও আপনার মনে হলো না যে সেটাকে তাহলে মিত্রা ডেকে ভাল করে এঁটে দেওয়া উচিত।

না, ও-কথা ভুলে গিয়েছিলুম। তা ছাড়া ওটা ছিল বাগানদার, শুধু নিকে এবং
গুথানটায় আলগা ক্ষুঁ আঁটা মনেই হতো না।

মানসবাবু প্রশ্ন করলেন, সেই ছোকরাটি ছাড়া আর কেউ যখন জানতো না, তখন পুলিশের কাছে সব নামটাকে আপনার করা উচিত ছিল না।

ভদ্রা-নী এগার বছর বয়সে, এর একটু কার ছিন তার আমাকে চুপ করে যেতে হয়েছে।

কি এমন কারণ থাকতে পারে, স্বামীর মৃত্যুর চেয়েও স্ট্রোক বেশী? জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

করতে পারি কি ?

একটু ভেবে তারপর বললেন ভদ্রাদেবী, হঠাৎ একাদিন নিউ মার্কেট থেকে বেরুচ্ছি। দেখ, এই ছেলেটি খালি গায়ে, খালি পায়ে লাড়য়ে আছে। গায়ে একচলতে শূন্য কাপড়ের ফালি তাতে চাঁবি বাঁধা। আমি মোটেরে উঠতে যাচ্ছি। এমন সময় কাছে এসে কান্দ-কান্দ খবর বললে, গরু চাকরি নেই। একবার তার গুপ্ত বাপ মারা গেছে, দু'দিন পরে শ্রাদ্ধ তাই ভিক্ষা করছি এখানে দাঁড়িয়ে। আপনি যদি দয়া করে কিছু সাহায্য করেন তাহলে আমি চরদিন আপনার দাস হয়ে থাকবো। তখন আমার কিছু সাহায্য করেন তাহলে আমি চরদিন আপনার দাস হয়ে থাকবো। তখন আমার কাছে বিশেষ টাকা-পয়সা ছিল না। মার্কেটিং করতেই সব শেষ। বোলাছলুম তাকে পরদিন বাড়িতে যেতে। একশো টাকা তাকে দিয়ে বললুম, আমার ভিক্ষা করাবি না, এতেই তোমার বাবার শ্রাদ্ধ হয়ে যাবে। টাকাটা হাতে নিয়ে সে কান্দতে লাগল। বললে, নকশাল দলে আমি যাচ্ছি এটা বটে যাওয়াতে কেউ চাকরি দিতে চাইছে না আমার। বাবার অন্তখে চিকিৎসা করতে পারি নি বলে, বাবা মরলো। ওদিকে মা ও ছোট দুটো ভাই বাবার না পেয়ে দিন কাটছে। মা লোকের বাড়ি দাসীস্বস্তি করেছে। ছেলেটি পায়ের পুপ মাখা রেখে বললে, আপনি যদি একটা যে কোন কাজ আমায় দেন তা ভাই যেন দুটোকে উপোস করতে হয় না। তারা বড় ছোট। এখন বলে, দাদা বড় বড় পেয়েছে, তখন আমার বুক ফেটে যায়। এই বলে একটু থেমে ভদ্রাদেবী বললেন, আহা বেচারাদের

সেই শুকনো মুখগুলো আমার সামনে যেন ভেঙে উঠলো। তাকে বলেছিলুম, শ্রীকৃষ্ণ চুকে গেলে একদিন দেখা করতে। শ্রীকৃষ্ণের ঠিক পরদিন গ্রাডা মাথায় এসে হাজির হলো। একটা চিঠি লিখে ছেলেটিকে আমার স্বামীর কাছে, অপিসে পাঠিয়ে দিলুম পাটকলে যা হোক একটা কিছু চাকরি ওকে দেবার জন্যে অনুরোধ করে। উনি চাকরি সেই দিনই করে দিলেন জগদলের ছ'নম্বর জুটমিলে। কিন্তু মাস ছয়েক তখনো হয়নি, হঠাৎ শোনা গেল গুদাম থেকে যে বিরাট চুরি হয়েছে, তার মধ্যে আছে সেই ছেলেটি। সেই নাকি দলের সর্দার। তার সঙ্গে নকশানদের যোগাযোগ আছে। বুঝতেই পারছেন, স্বামী এসে আমার ওপর রাগবাল করতে লাগলেন। তুমি এমন একটা শয়তানকে না জেনে শুনে একেবারে চাকরি দিতে বললে। এ পর্যন্ত বলে তারপর আর কি বলা উচিত যেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না ভদ্রাদেবী।

মানসবাবু তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, পাছে সেই ছেলেটি ধরা পড়লে স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে আপনার ওপর লোকের সন্দেহ এসে পড়ে তাই চেপে গিয়েছিলেন, বুঝছি। অকটা এবার আমার মিলে গেল।

অবশ্য আরো একটা কারণ, ঠিক যেদিন আমি দিল্লী চলে গেলুম সকালে, সেইদিনই রাতে ওই অঘটন ঘটলো!

মানসবাবু বললেন, ঈশ্বর যে আপনার মনের কথা অদৃষ্ট থেকে শুনতে পেয়েছিলেন। তাই এমন নাটকীয়ভাবে আপনার পথের কাঁটা দূর করে দিলেন। সেই মিস্ত্রী ছেলেটি ছাড়া আর কেউ জানবেনা সেই খোলা জানলার কথা, এ কাজ তার।

ভদ্রাদেবী এবার ধরা গলায় বলে ফেললেন, ছিঃ-ছিঃ, ও-কথা বলবেন না। দৈবাৎ ঘটনাটকে জিনিসটা এই রকম এসে দাঁড়িয়ে গেছে। মিস্ত্রী কথা। আপনি টাকা দিয়ে খুন করিয়েছেন আপনার স্বামীকে।

মানসবাবু মুহূর্তেই হেসে বললেন, দিল্লীতে গ্রেটার কৈলাসে 'ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের' অপিস থেকে জেনেছি, আপনার সঙ্গে শঙ্করদয়ালের বিষয়ে শীর্ষগির হচ্ছে। আর দেবী সন্ত হচ্ছিল না। তাই সেই ছেলেটিকে হাত করেছিলেন আপনি। কত টাকা তাকে দিয়েছেন।

আবার মানসবাবুর পায়ে ওপর হাত রেখে ভদ্রাদেবী বললেন, মনে রাখবেন, আপনি ভগবানের নামে দাবি করেছেন। আর দ্বিতীয় প্রশ্নী কেউ জানবেনা এসব।

মানসবাবু বললেন, কিন্তু বিধবা-বিবাহ তো অনেকেই করেন। তবে এত লুকোচুরি কি আছে!

এ বাড়িতে থেকে, এদের বৌ হয়ে এ-কথাটা আর এঁদের জানাতে চাই না।

বলে চট করে ভেতরের ঘর থেকে লক্ষ টাকার নোটের ভাঁড়া এনে ঠাঁর হাতে গুজে দিয়ে ভেতরে চলে গেলে।

* * * *

সুমন্থনাথ ঘোষ : বড় ও বড়োয় ক্রিশের দশকে যৌবন অতিবাহিত করেও যে সমস্ত লেখক যুদ্ধ, মহামারি ও রাজনৈতিক পালাবদলের প্রভাব মুক্ত হয়ে তন্মিত্ত স্বকীয়তায় সাহিত্য ও শিল্পের জগতে সংশ্লিষ্ট থেকেছেন ও সাহিত্যসৃষ্টি করেন স্মরণীয় তাঁদের অন্ততম। পুস্তক সরবরাহ ও প্রকাশনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করে স্বজনশীল সাহিত্য ও শিল্প প্রয়াস লেখককে এক বিশিষ্টতা দান করেছে। সাহিত্যের কোন ধারায় বা গোষ্ঠিতে যুক্ত না হলেও গতানুগতিকার বহমান স্রোতে পান না ভাসিয়ে লেখক গল্প গলাব নিম্নস্ত ভঙ্গীতে অনগ্র।

ভৌতিক ও রোমাঞ্চকর কাহিনী রচনাতেও দিক্‌হস্ত।

নিম্নস্ত প্রকাশন শিল্পের বাস্তব প্রাণীকতার ফাঁকে ফাঁকে লেখক বহু গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর রচনা "গোয়েন্দাধর্মী" লেখাপ্রতি এক বিশেষ আনন্দ বহন করে। উল্লিখিত "লাল নেশা" গল্পটি বাংলা গোয়েন্দা গল্পের গতানুগতিকতার স্রোতধারায় এক উজ্জল ব্যতিক্রম। লেখক ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে এক অজ্ঞাত পাড়ার বাসিন্দা।

* * * *



শঙ্খচূড়

নীহার বঙ্কন গুপ্ত

বাইরে আকাশ কালো করে মুসলধারায় বর্ষণ চলেছিল।

ঘণ্টা দুই আগে বর্ষণ শুরু হয়েছিল, এখনো তার বিরামের কোন চিহ্নমাত্রও নেই যেন : থেকে থেকে বিহ্বাতের চাবুক যেন বর্ষণমুখর আকাশটাকে চিরে দিয়ে যাচ্ছিল।

তার সঙ্গে বজ্রপাতের শব্দ।

কিরীটীর গৃহে আটকে পড়েছিলাম।

গৃহে যে আত্ম আর ফেরা হবে না জানতাম—তাই আশ্রয় করে বাড়ানটার উপর গা এলিয়ে সর্বাত্ম শিথিল করে দিয়েছিলাম। কৃষ্ণা শিচুড়া ও ভাঙ্গা হুঁকির ব্যবস্থা করেছে আমি।

কৃষ্ণা একটা পিকটোরিয়াল মাগাজিনের পাতা ওলটাইল কিরীটীর পাশে বসে। কিরীটীর মুখে পাইপ। সামনে ছটস্থির মাস।

হঠাৎ কৃষ্ণা বলল, যেভাবে সরকার পিছু লেগেছে—দেশ ড্রাই হয়ে গেলে তোমার কি অবস্থা হবে ভাবছি।

কিরীটী মুহূর্তে হেসে মাসের তরল পদার্থে একটা ছোট চুমুক দিয়ে বললে, চিনি আমার চিন্তামণিই ঘোণাবেন কৃষ্ণা, মা ভৈষী।

মানে কর্নেল বোস তো ! তা তিনিই বা পাবেন কোথায় ?

পাবেন—পাবেন। তজ্জলোনটিকে ভূমি চেনো না। আমার প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রগাঢ়—অতএব এ চিন্তা আমি করি না। জীবনের বাকি কটা দিন কেটে যাবে—আর কটা দিনই বা!

কৃষ্ণা মৃত তামল।

কিবাটী—

উ!

তোর জীবনের কোন একটা কাহিনী বল—যা আমার শোনা হয়নি। জানা হয়নি।

জানিস স্ত্রীর এই প্রচণ্ড বর্ষণমুখর রাতে একজনকে কথা মনে পড়েছে। মানে হঠাৎই মনে পড়ে গেল। আমার সত্যসন্ধানের জীবনে—জু-একটি ছাড়া—এমন একটি মানুষ চোখে পড়েনি। জীবনে এত সত্যায় সত্যসন্ধানের জীবনে বোধহয় তিনজনের সাক্ষাৎ পেয়েছি—যা দর কথা যত দিন বেঁচে থাকব ভুলব না। এক কানোভর—আমাদের ডান পাশে—তাই পাল সিং আর তিন হচ্ছে—

কে?

সুলতান আমের। জাতে পাঠান। সুনৈচিলাম পেশোয়ারে এক সর্দার চার্বার ঘরে ও ভয়ে ছাড়া তেঁরো বছর বয়সে ঘরে তুলে রাখা তার ভাকাত বাপের রাইফেলটা দিও তার কাকাকে খুন করে লাগু কোটালে পাশিয়ে যায়। বালস কি।

—হ্যাঁ, তখনই হাতে রাইফেল তুলে নিয়ে ছল সে রাইফেল তার হাতে থেকে নামেনি। একাডেমিতে মিলিটারির মেশিনগানের গুলি থেকে লোকটা তক্ষশিলার লুপ্ত নগরীর সূর্য্যক বেলা আশ্রয়গোপন করে তার প্রস্রাব মুকুনচনা কামে করে—মন্টাখানেক দূরে গুলি বানময়ের পর তার গুলিবিদ্ধ মৃতদেহটা এখন পুলক আবিষ্কার করে তখনো তার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা ছিল তার রাইফেলটা আর পাশে পড়েছিল তার দিন পাঁচেক আগে তারই হাতে গুলিতে মৃত প্রিয়র পচা লাশটা।

কৃষ্ণা বললে, শুন অনেকদিন আগেকার কথা।

তা ঠিক। এটি এটিশ আমল এবং সবে ঐতিহাসিক মহাযুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে। থাকি তখনো বাণভট্টের সময়। আর ঘটনাটা ঘটেছিল ১২৪১ সনের গোড়ায়—আজকের পাকিস্তানের কাশ্মীর ইসলামাবাদে।—অর্থাৎ তখনকার রাঙলপিণ্ডিতে।

গল্পটা শোনার দয়্য আন আর কৃষ্ণা বলাই বাহুল্য দুজনেই উদগ্রীব হয়ে উঠলাম।

স্বতন্ত্র, তোরাঃ আই. ডি. ইমপেক্টর সলিল সেনের নামটা নিশ্চয়ই মনে আছে।

বললাম হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি।

তার এক কাকা প্রফুল্ল সেন মশাই তখন পাঞ্জাব পুলিশের একজন এস. পি। কাকা-গোয়েন্দা (প্রথম) —১৪

মশাইয়েরই এক চিঠি পেয়ে আমি আর সলিল বাওলপিত্তি যাই। কিছুদিন আগে কাকামশাই ছুটিতে কলকাতার এসেছিলেন—তখন আমার কথা গল্প করেছিল সলিল তাঁর কাছে।

সলিল যখন আমার মেসে এসে তার কাকামশাইয়ের চিঠি দেখিয়ে পিণ্ডিতে যাবার আমন্ত্রণ জানাল, একটু অবাকই হয়েছিলাম কারণ তাঁর নামও তখনো শুনি নি দেখা তো দূরে থাক।

বললাম, কি ব্যাপার রে—তাঁর সঙ্গে তো আমার কোন পরিচয় নেই!

সলিল বললে, পরিচয় আছে।

মানে?

মানে তিনি আমার মুখ থেকে তোর কথা শুনেছেন।

আমার কথা?

হ্যাঁ।

তা আমার আবার কি কথা তাঁকে তুই বলেছিস?

তোর প্রথম বৃদ্ধ ও বিচার-বিশ্লেষণের কথা। শুনে তিনি বলেছিলেন—

কি বলেছিলেন?

ছেলেটি পুলিশ লাইনে চাকরি নেবে তো বল।

তা তুই কি বললি?

বললাম, না কোন দিনই তা নেবে না। স্বাধীন ভাবে সে Detection করতে চায়।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমাকে তাঁর কি প্রয়োজন হল?

নিশ্চয়ই প্রয়োজন হয়েছে, নচেৎ এত করে তোর কথা লিখবেন কেন? কবে যাবি বল।

যেতে আর আপত্তি কি, একটা নতুন দেশ দেখা হয়ে যাবে—তবে বর্তমানে একটা কোকেনের চেষ্টাকারবারীকে নিয়ে বাস্তব আছি—শেষোয়ার থেকে বর্ষা পর্যন্ত তার চোরাচাঁ কারবার—ডি, আই জির বিশেষ অনুবোধে—

চল না বাবা—তেমন প্রয়োজন বুঝলে না হয় চলে আসিস। না করিস না।

আমি টিকিট কাটতে বাছি ফ্রান্সিয়ার মেলে।

বেশ।

সলিল চলে গেল। সলিল তখনো পুলিশের চাকরিতে ঢোকেনি। অল্প কি একটা কাজ করছিল—বোধহয় কোন সংবাদপত্রের অফিসে।

কিরীটার হাতের শাইপটা নিভে গিয়েছিল।

নতুন করে তামাক ভরে আবার সে পাইপে অগ্নি সংযোগ করল।

বাইরে অঝোর ধারায় বৃষ্টি তখনো ঝরছে!

ডিসেম্বরের এক শীতের সন্ধ্যায় গিয়ে শিওর টেশনে ছুজনে অবতরণ করলাম। মনেই ছিল কাকামশাই প্রস্থান মেনের বাংলা। একটি টাঙ্গা করে ছুজনে গিয়ে বাংলার সামনে নামলাম।

কাকা ছিলেন না—কিন্তু কাকীমা ছিলেন। কাকার দুই ছেলে কনভেন্টে থেকে পড়াশুনা করে। বাড়িতে তাই কাকা, কাকীমা ও ভৃত্য-বেয়্যাবার দল।

হ্যাঁ কাকীমা, এই আমার বন্ধু কিরীটি বায়। কিন্তু কি ব্যাপার বল তো কাকীমা, হঠাৎ আমাকে কিরীটিকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসবার জন্য জরুরী পত্রাঘাত করলেন কেন?

কাকীমা বেশ মোটামোটা গিম্বাবানী গোছের এক মহিলা। বললেন, তা তো জানি না।

জান না! সলিল বললে।

না যে, শুধু একদিন সুলতান আহম্মদের কথা বলতে বলতে—

সুলতান আহম্মদ : ... সে ?

কে জানে বাপু—তুনেছিলাম তোর কাকার মুখে একটা দুর্ধর্ষ চোরাকারবারী—এ নামটা কিন্তু কাকীমার মুখ থেকে শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কান দুটো আমার খাড়া হয়ে উঠেছিল—কারণ কলকাতায় যে মাসুখটার চোরাই কারবার ধরার জন্য আমি বাস্তব ছিলাম তার নামটা এই সুলতান আহম্মদ। লোকটা একটা পাঠান। প্রচণ্ড দুর্ধর্ষ—সবত্র তার নাকি গতিবিধি এবং তাকে পুলিশ আজ পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনি—বাঘা বাঘা পুলিশ অফিসারদের ঘোল খাইয়ে ছাড়ছে ভারতবর্ষের সর্বত্রই প্রায়।

আমিই বললাম কাকীমার মুখের দিকে তাকিয়ে, কি নাম বললেন কাকীমা, সুলতান আহম্মদ?

হ্যাঁ।

সলিল আমায় বললে, তুই নামটা তুনেছিস নাকি কিরীটি?

আমি সলিলের কথার কোন জবাব দিলাম না। সুলতান আহম্মদের কথাই তখন আমি ভাবছি। এ সে সুলতান আহম্মদ নয় তো! যার চেহারাটা মাত্র কটোতে দেখছি ডি, আই, জির আছে। বয়স মনে হয় ছাব্বিশ-সাতাশের বেশী নয়, পাতলা দোহারা গঠন—চেহারা দেখলে দুর্ধর্ষ কোন পাঠান বলে মনেই হয় না। মুখখানা কিছুটা লম্বাটে ধরনের—ধারালো চিবুক, প্রশস্ত কপাল, চোখ দুটো নিরীহ গোবেচারীর মত—শান্ত উদ্দাম—উদ্দাম কিছুটা যেন চোখের দৃষ্টি। পরনে পেশোয়ারী কর্তা—তার উপর জরিব কাজ করা একটা ওয়েষ্টকোট, মাথায় পাগড়ি। মোটামুট ভারী স্ত্রী চেহারা।

এ চেহারার একটা লোক যে একটা দুর্ধর্ষ ক্রিমিনাল দেখে আদৌ বোঝবার উপায় নেই।

ডি, আই, জি কে বলেছিলাম, এই আপনাদের বতরনাক ক্রিমিনাল? চোরা-
কারবারী হলতান আহমদ?

হ্যাঁ কিরীটি, this is the person। এই ফটোর copyটা তুমি রাখ। ডি. আই.
জি. এক কপি ফটো আমার দিয়েছিলেন। ফটোটা আমার হটকেসেই ছিল তখন।

তারপর? আমি শুধালাম।

কিরীটি বলতে লাগল, রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ কাকামশাই এলেন।

আমাদের আহারপর্ব আগেই চুকে গিয়েছিল—ঘরের কায়ার প্লেসের সামনে দুজনে
বসে গল্প করাছিলাম। কাকামশাই আহারাতির পর আমাদের ঘরে এসে ঢুকলেন,
তারপর কাকামশাই একটা চেয়ার টেনে আমাদের পাশে বসলেন।

সলিল আমার পরিচয় দিল। কাকামশাই আমারই মুখের দিকে তাকিয়ে
ছিলেন।

তুমিহা কিরীটি রায়?

মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

কাকামশাই তখন বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার বোধহয় সাহায্য
করতে পারবে। এবারে বলি, কিরীটি, কেন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। একটা
দুর্ঘটনা—যার কর্মক্ষেত্র ল্যাণ্ডিকোটাল থেকে সবত্র ছাড়িয়ে আছে, মায় স্তম্ভর
সেই বর্ষা পর্যন্ত—অথচ আশ্চর্য কি জান কিরীটি, লোকটার বয়স খুব একটা বেশী না—
ছাব্বিশ-সাতাশের মধ্যেই হবে, বোগা মোহারা চেহারা, কিন্তু অসম্ভব ক্ষিপ্ত। আর—
আর কি?

বাইফেল চালানোর বাঁপারে সে বোধ কার গাভীবধারা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের
সমকক্ষ। আর কেবল বাইফেলই বা বলি কেন, তার হাতের পিণ্ডল ও ছোরাও সমান
চলে তার শত্রুকে লক্ষ্য করে। ঘোড়ায় চড়ায়, মোটর বাইক ও গাড়ি ড্রাইভ করতে
সে সমান দক্ষ।

আমি তখন বললাম, কাকাবাবু, লোকটার চোরাকারবার ও গতিবোধ কখনো আমি
অনেকটা জানি।

জান?

জানি।

কি করে জানলে?

কলকাতায় স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক বড় অফিসারের মুখে। আর তার ফটোও
দেখছি।

তবে তো দেখাছ সেই ক্রিমিনালটা সম্পর্কে তুমি অনেক কিছুই জান কিরীটি।

অনেক কিছু নয়—তবে কিছু কিছু জানি, আর তাই থেকেই একটা প্রদ্ব আমার
মনে জেগেছে—

কি প্রশ্ন ?

লোকটা বেশার ভাগ সময় কোথায় থাকে ?

এই বাওলপিণ্ডি শহরেই—যতদূর জানতে পেরেছি—এখানেই ?

হ্যাঁ ! তবে ঠিক কোথায় থাকে জানতে পারিনি, অনেক চেষ্টা করেও ।

আচ্ছা আর একটা কথা কাকাবাবু—

কি, বল তো ?

লোকটা কি বিবাহিত শুনেছেন ?

Yes ! That reminds me—একটা কথা—

কি ?

এর স্বামীর নাম শুনেছি বৌশন ।

বৌশন !

হ্যাঁ । মেয়েটা শুনেছি কাশীরা । অসামান্য স্তম্ভরা । বয়েসও খুব বেশী নয়—
বোল-সতের হবে ।

আচ্ছা কাকাবাবু, লোকটা যে এই শহরেই থাকে বেশার ভাগ সময়, সেটা অসম্ভব
করলেন কি করে আপনারা ? প্রশ্ন করলাম তখন আমি ।

সব্বদ লোকটার স্তলুকসঙ্কনের জগৎ অনেকদিন ধরেই গুপ্তচর লাগানো হয়েছে—
সেই গুপ্তচরদের নথো গত্ত এক বছরে চারজনের মৃত্যু ঘটেছে, এই শহরের মধ্যেই—

মৃত্যু ঘটেছে ?

হ্যাঁ । প্রত্যেকেরই বুকে রাইফেলের গুলির ক্ষতচিহ্ন এবং প্রত্যেকেরই বুকের
বামদিকে গুলি লেগেছে । পোষ্টমর্টেমে একটা বাপার জানা গিয়েছে প্রত্যেকেরই
হাটে—হৃৎপিণ্ডে সাক্ষা গিয়ে গুলি প্রবেশ করেছে, যার ফলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটেছে ।
প্রায় বনতে গেলে প্রতিটি গুলি হাটের রাইট ভেটিকেলকে গিয়ে বিন্দু করেছে—

আশ্চর্য !

হ্যাঁ কিরাটী, কাকামশাই বললেন, আশ্চর্য লোকটার হাতের নিশানা !

আমি বললাম, শুধু তাই নয় কাকাবাবু ঐ বাপারটা থেকে আরও একটা জিনিস
প্রমাণিত হচ্ছে—

কি রকম ? কাকামশাই প্রশ্ন করলেন ।

প্রতিটি হত্যা এই একই হাতের কাজ সেটাও বাধ্যতায় সে পুলিশকে জানিয়ে
দিয়েছে—যার পশ্চাতে রয়েছে তার একটি সাবধান বাণী—আমার পিছনে লাগলে এই
পরিণতিই হবে সকলের । আর আপনি ঠিকই বলেছেন কাকাবাবু, আমি বললাম, সে
হয়ত বেশার ভাগ সময় এই শহরের মধ্যেই থাকে এবং না না হলেও হয়তো—

কি বল তো ? প্রশ্ন করলেন কাকামশাই ।

বলছিলাম হয়তো তার কোন নিকট আত্মীয় এই শহরেই কোথাও না কোথাও

থাকে যার কাছে সুলতান আহম্মদ নিয়মিত আসা-যাওয়া করে।

তোমার অনুমান হয় তো ঠিকই কিরীটী। কাকামশাই বললেন।

আচ্ছা, শেষ হতাকাণ্ডটি কবে সংঘটিত হয়? আমি এবারে প্রশ্ন করলাম।

মাত্র মাস খানেক আগে—

হঁ। আমি বললাম, তাহলে এও প্রমাণিত হচ্ছে, অন্তত মাসখানেক আগে সে এখানেই ছিল!

ঐ চার-চারটি মৃত্যু যে একই লোকের হাতে ঘটেছে কিরীটী—তার আরও একটা প্রমাণ বোধ হয়—অন্তত পুলিশের ধারণা—

কি বলুন তো?

সবুজ রেশমী ক্রমাল!

২

সবুজ রেশমী ক্রমাল? প্রশ্ন করলাম আমি।

হ্যাঁ। প্রত্যেকের—মানে ঐ গুলিবিদ্ধ চার মৃত ব্যক্তিরই গলদেশে একটি করে সবুজ বর্ণের রেশমী ক্রমাল পেঁচানো ছিল।

গলায় প্রত্যেকেরই সবুজ বর্ণের রেশমী ক্রমাল পেঁচানো ছিল বলছেন?

হ্যাঁ। আচ্ছা কাকাবাবু, ঐ যে ‘রৌশন’ নামে কাশ্মিরী মেয়েটির কথা বললেন—পরমা সুলতানী—ওর কথা জানলেন কি করে? কেউ কি আপনাদের মধ্যে কখনও দেখেছে তাকে এবং সে যে ঐ সুলতান আহম্মদেরই স্ত্রী সে ধরনের ইজিত বা সংবাদ কোথা থেকে কিতাবে পেলেন?

শেষ যে গুলুচরটির মৃত্যু হয় মাসখানেক আগে—তার নাম পীর মহম্মদ, জাতে লোকটা পাঠান ছিল, পেশোয়ারে বাড়ি, বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের মত ছিল—লোকটা যেমন তাগড়াই চেহারা তেমনি দেখতে লম্বা-চওড়া। সে একদিন মাস চারেক আগে আপনা থেকেই এখানে আমার দপ্তরে আসে!

তারপর? প্রশ্ন করলাম।

বললে, সবেহেব আমাকে একটা কাজ দাও।

বললাম কি কাজ দেব? তোমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে।

বাড়ি কোথায়? পেশোয়ারে।

গুলুচর বিভাগে কাজ করবে? কি করতে হবে?

পুলিশের প্রয়োজনীয় পবরাখবর সংগ্রহ করে আনতে হবে।

কি ধরনের প্রয়োজনীয় খবর, সাহেব?

যদি কোন চোর-ডাকাতির সংবাদ—কোন লুণ্ঠন—কোন আগলারের খবর—আমার কথায়, কাকাবাবু বললেন, হঠাৎ চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল, সে বললে

আমি চেষ্টা করলে সাহেব একজনের সংবাদ এনে দিতে পারি—কার সংবাদ ? কাকামশাই প্রশ্ন করলেন ।

ভীষণ খতরনাক আদমী সে—ইব্লিশের বাচ্চা ॥

কে বল তো ? কে এমন লোক ? সুলতান আহম্মদের নাম শুনেছেন ?

কাকামশাই চমকে উঠলেন মনে মনে, কিন্তু মুখে সেটা জাদো প্রকাশ করলেন না । কেবল একটু প্রচ্ছন্ন ষোড়কের সঙ্গে বললেন, তুমি তাকে জানো নাকি ? জী শাব । চেনো তাকে । জী ।

কাকামশাইয়ের একবার মনে হয়েছিল, লোকটা সুলতান আহম্মদেরই চর নয় তো—পুলিশকে ফাঁসাবার জন্য পাঠিয়েছে । তবু বললেন, কি করে চিনলে তাকে ?

ও বাং মাত্, পুছিয়ে শাব । আমি তাকে চিনি । সে আমার জীবনটা একদম বরবাদ করে দিয়েছে । আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুশমন—

কি করেছে সে তোমার ?

আমার রৌশনকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে আমার বুক থেকে—

রৌশন ? আমার জর । কবে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ?

প্রায় এক সাল হয়ে গেল সেই থেকে সেই দুশমনটাকে আমি সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি । একবার যদি তার পাত্তা পাই তো তার কলিজাটা আমি ছুঁটুকরো করে ফেলব ।

পাবে তার পাত্তা ? আমাকে পেতেই হবে । দেখবেন সাহেব আমার রৌশনের তসবীর ! বলে লোকটা তার মলিন কুর্তীর পকেট থেকে সষত্রে কাগজে মোড়া একটা ফটো বের করল । দেখলাম অশ্রুপ হুমরা এক যুবতী ।

এই রৌশন ? হ্যাঁ, এই—এই আমার জর । কাগীর খেঁচে একে নিয়ে এসেছিলাম । এক হাউসবোটার মালিকের মেয়ে । শকারা চালাত—

চুরি করে ? হ্যাঁ সাহেব, চুরি করেই । তবে রৌশনও হামাকে ভালবেসেছিল—পেয়েছ তার কোন রকম সন্ধান পীর মহম্মদ ?

শেষ সংবাদ যা পেয়েছি—ডেরা ইসমাইল খান থেকে সুলতান আহম্মদ তাঁকে এখানেই এই শহরেই এনে কোথায়ও রেখেছে । সাহেব, আমি তো একা তার হাত থেকে রৌশনকে ছিনিয়ে আনতে পারব না, তাই—

পুলিশের সাহায্য চাও ! কাকামশাই বললেন ।

কেবল তাই না সাহেব, পুলিশের চাকরিতে ঢুকলে আমার অনেক সুবিধা হবে—

ঠিক আছে—আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও । ছ-চার রোজ পরে এস ।

পীর মহম্মদ সেলাম জানিয়ে চলে গেল ।

কাকামশাই একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, পরের দিনই ডি, আই, জি, মি: রবার্টসনের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললাম ।

মিঃ রবার্টসন সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল তাকে সেপাইয়ের একটা চাকরি দিতে। দিন তিনেক বাদে পীর মহম্মদ এলে তার চাকরি হয়ে গেল।

আমি তাকালাম কাকামশাইয়ের মুখের দিকে, তারপর ?

চাকরি নেবার তিন মাস বাদে একদিন সে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল।

কি খবর পীর মহম্মদ ?

সন্ধান পেয়েছি সাহেব—পেয়েছে ?

ইহা ? কোথায় ?

আরো কিছুদিন আমাকে সময় দিতে হবে। তারপর এসে সঠিক সংবাদ দেব। তবে এটা জামুন, সে ঘন ঘন এই শহরে আসে—তাই নাকি ?

ইহা। কিন্তু তার দলের লোকেবা তো নয়ই—এমন কি কাক পক্ষান্তেও জানতে পারে না তার আসার খবর। আচ্ছা আমি চল সাহেব—শীঘ্রই আবার মূল্যাকাত হবে—সলাম।

পীর মহম্মদ চলে গেল।

তারপর ? আমি প্রশ্ন করলাম, আবার কবে এল সে ?

বিষয় ভাবে ঘাড দোলালেন কাকামশাই। বললেন, না কিরাঁটি, আর সে আসে নি। আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। মাসখানেক বাদে কানটনমেন্ট এরিয়া—মানে আমাদের ডি সাহেব ডি, আর্ট. জি,—রবার্টসনের বাংলোর হাতার মধ্যে একটা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় বৃকে গুলিবিদ্ধ—গলায় সবুজ রঙের রেশমী ক্রমাল।

আমি বললাম সব শুনে, রুড সাহেবের বাংলোর হাতার মধ্যে পীর মহম্মদের মৃতদেহটা পাওয়া গেলেও নিশ্চয়ই স্থানে তাকে হত্যা করা হয়নি—অণু কোথাও হত্যা করে ওখানে মৃতদেহটা ফেলে দিয়ে গিয়েছিল সম্ভবত !

তাই আমাদেরও খাবনা কিরাঁটি। কাকামশাই বললেন।

এই পর্যন্ত বলে কিরাঁটি খামল। আমি বললাম, তারপর ?

কিরাঁটি বললে, রাত বারোটা বাজে—পে. চৌ. চৌ. করছে—

সকলে আমরা খাবার জন্টে উঠে পড়লাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর কিরাঁটি বলেছিল, নাকিটা আর একদিন তিনিস। কিন্তু আমি আর কৃষ্ণা সম্মত হলাম না। কাজেই আহাবের পর তিনজনে এসে আবার বাইরের ঘরে বসলাম। রুটি তখন কিছুটা কমেব দিচ্ছে। জানালাপথে চেয়ে দেখে বাড়ির সামনে প্রায় একইটু জল।

বুখলাম কলকাতা শহর ভাসছে।

কিরাঁটি আবার তার অসমাপ্ত কাহিনী শুরু করল। পীর মহম্মদের মৃত্যুসংবাদটা দেবার পর কাকামশাই বললেন, এই সুলতান আহম্মদের একটা কিনারা করবার জন্তই

তোমাকে ডেকে আনিয়েছি কিরীটী। বড় সাহেবকে তোমার কথা বলেছিলাম। তিনি সম্মত হলেই তোমাকে চিঠি দিয়ে আনিয়েছি।

আমি তখন বললাম, কলিকাতায় আমিও সেখানকার পুলিশের বড়কর্তার অনুরোধে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা শুরু করেছিলাম কাকাবাবু—বোধহয় এখন থেকেই সেখানে সাহায্য চাওয়া হয়েছে—

আমি সেটা জানি। জানতাম না কেবল তোমার সাহায্য তারা চেয়েছেন। তা কিছু জানতে পেরেছ ?

না। কোন কলকিনারাই যেন পাচ্ছিলাম না, এখন আপনার কাহিনী শুনে মনে হচ্ছে লোকটার একটা কিনারা হয়তো করতে পারব।

দিক্ লোকটা সাংঘাতিক টাইপের দুর্ধর্ষ কিরীটী।

সে তো বোঝাই যাচ্ছে। শুধু দুর্ধর্ষ নয় কাকাবাবু—অসাধারণ চতুর ও বুদ্ধিমান, তবে যা বুঝতে পারছি লোকটার একটা দুর্বলতাও আছে—উইক পরেন্ট তার চরিত্রের মধ্যে বলতে পারেন।

কি বলতো ? প্রশ্ন করলেন কাকামশাই।

লোকটার মেয়ে মাস্কের ওপরে আসক্তি।

তুমি বলতে চাও কিরীটী—

আমি মুহূর্তেই বললাম, বলতে এই মুহূর্তে আমি কিছুই চাই না কাকাবাবু—তাছাড়া it is too early to say anything...

বেশ বেশ, তা এখন তুমি—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, ছুটো দিন আমাদের ভাবতে দিন—তবে একটা কাজ আপনাকে করতে হবে কাকাবাবু—কি বল তো ?

রেল স্টেশনে—বাস স্ট্যাণ্ডে সবত্র প্রেন ড্রেসে কতকগুলো বিখন্ড লোককে পাহারায় রাখুন এবং তাদের ফোটো দেখিয়ে ভাল করে চিনিয়ে দিন স্থলতান আহম্মদকে—একটা করে ফোটোর কপি প্রত্যেককে দিতে পারলে আরও ভাল হয়—যাতে করে—

লোকটাকে দেখামাত্রই তারা identify করতে পারে, তাই তো !

ঠাঁ। তবে লোকটা যদি ছদ্মবেশ ধারণে পারদর্শী হয়, তাকে হয়ত চিঁ করে Spot out করতে পারা যাবে না, তবু সাবধানের মার নেই।

সেদিনকার মত অপেক্ষার আসর ভঙ্গ হল। আমরা যে ঘর শযায় আশ্রয় নিলাম। ষাট হোক, দুদিন নয়—চারটে দিন আমি শুয়ে বসেই কাটিয়ে দিলাম। বাংলা থেকে কোথায়ও বের হলাম না। পঞ্চম দিনে কিন্তু বেরুতেই হল সত্ত্বত—আমি প্রশ্ন করলাম, কেন ?

আবার একজন লোক নিহত হ'ল।

নিহত হ'ল।

হ্যাঁ, সত্যত। একটা পেন ড্রেস গুলুচর। সেই আগের মতই বাদিকে বৃকে রাইফেলের গুলির ক্ষতিচিহ্ন ও গুলার সবুজ রেশমী ক্রমাল। খবরটা কাকাবাবুর মুখে জনেই আমি তার সঙ্গে অকুস্থানে গেলাম। যে সব লোককে স্টেশনে ও বাস স্ট্যাণ্ডে মোতায়েন করা হয়েছিল কয়েকদিন আগে তাদেরই একজন। লোকটার নাম সফিউল্লা। একজন পাঞ্জাবী। বয়স অল্পমান চৌত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ। রোগা পাতলা চেহারা। গত পাঁচ বছর ধরে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করছিল। লোকটা ছিল যেমন বিশ্বাসী তেমনই বুদ্ধিমান ও কর্মক্ষম। কিস্যিটা বলতে লাগল আবার একটু থেমে, ঘটনাটা ঘটেছিল পুরাতন শহরের মধ্যে, মল থেকে অনেকটা দূরে, বাড়িগুলো সেখানে খুব ঘিঞ্জি নয়। দেখলাম একটা সাদা রংয়ের দোতলা বাড়ির হাত পনের দূরে ঘাসের ওপরে মৃতদেহটা পড়ে আছে ;

পুলিস মৃতদেহটা নিয়ে বাস্ত ছিল—কিছু দূরে আসল কৌতূহলী মানুষ ভিড় করেছে, কিন্তু পুলিশের ভয়ে সামনে আসতে পারছে না।

সকলের চোখে মুখেই একটা ভীতি যেন স্পষ্ট। আমি একবার মাত্র মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে জায়গাটার আশপাশে নজর দিলাম।

কাঁচা ধুলোর সড়ক—কংক্রিট রাস্তা নয়। কিছু বাড়ি আছে বটে ঐ তল্লাটে—কিন্তু ঐ সাদা রংয়ের দোতলা বাড়িটা যেন কিছুটা স্বতন্ত্র অন্ত্যান্ত বাড়িগুলো থেকে। লোহার গেটও পার হলেই খানিকটা বাগানের মত চোখে পড়ে। নানা ধরনের গাছ-পাছালি আছে সেখানে।

আমি কাকাবাবুকে প্রশ্ন করলাম, ঐ সাদা বাড়িটা কার কাকাবাবু?

ওটা জোহরা বাঈজীর বাড়ি।

বাঈজীর বাড়ি! হ্যাঁ। খুব নাম করা গাইয়ে। প্রজন্ম পায় আত অপূর্ব।

বাঈজীর সঙ্গে একটু আলাপ বরা যায় না কাকাবাবু?

কেন যাবে না। কেন বলতো—বাঈজীর সঙ্গে আলাপ করতে চাও কেন?

আমি বললাম, এমনিই—

এখন যাবে? কাকামশাই শুধালেন।

না এখনি না। আজ সন্ধ্যার পর যদি হয় তো ভাল হয়।

কিন্তু সন্ধ্যার পর তো স্থবিধা হবে না কিস্যিটা।

কেন? ওর বাড়িতে রোজ সন্ধ্যার পর মাইকেল বসে। শহরের সব রহিস লোকেবা গান শুনে আসে।

তা হোক। আপনি বরং একটা কাজ যদি করতে পারেন তো ভাল হয়।

কি বল তো?

লোক পাঠিয়ে একটা সংবাদ দিয়ে রাখবেন যে আমরা যাব ওর বাড়িতে সন্ধ্যার পর—

বেশ তো !

ঐ সময় কালো রংয়ের একটা অস্ট্রীন গাড়ি দেখা গেল ঐদিকে আসছে । গাড়িটা পাশ দিয়ে চলে গেল—এবং ঠিক সেই সময় চলন্ত গাড়ির জানানা পথে চকিতের জন্ত একটি অপরূপ স্তম্ভরী নারীর মুখ দেখতে পেলাম ।

কাকামশাই বললেন, ঐ তো জোহরা চলে গেল ।

বললাম, ঐ জোহরা ? ইয়া । বয়স তো ওর খুব বেশী মনে হল না !

না, কুড়ি, একুশ হবে । ওর মা জন্মনব্বাঈ ছিল এ শহরের নামকরা বান্ধিজ । তারই মেয়ে । আগে ও লকলের সামনে বেকত না—গানও শোনাত না, বছর দুই হল ওর মা মারা যাবার পর থেকে ও ব্যবসা শুরু করেছে ।

গায় কেমন ?

কাকামশাই আমার প্রশ্নে মুছ হেসে বললেন, গান মোটামুটি গায়—তবে শুনি ওর গানের চাইতে লকলের কাছে ওর রূপেই আকর্ষণটাই নাকি বেশী ।

তাঁই বুঝ ? ইয়া তাঁই ভিড়ও খুব হয় আসরে—

তা সাতাই দেখার মতই চেহারা বটে মেয়েটির ।

কাকাবাবু আড়চোখে একবার তাকালেন । আমি কিন্তু বাগাবটা গায়েই মাখলাম না । বললাম, আমি তাহলে চলি—

যাবে ? ইয়া । আর কিছু তোমার এখানে দেখবার নেই ?

না কাকাবাবু, বলতে দিয়ে হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল পথের ধারে ধুলোর ওপর কিছু ঘোড়ার খুরের এলোমেলো দাগ । বললাম, ঐ দেখুন কাকাবাবু—

কি বল তো ? ঘোড়ার খুরের দাগ ।

কাকামশাই যেন নেহাৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দাগগুলো একবার দেখলেন । তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলেন । কাকামশাইয়ের গাড়িতেই আমি ফিরে এলাম । একটু থেমে কিরীটি বললে, একটা কথা আজ অকপটে স্বীকার করতে আমার কোন ষিধা নেই স্বত্ৰত—

কি কথা ? আমি বললাম ।

সেদিন স্থলতান আহম্মদ যদি ভুলটা না করত .

ভুল ?

ইয়া, পরে বলব । থাকগে, কথা হচ্ছে সে সেদিন ঐ ভুলটা যদি না করত—তবে হয়ত অত তাড়াতাড়ি ওর মৃত্যু ঘনিয়ে আসত না । আমাকে হয়ত সেদিন শুধুহাতেই ফিরে আসতে হত । স্থলতান আহম্মদের পাত্তাও কেউ কোনদিন পেত না ।

এ কথা কেন বলছিস কিরীটি । প্রশ্ন করলাম আমি ।

বলছি এই কারণে যে, ঐ পাঞ্জাবী যুবকের মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই স্থলতান আহম্মদের ভাগ্যে শনি প্রবেশ করেছিল ।

যাক গে, যা বলেছিলাম। সলিল বাঁড়তেই ছিল, আমাকে ফিরে আসতে দেখে প্রশ্ন করল, কি হ'ল—এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে কিয়টি?

বললাম, দেখা হয়ে গেল তাই চলে এলাম।

দেখা হয়ে গেল সব কিছুর?

হ্যাঁ, আমার যা দেখবার ও জানবার ছিল দেখে এলাম জেনে এলাম সলিল!

বল?

আজ এক জায়গায় গান শুনতে যাব—গান শুনতে যাবে—তা কোথায়?

জোহারা বাঈজীর গৃহে। বাঈজীর গান শুনতে যাবে!

কেন হে, তোমার কোন আপত্তি আছে নাকি? সময়টা বেশ আনন্দেরই হেটে যাবে—যাবে নাকি আমার সঙ্গে?

না তাই, রফে কর কাকা শুনলে...

কি হবে? না, বললাম মানুষটা অত্যন্ত মরালিস্ট—

তাই নাকি?

হ্যাঁ, পুলিশের চাকর করছেন এতদিন ধরে কিন্তু কখনও একটা পয়সা ঘুষ নেননি আজ পর্যন্ত কারও কাছ থেকে---

অগ্রায় করছেন।

মানে? দেখ যে পুজায় যে মস্ত বা যা উপাচার—না মানলেই গোলমাল।

কাকা জানতে পারলে কথটা।

কাকাবাবু জানেন?

জানেন।

হ্যাঁ, বলেছি তাঁকে।

তা কি বললেন কাকাবাবু?

বাবস্থা করবেন বলেছেন—

মতি বলছ?

মিথো যে নয় সঙ্ঘার পরই জানতে পারবে?

ঠিক সঙ্ঘায় নয়। রাত সোয়া নটা নাগাদ গেলাম জোহারা গৃহে। কাকাবাবুর কাজ ছিল কিছু—সেই আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল—জোহারা বোধহয় সেদিন আমাদের যাবার কথা শুনেই তার আসার শেষ পর্যন্ত বসায়নি, সারা বাড়িটা নীরব নিস্তব্ধ।

গাড়ি থেকে নেমে গেট দিয়ে ভেতর প্রবেশ করলাম। কাকামশাই আগে আগে, তাঁর পশ্চাতে আমি। কাকামশাইয়ের মুখে দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলাম, জোহারা

গৃহে এই রাজে খাবার ব্যাপারটা। তিনি ঠিক সহজ মনে নিতে পারেন নি। আমার প্রস্তাবে যেন তাঁর মনের মধ্যে এতটুকু সায় ছিল না—অথচ প্রস্তাবটা তিনি অস্বীকার করতে পারছিলেন না। তাই বোধ করি ভেতরে ভেতরে তিনি একটু অস্বস্তিই বোধ করছিলেন।

তিনি একবার বসেছিলেনও, জোহরা বাঈজীর ওখানে গিয়ে কি হবে? তুমি কি মনে কর কিয়াদী, সে তোমার এই ব্যাপারে কোনরকম সাহায্য করতে পারবে?

আমি বলেছিলাম, কোনই হয়ত লাভ হবে না, তবু...

তবে দেখানে খাবার কি প্রয়োজন?

কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করে দুটো কথা বলতেও তো কোন ক্ষতি নেই কাকাবাবু।

তা নেই—তবু কি তুমি মনে কর, তোমাকে সত্যি কোন কথা জানলে ও বলবে?

তা হয়ত বলবে না। আমি তবু তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই কাল রাজে কোনও সময় সে কোনও গুলির আওয়াজ পেয়েছিল কিনা?

এই হুজুর... সকল মকলকেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে—কউ তো কিছু শুনেতে পারিনি। তাই আমার মনে হয়েছে, হয়ত লোকটাকে যত্ন কোথাও হত্যা করে এখানে সে ফেলে রেখে গিয়েছে এর সময়।

তা বিশেষ করে এখানো ই বা ফেলে গেল কেন মৃতদেহটা—প্রশ্নটা আমার মনে প্রথম থেকে জারলেও একটিবারও উচ্চারণ করিনি কাকাবাবুর সামনে, তখনো চূপ করে রইলাম।

আমাদের মাদা পেয়ে একজন দাসী বের হয়ে গেলো, আটঘে সাব—বাঈ আপকো ইন্তেজার কর রহে হে—

কেয়া, বাঈজা বৈঠা হায়?

জী। আইয়ে পবারিয়ে—

অতঃপর দাসী জোহরা যে ঘরে বসেছিল সেই ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে প্রবেশ করল। ঘরটি মূল্যবান আসবাবপত্রের সজ্জিত। দামী দামী সব কোচ দেওয়ালের দু'ধারে—মেঝেতে দামী পাবল কাপেট বিছানো তারই মাঝখানে গাঢ় বক্তবর্ণ ভেলভেটের গালিচার উপরে বসে জোহরা।

ঘরের মধ্যে ফায়ার প্রুপ জ্বলছে। ঘরের বাতাস বেশ উষ্ণ। আরামপ্রদ, বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে ভেতরে প্রবেশ করে বেশ আরাম বোধ হ'ল।

রূপ বটে বাঈজার। যাকে বলে সত্যিকারের চোখ-ঝলমানো রূপ। পরনে শালোয়ার কামিজ, গায়ে মোনালী জবির কাল করা একটা কালো বংয়ের দামী শাল। লম্বা বেশ বিহুনি করা। সামনে একটা তানপুরা শোয়ানো অবস্থায় রয়েছে। হাঁটু মুড়ে বসে জোহরা তানপুরার তাগে মুহু অঙ্গুলি সঞ্চালন করছিল। আমাদের পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে কুনিশ করল, পাখাঘিয়ে সাব—

এ গরীব খানামে—আপ যেইনা আদমি—কেইসে হুকুম্বা যাদা করু।

তোমার নাম জোহা? কাকামশাই গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন।

জী জনাব।

কাল রাতে তুমি ঘরেই বোধহয় ছিলে বাঈজী? জী।

গান বাজনার আসর বসেছিল? নেহি।

কেন? হঠাৎ ঐ কেন-র উত্তরে আমার মনে হল যেন বাঈজী একটু খতমত খেয়ে যায়। কেমন বিব্রত ভাবে তাকাতে থাকে বাঈজী।

কাল গানের আসর তাহলে বসেন? না।

কত রাতে কাল নিদ গিয়েছিলে? আমি একটু রাত করেই শুই। তা বোধহয় বারোটা হবে তখন।

এবার মাঝখানে আমিই প্রশ্ন করলাম, অত রাতে এ পাড়াটা বেশ নিঝুম হয়ে যায় না।

হ্যাঁ বাবুজী রাত নাটার পরই চূপচাপ হয়ে যায় একদম পাড়াটা—বিশেষ করে এখন তো শীতের রাত।

আবার আমিই প্রশ্ন করলাম, কাল রাতে কোন গুলির আওয়াজ পেয়েছিলে বাঈজী শুনে?

গোলী! নেহি তো বাবুজী!

পাওনি? আমিই আবার প্রশ্ন করলাম, পাওনি শুনেও একটা মাস্তবেচ চিৎকার? না।

মুলতান আহমদের নাম শুনেছ বাঈজী? প্রশ্নটা করে আমি বাঈজীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালাম। মনে হল আমার বাঈজী যেন কেমন বিমূঢ় বিধাগ্রস্ত। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলাম ওকে কোন চিন্তার অবকাশ মাত্রও না দিয়ে, সে তো মধ্যো মধ্যো তোমার এখানে আসে।

দেখলাম বাঈজীর দুই চোখে কেমন একটা যেন অসহায় ভীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমি বললাম, কোন ভয় নেই তোমার বাঈজী। বল বা জান!

বাবুজী হামি—বাঈজীর মুখের কথাটা শেষ হল না, বন্ধ কাচের সাদি বন্ বন্ শব্দে গুঁড়ো হয়ে গেল আর গুলি এসে বাঈজীর বাম বক্ষে বিদ্ধ করল। বাঈজী লুটিয়ে পড়ে গেল লাল জাজিমের ওপরে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তখন সে।

আমরা বিমূঢ়—হতবাক। কি করব বোধগম্য হচ্ছে না। ঐ সময় ক্ষত ধাবমান একটা অস্বক্ৰমণি ক্রমে অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল।

বাঈজীর প্রাণবায়ু নির্গত হয়েছিল। তার তুলুপ্তিত বক্তাক্ত মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে কাকামশাই মুহূর্তে বললেন, I never dreamt of it—চল।

—কাকাবাবু, ঐ দালীকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।

এবারে আর কাকামশাই কো... প্রতিবার জানালেন না। দাসীকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। প্রথমেই খানায় গেলেন। কয়েকজন কনস্টেবল জোহরার বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন অবিলম্বে। তারপর আমার নির্দেশে দাসীকে সামনে আনা হল। দাসী তখন ভয়ে কাঁপছে।

কি নাম তোরা?

মরিয়ম।

কতদিন বাঈজীর বাড়িতে কাজ করছিস? প্রশ্ন করছিলাম আমিট, বাংলাতে একজা পিপাহা উহুতে ওকে প্রশ্ন করে তার জবাবটা আমাকে তর্জমা করে করে শোনাতে লাগল।

চার মাস হজুর। মুলতান আহম্মদ ওখানে প্রায়ই আসত, না?

মুলতান আহম্মদ কে—আমি চিনি না।

আমি তখন মুলতানের ফটোটা ওকে দেখালাম। বললাম, এই আদমীকে চিনতে পারছিস? হ্যাঁ

এ আসত না মধো মধো বাঈজীর ঘরে? আ... আসত বাবুজী।

কাল রাতে এসেছিল? এসেছিল। বিকেলেই এতলা পাঠিয়েছিল সে আসবে রাতে দশটার পর, তাই বাঈজী আসব বসায়নি।

ঐ লোকটা তোরা বাঈজীকে পিয়ার করত, তাই না?

তা জানিনা। তবে ও এলে বাঈজীর ঘরে খিল পড়ে যেত। কারও ভেতরে বাবার হুকুম ছিল না।

কাল কত রাতে সে এসেছিল? জানি না।

জানিস না?

না। আমাদের রাত নটা বাজতেই বাঈজী ছুটি দিয়ে গিয়েছিল।

আমাদের কথা শেষ হ'ল। কিরাটী বলতে লাগল, একটা গাড়ি খানা কমপাউণ্ডে প্রবেশ করল। হাবিলদার এসে কাকাবাবুকে ও খানা অফিসারকে সেলাম করল। খানা-অফিসার শুধালেন, কি খবর ইসমাইল খান? সেখান থেকে চলে এলে কেন? তোমাকে বলেছিলাম না পাহারায় থাকতে হবে।

লেকিন সাব, ও কোঠিমে তো কোই নেহি—নেই?

নেহি। কোই লাশ ভি নেহি!

কাকামশাই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর মরিয়মের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোরা বাঈজীর জেবর ছিল না?

ছিল হজুর। বহু সোনাদানা হায়ে জহবৎ ছিল। নগদ রূপেরা ভি ছিল।

কোথায় থাকত সে সব?

বাঈজীর শোবার ঘরে—লোহার দিশুকে। চাবি?

সব সময় বাঈজীর কাছেই থাকত হুজুর।

সকলে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

হাবিলদার সাব? কাকামশাই ডাকলেন! হুজুর!

সে বাড়িতে পাহারায় কোন শেপাই বেধে আসনি হাবিলদার? কাকামশাই ডাকলেন?

এসেছি। পাঁচজন আছে পাহারায় সাহেব।

কথাটা বলে কাকামশাই আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার মাথার মধ্যে তখন একটি কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে—জোহরার লাশটা উধাও হয়েছে, এবং বাপারটা তো একটিনাত্র সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, লাশটা স্তম্ভিত ভাবে স্বলতান আহম্মদই বা তার অহুচরেরা জোহরার গৃহে থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে এবং—এবং—

ওখলাম আমি কিরীতীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

সুত্রত, কিরীতী বললে, এও ঐ সঙ্গে আমায় স্বনিশ্চিত হয়েছিলাম—স্বলতান আহম্মদ পিণ্ডি ছেড়ে এখনো কোথাও যায়নি। আর—

আর কি?

আর—কিরীতী বললে, জোহরার কাছে স্বলতান কেবল তার দেহের ক্ষুণ্ণ মেটোতেই আসত না—ওখানে মধ্যে মধ্যে আসত সে জোহরার দেহের আকর্ষণই কেবল নয়—আরো কিছু ছিল। স্বলতান সম্ভবতঃ জোহরাকে ভালবসত। ভালবাসত? প্রস্তাব করলাম আমি।

ই্যা, সুত্রত। আর অনুমান যে মিথ্যে নয় সেটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল দিন পাঁচকের মধ্যে। তার ভাববাসার পূর্ণ শোধ করে গেল ঐ পাঠান যুবক নিজের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে।

তবে সেই মেয়েটি—বোশন না কি যেন নাম।

না সুত্রত—সেটা ছিল তার নিছক বোশনের রূপ ও যৌবনটাকে ভোগ করবার একটা দুর্দমনীয় আকর্ষণ—বলতে পার বোনক্ষুধা। তা যদি না হত—যাক গো শোন সব ঘটনা, তখনলই বুঝতে পারবে কথাটা আমার সত্য না মিথ্যা!

ইতিমধ্যে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ঘরের গোলা জানালাপথে রাত্রি শেষের আকাশে একটা চাপা আলোর ইশারা ছড়িয়ে পড়ছিল। সুষ্টি তখন থেমে গিয়েছিল। কিন্তু কিছু কিছু ভিন্ন এলোমেলো মেঘ ইতস্ততঃ আকাশের গায়ে ভাসছিল।

কিরীতী বললে, কাহিনী আমার শেষ হয়ে এনেছে। কৃষ্ণা, এ সময় এক কাপ কফি হলে মঙ্গল হত না। কৃষ্ণা উঠে গেল নিঃশব্দে।

কফি পানের পর আবার শুরু করল কিরীতী তার কাহিনী।

আমি কাকামশাইকে বললাম, কাকাবাবু, সুলতান আহমদকে যদি ধরতে চান তো খুব চটপট কাজ করতে হবে।

কি বলছ কিরাটী! কাকামশাই বললেন।

হ্যাঁ, কাকাবাবু। এখানকার যে আকর্ষণে সে মধো মধো ছুটে ছুটে আসত—সে ঐ বাঈজী জোহরা। তার সব কথাই জানত—সম্ভবত তার গতিবিধিও জোহরার অজ্ঞাত ছিল না। তাই সে দূর থেকে রাষ্ট্রফেলের গুলি চালিয়ে শেষ করে দিয়েছে—পাছে সে আমাদের কাছে কোন কিছু কান্ন করে দেয়। কিন্তু তাকে শেষ করে দিলেও তার মৃতদেহটার মায়া সে ছাড়তে পারেন—তার প্রতি তার প্রগাঢ় প্রেম প্রলুব্ধ করেছে জোহরার মৃতদেহটা তুলে নিয়ে যেতে। কিন্তু—

কিন্তু কি কিরাটী? আমার মতে ঐটাই হয়েছে তার চরম ভুল।

ভুল? হ্যাঁ। কারণ তার মৃত্যুবাণ সে আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছে যে মুহুর্তে সে জোহরার মৃতদেহটার গৃহ থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

ও কথা কেন বলছো কিরাটী?

আমার মন বলছে ঐ কথা। ভেবে দেখুন, যতই সে চতুর শক্তিশালী কিপ্রগতি ও দুর্ধর্ষ হোক না কেন—জোহরার লাশটাই তার হাতে হাতকড়া পড়বে, প্রেমে অন্ধ হয়ে যদি সে ঐ লাশটার দিকে আর ফিরে না তাকাত, ও এমন জায়গায় চলে যেত যে আপনাদের দাখা ছিল না তাকে trace করা। সে আর কিছু দিন কাঁধে করে ঘুরে বেড়াতে পারবে না, কোন নিভৃত জায়গায় লাশটা তো সে গোর দেবেই।

গোর দেবে? দিতে তো হবেই। আপনি সর্বত্র পুলিশের বাহিনী করেন যতটা সম্ভব ঐ শহরের আশে পাশে। আর দ্রুতি করবেন না।

কাকামশাই সেই ব্যবস্থাই করলেন।

সে রাত্রে থানা থেকে যখন ফিরে এলাম গৃহে, কিরাটী বলতে লাগল, শাতের বাড়ি তখন প্রায় শয় হয়ে গিয়েছে।

ঘরে ঢুকে দোপ সাল তখনো জেগে।

আনাকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললে, জোহরার সঙ্গে আলাপ করলি?

নিজেকে বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল। আরাম-কদারার ওপরে জামা কাপড় ছেড়ে সোজা গিয়ে কবলের তলায় প্রবেশ করলাম।

সলিল বললে, কি হল? আমি বললাম, কাল হবে সলিল, বড় ঘুম পাচ্ছে।

ছুটো দিন কেটে গেল। কোন সংবাদ নেই।

কাকামশাই ছটফট করছিলেন। আমি কিন্তু আদৌ বাস্তব হয়নি। কারণ আমি জানতাম ঐ শহরের আশেপাশেই কোথাও না কোথাও সুলতানের সন্ধান মিলবেই।

গোয়েন্দা (প্রথম)—১৫

ইতিমধ্যে আরও একটা কাজ করা হয়েছিল—শহরের সর্বত্র স্থলতানের ছাব ছাপিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, কেউ যদি স্থলতানের সন্ধান দিতে পারে সে পাঁচ হাজার টাকা পাবে। পরামর্শটা অবিশ্রাম আম্মই কাকামশাইকে দিয়েছিলাম।

তার তখন বোধহয় কিছুটা বিশ্বাস আমার ওপরে জন্মেছে। ওঁর বড় সাহেবের—পুলিশের বড় কতীরাও বোধ করি কিছুটা আস্থা আমার ওপরে জন্মেছিল। ইতিমধ্যে কাকামশাই নির্দেশ দিয়েছিলেন বাড়ি বাড়ি এক-একটা এলাকা জুড়ে সার্চ করতে—যদিও আমি তাকে সে বাপাবে কোন পরামর্শ দিইনি, কিন্তু আমি বাধ্যও দিইনি।

আরো চারো দিন কেটে গেল।

চতুর্থ দিন রাতে চরম ঘটনাতো ঘটল। ঐ রকমের একটা কিছু যে ঘটতে পারে—একটা ক্ষীণ আশা আমার মনের মধ্যে জাগছিল।

রাতি তখন প্রায় সোয়া এগারটা।

আমি আর কাকাবাবু বাইরের ঘরে বসে স্থলতানের ব্যাপারটাই আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ দেহা ঠেলে এক বোরখা-পরানারী আমাদের ঘরের মধ্যে এসে ঘেন হুমড়ি পেতে পড়ল।

কে? কে? বলতে বলতে কাকামশাই উঠে দাঁড়ান।

সাব—কে তুমি?

ঐ স্থলতানটাকে আপনি খরতে চান?

কে—কার কথা বলছেন?

স্থলতান—সেই ডাকু—জান তুমি তার খবর?

একটু আগে সন্ধ্যার উপর বাইরের লাশটা তুলে নিয়ে টাকসিলার দিকে গিয়েছে।

টাকসিলা মানে তুর্কিশলা ঠিক বলছ?

হ্যাঁ সাহেব, সার্চ—তুমি—তুমি কে? আমি?

এভাবে আমিই কথা বললাম, তুমি কি পীর মহম্মদের জর? বাবুজী হ্যাঁ—আমি রোশন। সে আমার জিন্দগী বরবাদ করে দিয়েছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, কাকাবাবু, আর দেহি করবেন না। এই কদিন আমার মন বলছিল এই রকমই একটা কিছু ঘটবে।

আমার কণায় কাকামশাই আর দেহি করলেন না।

ঘটা দেড়েকের মধ্যে হঠাৎ ট্রাক ভর্তি মিলিটারী ও আর্মড পুলিশ নিয়ে আমরা ছুটলাম তুর্কিশলার পথে। চমৎকার মেটাল বাধানো রাস্তা।

শীতের রাত হলেও আকাশ পরিষ্কার ছিল।

ক্রয়োদশার চাঁদ ছিল আকাশে।

সেই চাঁদের ক্ষীণ আলোয় আমাদের দুটো ট্রাক ছুটে চলল।

শ্রদ্ধাশিলার ব্যাপারটা তখনরা জান বোধ হয়, এক্সক্যাভেশন করে বৌদ্ধ যুগের পুরাতন এক নগরী ও সভ্যতা আবিস্কৃত হয়েছে। সেই লুপ্ত নগরী আজকের দিনে একটি বিশেষ ঐতিহ্য স্থান। একটি নিজন জায়গা। আশে পাশে বহুদূর পর্যন্ত কোন মানুষের বসবাস নেই।

রাওলপিণ্ড শহর থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ-চাল্লিশ মাইল দূরে জায়গাটি অবস্থিত।

প্রায় তার কাছাকাছি এসে আমরা দেখতে পেলাম দু'লো উড়িয়ে এক অস্বাভাবিক ভাবে ছুটে চলেছে।

চারদিকে ভোরের আলো আপসা আপসা ফুটে উঠেছে তখন।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

ট্রাক দুটোর গতি আরো বাড়িয়ে দেওয়া হল।

অগ্রগামী অস্বাভাবিক সেই লুপ্ত নগরীর স্তূপের মধ্যে মিলিয়ে গেল ট্রাক দুটো এসে তবুও দেখে নেই। শ্রদ্ধাশিলার কীউরেটারের অক্ষির সামনে কীউরেটার তখন ছিলেন ওখানে শ্রদ্ধাশিলার গুপ্ত মহাশয়। ভোরবাত্রে ট্রাকের শব্দ পেয়ে মিস গুপ্ত এসে হাজির হলেন।

কাকামশাই তার মাঝামাঝি কথা তাকে বললেন তখন তাইই পরামর্শমত আরম্ভ পুলিশ ও মিলিটারীরা জায়গাটা ঘিরে ফেলল।

তারপর শুরু হ'ল লুকোচুর। প্রায় ঘণ্টাপাশের লুকোচুরের পর শুরু হ'ল হু-পাকের গুলিবর্ষণ।

মিলিটারীরা মেশিন গান এনেছিল সঙ্গে।

বিশেষ একটি জায়গায় মেশিনগান বসানো হ'ল।

তা প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে গুলি বিনিময় চলল। পুলিশের সব মিলিটারীর প্রায় আটজন লোক মৃত ও আহত হয় সেই এনকাউন্টারে।

অবশেষে একসময় গুলি থামল এবং প্রায় আশ্চর্যের দরে অচ্যুতদের পর একটি দালানের মাথায় স্তলতানের গুলিবর্ষ মৃতদেহটা আবিস্কৃত হ'ল—

পাশে পড়ে আছে পচা জোহরার মৃতদেহটা।

আমি বললাম, কাকামশাই শেষ।

কিরাটা বললে, না আরও একটু আছে স্বস্তি।

কি রকম?

কিরাটা বললে, বছর পাঁচেক বাদে আমি আবার পিণ্ড চাই। দেখলাম জোহরার বাড়িটা তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। আর কিংবদন্তী সুনাম, ওই বাড়ির চারপাশে মধ্যবাত্রে অনেকে নাক এক অস্বাভাবিক যুগে বিভাজিত দেখেছে এবং ঐ বাড়ির ভিতর থেকে শোনা যায় নারীকণ্ঠের গান।

আমি বললাম, তা তুমি যে সুলতানকে ধরতে পারবে বুঝেছিলে কি করে? — জোহরাকে গুল করে মারার পর তার লাশটা সে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তাতে করে দুটো বাপার আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এক জোহরাকে সে ভালবাসত — আর দুই জোহরার মৃতদেহটা নিয়ে চট করে অস্ত্র চলে যেতে পারবে না — সে ঐ শহরেই তখনো আছে, যে কারণে তার ছবি ছাপিয়ে পুয়ন্ডার ঘোষণা করা হয়েছিল এবং আমার অনুমান যে মিথ্যা নয় তাও প্রমাণিত হয়েছিল।

কৃষ্ণা শুধাল, আর রৌশন?

কিরাটি বললে, সেটাও আমি অনুমান করেছিলাম আমার কথিত পূর্বের ঐ ছবি বাপার থেকে। একমাত্র রৌশনই সরকারকে জানাতে পারে সুলতান কোথায় আছে।

কেন?

নারীর প্রতি নারীর সহজাত হিংসা। সেটাই 'ছল আমার হাতে শেষ তুরুপের তাম।

কৃষ্ণা আবার বললে, রৌশনের কি হ'ল?

জানি না। কারণ পূর্বের দিনই রাত্রে গাড়িতে আমি কলকাতায় ফিরে আসি। একটু থেমে আবার 'কিরাটি' বললে, ছোটবেলায় গাঁয়ের বাড়িতে একটা শঙ্খচূড় মাথ দেখেছিলাম — অমন স্নানর অথচ ভয়ঙ্কর একটা জিনিস আমি খুবই কম দেখেছি জীবনে। সুলতান আহম্মদের কথা মনে হলো আমার মনে পড়ে সেট শঙ্খচূড় মাথটার কথা।

*

*

*

নীহার রঞ্জন গুপ্ত : বিজ্ঞানের সাধনায় সাফল্য অর্জন করেও যে কয়জন সাহিত্যদেবী শিল্পের রূপোলী আবেশে আবিষ্ট হয়ে জীবন অতিবাহিত করেন নীহার রঞ্জন গুপ্ত মশাই তাঁদের অন্যতম। ইংরাজী সাহিত্যের “শার্লক হোমসের” স্রষ্টা পুরুষ কোনান ডয়েলের ছায় ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্তও বাংলা বহু ও গোল্‌ফের সাহিত্যে স্বকীয়তায় এক উজ্জল নাম। চিকিৎসা বিজ্ঞানে সাফল্য তাঁর সাহিত্যকার্যে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। নীহাররঞ্জনের “উদ্ধা” কলকাতার পেশাদার বঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এক ইতিহাস।

লেখকের কল্পবীক্ষণ, আলোকের আধারে, বহুভাষী ‘কিরাটি’, বিচারিণী, অগ্নিস্বাক্ষর, নক্ষত্রের বাত্রি ইত্যাদি গ্রন্থ বহু পঠিত ও বহুল প্রচারিত।

*

*

*



নিক্কণ

অমরেন্দ্র দাস

অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের মত গভীর ঘান রাত্রি। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই শুধু মাঝে মাঝে প্রেত হাওয়া আর নানারকম রাত্রি পোকাদের একটানা ভয়াবহ অদ্ভুত কক্ষণ শব্দ। কালো মিশামিশে অন্ধকার রাত্রি। আকাশে চাঁদ ঝুঠনি এখনও, বোধহয় আনাবঙ্গা পক্ষের জন্তে চাঁদের অগস্তাঘাতা হয়ে'ছিল।

যে পাড়ার কথা বলছি সেখানে দক্ষিণে নতুন ভাড়াটে এসেছে। অনেকদিন ধরে চাঁৎপুর রোডের এক মেসে কাটিয়ে একটা নিজস্বতার জন্তে এ পাড়ায় এসে একটা ছাতের চিলে ঘর ভাড়া নিয়ে'ছিল। দক্ষিণে নিজে লেখক। লিখে তার পেট চলে। লগার জন্তে তার সবদা একটা স্বল্পর নির্জনতা প্রয়োজন ছিল। আজ অনেকদিনের পর এই তিনতলা বাড়ার ছাতে একটা এককোণা ছোট ঘর পেয়ে তার খুসার অন্ত নেই। কিন্তু এই ক'দিনের মধ্যে হঠাৎ গভীর রাত্রি হলে একটা শব্দ শুনে তার দেহের লোম কুপেতে যে চাকলা জাগে সেটা সে কিছুতে বরদাস্ত করতে পারে না।

গভীর রাত্রের বুকে যখন পাড়ার মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে আসে, সবাই যখন

স্বপ্নের কোলে ঢলে পড়ে তখন—তখন হয়ত সর্কজিং একমনে একটা মোমবাতির কম্পমান শিখায় পাতার পর পাতা নায়ক নায়িকার জীবনে উত্থান পতনের ইতিহাস বচনা করে চলেছে। বাস্তব জগতের কথা হয়ত তুলে গেছে। হয়ত নায়িকার দুঃখে তার মনটা আত্ম; কিংবা হয়ত নায়কের দীর্ঘ প্রেমের চিঠির মধ্যে রোমান্স সৃষ্টি করে চলেছে। নিঃশাস প্রশ্বাস ফেলবারই হয়ত তার সময় নেই? ইঠাং কানের মধ্যে কে যেন মিষ্টি হুঁরে তুড়িয়ে নিকল তুলে। কে? কে?

সর্কজিংয়ের গায়ে গেল ধমে। মাথাটা তুলে গোলা দরজা দিয়ে বাইরে নড়া ছাঁতের দিকে তাকাল। গভীর শুক রাত্রি। ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকেছে ঘরের মধ্যে। লঙ্কাবান আকাশের বৃকে চুমকি তারাগুলো জলজল করছে। এঁটু পশ্চিম হয়ে আবার ও লম্বার গভীরত্রে ঢুকে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু আবার কে যেন কানের কাছে এসে হাতের চুড়ির মিষ্টি শব্দ তুলে সর্কজিংকে সজাগ করে দেয়। সর্কজিংয়ের মনে আবার দোলা দেয়, দেহের লোমকণগুলো তাড়ু সজাগ হয়ে উঠে। নিশ্চয় নিজন নঃস্ব এই চিলের ছাঁতের ঘর, সর্কজিং একাই এ ঘরে বাস করে। ছোট্টোলে খায় আর ঘরের মধ্যে শায়। একা থাকার জন্তে ভয় অবশ্য তার হবে না কিন্তু এই নিজন চিলের ছাঁতের ঘর। একবড় বাড়ী, কোন ঘরের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। বাড়ীওয়ালী ভাড়া দেওয়ার জন্তে এ ঘরখানা তৈরী করেন। এমন একটা ছোট মত আস্তানা করে বেগেছিল। সর্কজিং কেমন করে জানি এর সন্ধান শেষে বাড়ীওয়ালার কাছ থেকে এটা আদায় করেছে।

ওপরে টালি আর দেয়ালগুলো ঠেটের। সিঁড়ির শেষ ধাপে ঘরটা তৈরী করা হয়েছিল, সেজন্তে ঘরের পাড়াইটা খুব বেশী বড় নয়। সর্কজিং লম্বা নয় বরং বেশ বেঁটে ছোট পাটো মানুষটি। কিন্তু সে টানটান হয়ে দাঁড়ালে তার মাথায় টালির ছাতটার ছোঁয়া লাগে। প্রথম উত্তেজনায় ঘর ভাড়া করে পরে কিন্তু ঘরটা ভাল করে দেখে আর সর্কজিংয়ের ভাল লাগেনি। লেখক মানুষ, ভাবুক ভোলাব জন্তে নোংরামোটা অবশ্য গা সওয়া। কিন্তু প্রতিমামে কুড়ি টাকা ভাড়ার পরিবর্তে ঘরটা নিয়ে দেপল তার লোকমানই হয়েছে। কে'ন মানুষ নামে জীবই একদণ্ড ঘরে টিকতে পারে না কেমন যেন ভাপসা ধরনের গন্ধ। বাড়ীওয়ালী কতকগুলো বাড়াবাড়ানোর বহুপাতি, চুনবাঁলি সবিয়ে পরিষ্কার করে দেয় কিন্তু জিনিসপত্রের সন্ধ্যালে কি হবে, ঘরের মেঝে দেখে নিজনতার সন্ধ্যালে এর সন্ধ্যান-কল্পনা এত স্বপ্ন, তার মন থেকে বুদ্ধদের মত অপদারিত হয়ে গেল। কতকগুলো ঠেটের টুকরো পেটা মেঝে। পিঠ দিয়ে কোন সময় শুতে গেলেনই গায়ে বর্শার মত ফুটে ওঠে! তার ওপর দেয়ালে কোন বাগি দরান নেই। ফাঁক ফাঁক দাঁড় বের করা ঠেটগুলো ঠা করে চেয়ে রয়েছে। আগে দেপেগুনেই ঘরটা ভাড়া নেয় সর্কজিং। তখন মনে ছিল একটা গভীর উত্তেজনা, বাক নির্জনতা এবার পাওয়া

গেল! ঢালাও চিন্তা করো আর লেখো। কিন্তু ঘরের চেহারা দেখে চিন্তার কথা তুলে ছুঁচিছুঁচি মনে এলো বাসা বাঁধে। তারপর বাড়ীওয়ালাকে লাইটের কথা বলতে তিনি আকাশ থেকে পড়ে যান—বলেন কি মশাট! আপনি কি স্বপ্ন দেখছেন নাকি! ছাতে লাইট?

সরুজিতকে আবার খানিকটা আশ্চর্যভাব নিয়ে কিরে আসতে হয়, মনে খানিকটা নিজেই সামান্য তৈরী করে নিয়ে চূপ করে যায়। তবু ভাল, মেমের মেছোহাটার চেয়ে অনেক শুণে ভাল। তারপর বাস্তব বিদ্যায় এনে সেই ঘরে কায়েমী করে নেয় সেইদিনই প্রথম।

বাড়ীর ঘরে মোমবাতির কম্পমান হলদে আলোর সামনে সরুজিত বসে তন্ময় হয়ে একটা গভীর মনস্তত্ত্বমূলক গল্প লিখতে। রাত্রি গভীর। সেদিন আকাশে ঠান্ডা ছিল, ঠান্ডার রহস্যময় আলো এসে ছাত্তের ওপর পড়ে ঘরে দিকটোছে। সেদিন বাতাসে একটা সাদা হুঁস্‌হুঁস্‌ শব্দ মাঝে মাঝে নিশ্চলতাকে আলতোভাবে গলা টিপে ধরেছে। কোথাও কোন মানুষের সাড়া নেই, সব ঘুমিয়ে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে বড় বানো খেঁচ পাড়া ষাওয়ার প্রচণ্ড শব্দ এসে কানের পর্দাকে জালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তবু সে মাঝে মাঝে, তারপর আবার শূন্যতা, আবার শূন্যতা, আর আসছে পাশের বাড়ীর বারান্দার অজস্র ফুলের গাছ থেকে কি যেন মিষ্টি গন্ধ। হঠাৎ সরুজিতের কলম খেঁচে যায়। কে যেন কানের কাছে চূড়ির নিকর তুলে সরে গেল। প্রথম মনের ভুল ভেবে সরুজিত আবার লেখায় মন দিল। কিন্তু আবার....!

আগন্তে আগন্তে সরুজিত কলমটা রেখে দিয়ে বাঁধের বেড়িয়ে আসে। বাইরে চওড়া নেড়া ছাত কোন পাঁচিল নেই, ঠান্ডার আলো এসে পড়েছে। পশাপাশি আরও কয়েকটা বাড়ীর ছাতের দিকেও সরুজিত তাকায়, যদি কিছু দেখতে পায় এই আশায়। যদি কোনও মেয়েদের কাপড়ের আঁচল কিংবা চুলের অংশ। নতুন এ বাড়িতে আসা। এ বাড়ী বা এ পাড়ার সে কিছুই জানে না। হঠাৎ মনের মধ্যে ধক্‌ ধক্‌ করে একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে। তবে কি সে যে ঘর ভাড়া করেছে সে ঘরের কোন দোষ আছে? কোন মেয়ের আস্রা এই ঘরের চারিদিকে মুক্তির জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একা এই চলে কোঠায় নিশ্চল রাত্রে সরুজিতের দেহের লোমকূপ-গুলো তীব্র হয়ে ওঠে।

ও ঘরে চলে এসে মোমবাতির আলোর সামনে বসে ভাবতে থাকে, এমন শঙ্কার ভাব নিয়ে একা এই তিনতলার ছাদের ঘরে কি রাত্রি কাটান যায়! অথচ এই নির্জন ঘরে একা থাকবে বলে সে ভাড়া নিয়েছে। এখন কিন্তু যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাস কষ্ট হয়ে ইাকিয়ে মরবার যোগাড়।

ক্রমাগত চূড়ির মুহূর্ত ঝঙ্কার কানের মধ্যে কেমন যেন রাত্রিটাকে সরুজিতের কাছে

ভয়াবহ করে তুলতে থাকে। সে বাতটা কোনরকমে বহুশ্রমস্বত্বের আবরণ উন্মোচন করতে না পেয়ে নিরুদ্বেগে কাটাতে পারলো না। পরদিন বাড়ীওয়ালাকে গিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করে ঘরটার সম্বন্ধে।—কান উপস্থব হয় কিনা?

শুন বাড়ীওয়াল। রাঘববাবু আকাশ থেকে পড়লেন, বলেন কি, এমন অপবাদ কেউ যে দয়নি মশাই।

—কিন্তু শব্দটা তাহলে কিমের?

বাড়ীওয়াল। রাঘববাবু মৃত হসে বলেন, ও বোধহয় আপনার বয়সের দা।। বিয়ে যা করেননি সেই ছন্দে বোধহয়...

সর্বজিভের রাগ বের যায়। লোকটা আচ্ছাই তো, বসিকতা করবার আর সময় পেল না। কিন্তু মুখে স কিছু বলল না। নিশ্চিত হয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে এল। শব্দটা তাহলে—সে কাখা থেকে?

স্বতন্ত্র নিন রাত্রি থেকে বশ কয়েকদিনের রাত্রি কালেশ্বরের পাতা থেকে গত হ'ল। কিন্তু কিছুই চুড়ির মূহ বন্ধারের বহু উদ্ধার করতে পারেনা সর্বজিভ। দিনের বেলা লোকজনের গুণগোলে কোন শব্দ শোনা যায় না। এমন কি রাত্রি-বেলাতেও ঘটকণ লোকজনেরা ভেগে থাকে, সর্বজিভ লক্ষ্য বত্রে কোন শব্দ নেই। কিন্তু একটু নিশ্চয় হলই কেমন যেন শব্দ না কানের কাছে এসে নিকণ তোলে। কিন্তু কোন অন্তত্বের আবির্ভাব নেই। শুধু অদৃশ্য নিকণের মূহ চাপা শব্দ অন্ধকারে শুয়ে শুয়েও সর্বজিভ অমুভব করে তার অতি কাছে, একেবারে বুকের কাছ পোবর কে যেন নিঃশব্দ পদসঙ্কাবে এসে হাতের চুড়ির শব্দ দিয়ে তার আগমন বার্তা জানাচ্ছে। যেন শুয়ে শুয়ে বকে কিসের ঠাণ্ডা স্পর্শ লাগে, গলায় মুখে চোখে ঘাম জমে রামকুণ খাড়া হয়ে ওঠে। অজানা ভয়ে সর্বজিভের ঘুমই হয় না। কেবল মনে হয়, কে যেন অন্ধকারে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বিভাসিকাময়ী কোন অশরীরী। লোলুপ তার চাউনি, কুটিল তার মন কিংবা সন্দেহ কোন মায়াবিনীর বিবর্ণ চোঁটের চটুল হাসি।

সর্বজিভ অন্ধকারে ঘরের মধ্যে শুয়ে কেমন মোহগ্রস্থ হয়ে উঠল। বয়স তার বেশী নয়, এখনও যৌবনের বক্ত্র সমনীতে, মেয়েদের আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা দেহের পরশে পরশে। বিশেষ করে সে লেপক; নারী পুরুষের জীবন নিয়েই তার কারবার। কিন্তু কে এ? এই প্রশ্নটাই বার বার তার কণ্ঠে অমুকারিত্র হয়ে মনের মধ্যে প্রতিধ্বনি দিয়ে ফিরে আসত। এ বহুশ্রমলোকে এই অদৃশ্য নারী বন্ধার ভূপে নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে তার কাছ থেকে কি চায়?

কে এই অদৃশ্য নারী?

মশার পক্ষম লয়ের স্তবের সঙ্গীতের ভঙ্গিমা কানের কাছে স্তব স্থপ্তি করে চলেছে। বাইরে মাঝে মাঝে কোথা থেকে ঝিঁ ঝিঁ পোকায় ডেকে নিশ্চকতা

টুকরো টুকরো করছে। নীচের দোতলার বাসিন্দারা এখন সব ঘুমে অচেতন। আর ঘুমে অচেতন না থলেও নীচের কান ঘরের কোন শব্দই ওপরে এঠি চিলের ছাত্তের ঘরে আসে না। তবে পাশে নয় একটু দূরে একটা চারতলা বাড়ীর সর্ব উপর তলার একটা ঘর থেকে কিছুটা স্বপ্নাত মন্থ জ্বালোর ছাতি চোখে পড়ে। নতুন ঘরে আসার পর থেকে রাতগুলো যেন আর সর্দিজ্বরের কাটিতে চায় না। নয় নয় একটা অজানা রহস্যের আশঙ্কায়! একটা বিভ্রাস্তিময় আশঙ্কে কেন যেন তার লেখার সব খেই লগুভু হয়ে যায়, লেখা নিয়ে মনেও লেখা হয় না। কেবলই মনে ভাগে চুড়ি শব্দ। কে যে পিছনে এসে কাপড় পদপদ শব্দ জাগিয়ে চুড়ি বা ভরে তার অস্থির জানায়, সর্দিজ্বরের কনক বনে যায়, শূণ্য দৃষ্টিতে শূণ্যমার্গে চেয়ে থাকে তখন এইরকম পরিস্থিতি

ঠান একদিন চল্লিশ পদে সর্দিজ্বরের মধ্যে দেখা, লালবাড়ারের স্পেশাল পুলিশ ডাক্তার গোয়েন্দা বন্দার বন্দানী তার আসে। তাকে একটা বেষ্টিবেটে ঘরে নিয়ে গিয়ে বাপারটা সব আলোপাশ বলল সর্দিজ্ব। পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগে বন্দানী বহাণের খণ্ডে না। চল গোয়েন্দা হিসাবে। সে কথা সর্দিজ্ব জানত — ভাট, বাপারটা আমি কিছুমাত্র বুঝতে পারছি না অথচ নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। লেখার ক্ষেত্রে মজন ঘর বাড়ি নিলাম সেই লেখাই আমার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

পুলিশ বিভাগের লো। একটু গাঙ্গাষ এনে মুখে একটু চিন্তা করে। তারপর বলে, কাল ছুটি আছে। কাল রাতে তোমার ঘরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ নিলাম। বাপারটা নিজের চোখে শুকানে শুভে হবে। তারপর যা কিছু একটা ব্যবস্থা করা যাবে। সর্দিজ্ব উৎসাহিত হয়ে বলে, কিছু অনুমান করতে পারছ?

বিমান বিহারী হেসে বলে, কিউরাসটি ক্রিয়েট কর না। আমার অহেতুক মানসিক আতঙ্ক দোকান মাল্লার চক্রান্ত! কিংবা। এই বলে বিমানবিহারী হাসল, বলে, তোমরা ভুল প্রতের কথা বলবে তবে শুটী আর আমি বলব না, কারণ আমি শুটী বিশ্বাস করি না।

এই বলে সোদন বিমানবিহারী বিদায় নিল। বাসার ঠিকানাটা নোট বইতে টুকে নিয়ে এলে। কাল রাত্রি দশটা নাগাদ যাওয়া দাওয়া করে তোমার বাসায় পৌঁছাল। সর্দিজ্ব একটু কুস্তি হ'য় বলে, আমার ঘরে রান্নার জ্বারেরমেন্ট থাকলে তোমায় খেতে বললাম, কিন্তু... বিমানবিহারী হেসে বললে, থাক থাক আর সৌজন্য প্রকাশ করো হবে না। বিয়ে থা করে এটা একদিন পূরণ করে দিও।

পরদিন রাাত্র দশটার সময়ই বিমান এসে উপস্থিত। হাটো একটা তিন ব্যাটারীর টর্ক, বিভলবার ও একটা লাইটিং কামেরা। দেখে সর্দিজ্বিতাবাস্তব হয়ে বিমানবিহারীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এঁকি, তুমি যে দেখছি একেবারে তৈরী হয়েই এসেছ। বিমান হেসে বলল, বলা ত যায় না। আমাদের কাছে বেকলে সর্বদা তৈরী হয়েই

বেকতে হয়। এই বলে আস্তে আস্তে সব জিনিসপত্রগুলো এক জায়গায় রেখে মেঝেতে বসে বিমান।

তারপর এ কথা সে কথা রাজনীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত, দেশবিদেশ, পুলিশ অফিসের গল্প করতে করতে বাতের গভীরতা নেমে এল। বিমানের নিদ্দেশে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিলে ওরা একসময় নিঃশব্দ বিছানায় নিখাস বন্ধ করে শুয়ে থাকে। ঘরের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার, দরজাটা বন্ধ। কোন জানালা নেই ঘরে। নিশ্চয়ই কখনো গভীর রাত্রি। ছ'জনে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যদি শুনে পায় কারও অস্তিত্ব, চুড়ির নিকন কিংবা কাপড়ের বসণসানি। বিমান শুয়ে হালের মুঠিতে টর্চটা ধরে আছে, মনে তার দক্ষিণ উত্তেজনা। সর্বজিতও অপেক্ষা করছে প্রতিদ্বন্দ্বের মত সেই চুড়ির শব্দ শোনবার জন্য।

ওদের অবস্থা বর্ণনাতীত। এখুনি যদি কোন আবেশালা, হঠাৎ অন্ধকারে লাফিয়ে ওঠে তাহলে ছ'জনে হয়ত উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠবে।

এমন একটা পরিস্থিতি, মনে হচ্ছে যেন অন্ধকারটা লকলিকে তার ছ'বাহু নিয়ে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ চুড়ির মুহূর্ত। সর্বজিত চাপাস্বরে বলল, ঐ। আবার শব্দ। এবার যেন মনে হল খুব কাছে; একেবারে পাশে যেন কে চুড়ি দোলাচ্ছে। সর্বজিত আবার চাপাস্বরে বলল, শুনে পাইছ? বিমান হাত চেপে ধরল—চুপ। আর শব্দ নেই, আবার সব নিশ্চল।

তারপর অনেকক্ষণ কেটে গেল, কোন সাড়াশব্দ নেই। সর্বজিতের ঘরে অগভীর নীরবতা। সর্বজিত ভাবে বিমান হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই ও একটু ঠেলা দেয়, ঘুমুলে বিমান? বিমানের সাড়া পাওয়া গেল। গভীর স্বরে বলল, না।

তাবছ কিছু—না শুনি আর কোন শব্দ পাওয়া যায় কি না।

সর্বজিত জিজ্ঞাসা করে, কিছু বুঝতে পারছ? হঠাৎ একটা পায়ে চল ছপদাপ শব্দ শুনে পায় গেল। ওরা কথা বন্ধ করল। শব্দটা মনে হল খুব কাছে। কে যেন পা মাড়িয়ে মাড়িয়ে খুব কাছ দিয়ে চলে গেল।

সর্বজিত চাপা স্বরে বলল, একবার উঠে টর্চটা নিয়ে দেখব? বিমান একটু চুপ করে থেকে তারপর বলল, না কোন দরকার নেই ঘুমিয়ে পড়। কাল সকালে একবার বাড়ীওয়ালার সঙ্গে দেখা করে তারপর এল আসল রহস্যটা।

সর্বজিত একটু বিস্মিত হ'ল কিন্তু বন্ধুবরকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না। শুধু ভাবতে থাকে সে রহস্যটা কি, যে রহস্যটার সমাধান বিমান এক সহজে করল। এমন কি সে রাতে তার ঘুমই এল না। মনে তো কয়েকদিন ধরে একটা শব্দের ভাব ছিলই তারপর বিমানের হঠাৎ রহস্যভেদের ব্যাপার। কৌতূহলটা গলার কণা পর্যন্ত নিয়ে উঠে গেছে সারারাত কাটাল। তারপর সকালবেলা বাড়ীওয়ালার গাধাবাবুর কাছে বিমানকে নিয়ে গেল সে।

রাঘববাবুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিমান জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? আপনার এ বাড়ীর ভিত্তি কি আশেপাশের অ্যান্ড বাড়ীর সঙ্গে এক?

কেন বলুন তা?

—না বলুন না। তাহলে একটা রহস্যের সমাধান হয়ে যায়।

রাঘববাবু বলেন, হ্যাঁ, এ বাড়ীর সঙ্গে পাশের চারটে বাড়ীর ভিত্তি এক একটা বাড়ী একদিন একজনের ছিল কিনা?

বিমান এবার সর্দজিতের দিকে ফিরে বলে—তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? চারটে বাড়ীর ভিত্তি এক থাকার জন্তে এই একম শব্দ শোনা যায়। যিনিও বেলা শুনে পাননা, দিনের বেলা গোলমাল শব্দটাকে ঢেকে রাখে। রাত্ৰিতে নিশ্চয়ই হলে সে শব্দটা প্রতিধ্বনি করে যায়। আর চুড়ির শব্দ শোনা যায় বেশী কারণ মেয়েদের হাতগুলো সর্বদাই নড়ে। আর তাছাড়া তোমার মনে চুড়ির শব্দটা এই বেশী করে গঁথে পিয়েছিল বলে সেইজন্তে অন্য কোন শব্দ কানের মধ্যে যেত না। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে অন্য শব্দও শুনে পেতে। এই বলে বিমান একটু হেসে বলে, আর একটা কারণ ভূমি পদার্থ সাহিত্য রচনা করতে করতে মেয়েদের কথা ভাবতে সেই জন্তে চুড়ির শব্দটা এই তোমার মনে কেটে বসেছে বেশী করে।

সর্দজিৎ হেসে বললে, ধন্যবাদ বন্ধু, তোমার গোয়েন্দাভাবন শক্তি দার্বক হোক। এবার আমার কাছে সব পারকার হয়ে গেছে।

*

*

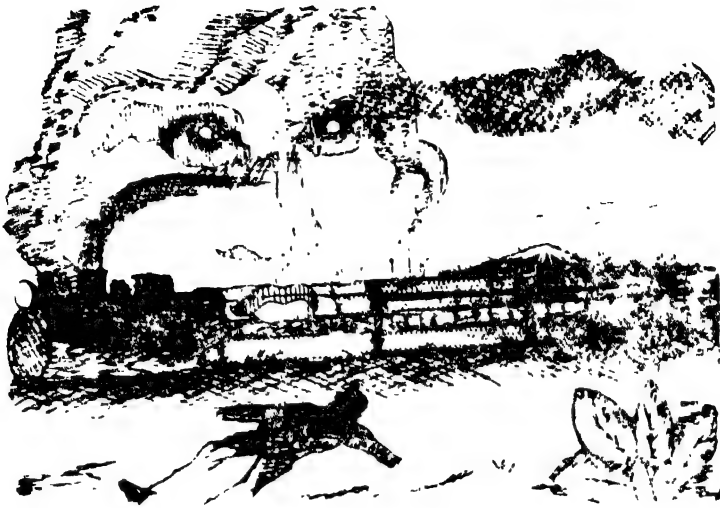
*

॥ অমরেন্দ্র দাস ॥ জন্ম ১৯১০ সালে কলকাতায়। আবাল্য চক্ষিণ পরগণার হরিনাতি গ্রামে বদ্ধিত মানুষ অমরেন্দ্র দাস মশাই ১৯৫৭ সাল হতে আজ পর্যন্ত প্রায় অর্ধ শতাব্দিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। গান লিখে সাহিত্যের ভগতে অল্পপ্রবেশ ঘটলেও গোয়েন্দা, হাসি ও রহস্য ছাড়াও যে লেখাতে তাঁর প্রতিষ্ঠা তা হচ্ছে ইতিহাস আশ্রিত কাহিনী। তাঁর জেবুয়েসা, বেগম বিজিয়া, নর্ডকী নিকী, শ্রীমতী সংবাদ, ক্রীতলাসী, জুপুরছন্দ ইত্যাদি গ্রন্থ সমধিক খ্যাত।

*

*

*



খুনী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ক্রমাগত মোটরের শব্দে অধৈর্য হন। রাত দেড়টার সময়, এই হাড়জমানো শীতে, কবলের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে একটা বিশী গাল উচ্চারণ করলে হাজারী।

প্রাইভেট গাড়ি। কিংবা লরীর স্বচ্ছন্দ বিচরণের পথ এ নয়। যুদ্ধের আনলে মিলিটারী যা খোয়া ছাড়িয়েছিল, কিন্তু সে খোয়ার পথ নিতে গেলে এখন ভূতাত্ত্বিক গবেষণা করতে হয়। এখন পায়ের পাতা ডোবানো লাল ধূলা আর গোকুর গাড়ীর দ্বারা এলোমেলো পথ। কয়েকটা আদিবাসীদের টুকরো টুকরো গ্রাম, কিন্তু শাল-পলাশের বন, ছোট ছোট ছাঁতিনটি পাহাড়, তারই ভেতর দিয়ে পথটা দামোদরের বালুচরে গিয়ে মুখ খুঁবে পড়েছে।

ঘরের ভেতরে গনগনে তাওয়া জালিয়ে তাই নিশ্চিন্তে কবলের তলায় ডুব দিয়েছিল লেভেল ক্রসিঙের প্রতিহারী হাজারী। আন্ডাল চারটের সময় মেল ট্রেন পাস করবে, স্টেট বন্ধ করে নির্ভাবনায় শুয়ে পড়েছিল সে।

এমন সময় মোটরের হর্ণ তাকে ঘুম থেকে জাগাল। ঘূঁটের ধোঁয়ায় জমাট হয়ে আসছে ছোট ঘরটা। চোখ জালা করে উঠলো হাজারী। কিন্তু হর্ণের তাড়ার চোখটা মুছে নেবার সময় পর্যন্ত পেলনা। দরজা খুলতেই তাঁর হিম হাওয়া এলে

পড়ল গায়ে, বান দুটো কনক করে উঠল। কবলটাকে ভালো করে মাথায় গলায় জড়িয়ে ছ'পা এগোতেই একরাশ বাতাস গালাগাল তাকে অভিযান করল।

—উল্লুক, বাস্কেল, ইডিয়ট। মরে ছিল নাকি ?

একটি ল্যাণ্ডরোভার গাড়ী গেটের পেছনে দাঁড়িয়ে; তার প্রকাণ্ড আলোটা সার্চলাইটের মতো জ্বলছে। গায়ে শুভারকোট চড়ানো তিনটি মানুষ। একজনের হাতে চুকট।

চুকটওয়ালা আবার কটুগলায় ধমক দিয়ে উঠল : এমন করে ডিউটি করো তুমি ? দিপাট করব তোমার নামে। সন্ধ্যা হতেই চোখ বন্ধ করে তুমি নাক ডাকাচ্ছ আর আধ ঘটা ধরে আমরা সমানে হর্ণ বাজাচ্ছি।

নির্বিকার মুখে চাঁদ খুলছিল হাজারী, এবার ফিরে তাকালো এদের দিকে। হয়তো বলতে যাচ্ছিল, রাত দেড়টাকে সন্ধ্যা বলে না। উত্তরটা তার আর দেওয়া হ'ল না, চুকট হাতে মানুষটির ওপর চোখ পড়তেই ঠাণ্ডা হাত পা আরো ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার।

—সলাম হজুর।

—সলাম হজুর?—চুকটধারী মুখ বিকৃত করল—সলামটা ছিল কোথায় এতক্ষণ ? ট্রেনের সঙ্গে ধোঁজ নেই—দিব্যা গেট বন্ধ করে রেখে স্থব নিদ্রায় শুয়ে পড়েছে। পাবলকের সঙ্গে বুঝি এই রকম ব্যবহারই করা তোমরা ?

পাথুরে ঠাণ্ডায় এমনিতে হাত-পা কাঁপাছিল, ঠক্কানি শুরু হল এবার, হাত ছোঁড় করল হাজারী।

কমর মাপ করুন মালিক। এদিকের দেহাতী লোক এত রাতে কেউ তো গাড়ী নিয়ে বেরোয় না, তাই—

—তাই যা খুঁশি করবে ? ভেবেছ ইংরেজের আমল আছে এখনো ? মনে রেখো জমানা বদলে গেছে। এখন চাকরি রাখা নয়—দশকে দেবা করাই তোমাদের কাজ।

আর একজন সিগারেট ধরালেন। করাপশন্, চ্যাটার্জি, করাপশন্। টপ্, টু বটম্।

চ্যাটার্জী এবার কথা বললেন না, কন্ঠ মুখ করে নাক দিয়ে ঘাড়ার মতো আওয়াজ তুললেন একটা। তা থেকে বোঝা গেল, তিনি শুধু এ বাপায়ে যে একমত তাই নন, এর চাইতে উগ্র মতামত প্রাণণ করে থাকেন।

—কিছু হবে না দেশের। আমরা মিথোই খেটে মরছি।—চুকটের মুখ থেকে একরাশ মোটা ছাই ঝরিয়ে দিয়ে চ্যাটার্জী বললেন,—নাও হে, এবার গঠো গাড়ীতে। যা শাত—প্রায় জমিয়ে দিলে !

তৃতীয় লোকটি চুপচাপ ছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ চমকে নড়ে উঠলেন,—আঁ।

দাঁড়িয়েই দাঁড়িয়েই ঘুমুচ্ছিলেন নাকি মিটার মাইতি ? হাউ ফানি !—চ্যাটার্জী

এবং তাঁর মজিটি শব্দ করে হেসে উঠলেন।

চাটাজির মোটা ভাড়া গলার সঙ্গে তাঁর মক্কা গলার আওয়াজ মিলল, কেমন জাঁতকে উঠল হাজারী। আর জাঁতকে উঠল একটু দূরের আকাশ খোপের ভেতরে বসে থাকা একটা শেয়াল—খাঁক্ করে একটা লাফ দিয়ে প্রায় কড় নিঃশ্বাসে ছুটে পালালো সেটা।

—ওঠো হে ঘোষ, উঠে পড়ো—চাটাজি ভাড়া দিলেন, ঠাণ্ডায় নাক কান ছিঁড়ে গেল যে।

ঘোষের কিন্তু পাড়ীতে ওঠবার লক্ষণ দেখা গেল না, কেমন উমখুস করতে লাগলেন। আর তেমনি নিঃস্বাস মেঝে দাঁড়িয়ে বইলেন মিটার মাইতি—খুব সম্ভব আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন।

শীতল অঙ্কুর আকাশের বুক চিরে বিহ্বল শিখার মতো উদ্ভা খরল একটা। সেদিক থেকে চোপ ফিরিয়ে ঘোষ বললেন, এখনো পনেরো মাইল পেরুলে তবে ডাক বাংলো। কী যে বোগাস্, এরিয়া—যেন পাণ্ডব-বজ্রিত দেশ। সত্যি বলছি, স্টিয়ারিং ধরতে আর ইচ্ছে করছে না—হাত অমোড় হয়ে গেছে! একটু যদি গরম হওয়া যেত—

গেট খুলে দিয়ে হাজারী অপেক্ষা করে আছে। শীতের হাওয়ায় তারও মুখচোখ কালিয়ে যাচ্ছে। আপদগুলো চলে গেলেই বাঁচে—কতক্ষণ আর এই ঠাণ্ডায় এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়! কিন্তু সে কথা বলা তো দূরে থাক, হাজারী ভাবতেও সাহস পেল না! চাটাজির মহিমা সে জানে—জানে তিনি কে এবং কী! তাঁর কলমের একটি খোঁচাতেই তাঁর চাকরি পতন হয়ে যেতে পারে।

চাটাজি বললেন, এখানে গরম হবে কোথায়? কাছাকাছি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল আছে তেবেছো নাকি?

মিটার মাইতি আবার ঘুম থেকে জাগলেন। শেষ কথাটা বোঝায় তাঁর কানে গিয়েছিল। —চলুন না, পয়েন্টস্-ম্যানের এই ঘরটা তো রয়েছে। বদা থাক্ একটু ওখানেই।

সত্যের হাজারী একবার নাড় উঠল। কথাটা ঠিক শুনেছে কিনা বুঝতে পারল না।

—ওই ঘরে? সে কি হে!—চাটাজি বিস্মিত হলেন।

ঘোষ যেন লুকে নিলেন কথাটা।

—তা আইডিয়ারটা মন্দ কা। ম্যাস্ কন্টাক্ট আমাদের কাজের একটা বড় অঙ্গ! আর এ ও ম্যাসের একজন। না ইয় একটু কন্টাক্ট এর সঙ্গে করা থাক। সত্যি বলছি এই শীতের মধ্যে পনেরো মাইল কেন, এক মাইল যাওয়ার কথা ভাবতেও আমাদের কংকল্প হচ্ছে।

মিটার মাইতির মুখ দিয়ে বব্ব বব্ব করে একটা চাপা আওয়াজ হচ্ছিল, আবার

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন খুব সম্ভব। কিন্তু ঠিক স্ট্রাটজিক পয়েন্টে ওঁর ঘুম ভাঙে। জেগে উঠে বললেন, চলুন না—একটু বসাই যাক শর ঘরে। ডাকবাংলোতে গিয়েও জায়গা পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই। কয়েকজন ভি আই পি আসবার কথা আছে শুনেছি। তার চাইতে এখানে একটু বসে গেলে—

—মেজরিটি মাস্ট বি গ্র্যাণ্টেড। চ্যাঁজি দাক্ষিণেয় হাঙ্গি হাঙ্গলেন। তারপর ডাকলেন, ওহে, কী নাম তোমার? এসো এদিকে।

সম্ভাষণ হাজারীর উদ্দেশ্যে।

শীতে আর আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় মুমূর্ষ হাজারী সামনে এসে দাঁড়ালো। দুর্বল গলায় বললে, সেলাম হুজুর।

—সেলাম ইতিপূর্বেই তুমি কবেছ, তক্তিতে আর প্রয়োজন নেই—চ্যাটাঞ্জি গণ-সংযোগের অন্তে বক্তৃতা করে থাকেন, তাই সাধুভাষা ব্যবহার করলেন। তারপর বললেন, কী নাম তোমার?

—তজ্জ, হাততালি মিং।

—বাড়ি কোথায়?

—জী, ছাপ্‌রা জিলা।

ছাপ্‌রা জিলা?—ঘোব কাড়ন কাটলেন : তবে আর তোমার ভাবনা কি হে? দিল্লী তো তোমার হাতের মুঠোয়। ইচ্ছে করলে—একুনি আম্বালাডর। তুমি কেন ভায়েগা ভাজছ এখানে বসে।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কেমন বেয়্যাড়া ধরনের হেসে উঠলেন মিস্টার মাইতি—ব্যাঙের সাপ গেলার মত কাঁক কাঁক করে আওয়াজ হ'ল।

চ্যাটাঞ্জি মুহু হেসে বললেন, ওয়েল সেড্।

কিন্তু এমন উচু ধরনের বসিকতাতা মাঠেই নারা গেল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল হাজারী, এক বর্ণও বুঝতে পারল না।

—শুনেছ—সদস্যভাবে এবার চ্যাটাঞ্জি বললেন, তোমার ঘরে একটু বসব আমরা? হাজারী বার কয়েক ঝাঝি খেলো কেবল।

—জী, গরীবের ঘর, দাঁড়ি গাটিয়া—

এক মুখ চুপুটের বোয়া ছুড়িয়ে চ্যাটাঞ্জি আরো উদার হয়ে উঠলেন।

—সারা ভারতবর্ষই গরীবের দেশ, বুঝেছ হাজারী?—চ্যাটাঞ্জির হৃদয়ে গণ-সংযোগের প্রেরণা এসে গেল : সেই কোটি কোটি গরীবই হচ্ছে দেশের শক্তি, তার প্রাণ, তার আত্মা। সেই আত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করাই আমাদের কর্তব্য—আমাদের মিশন—অর্থাৎ ব্রত। চলো আজ আমরা তোমারই অতিথি।

মাইতির কেমন আশা হচ্ছিল চ্যাটাঞ্জি এবার জড়িয়ে ধরবেন হাজারীকে কিন্তু ধরলেন না দেখে একটু নিরাশই হলেন মনে মনে। ঘোষের ইচ্ছে হ'ল, হাততালি

দিয়ে ওঠেন, নেহাৎ একলা হাততালি জমবে না বুঝেই থেমে গেলেন।

হাজারীর হাঁটু এবার শব্দ করেই কাঁপতে লাগল। —কিন্তু হুজুর—

—এসো এসো, তোমার কোনো ভয় নেই—হাজারীর বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই তার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন চাটাজি।

মাটির একটা বড় মালায় গনগন করছে আগুন। বাইরের তীব্র শীতল হাওয়ার মধ্যে থেকে এই ঘরে পা দিয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সবাই।

ঘোষ বললেন, নট ব্যাড! অবশ্য ধোঁয়াটা না থাকলে আরো ভালো হত।

আর মাইতি লোপুপ দৃষ্টিতে তাকালেন খাটিয়াটার দিকে। তেল চিট্‌চিটে বালিশ, ময়লা ধুয়ো কয়ল। ছারপোকাও নিশ্চয় আছে কয়েক লাখ। তবু মাইতিয় বালিনা হ'ল, সোজা বিছানাটাতেই লম্বা হয়ে পড়েন। চাটাজির পাশায় পড়ে সারাদিন এক ফোঁটা বিশ্রাম জোটেনি।

হুজুর এইটুকু তো ঘর। কোথায় যে আপনাদের বসতে দিই—

কথাটার ভেতর বিনয়ের আতিশয্য নেই এক বিদ্রুপ। ঘরটা হাত ছয়েক লম্বা, হাত চারেক চওড়া হবে বলে মনে হয়, সামান্য কিছু বেশি হতেও পারে। তেওরে হাজারীর খাটিয়া, একটা চৌপাই, কোম্পানীর গোটা দুই বাঁহ, ফাগ, উমুন, হাঁড়ি-কড়াই, দড়িতে ঝোলানো শোষাক, একটা মোটা লাঠি। টিনের বাস্কও আছে—তবে সেটা খাটিয়ার তলায়।

ঘুঁটের হাকা ধোঁয়ায় একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল তবু চাটাজি বললেন, আরে, এক কয়লে অনেক ক'কেরে জায়া হয়। ভালোই হ'ল, তোমার ঘর দেখে গেলাম। নাঃ স্পেস্ সতিই খুব কম। ফ্যামিলি নিয়ে তো থাকাই যায় না দেখছি। ওয়েল, আমি দিল্লীতে লেখালেখি করব এ নিয়ে।

চাটাজি খাটিয়ায় বসে পড়লেন, তাঁর দৃষ্টান্তে ঘোষ এবং মাইতিও আসন নিলেন। খাটিয়াটা খটখট করে উঠল—হাজারীর বরাত শুনেই ছিড়ে পড়ল না। হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল হাজারী সিং—বিছানার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘদ্বার চাপল একটা।

—দাঁড়িয়ে কেন হাজারী, বোসো।

—হুজুর আপনাদের সামনে—

—আরে বোসো, বোসো—চাটাজির মুখে অস্ত্রগ্রহের হাসি : বসে পড়ো। নাউ উই আর ফ্রেন্ডস্‌। এ-যুগে সবাই শয়ান।

অগত্যা বসতে হ'ল হাজারীকে। আধখোলা দরজায় পিঠ দিয়ে। পেছন থেকে কনকনে হাওয়া আসছে—কয়লটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়েও তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না।

—কত মাইনে পাও তুমি?—ঘোষের জিজ্ঞাসা।

হাজারী আনালে।

—এত কম?—ঘোষের চোপ বিক্ষিপ্ত হ'ল : চল কি করে ?

এর উত্তর নেই। বিনীত হাসতে চূপ করে রইল হাজারী।

চুপে নিভে পিয়েছিল, চ্যাটার্জি সেটাকে ধরালেন। তারপরে আশ্বে আশ্বে বললেন, রেলওয়েতে মাইনে সত্যিই বড় কম নিচ্ছে। আমি ভাবছি, এ নিয়ে মুত্ করব। বিশেষ করে দেশ খাদান হওয়ার পরে ওয়ার্কিং ক্লাসকে নেগলেট করবার আর কোন মানেই হয় না।

—একজাকটলি!—ঘোষ কথাটা লুকে নিলেন : এইগুলোই তো ব্রহ্মসাইডাল পলিসি। নইলে কি এসব খান-তা সেট ব্যাক হয় ইলেকশনে ?

চ্যাটার্জি গভীরভাবে চিন্তা করলেন খানিকক্ষণ।

—কিন্তু কি জানো ঘোষ, এদের লোভ খে-ভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে বতাই করো পেট ভরাতে পারবে না। অথচ, সত্যিই জ্ঞানো—এদের নীড় কতটা? ক্রী ফায়ারটার পাছে নেচারের ভয় কমেন হেল্দি স্থাপি লাইফ—

মাইতি এর মধ্যে হাটওয়ালে সৈমান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আচমকা ভেগে উঠে জড়ানো পলায় বললেন, সোদন কাগজে দেখছিলাম আসামে কোন এক লেভেল ক্রমিং থেকে গেটম্যানকে বাধে নিয়ে গেছে।

চ্যাটার্জি শুনে পেলেন না। কিংবা শুনেও কর্ণপাত করলেন না।

—যায় শাকসজ্জা—ফেকের টাটকা চাল—

—চালের মণ পয়ত্রিশ টাকা, আর আটা—বলতে বলতে আবার ঘুমিয়ে গেলেন মিঃ মাইতি। চ্যাটার্জি এবার তাঁর দিকে বিরক্ত দৃষ্টি ফেললেন একটা।

ঘোষ বললেন, ঘুমের ঘোরে কথা কইছেন।

—হঁ, তাই দেখছি।—কহুক্ষণ সন্ধিতভাবে সেদিকে তাকিয়ে থেকে চ্যাটার্জি এবার হাজারীর দিকে ফিরলেন।

—দেখ ক পাঠাও হাজারী ?

—জা দশ-পনেরো—

চ্যাটার্জির মুখে এবার আয়ের পরিতৃপ্তি দেখা দিল।

—দেন ইউ প ঘোষ, এই টাকাতে চালিয়েও দশ-পনেরো টাকা দেশে পাঠাতে পারছে—তার মানে, যা পায় তাতে প্রয়োজন মিটিয়েও ওর বাড়তি থাকছে। তা থেকে বোঝা যায়, এর বেশি নীড় ওর নেই। হোয়ার অ্যাঙ্ক একটা উচুনের গর্ভর্মেন্ট সার্ভেটকেও মাসের শেষের দিকে টানটানিতে পড়তে হয়—গাড়ীর তেল ঘাঁটিতে পড়ে।

—সবই স্ট্যাটাস্, আর স্ট্যাণ্ডার্ড অফ্, লিভিং—

নীতে আর ঘুমে হাজারীর শরীর কঁকড়ে আসছে। কতক্ষণে যাবে এরা তার ঘর থেকে? না হয় এর খাটরাতেই শুয়ে পড়ুক এরা—সেও মেরেতেই গোয়েন্দা (প্রথম)—১৬

খানিকটা পড়িয়ে নিক। এই রাত দুটোর সময়, এমন হিম ঠাণ্ডার ভেতরে কেন থামোখা বকবক করছে বসে ?

চাটাজি বলে চলেছেন, ইয়া—স্টাণ্ডার্ড অফ্‌ লি'ভিং। একটু খোঁজ করলে দেখবে, ইভন তোমার জেনারেল মানেজারের চাইতেও কত সুখী এরা। কী কন্টেন্ট-মেন্ট! আর সাধারণ মানুষের এই যে ঘোষ—ভারতবর্ষের আইডিয়াল হচ্ছে ঠিক এইটাই। আজ যারা এদের ফেপিংয়ে ভোগে তারা শুধু ইংরেজদের পোলিটিক্যাল অ্যাডভান্টাকেই ফুলফিল করতে চায়। যে অজাব এদের কোনোদানই নেই কৃত্রিমভাবে তাকেই সৃষ্টি করে তারা। আর—

ঘোষ মুখ ফিরিয়ে হাই উল্লেন সেই সঙ্গে ঈর্ষাতুর চোখে একবার তাকিয়ে দেখলেন মাই'তর দিকে। মাই'ত এবার সত্যি নিখর ঘুমে ভলিয়ে গেছেন। মুখটা একটু ফাঁক হয়ে আছে, ঘরঘর করে চাপা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে। ঘোষের মনে হ'ল, একটা চিমটি কেটে মাই'তিকে জাগিয়ে দেন হি'ন। দি'বি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছেন, অথচ চাটাজির যত বক্তৃতা সমানে শুনেতে হচ্ছে তাকেই।

চাটাজি বললেন, দেশ গড়তে হবে—সকলকে নিতে হবে কর্তব্যের ভার। আজ যারা লাভার, তারা একদিন কত সাক্ষিফাইস করেছেন। কিন্তু শুধু তাঁদের ত্যাগেই তো চলবে না। আজ দেশের সব মানুষকে ত্যাগ শিখতে হবে—শিখতে হবে কর্তব্য—

ঘোষ হঠাৎ উঃ করে উঠলেন। ভুরু কৌচকালেন চাটাজি।

—কী হল হে? ছারপোকা নাকি?

—না ভজুর, খটমল মই—নির্বাণ হাজারীর এতকণে জন্তু কৈকিয়ত একটা।

—খটমল ছাড়া তোমাদের খাটিয়া আর কলের জল ছাড়া কলকাতার গয়লার ছুব—তুই-ই আবসার্ড!—ঘোষ গজগজ করে উঠলেন। ঘোষকে সত্যিই ছারপোকা কামড়ায়নি—কিন্তু সরব স্বগতোক্তি'র ক্রটিটা এ-ভাবে ছাড়া ঢাকবার কোনো উপায় ছিল না।

চাটাজি থামবার পাত্র নন। আবার আরম্ভ করলেন, দুশো বছরের একটা পরাধান জাতিকে বাতাবাতি ঘুম থেকে জাগানো যায় না। প্রত্যেকে যদি ত্যাগ করতে পারে কর্তব্য যদি—

এবারেও শেষ করতে পারলেন না। লেভেল ক্রসিং-এর ঠিক পেছনেই সাতটা আটটা শেয়াল এক সঙ্গে ডেকে উঠল। পাঠাড়ের মাথার উপর দিয়ে শাল পলাশের বন কাঁপিয়ে হু হু করে ছুটে এল উত্তরের হাওয়া। ভেজানো দরজাটা খুলে গেল এক বটকায়—ঠাণ্ডা বাতাসের আপটান ঘুমন্ত মিটার মাই'তি শেষ পর্যন্ত চোখ মেলে ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

ঘোষ প্রায় আত্ননাশ করে উঠলেন।

—বাপসে, নর্স পোলে এসে পড়েছি নাকি ? কী যেন নাম তোমার—ওহে হাজারী
দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দাও না—

—না না, খোলা থাক খানিকটা। —চ্যাটার্জি কোটের কলারটা তুলে দিয়ে
বললেন, খোঁয়া দেখছ না ঘরে ? গ্যাস পয়জানিং হয়ে মরবে নাকি শেষে ?

—হঁ, তাও বটে !—একটু চুপ করে থেকে ঘোষ বললেন—আর তো পারা যায়
না। নিয়ে আসবো ব্যাগটা ?

চ্যাটার্জি একবার আড় চোখে তাকালেন হাজারীর দিকে। ঘুমে আর ঠাণ্ডায়
অদ্ভুত রকম কুণ্ডলা পাকিয়ে বসে আছে হাজারী। বললেন, আমিও সেই কথাই
বলতে বাচ্ছিলাম। তবে কিনা আনন্দের পাবলিক মান—আমাদের কর্তব্য হ'ল লোকের
কাছে সবসময় নিজেদের ডিগনিটি বাঁচিয়ে চলা। এই লোকটার সামনে—

ঘোষ মুখ বাকালেন ইংরাজীতে বললেন, এর জ্ঞান ভাবতে হবে না। এরা
আমাদের চাইতে এ-সবের মর্ম অনেক ভাল বোঝে। একেও একটু গরম করে দেওয়া
যাক—খুশিই হবে।

ঘোষ উঠে দাঁড়ালে হাজারীও দাঁড়িয়ে পড়ল। হায়, মিথো আশা ! ঘোষ
বেরিয়ে গেলেন, নির্বিকার ভাবে নেভা চুকটে আগুন দরালেন চ্যাটার্জি। মাইতি
ঘুমোতে লাগলেন এক মনে।

—দেশে-দেশে যাওনি হাজারী ?

—বাই হুজুর। দো-চার বরষমে এক দফে।

—চাষ-বাস আছে ?

এক মুহূর্তে হাজারীর মন দূরে চলে গেল। চাষ-বাস ছিল বই কি এক সময়।
বহুদৈর খেত ছিল, ছোট একটা ফলের বাগিচা ছিল, একটা তালগাছ ছিল। কিন্তু
সে-সব কোথায় গেল তার খবর জ্ঞানত তার বাপ, যে চোখে ভালো দেখতে না পায়
সাদা কাগজে টিপসহি দিয়েছিল, আর জানে জমিন্দার ত্রিজনন্দন চৌধুরীজি তার
বাড়িতে বহু তার তার আদমি পাটনা থেকে এসে খানাপিনা করে।

—চাষ এক সময় ছিল হুজুর। এখন নেই।

—হঁ চাকরির লোভে সে-সব বিসর্জন দিয়েছ ?—চ্যাটার্জীর মুখে ক্ষাতের চিহ্ন :
এই স্নেহ মেটালিটির জগুই আমাদের দশটা উচ্ছিন্ন গেল ! মাইটি যে সব চাইতে
খাটি জিনিস—তোমাদের কে বোঝাবে সে কথা ? আমরা কেবল বকেই মরি !

ঘোষ ছোট একটা ট্রাভেলিং ব্যাগ নিয়ে ফিরে এলেন।

—আগাব মাইতিকে ?

—কী হবে আগয়ে ? ওর চলে না।

ব্যাগ খুলে গোল-গ্লাস বার করতে করতে মুখভর্তি করলেন ঘোষ।

—এদিকে রাইট অ্যাণ্ড লেফট ঘুষ খাচ্ছে, আর একটুখানি এ সব ঠোঁটে

ছোঁয়ালেই কাব্যেস্তার নষ্ট হয়। হিপোক্রিট।

সোডা খোলবার আওয়াজে একটুখানি নড়ে উঠলেন মাইতি, মুখটা কপ করে বন্ধ হয়ে গেল। পাছে ঘুমের ঘোরে তাঁর খোলা মুখে খানিকটা ঢেলে দেওয়া হয়—সেই ভয়েই যেন সতর্ক হয়ে গেলেন আগের থেকে।

ছুটি গ্রাসের তরল সোনালী ওপর শাদা কেনা বকবক করে উঠল হীরের মতো। আর চক্চক করে উঠল হাজারীর চোখ। এই শীত, এই জড়তা আর ওই পঞ্চটা। তাকে ও চকিত করে তুলল।

চ্যাটার্জী লক্ষ্য করেছিলেন। একটা যুদ্ধ হাসি ফুটে উঠল ঠোটের কোণায়।

—এ চাঁদ মালুম হায় হাজারী?

মালুম আছে বইকি হাজারীর। নইলে তার মতো পরীব-পরবর এক আধটা দিন খুশি হবে কী করে। তবে মাতোয়াল না হাজারী। ন'মাসে ছ'মাসে এক-আধটা হাটের দিন সামান্য হাঁড়িয়া মেলে আ'নবাসীদের কাছ থেকে।

বিনীত হাসিতে হাজারী মাথা নিচু করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তার জলন্ত চোখ দুটো আবার উঠে এল সোনালীর উপর হীরের কেনা জমে ওঠা গ্রাসের দিকে! বড় আড়া পড়েছে আজ—বড় বেশি।

চ্যাটার্জী বললেন, বাবে হাজারী?

বুকের ভেতর ধক্ক করে উঠল হাজারীর। প্রাণপণে সামলাতে চাইল নিজেকে।

—না হজুর।

—আপত্তি কেন হে? বা শীত—একটু তাজা হয়ে নাও না। তব্ব নেই—আমরা তো রয়েছি।

—ডিউটি আছে হজুর। একটু পরেই মেল ট্রেন পাশ করাতে হবে—

—যে বকম কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়েছ, তাতে মেল ট্রেন পাশ করাতে পারবে বলে তো ভরসা হয় না। আরে, গিলে ফেলো এক চুমুক গা গরম হয়ে যাবে।—চ্যাটার্জির মুখে দেবদুল্লভ হাসি। স্নেহ, অল্পকম্প, বন্ধুত্ব—কী নেই সেই হাসিতে?

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্ষীণ গলায় হাজারী বললে, না হজুর, সরকারী কাজ—ঘোষ ইংরাজীতে বললেন, ইনসিষ্ট করছ কেন? না খায় বয়েই গেল।

গ্রাসে চুমুক দিয়ে চ্যাটার্জি জবাব দিলেন ইংরেজীতেই: উইটনেস রাখতে চাই না—পার্টি করে ফেলতে চাই—বুঝতে পারছনা? আমাদের পঞ্জিশনের কথাটাও ভেবে দেখো।

—ডাটস রাইট!

চ্যাটার্জির মুখে বড় বদলেছে এর মধ্যেই। মেজাজ খুশি হয়ে উঠেছে আরো! এখন তিনি ধীরে জনপণের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছেন।

—ওই পেভলের গ্রাসটা বুঝি তোমার? ধরো—

—হুজুর—

—আমি বলছি তোমাকে—হাজারী আর একটু কাছে থাকলে চ্যাটার্জি হাত বাড়িয়ে বোধহয় তার গলা জড়িয়েই ধরতেন : আরে, আতি অমানা বদল হো পন্ন। আমরা সব ভাট ভাই। তোমো গেলাস—

এবার শেষ বাধাটাও উপড়ে গেল হাজারীর। আর মনে পড়ল, চ্যাটার্জি বলে ছিলেন ডিউটি নেহি করতা—সামুসে গেট বন্ধ করে নিদ লাগাও—তোমার নকরি আমি—। না—হুজুম মানতেই হবে।

কাঁপা হাতে গ্লাস তুলে বললে, হুজুর—বহুৎ খোড়া

ঘোষ ইংরেজিতে বললেন, ব ? রিয়্যাল স্বচ—ওলড স্মাগলার...

জাটস অল রাইট ! ওরা ওস্তাদ লোক স্মারবোলিউট আলকোহলের এক গ্যালনেও দেব কিছু হয় না। ঢালো—

কিন্তু সাঁওতালী হাডিয়া আর রিয়্যাল স্বচের তফাৎ জানা ছিল না পরীষ হাজারীর। এক চুমুকে স-টাই শেষ করতে গিয়ে বুক পর্যন্ত আগুন ধরে গেল। তারপর মনে হল, এইবারে উঠে দাঁড়িয়ে তার চীৎকার করে একখানা গান গাওয়া দরকার, শুধু হুজুরেরা খুশি হবেন। তারপর—

কখন ঘুমন্তপ্রায় মাইতিকে চাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কখন খুশির ঝাঁক হাওয়ার মতো লাগুবোভার উড়িয়ে বেরিয়ে গেছে, খাষ তার কোন খবর হাজারী জানত না। হঠাৎ একটা বীভৎস বিকট আওয়াজে তার ঘোর কাটল, টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো সে।

মেল ট্রেন ঠিকই বেরিয়ে গেছে। গার্ডের গাড়ীর লাল আলো অনেক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে রক্তবিন্দুর মতো। শুধু লাইনের পাশে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে গোরুর গাড়ীটা—আহত বলদ দুটো গোড়াচ্ছে মৃত্যু যন্ত্রণায় আর তার ঘূমের স্তম্ভে খোলা গেট পেয়ে যে লোকটা গাড়ী নিয়ে লাইনে উঠে এসেছিল, সে লোকটা টুকরো টুকরো হয়ে প্রায় দশ বার গজ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে—শেষ রাতের ক্ষীণ চাঁদের আলোয় লাইন-স্পার হুড়ী বন্ধে স্নান করছে।

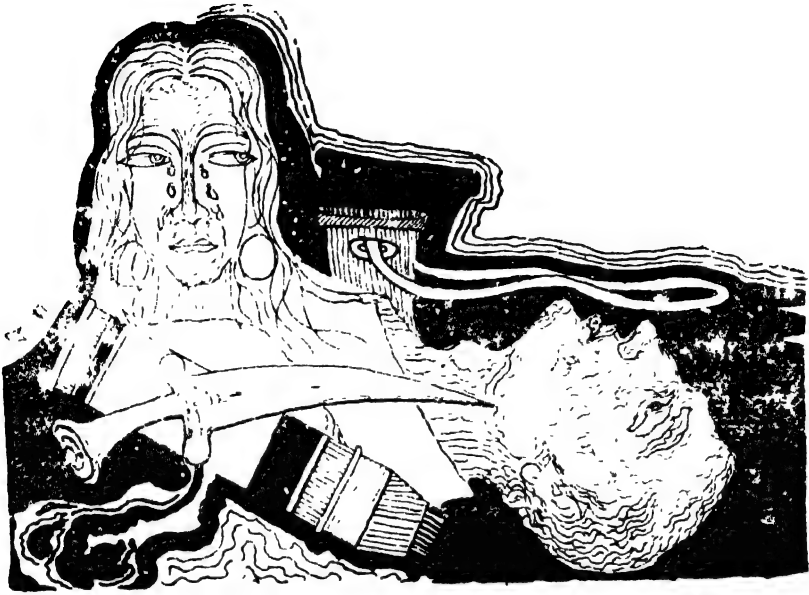
চাকরি ধাবেই—স ভাবনায় নন্দ। খুনী—বিহ্যৎ চমকের মতো কথাটা মনে পড়তেই হাজারী টলতে টলতে সেই রক্তমাংস ছড়ানো লাইনের উপরেই মুখ খুবছে পড়ে গেল।

মার্ভার কেস হিষ্টিটা পড়ে বিখ্যাত গোয়েন্দা জামল সেন তাবতে লাগলেন :
খুনে সব মৃত্যুর পরিণামই মৃত্যু। কিন্তু এ-ধরনের খুনীকে চিহ্নিত করা শক্ত। তবু
কর্তব্য তো করতেই হবে—অন্তত একটা তদন্ত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : জন্ম বরিশাল জেলায় ১৯১৮ সালে। কল্লোল উত্তর
মুগের লেখকগণের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন মিত্র ও সন্তোষকুমার ঘোষ
নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য নাম।

হুম্ম ঘটনা সংস্থাপন, পট্টীয় অভিনিবেশ ও বেগবান ভাষা প্রয়োগ নারায়ণ
গঙ্গোপাধ্যায়কে স্বল্প কালের মধ্যেই এক বিশিষ্ট আসন দান করে। নারায়ণবাবুর
ভাষার কারুকার্য ও নিপুণ প্রয়োগ সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁকে স্বাতন্ত্র্য ও
স্বকীয়তা দান করেছে। তাঁর লেখার বিষয় প্রায় অতীতের স্বাতি আচ্ছন্নতা;
ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা প্রবাহ লেখকের অনবদ্য ভাষায় মুগ্ধ হয়ে উঠেছে। সমকালীন
সাহিত্যে বুদ্ধির দাপ্তি, ভাষার প্রাক্কলতা ও বৈদগ্ধ্যের আভাস তাঁকে বিশিষ্টতা
দান করেছে। তাঁর লেখার বারেক্ত্বভূমির বিশেষত দিনাজপুরের ভৌগোলিক দৃশ্যপট
অনিবার্য ভাবেই উপস্থিত।

তবে নদীমাতৃক দক্ষিণের পলিসঞ্চিত উপনিবেশের চিত্রণমাধুর্য ও তাঁর অনেক
লেখার সমুপস্থিত লেখকের লালমাটি, শিলালিপি, উপনিবেশ ইত্যাদি গ্রন্থ সমধিক
পঠিত।



একটি সূত্র

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শুধু একটি পাতা, চায়ের পাতা। ছোট ভাঙ্গা কাঠির একটা টুকরো।

কিন্তু তার প্রতাপ অসীম। চাকনি থাকুক বা নাই থাকুক, কখন কোন ছিত্রশিল্পে চায়ের পেয়ালায় এসে পড়ে এবং ঘুরপাক পায়, তা বলা যায় না। চামচ দিয়ে চিনিটা স্টার করতে গেলেই যত গড়গোল। চামচের মাথাটা বাগিয়ে ধরে আত সন্তুর্ণণে তুলে ফেলার চেষ্টা করে দেখবেন বাপারটা কি রকম ঘোরালা হয়ে ওঠে। কখনও লিকারে ডুব দিয়ে ঘাপটি মবে শুয়ে থাকে। কখনও বা থি তয়ে গেলে, চাঁকতে দেখা দেয়। ভেসে বেড়ায় চোখের সামনে, কিন্তু ধরা দেয় না। তা হয়তো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু নিরীহ চেহারার ঐ ক্ষুদ্র শয়তানকে পাকড়াবার জন্তে যোথ চেপে যায় এবং যতক্ষণ না পলাতক ইঞ্জিনটিকে বাস্তবে ধরা যায়, ততক্ষণ স্বস্তি নেই।

তাই বলছিলুম—মাত্র একটি ভিজে অল্প কোলা পাতার টুকরো। কিন্তু ছনিয়ার দুর্ভাবনা ভয় করে তারই ওপর। কাঠির মতন চেহারা। চায়ে-ছুধে ডুবে আর ভেসে ভেসে রঙটা ফিকে হয়ে এসেছে। যেন ক্ষীণদেহ মানুষের বিবর্ণ আকৃতি। অনেকদিনের

পুরানো অস্থ এবং শেষ পর্যন্ত মারাত্মক। চারের পাতার মতো চোখের পাতা, একটু কোলা কোলা। অনেকটা যেন তার বাবার মুখ, ঈষৎ স্ফীত চোখের কোল। ভীত মন, সজাগ দৃষ্টি আর অসহিষ্ণু মেজাজ, ক্রমিক বোগীর যা হয়ে থাকে। টান-টান চেহারা, আঁচু শিরাগুলো চড়া তারে বাঁধা। মাহুখটি বা নাকানি-চোবানি খাইয়েছেন এবং এখনও খাওয়াচ্ছেন, শিবানী ভাবে।

কী প্রচণ্ড তার দায়িত্ব, এই অটল সমস্তার সমাধান। তিনি যারা গেছেন, কিন্তু যুত্বার জের মেটে ন। গত একমাস ধরে শিবানী কত ভেবেছে, বিশ্লেষণ করেছে। রাতে ঘুম সেই অর্ধেক দিন, কিন্তু হৃদয় মেলেনি। কোমরের আশেপাশে হারানো জিনিসের খানাচে কানাচে সে ঘুরে মরছে। কিন্তু জিনিসটি কদাচিৎ খুঁজে না। টুহুর বাড়ী থেকে ফেরবার পথে এই কথাই ভাবছিল শিবানী। ভেবে কুল পায় না। বাবা গেছেন তিন মাস হল। কিন্তু শেষ তিরিশ দিনের মধ্যে সে একবারও বাড়ী ছেড়ে বেরোয় ন। আজ নিতান্ত টুহুর উপরোধে পড়ে বাড়ীর বাইরে খোলা বাস্তায় জনতার মুখ দেখল।

সাদার্ম আভেনিউ দিয়ে হাঁটছিল শিবানী। কাস্তবর্ষ ভাত্রেব আকাশে। সূর্য অস্ত গেছে কিন্তু কি আশ্চর্য রঙ ঢেলে দিয়ে গেছে। সাদগাস্ত মেঘের পাড়, রাতে কে যেন প্যাস্টেল শেডগুলো পরতে-পরতে মাখিয়ে গেছে। শিবানী চোখ ফিরিয়ে নিল। চোখ জুড়িয়ে যায়, জড়িয়ে যায় ঘুরে আসেজ্ঞে ঝিরঝিরে ভিজে হাওয়ায়। কিন্তু মন জুড়ায় না! টুহু ঠিকই বলে 'ভাব-ভেবে মাথা খারাপ করিনি। কত হোমরা-চোমরা হিমসিম খেয়ে গেল তুই আর করবি কি? ধবে নে, তোর অহুমানটা ঠিক হ'ল। কিন্তু সেটা কি সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেবে কেউ? বলবে—প্রমাণ কি ও কোথায়? আর প্রমাণ তুই জোগাড় করবি কোথেকে—যেখানে সব চিহ্ন উধাও?'

শিবানী হো তাই খুঁজছে, এক মাস ধরে। পোস্ট-মটেম রিপোর্ট আসবার পর সে উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিল। এ কি করে হয়। তার বাবাকে হত্যা করল কে? শেষ পর্যন্ত শিবপদকেই পুলিশ সন্দেহ করেছে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে তাকে প্রথম কয়দিন নবরবন্দী রেখেছে। নানাতাবে সওয়াল করে স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি। এখন শিবপদ হাজতে। কবোনারের কোর্টে শুনানো শেষ হলে বার বেরিয়েছে—অজ্ঞাত আততায়ীর ছাবকায় মৃত ব্যক্তির জীবন নাশ, অখ্যাৎ মরাসরি খুন! এখন দায়বায় সোপাঁদ শিবপদ বিচারাবান। আদালতে মামলার কয়েকটা তারিখও হয়ে গেছে। দু-একদিন শিবানীকে যেতে হয়েছে, তার অবানবন্দী দিতে। তবে সওয়ালে তাকে বিশেষ বেগ দেওয়া হয়নি।

শিবানী বতদূর জানে, শিবপদ খুঁদ নয়। ধীরেস্থে আঁটআট বেঁধে মাহুখ খুন করার মতো সে মাহুখ নয়। শক্তিপদবাবুর সঙ্গে তার সজ্ঞাব ছিল না, এ কথা সত্যি। বনিবনা হত না নানা কারণে। একাধিক বিষয় নিয়ে তাদের মতান্তর ঘটেছে,—

বাজনাতি, অর্থনীতি, সঙ্গীত এবং ফুটবল-ক্রিকেট কোনো ব্যাপারেই উভয়ের মধ্যে মতের মিল ছিল না। বহুদিন প্রচণ্ড তর্ক হয়েছে। শক্তিপদবাবু ছেলেমানুষের মতন চৌচামেচি করেছেন, অকারণে উত্তেজিত হয়েছেন এবং কখনও কখনও কড়া কথা বলতেও ছাড়েননি। শিবপদরও মেজাজটাও মোটেই সুবিধের নয়। তবে চট করে চটে উঠতে যেমন খপ করে জলে ওঠে, আবার ভস করে থেমে যায়। খোঁয়া কিছুক্ষণ থাকে বটে, কিন্তু নব্বম হয়ে কিমিয়ে গেলেই সব পরিষ্কার।

শক্তিপদবাবুর স্বভাব অগ্নবকম। তিনি রাগেন, রাগ পুষেও রাখেন। কিছু জটিল চরিত্র, অন্তরে ভূগে ভূগে কমপ্রেস্ব সৃষ্টি হয়েছে। মনটা নিকর বক্রগতি, দেখে ক্রিষ্ট, দৃষ্টি তথক। অসন্তোষ বিবস্ত্রির গোপনে লালিত হতে থাকে। মিলোতে দেন না ঐটেই হ'ল বিলাস। বিপত্নীক এক সম্মান মানুষ, শিবানাকে ভালোবাসেন প্রচণ্ড। কিন্তু সেই পিতৃ-স্নেহ অধিকার বোধের খান মেশানো। খুব অপদস্থ হলে, হিংসার পাণ্ডা জবাব দেবার মতো তাঁকুতা আছে তাঁর মগজে। শিবপদরও মধ্যমাবোধ পবল তাঁক। তবে প্রতিযোগিতাপ্রবৃত্তি নেই, যত্নতঃ তাই মনে হয়।

ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে উঠেছিল শিবপদর প্রস্তাবে। বিয়ে করতে চায় সে শিবানাকে। শিবানার চরিত্রে দুটি গুণ তাকে আকর্ষণ করে—একটি হ'ল ওজন-জ্ঞান আর একটি হল রোমাণ্টিক ইচ্ছাসম্বলিত দৃষ্টিভঙ্গী। তার চেহারাও পুরুষের মন-ভোলানো রূপ নেই, আছে স্নিগ্ধ গাভার্য। এক কথায় যাঁহুর চেয়ে লাভণীটাই বেশি। মনটা একটু গগ্ন ঘোঁষা। স্বল্পসংখ্যক বন্ধুরা তাই বলে থাকে—শিবানার লজিক আছে ম্যাজিক নেই। পুরুষেরা তার সঙ্গে তর্ক করে আলোচনা করে তৃপ্তি পায়। কথা বলার ক্ষমতা খেটে আগ্রহ বোধ করে, কিন্তু ওর স্থির দৃষ্টির সামনে প্রেমে পড়তে ভরসাই পায় না। শিবপদর কাছে এইটেই হল প্রধান গুণ। শিবানীর ঠাণ্ডা মাথা, সুনির্দিষ্ট বাহ্যলাহীন ভাষা এবং যুক্তিনিষ্ঠ মন তার নিজের স্বভাবের সঙ্গে মিল খাবে। যেখানটায় গরমিল—তা হচ্ছে মেজাজ। কিন্তু শিবপদ মনে করে এবং আশা রাখে ঐখানেই শিবানী তার ব্যালান্স-এর কাজ করবে। যথা সময়ে যথা স্থানে, চাপ দিয়ে কিংবা হাল্কা হয়ে, শিবপদর টাল খাওয়া টেম্পারের ভারসাম্য বজায় রাখবে।

গোলপার্ক এসে গেল। এগার বা-দিকে বাঁক নিলেই একটি নিজস্ব বাস্তব্য তাদের বাড়ী। পরিচিত কালো ফটক—গ্রীলে এম্ হবকটা উজ্জল আলুমিনিয়াম পোটে বক বক করেছে। ট্যাণ্ডেমপ্রেট—তাই গেট খুলে বেশ খানিকটা যেতে হয় ভেতর দিকে। শিবানী ড্রয়িংরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর বুলিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। শক্তিপদবাবুর সখের বাড়ী ছোটো খাটো, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বাগানটি লতায় ও ফুলগাছের স্থাবকালে সত্যিই মনোহর। চার-পাঁচটি ঘর মাত্র কিন্তু প্রত্যেকটি প্রশস্ত। দরজা জানালা বড় বড়, আলো-হাওয়ায় অভাব কোনোকালে হবে না। পূর্ব আর দক্ষিণ খোলা। নিরিবিলা বাড়ী, পিছন দিকে উঁচু পাঁচিল।

এবং তারই সংলগ্ন শ্রম দেয়ালের একটি টানা হলঘর। ওপরে মোটা টালির ছাউনি। এটি শক্তিপদবাবুর লেবরেটরি। এইখানেই তাঁর অবসর-সময় কাটত। বড় এক কোম্পানীর বায়ো কেমিস্ট ছিলেন তিনি। গ্রনামের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তারপর শরীরটা হঠাৎ ভাঙতে শুরু করল। মাস ছয়েক ভোগার পর শক্তিপদবাবু একেবারে অপটু হবার আগেই কাজে ইস্তফা দিলেন এবং বাড়ীতে বসে ঐ নাজস্ব ঘরটিতে নানা টুকিটাকি কাজ করতেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতেন।

শিবানী কতদিন আপত্তি করেছে, বলেছে,—‘তোমার শরীরটা কি হচ্ছে, মুখের চেহারা একবার দেখো আরশিতে! বয়সের আগে বুড়িয়ে গিয়ে লাভ আছে? তা ছাড়া, পেটে ও বুকের দিকে প্রায়ই পেন্‌ হার বসে।’ অথচ ঘাড় নাচু করে হেঁট হয়ে একটানা কাজ করা কি তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো ঐ একই ধরে আবদ্ধ থেকে?’

শক্তিপদ জবাব দেন না, দিয়ে লাভ নেই। মেয়ের যুক্তি বিচারের কাছে তিনি কখনোই পেরে ওঠেন না। মুখটা একটু বিকৃত করে, যেন উত্তীর্ণ বাথাকে মনের দ্বারে দাবিয়ে রেখে বলেন, ‘নাঃ—আর কুলোবে না কোনও লাভ নেই থেকে—’

শিবানী একটু থমকে থেকে জিজ্ঞাসা করে,—‘মনে?’

শক্তিপদ জবাব এড়িয়ে যান বলেন, ‘বাজে বাকসিনি তোমার আর কিছু কাজ নেই?’

একদিক থেকে শক্তিপদ নিলিপ্ত। ঘরোয়া বন্দোবস্তে, সংসার-চালনায় টাকাকড়ির হিসাবে, মেয়ের পড়াশুনা ঘোরাকেরা প্রকৃতি বাক্সিত বাপারে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করেন না। তবে গত ছয় মাসে তাঁর স্বাভাবিক অসংযুতা অসন্তুষ্ট বেড়েছে বদমেজাজ আরও বদ হয়েছে। মুখে সর্বক্ষণ একটা ক্রিষ্ট তক্ততা ও বিবর্তিত ছাপ এবং সেটা ক্রমশই গভীর হয়ে উঠেছে। শিবপদর সঙ্গে যেনি বচসা থেকে খোলাখুলি ঝগড়া হয়ে গেল এবং পরস্পর কটু-কাটবোর মধ্যে দিয়ে একটা বিস্ত্রী বাপারে পরিণত হ’ল, তারপর থেকেই শক্তিপদর শরীর আরও নীর্ণ হতে লাগল।

শিবপদ খুব দীর্ঘ পলায় এবং যথাসাধ্য সম্ভব ব্যসা করে শিবানীর সঙ্গে মিয়ের প্রস্তাব তুলেছিল। কিন্তু এক যে কন্যা বাপারে পরিণত হ’ল, তা বলবার নয়। তর্কাতর্কি চেষ্টামেচি, শেষকালটা গালিগালাজ। মতের মিল কোনদিনই ছিল না, কিন্তু একটু দুর্বল যথেষ্ট মৌখিক ভক্ততা অন্ততঃ বজায় ছিল। এখন আর সেটুকুরও বালাই রইল না। বাদবিতণ্ডার শেষে শক্তিপদ বাকসের মতো হঠাৎ ফেটে পড়ে শুধু বললেন,—‘বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে, স্বাউণ্ডেল কোথাকার। ড্যাটি সোয়াইন, এতবড় আত্মপা— দেখে নেবো তোমায়, এই বলে রাখছি আমি—’

শিবপদ মেজাজে হঠবার পাত্র নয়? জবাব দিল সমান ডাঁচু পলায়, ‘ছোট লোকের মতো মুখ...বুড়ো শকুন কোথাকার, ওন্ড টাইরেট—এবার মবে গেলেই তো পারেন।’ শক্তিপদ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে শুভূত ঠাণ্ডা পলায় বলেছিলেন,

‘তা—তা পারি বটে।’

এবং বিধি মিষ্ট সম্ভাষণের পর ভাবী শত্রু-আমাতার মধ্যে কি রকম সম্পর্ক থাকতে পারে তা বোঝা শক্ত নয়। শিবানী বাপের দোষগুণ সবই জানত। এ ক্ষেত্রে প্রথম অভ্যন্তরীণ শক্তিপদর তরফ থেকে, একথা জেনে ও বুঝেও শিবপদর দৈর্ঘ্যচ্যুতি ও প্রত্যুত্তরকে সে ঠিক ক্ষমা করতে পারল না। শিবপদ যখন বেরিয়ে যাচ্ছে বাড়ী থেকে, পিছন থেকে শিবানীর মুখ দিয়ে বেকস একটা স্থির ওজন করা উক্তি—‘আপনি এ বাড়ীতে কখনও আসবেন না।’

শিবপদ একটু হকচকিয়ে গেল। বোধহয়, ঠিক এট ‘জিনিসটা’ প্রত্যাশা করেনি। তাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল—‘শেষ কথা …?’

‘—ই্যা—তা ছাড়া আর কি হতে পারে?’ বলেই শিবানী মুগ্ধ কিরিয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু অনেক কিছুই হলে বাকী ছিল এবং শেষ কথারও শেষ নেই। সেই ঝগড়া-ঝাঁটির পর, বাপ মেয়ে দুজনের মধ্যে একটা গাভীরের আড়াল নেমে গেল। পরস্পর নিজেকে ঠিক দোষী মনে না করলেও কেমন যেন একটা দূর-দূর অস্বস্তির ভাব। শক্তিপদ ভাবছেন, শিবানী ভেতরে ভেতরে বোধহয় শিবপদকেই সমর্থন করে যদিও বাইরে তার ভাবান্তর নেই। আর শিবানী …? কি যে ঠিক ভাবে তা বোঝা যায় না। শিবপদর অপরাধ কার কাছে এবং কতখানি হয়তো তার বোঝাপড়া মনে করে মনে মনে।

তবে ইদানিং সে লক্ষ্য করছে, বাবার শরীরটা হুড়হুড় করে ভাঙছে। কি যে অসুখ, ডাক্তারে বলেন না। অথচ বাধা আর ঘূমের গুয়ু ছাড়া আর কিছু দেন না, দিতেও চান না। শিবানী আড়ালে তাঁকে জেরা করেছে, কিন্তু ডায়োগনোসিস আদায় করতে পারে নি। মোটামুটি শক্তিপদর কটিন বদলায় নি। ঘুম থেকে উঠতে যা দেবী হচ্ছে আজকাল। দিনে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পালা কিছু বেড়েছে। সম্ভাব্য লন এ খানিকক্ষণ সময় কাটে। চা-সিগারেট গত দু তিন মাস মুখে করেন নি। আর রাতে সামান্য কিছু খেয়ে ইঞ্জিচেয়ারে বুকের কাছটায় হাত দিয়ে চোখ বুঁজে পড়ে থাকেন। বাধার কথা; শারীরিক ঘট্টনা ও অস্বস্তির কথা বলেন না। তারপর টেনে টেনে যে ভাবে বিছানায় শুতে যান, তাতে মনে হয় পা ছুটো তার নিজের নয়। শিবানীর কেমন যেন ভয়-ভয় করে আজকাল……

শুধু একটা বিষয়ে শক্তিবাবু খুব দৃঢ়। প্রতি বুধবার বিকেলে তাঁর চৌরঙ্গী অঞ্চলে যাওয়া চাই। সেখানে এক ক্লিনিকে সীমাবাধ নেওয়া তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। ডাক্তার বলেছিল, রিউম্যাটয়েড আর থ্রাইটিস বড় কষ্টকর ব্যাধি। ইনজেকশনে সাময়িক উপশম হতে পারে, কিন্তু মাসাজ ও ট্যাক্সি বাথ নিয়মিত নিলে স্থায়ী উপকারের আশা আছে। শক্তিপদবাবুর পেশা গেছে অবসর নেবার পর থেকে। কিন্তু নেশা

ঠিক আছে ঐ ছুটো। ল্যাবরেটরি আর টাকশি বাথ। ইলানিং শিবপদকেও দীক্ষিত করেছিলেন। ছুজনে একই দিনে ক্লিনিকে যেতেন এবং অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন মেজাজে ফিরে আসতেন শক্তিপদ। মাসাজে ও উত্তম বাষ্প-স্নানে যখন গলগল করে শ্যাম বেরিয়ে যায়, তখন বোধহয় মেজাজ কিছু ঠাণ্ডা হয়, একবার হেসে বলেছিলেন শিবপদকে।

কিন্তু ঐ বিস্ত্রী সিন-এর পর শক্তিপদবাবুর সঙ্গে শিবপদ যখন বাক্যালাপ বন্ধ, তখন পরস্পর দেখা হলে কে কি করে জানতে একটু কৌতূহল হয় শিবানীর। কারণ, মুখ দেখাদেখি একেবারে বন্ধ হবার নয়। শক্তিপদবাবু যাঁই গোপন স্বভাবের লোক হোন, শিবপদের গৌ আছে যেথেষ্ট। ভয়ে বা বিরক্তিতে নিজের কোট ছাড়বার পাত্র নয় সে। ড্রাইভারের কাছে শুনেছিল ক্লিনিকে প্রতি বুধবারই যাচ্ছে শিবপদ। এবং শিবানী বেশ অস্বস্তান করতে পারে, হঠাৎ মুখোমুখি হলে শক্তিপদবাবু কিভাবে চাপা গর্জন করে সরাসরি পিঠ দেখান আর শিবপদ অবজ্ঞাভাবে নাক উঁচিয়ে মুখ ফিরায়ে নেয়। এই ভাবেই চলছিল মাস খানেকের ওপর।

সেদিন সন্ধ্যার পর সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল দেখে শিবানী বাবার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। টেলিফোন করল বার দুই, কিন্তু লাইন পাওয়া গেল না। তৃতীয়বার কে যেন কোন দরল, কিন্তু ওপাশ থেকে একটা বাস্তবতা ও আওয়াজের মধ্যে সে যে কি বলল বা বলতে চাইল, তা বোঝা গেল না। শিবানী এতটুকু বুঝল তার অবিলম্বে যাওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি চাকরকে ডেকে কি একটা বলে বাইরে এসে দেখে, কোথাও ট্যাক্সির দেখা নেই। অতঃপর পদব্রজে গড়িয়াহাটের মোড় পর্যন্ত এসে বাস-ই দরল। প্রায় তিন কোয়ার্টার পরে ক্লিনিকে পৌঁছে দেখল লাল পাগড়ি আর ছুজন মার্জেন্ট ভিড় সরাজে। শিবানী নিজের পরিচয় ও প্রয়োজন বলতেই একজন মার্জেন্ট তাকে নিয়ে ওয়েটিং রুমে বসাল। কিছুক্ষণ পরে একজন ডাক্তার ঘরে এসে ঢুকলেন।

তারপর কি রকম যেন বাসসা হয়ে গেল ডাক্তারের মুখ। কানের মধ্যে একটা কীপ শব্দ ক্রমে তীব্র হতে লাগল আর সারা গায়ে চিন্‌চিনে জালা। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আর ডাক্তারের কথা, দুটোই যেন ক্ষণ থেকে ক্ষণততর হয়ে চলেছে, ধামধাম কোন লক্ষণ নেই। বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল শিবানীর ধাতস্থ হতে। চৈতন্য হারাবার মতন সে নয়, তবু অবস্থা সত্যের দুর্বলতা কাটিয়ে এই অবস্থা বুঝে নিতে এবং পুলিশের কয়েকটা প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিতে বেশ সময় লেগেছিল। দেহ যেমন চেঁচাবে চেঁচাবে ওপর এলানো অবস্থায় ছিল, তেমনিই বইল। দরজা একপাট খোলা। পুলিশ যখন শিবানীকে বাইরে নিয়ে আসছিল তখন একবার চকিত দৃষ্টি পড়েছিল বাবার মুখের দিকে। ষাড় পিছনের দিকে একটু হেলে আছে, মুখ ঈষৎ উঁচু দিকে। নাঃ—মুখে একটুও বিকৃতি নেই। মাথুঘটা যেন শিথিল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু ডান

পাটান করে সামনে বাড়ান

এরপর বাড়ীতে একলা থাকাই সমস্ত। কিন্তু শক্তিপদবাবু থাকতেও শিবানীর আপন মনে একলা থাকা অনভ্যাস ছিল না। দুজনেরই স্বভাবটা চুপচাপ। তবে এই ঘটনার পর টুহু কারুর মানা শুনল না। সাত-আট দিন এসে রইল শিবানীর কাছে। টুহু শিবানীর স্কুলের বন্ধু, কাজেই শিবানীর চালচলন পছন্দ-অপছন্দ কিছুই তার অজানা নয়। তা ছাড়া শিবানী টুহুকে পেয়ে অনেকখানি শান্তি পেল। একে তো হত্যাকাণ্ড এবং আত্মঘাতিক মর্য়-এ তদন্তের ব্যামেলা। তার ওপর রিপোর্ট নিয়ে ডিটেকটিভ পুলিশের আনাগোনা বাবে বাবেই একই ধরনের প্রশ্ন, শিবপদর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিয়ে নানা বকবক সওয়াল, মামলায় তার সাক্ষ্য সযত্নে আগাম নির্দেশ—এ সবের বিরাম ছিল না একটি দিনের জুতা। টুহুর উপস্থিতি এ দিক থেকে খুবই সাহায্য করেছিল, অনেক ভাল সে সামলে নিত। যাক্কে একঘরে শুয়ে দু'জনে মাঝে মাঝে শক্তিপদবাবুর এ-দেন শোচনীয় পরিণাম নিয়ে চিন্তনা করেছে। কিন্তু কেউই বহুস্তরের চিন্তা করে শাবেনি। সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে, শিবপদ কি করে ছুরি মারল, আর সে ছুরি গেল কোথায় ?

পুলিশের অবস্থা এ বিষয়ে সম্বন্ধ নেই। ডিটেকটিভ উপস্থানে যে ধরনের বিশদ্রবণ বিজ্ঞেয়ণ পড়া যায় আশামী ছাড়া আর সকলকেই সম্বন্ধের আওতা নয় এনে শেষ পর্যন্ত এক চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে পৌছে প্রকৃত অপরাধকে কোণঠাসা করা হয়, এখানে সেরকম কোনো মিসাক্স ঘটনার সম্ভাবনা ছিল না শক্তিপদবাবুর মৃত্যুর কারণ সযত্নে পুলিশের তরফে কোন সংশয় থাকবার কথা নয়। ব্যাপারটা এতই প্রত্যক্ষ ও সহজ, ক্রিমিকের লোকদের অবদানবন্দা এত স্পষ্ট ও ক্রটিহীন যে শিবপদর অপরাধ-সংঘটনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। যে দিক দিয়েই দেখা যাক সমস্ত ইঙ্গিত শিবপদকেই অভিহিত করেছে।

প্রথম কথা, সেই বুধবার দুজনেই ক্রিনিকে এসেছিলেন। বারান্দায় উঠে সামনেই ওয়েটিং-রুম—সেখানে দুজনের অবাঞ্ছিত মুখ দেখাদেখি হয়েছিল। পরস্পর দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন সেটা দু-একজন ভদ্রলেকে লক্ষ্য করে ছিলেন। তিন নম্বর কামরায় শক্তিপদবাবু মাসাজের জুতা চোকে আঁচ উলটো দিকে তেবো নম্বর। মাঝে কার্ভার। এই তেবো নম্বর কামরায় যখন শিবপদ প্রবেশ করেছিল, তখন হঠাৎ দুজনের উচু স্বরে কথাবার্তা শোনা যায়। হয়তো দু-এক মিনিটের বাক্যালাপ, কিন্তু সেটা যে অত্যন্ত গরম মেজাজের, দুই কামরার আঁটে-ওটাই তা শুনতে পেয়েছিল। কি নিয়ে অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটল, তা তারা জানে না। উভয়ের মনোমালিঙ্গের পূর্ব ইতিহাস তাদের জানবার কথাও নয়। শুধু এইটুকু তারা নজর করেছিল—উভয়ের মুখ বিষম ও আকর্ষণ। আর 'ওলড ভিলেন—আপনার দ্বারা সবই সম্ভব' এই শেষ কথাগুলো বলে শিবপদ নিজের কামরায় ঢুকে লক্ষ্যে

দরজা বন্ধ করে দেয় ও বাগে ফুঁসতে থাকে।

তিন নম্বরের আট্টেগেণ্ট এ সবই সম্বন্ধন করে। তেরো নম্বরের লোকটির জবান বন্দার সঙ্গে বিদ্যুৎমাত্র অঙ্গুষ্ঠ নেই। উকিলের জেরায় কেউই টলেনি। তাদের উজ্জিত কোথাও অস্পষ্টতা ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

শক্তিপদবাবুর আট্টেগেণ্ট প্রাথমিক তদন্তে এজাহার দেয় এবং পরে সাক্ষী হিসেবে সওয়াল-জবাবে যে সব কথা বলে, সে সবই শিবপদের বিপক্ষে এবং যারাজ্ঞক বকমের। শিবপদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে যখন শক্তিপদ নিজের কামরায় এলেন, তখন তিনি উত্তেজনার ছুঁল। কারণ, তাঁর হাত-পা কাঁপছিল। মাসাজের সময় সে ভাদোডাবেই লক্ষ্য করেছে, তিনি হাঁপাচ্ছেন প্রায় পনেরো-কুড়ি মিনিট পরে তার পেই ও শ্বাস ক্রমশঃ শিথিল ও ধাতস্থ হয়! আর একটা জিনিসও সে নজর করে, শক্তিপদবাবু তার দু-একটি দরকারী প্রশ্নের কোন জবাব দেন নি। বরং অগ্নি-দিনের চেয়ে বেশি অগ্নয়নক। হয়তো শিবপদের সঙ্গে বচসার ফলেই এই ভাবান্তর এবং কায়িক ক্লান্তির অগ্নি আনমনা তার। মাসাজ যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন শক্তিপদবাবু আনমনে বিড়বিড় করে বলে ওঠেন—‘কে কাকে খুন করে, দেখা ধাবে!’ খুব পরিষ্কার শুনেছে, এ কথা সে হলপ করে বলতে পারে।

এর পর শক্তিপদ আসন ছেড়ে ওঠেন। বা হাতে ফ্লাস্কটা কোণ থেকে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে কামরা থেকে বেরিয়ে ঠিক পাশেই চার নম্বর মাকী স্টীম-বাথ নেবার ছোট কক্ষে ঢোকেন। এটি তাঁর বরাবরের অভ্যাস, চার নম্বরের আট্টেগেণ্ট দেখেছে, গা দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ঘাম না বেরুলে শক্তিপদবাবু ফ্লাস্ক খুলে অল্প চা পান করেন। সোঁদন স্টীম-বাথ শেষ হলে আট্টেগেণ্ট বাইরে বেরিয়ে আসে এবং কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়ায়। ওদিকে তেরো নম্বর কামরার আট্টেগেণ্ট বলে শিবপদের মাসাজ শেষ হলে সেও কিছুক্ষণের অগ্নি বাইরে আসে, কারণ তারপর শিবপদের স্টীম-বাথের অগ্নি গরম কামরায় যাবার পালা। মোটামুটি ঐ চার-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এই সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে থাকবে।

এর বেশি তারা কিছু জানে না এবং দেখেও নি। একেবারে গিয়ে দেখল, চার-দিকে বাস্তবতা ছুটোছুটি ও চৌচামেচি। স্বত্বাধিকারী পুলিশকে ডাকার আয়োজন করছেন। ইতাবসরে চার নম্বর কামরায় মুখ গলিয়ে দেখে ভরাবহ দৃশ্য। শক্তিপদবাবু এলিয়ে রয়েছেন চেয়ারে। বকে বক্তের দাগ, তাজা ও ভিজ়ে বক্তের ধারা নেমে আসছে গা দিয়ে। ফ্লাস্কটা পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে আছে। মুখ খোলা। প্রাস্টিকের ছিপটি একটু দূরে একখানা চেয়ারের পায়ের নাচে, আর ফ্লাস্কের গলার কাছে কয়েকটা শুকনো চাষের পাতা।

মামলার শুনার সময় এসব কথাই সমর্থিত হ’ল। তদন্তকারী পুলিশ কর্মচারী দুজন হত্যার দিন কোনে খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে যা যা দেখতে

শায় সব কথা ব্যক্ত করে। যেটি প্রধান ‘এক্সহিবিট’—এ চায়ের স্নাক, আদালতে পেশ করে জুরিদের তা দেখাও হয়েছিল। কিন্তু জুরিদের একটি প্রশ্নের উত্তর এ মার্জেটারি কিংবা তদন্তের ভারপ্রাপ্ত উপরতন কর্মচারী কেউই দিতে পারেন নি। হত্যার সময়ে কিংবা অব্যবহিত পরে শিবপদ কোথায় ছিল? একজন অ্যাটেওয়েট বলে, শিবপদ নিজের কামরা ওংগো নখরের দরজার গোড়ায় ছিল। ক্লিনিকের আর এক দিক ছিল ঘটনাস্থল চার নখর ঘর থেকে প্রায় দশ-বাঘো গজ দূরে। করিডরে শিবপদ দাঁড়িয়েছিল এবং তখন তার মুখের চেহারা খুব উত্তেজিত।

আর যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা—সেটা হ’ল যে, কি অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল, তার কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। তিন নখর কামরা তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছিল। মেঝের জুট কার্পেট তুলে, দেয়ালের গায়ে কাঠের কোট কাবার্ড খুলে যথেষ্ট সন্ধান করা হয়। শিবপদের কামরায় এবং চার নখর স্টীন-বাথ-এর কক্ষও জিনিসপত্র উল্টেপাল্টে পুলিশের লোক সন্ধানের কোনও ক্রটি করেনি। বারান্দায়, সামনের করিডরে, এমন কি বাইরে রাস্তায়, পাশের প্যাসেজেও আত্মনির্ভরতা করে খোঁজা হয়েছে। কিন্তু অস্ত্র নিখোঁজ। এইটাই রহস্য। দায়রায় প্রথম দিনে ময়না তদন্তের রিপোর্ট দাখল হলে ডাক্তারকে ঘণাবীতি সওয়াল করা হয়। তিনি তাঁর অব্যবস্থাপন বলে, তাক্স-মথ এবং দারালো কোন অস্ত্র ধরাই খুন করা হয়েছে। হৃৎপিণ্ডের ঠিক ওপরেই অস্ত্রের আঘাত এবং ক্ষতের গভীরতা দেখানে প্রায় চার ইঞ্চি, তখন নিঃসন্দেহে বলা চলে ফলার বাইরে হাতলের মতো জিনিসটাও লম্বায় অস্ত্রের আরও তিন-চার ইঞ্চি। নটলে হাতের মুঠোয় ধরা যায় না এবং ভালো করে গ্রিপ না করলে, দেহের মধ্যে চার ইঞ্চির কাছাকাছি একটি ফলা সজোরে প্রবেশ করানো যেতে পারে না।

প্রথম দিনে আদালতে বসে শিবানা সরকার তবফের সব জবানবন্দী নিবিষ্ট মনে শুনে এল। আর এইটেই তার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর রহস্য যে সাইজে এত বড় একটা দারালো ছুরি রক্তচিহ্ন মেখে একেবারে গায়েব হয়ে গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে। ক্লিনিকের স্বত্বাধিকারী এবং মাত-আটজন অ্যাটেওয়েট, তার উপর কয়েকজন পেশেন্ট এবং ওয়েটিং রুমে প্রতীক্ষমান চার পাঁচজন ভ্রমলোক, কেউই পুলিশ এসে পৌঁছানো কাল পযন্ত ক্লিনিক তেড়ে যান নি। কাউকে ছুটে পালাতে কিংবা এমনকি সাধারণভাবে বেরিয়ে যেতেও দেখেন নি। শক্তিশদবাবুর অ্যাটেওয়েট মাত্র অল্পক্ষণ ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছিল সিগারেট খেতে। আশঙ্কানা খেয়েই সে সিগারেট নিভিয়ে ঘরের ভিতর আসে এবং দেখে শক্তিশদবাবুর এই অবস্থা! দেখেই ভয়ে আতকে সে চিৎকার করে ওঠে এবং সমস্ত লোক জড় হয়। যেই ঘটক হোক, ক্লিনিক ছেড়ে তার পালাবার কোন উপায় ছিল না এবং ছুরি বা ঐ আতীত কোন অস্ত্র বাইরে ছুঁড়ে ফেলাও সম্ভব ছিল না। খুন হয়েছে শুনেই স্বত্বাধিকারী ক্লিনিকের মেন দরজা বন্ধ করে দেন এবং এ

সমস্ত ব্যাপার পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ঘটে যায়। তাহলে আসল প্রমাণ তো নিশ্চয়।

পুলিশও এই নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বিগ্ন। আদালতে জুরির সামনে ভালোভাবে কেস প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জুরি জাতীয় যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়েছে সেটা দেখাতে না পারলে কেস দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সরকারী উকিলও একটু ষিঁ ও ছুঁচুতার মধ্যে পড়েছেন। তবে ভয়সার কথা এই যে, পারিপার্শ্বিক সমস্ত তথ্য ও অবস্থা শিবপদকেই দোষী সাব্যস্ত করছে। ছুঁপক্ষের মনোমালিন্দ, দুর্ঘটনার ঠিক আগেই দুজনের মধ্যে তীব্র ঝগড়া, শিবপদের উদ্বেগনা, শক্তিপদবাবুর শেষ উক্তি—‘কে কাকে খুন করে, দেখা যাবে’ ইত্যাদি সব জিনিস একত্র বিবেচনা করে দেখালে শিবপদের অপরাধ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। যে কয়দিন মামলা চলেছে, তার মধ্যে জুরিদের হাবভাব দেখে, তাঁদের প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে যে, তাঁরাও আসামী সম্বন্ধে অনেকটা একমত। সেখানে মারণ-অস্ত্র আবিষ্কার, আসামীকে খুন করতে দেখা কিংবা ঐ কামরা থেকে বেরতে দেখা, এইরকম আইনের প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব, সেখানে সমবেত পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও অবস্থা থেকেও দোষ প্রমাণ করা চলে। অবশ্য এই পারিপার্শ্বিক ঘটনা বা তথ্যের মধ্যে এমন কোনও খুঁত বা গলদ থাকে চলে না। তাহলে কেস ফেসে যাবে। জজ ও জুরি, উভয়ের কাছেই অপরাধ সন্দেহের উল্লেখ, স্তায়া ও শিক্ত বলে গ্রাহ্য হওয়া দরকার।

শিবানীর মনেও এ প্রশ্ন একাদিকবার উঠেছে। শিবপদকে কি নিঃসংশয় রূপে দোষী বলে সাব্যস্ত করা যায়? তার মনে যথেষ্ট ষিঁ ও ছুঁচুতা রয়েছে এ সন্দেহ। অপক্ষপাত দৃষ্টি দিয়েই সে বিচার করে দেখেছে এবং এখনও দেখছে। ‘রৌজনেব্ল ডাউট’ কিন্তু থেকে যাচ্ছে—দুটি কারণে। শিবপদকে কেউ তার বাবার কামবায় ঢুকতে দেখেনি কিংবা সেখান থেকে বেরতেও দেখেনি। দ্বিতীয়তঃ অস্ত্রটা গেল কোথায়? এত তাড়াতাড়ি সে উধাও হওয়া সম্ভব নয়। এখন সবচেয়ে বড় কথা শিবানীর কাছে—শিবপদের কাছে কোনও অস্ত্র ছিল না, এই কথাটা প্রমাণ করা। জুরি সঙ্গে নিয়ে সে যায়নি, জুরি বসে কোনো জিনিসই নেই—এইটে যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায়! কিন্তু কি করে?

খুনের মাংসের কাউকে দোষী প্রমাণ করতে হলে তিনটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার, সকলেই জানে। প্রথমতঃ আসামীর মতলব বা উদ্দেশ্য। এ স্থলে বলা যায় এবং জেদায় শিবানীর কাছ থেকে তা আদায় করা হয়েছে, যে শিবপদের উদ্দেশ্য ছিল। প্রমাণ—বিশ্বের প্রস্তাব এবং ভা নাকচ। দ্বিতীয় কথা, সুযোগ। সুযোগ অবশ্যই ছিল, যেহেতু মনোমালিন্দের পর শিবানীদের বাড়ী ঘাওয়া বন্ধ হলো, ক্লিনিকে পরাম্পদের দেখা হত। পাশাপাশি কামরা, হত্যার হত্যার সুযোগ অবর্তমান নয়। তৃতীয় কথা এবং সবচেয়ে বড় কথা হত্যার উপায় এবং তার সন্ধান। এখানে সেই-

টেরই অভাব। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট ও ডাক্তারের জ্ঞানবন্দীতে হত্যার উপায়স্বরূপ যে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তার আকৃতি এবং আঘাতের প্রকৃতি আইনতঃ গ্রাহ্য। কিন্তু অস্ত্রের কোনো পাত্তা নেই।

শিবপদর বিপক্ষে প্রথম দুটি শর্ত একত্র নিলে যথেষ্ট সাংঘাতিক। কিন্তু তৃতীয় শর্ত...? অবশ্য খাইনের তর্কে ও বিচারে অস্ত্রটা পাওয়া যায়নি বলে অস্বাভাবিক হত্যা করা হয়নি, একথা প্রমাণ হয় না। শিবানী পাকা কৌশলীর মতোই আপনমনে প্রশ্ন তোলে—প্রমাণ হয় না, মেনে নিলুম। কিন্তু তাই বলে কি প্রমাণ হয় যে, বিশেষ একটি ব্যক্তি থাকে আসামা বলা হচ্ছে, এখানে শিবপদ, সে-ই হত্যা করেছে? এক কথায়, একটা নেগেটিভ তথ্যকে পজিটিভ প্রমাণে দাঁড় করানো যায় কি? শিবানী ষড়টুকু শিবপদকে চেনে, তাতে তার বিশ্বাস, মাহুস খুন শিবপদর পক্ষে সম্ভব নয়।

ভারতে সন্কোচ হয় এবং ভালোও লাগে না—তবে, শক্তিপদবাবুর পক্ষে এ কাজ বয়ঃ হয়তো...হয়তো বা কল্পনা করা যায়। কারণ, তাঁর মন ছিল বৈজ্ঞানিক, পরিকল্পনা-প্রবণ এবং একটি নির্ধারিত। তাঁর চরিত্র জটিলতর এবং রাগ বা আক্রোশ গোপনে শোষণ করা, তার কছুটা অজ্ঞাস ছিল। সে যাই হোক, তিনি তো খুন করেন নি, নিজেই খুন হয়েছেন।

ভারতে ভারত, এই জায়গায় এসে শিবানীর মন থমকে দাঁড়াল। ঋনিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে, উঠে দাঁড়াল। কি যেন একটা নতুন চিন্তা তার মনকে পেয়ে বসেছে। পায়চারি করতে লাগল শিবানী অস্থির হয়ে, যে অস্থিরতা তার স্বভাবে নেই। কিন্তু এমন এক বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়লে, অতিবড় স্টোইক-এরও ধৈর্য ভেঙে পড়ে। তবু সে প্রাণশূন্যে নিজেকে অব্যাহত রাখা ও ভাবনা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল। কারণ এখন থেকে শিবানীকে সমস্ত শক্তি ও নিবিষ্ট মন নিয়ে কাজে লাগতে হবে। যে-কোনো উপায়ে ষড় কন্ট্রিন্ট হোক, তাকে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। নইলে কী করবে? পুলিশ...? তাদের মন তো তৈরি, কেসও তৈরি। যে জাল জড়িয়েছে, তা ছুঁতে। গ্যালভানাইজড তারের মতো শক্ত সে জাল। ছুরি দিয়ে তাকে কেটে ফেলা যাবে না। সেই ছুরি... আর ছুরি? কিন্তু কোথায় গেল সেটা? নিশ্চয় হয়ে গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে? শুধু ইম্পাতে তৈরি যে বারালো ফলা বাবার বুকে বিধোঁছিল, তা কি উবে গেল গলে গল?

এ হতেই পারে না, শিবানী মনের জোর আনে। তাকে সব সন্কোচ কেড়ে ফেলতে হবে, ঝাড়া ডেউকিতির মতো কাঁধ-কারণ বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। যেসব তথ্য মামলায় প্রকাশ পেয়েছে এবং আরও যদি কিছু অজানা থাকে, সব জড় করে ধারাবাহিক শৃঙ্খলায় বাঁধতে হবে তাদের। যাচাই করে দেখতে হবে, কোথায় তা দুর্বল, কোথায় ছিল রয়ে গেছে। রোগে ভুগে বিছানায় শুয়ে যে মৃত্যু, তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস থাকে। কিন্তু অপঘাতে মৃত্যু কিংবা হত্যা—তার মধ্যে কি শৃঙ্খলা পাওয়া

ধাবে? এ তো অসম্ভব মনে।

বাবা যখন মুখ উচু করে ফ্লাস্ক খুলে চা খাচ্ছিলেন, সেই সময়ে, ঠিক সেই আশ্চর্য দৈবমুহূর্তে, ছুঁবে বিধিল বৃকে...। এই হত্যা না হয় সম্ভব হল, যুক্তির বাহ্যিক। কিন্তু যত্না সম্ভব হলেও, জীবনে কি সম্ভব এই দুর্ভাগ্যবশতকে আশ্রয় করে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগানো? অদৃষ্ট ঘাণে কি দৈবজ্ঞ যে, চরম সঙ্কট-লগ্নে তার নাটকীয় আবির্ভাব এবং বৃকে বক্তৃতলক লাগিয়ে দিয়ে উপচার-অস্ত্রকে ভোজবাজির মতো উড়িয়ে দিল...? নাঃ—এই হত্যার মামলার যুক্তির যে লোহজ্বাল গড়ে উঠেছে বা ঘটনা করা হয়েছে, তা নিবেট নয়! জোড়াতালির একটা খুঁটো আঙুলের যেন ধরা পড়ে, কোথায়...সেই গলদ?

এরপর শিবানী উঠে পড়ে লাগল। আর বেশি সময় নেই। গত মাসে আরও তিন-চার দিন শুনারী হয়ে গেছে। সন্ধ্যাল জবাবের পালা প্রায় শেষ। এখন হয়তো একটা বা দুটো দিন মামলার জের চলেবে গুটিয়ে নেওয়ার আগে। তারপর জজ জুরিদের কেস ব্রিঙ্গে দেবেন। জজের ভাবগতিক বোঝা শক্ত, যেহেতু নিরপেক্ষ জায়-নিষ্ঠ বিচারক দু'পক্ষকেই সমান সুবিধাসুযোগ দেন। চরম দণ্ড দেবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তার মনোভাব ঠিক ধরা যায় না। তবে জুরিকে চাজ দেবার সময় কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, ঘটনা ও তথ্য একত্র সাজিয়ে পরিবেশন করার ভঙ্গীতে তার যুক্তির খুঁকাত কোন দিকে, তা অনুমান করা চলে হয়তো। কিন্তু তারও তো আর বিশেষ দেবী নেই।

টুহুর কাছ থেকে ফেরবার পর শিবানীর চিন্তার বিরাম নেই। একমাত্র টুহুরকেই সে ইজিত দিয়েছিল, যে ইজিত তার মনে উদয় হয়েছে। সেদিন এই কেসের যে একটা নতুন দিক চোখের সামনে একটু একটু করে ফুটে উঠেছিল, তার আভাস টুহুরকে দিয়েছিল শিবানী। পাছে শিবানীর ভরসা ও চেষ্টা ব্যর্থ হয়, সেজগৎ নিয়ে ঘাণা-উৎসাহ চাপে বেখে টুহুর অনেকটা দমিয়ে দিয়েছিল শিবানীকে। বলেছিল, তার অনুমান যদি ঠাট্টাও হয়, প্রমাণ কোথায়? শিবানী কোথেকে ঘটনার গুণ্ডিন পরে সে প্রমাণ জোগাড় করবে? শিবানী জবাব দেয় না। কিন্তু বাড়ী কিবে আসা অবধি সে ক্ষীণ আশা ছাড়েনি। কি করে সেই পরম প্রয়োজনীয় 'কু' খুঁজে বার করা যায়! যদি প্রমাণ করা যায়, ছুরিটা আদৌ ছিল না কিংবা তার লোপাট হয়ে যাওয়ার সম্ভব কারণ ছিল তাহলে শিবপদর সঙ্গে এই হত্যার সম্পর্ক নাকচ করা যেতে পারে। যদিও ঐ 'যদি'টাই হল আদল কথা!

এর পর শিবানীর বেশি সময় কাটতে লাগল শক্তিপদর লেবরেটরিতে। সেখানে বসে নির্জন ভাবে, এটা-ওটা নেড়েচেড়ে দেখে। উঠে এসে নিজের ঘরে ঢোকে, কাগজে কিছু নোট করে। মাঝে দু-একদিন বাড়ীর উকিল শীতলাচরণের কাছে গেল, তারপর বাবারই এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে এল। ইনি হলেন শচীকান্তবাবু, একজন

নামকরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার। সরকারী চাকরি থেকে বটাস্বর্য্য করে এমন অবসর কাটাচ্ছেন শৌখীন বাগান আর নিজ্ঞান চর্চায়। শিবানীর তৎপরতার যেন অস্ব নেই। শাবাদিনই পাটকে, ভাবছে মায়ে মায়ে বেয়িয়ে যাচ্ছে শচীকান্তবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। মামলা ইকিগমো গুটিয়ে এসেছে, সওয়াল-জবাব শেষ। সাক্ষী-সাবুদের জেরা মিটে গেছে, উকিল-উকিলে আইনে নজিরে আর কচকচির পালা চুকেছে।

আগামী সোমবার দায়বীর শেষ মিটিং, তার পর জজের বক্তৃতা এবং জুরির শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা। আর তারপরই রায়, এবং সেটা যে শিবপদর সম্পূর্ণ বিপক্ষে সে বিষয়ে জনমত প্রায় নিশ্চিত। আদালতে ভিড জমে প্রত্যেক শুনার দিনে, খবরের কাগজেও এ মামলার পাবলিসিটি হয়েছে যথেষ্ট। বিচারে শেষ পযন্ত কি দাডায়, তা জানবার জন্য যেনকেই উৎসুক। তাই কেউ কেউ আসেন, রহস্য-সমাধানের খোঁজে। কেউ আসেন ভগ্নুরে দিবানিশা না দিয়ে এমন সময় কাটাতে। কারুর উকিল-বন্ধু আছে, বার লাইব্রেরিতে না বসায় চা-টা জোটে আর মুকতে কেছাও শোনা যায়। আর বেশির ভাগ দর্শক চায় উত্তেজনার খোরাক পেতে। কারুর কারুর খুন জগমের ওপর অশঙ্ক বকমের আকর্ষণ কারুর বা শ্রেক কোতুল। আর রিপোর্টারের দল—এই তাদের কর্ত্তি-রাজগার

তবে কেসটায় বেশ সাড়া পড়ে গেছে শহরে। পাডায় ছেলেদের ক্লাবে, বয়স্কদের মজলশে এমনকি মেয়েলি বৈঠকেও এ মামলার আলোচনা হয়। শিবানীর পরিচিত গোষ্ঠী দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক দল শিবপদর ঘোরতর বিপক্ষে, তাদের মতি স্থির। লাবটা এইরকম—বজ্জাত্ত লোক। মেয়েকে বিয়ে করতে খল না তাই বাপকে খুন করে এল। বাইরে ভজ্জতার ঘুঁশ ভেতরে শয়তান। আর এক দলের মনোগত ইচ্ছা—শিবপদ নির্দোষ প্রমাণিত হোক, আসল আসামী বোধহয় আর কেউ। সাধু ইচ্ছা যায়, কেননা আসল আসামী ক, কিভাবে হঠাৎ ক্রিমিকে চড়াও হয়ে শক্তি পদবাবুকে খুন করে গেল, কেনই বা খামোকা হত্যা করল আর অদৃষ্ট অস্পৃগ হয়ে সরে পড়ল অত শাগগির সে সব বিবেচনা তাদের মনে ঠাই পায় না। আসলে, এদের মন নরম। কেউ শিবপদকে চেনে ও জানে, তাদের ধারণা, সে খুনী নয়। তাই গোপন সহানুভূতি আসামীর দিকে। শিবানীকে অবজ্ঞা কেউ গোলাখুলি কিছু বলেনি, বলতে ঠিক সাহস পায়নি। বাপের মৃত্যুর পর থেকে সে সজ্ঞা এড়িয়ে চলছে তার ওপর তার স্বভাব গাঙ্গীষের আভিজাত্য তো আছেই।

শুধু টুটুর কাছে কখন কখনও সে একটু মন খুলেছে, তার নিজস্ব সন্দেহের কথা ইজিতে বলেছে। কিন্তু গত পনের দিনের মধ্যে সে কারুর কাছেই মুখ খোলে নি। কেবল উকিল নীতলবাবু পারিবারিক বন্ধু ও হিতৈষী বলে তাঁর সঙ্গে কিছু আলোচনা করেছে। আর শচীকান্তবাবু স্নেহশীল মানুষ, পিতৃতুল্য ও প্রজ্ঞেয়। কিন্তু ঠিক সেই

কারণে তাঁর কাছে শিবানী যে ঘটান্নাত করছে ইদানীং তা নয়। তিনি বিজ্ঞানী, অধিকন্তু চাপা ধরনের মানুষ। সেইজন্য তাঁর ওপর নির্ভর করা চলে। আর শচীকান্ত বাবুর শুধু উপদেশ বা পরামর্শ নয়, যত্ন পরিশ্রম এবং সহযোগিতার ওপর শিবানীর কর্তব্য সম্পূর্ণ নির্ভর করছে।

শুক্লাবর সন্ধ্যায় শচীকান্ত শিবানীকে যখন বিদায় দিলেন, তখন শেষ বাবের মতো জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ভালো করে ভেবে দেখেছ তো মা?’ শিবানী মাথা নেড়ে শায় দিল। দরজার কাছে এসে অনেকটা আপন মনেই বলে উঠলেন, ‘আমি শক্তিপদর কথা ভাবছি না, সে এখন ভালোমন্দের ওপরে। ভাবছি, তোমার জন্য। আমাদের পরীক্ষার ফলে কতবড় সুঁকি, বুঝতে পারছ বোধ হয়……’

শিবানী স্নান হেসে বলল, ‘বুঝেছি, কিন্তু আর কি করতে পাতি বলুন।’

শচীকান্ত বিমর্ষভাবে জবাব দিলেন, ‘অন্য কোনো পথও তো দেখছি না……’

সোমবার শেষ পর্যন্ত গড়িয়ে এল। এদিন সবাই হাজির—জঙ্গ-জুডি, দু-পক্ষের উকিল, তাঁদের আদিস্টাট, কোর্টের কর্মচারী, পুলিশের লোক, প্রধান সাক্ষী দল আর বাছাই করা পাবলিক এবং যে কোনও অকুস্থলে প্রথম ছাড়পত্রওয়াল। প্রেসের প্রতিনিধি। স্টেনোগ্রাফাররা পেঙ্গিল মনিয়রে বসে আছে। বাড়ার প্রবীণ উকিল শীতলাচরণবাবুর পাশে বসে শিবানী চার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। পিছনেই টুইল, তার চোখে আজ শিবানীর মুখখানা যেন অস্বাভাবিক রকমের পাংশু লাগল। শিবানী কোন দিন নার্ভাস হয় না। পরীক্ষার হলে যখন ভালোমন্দ সব মেয়েই কোলাপ্স হবার জোগাড় শিবানী তখন একটু বেশী গম্ভীর বা অগ্রমনস্ক হত, আর কিছু নয় কিন্তু টুইলর মনে হল, আজ একটা চরম পরীক্ষা। তার নিজের এ অবস্থা হলে নিশ্চয়ই হার্ট ফেল হয়ে যেত। পিতার মৃত্যুর জন্তু যে ব্যক্তি দায়ী, তার শাস্তি হাক—এ ইচ্ছা যেমন সঙ্গত, অতীত ব্যক্তি সত্যি নিরাপরাধ হলে তার মুক্তিকামনা স্বাভাবিক। শিবানীর আজকের মনের অবস্থা বুঝতে চেষ্টা করে টুইল। শিবপদকে দেখা যাচ্ছে, বসে আছে আসামীর নির্দিষ্ট জায়গায়—দুপাশে দুজন সার্জেন্ট শুক্লাবর মুখ, কিন্তু উত্তেজনার চিহ্ন বোকা যাচ্ছে না। তার অপরাধ প্রায় প্রমাণিত হয়েই গেছে, এখন জুরিদের চূড়ান্ত রায় শুধু বাকী।

আজ খুনের শাস্তি ফাঁসি তো একরকম উঠেই গেছে। খানজাঁবন সন্ত্রাস কারাবাস এখন ছকুম দেওয়া হয়। কিন্তু তফাতটা কোথায়, এটাই বা কয় কিসে? এক মুহূর্তে মরা, আর তিলে তিলে মরা। ফাঁসির ছকুম থেকে বুলে শড়া পয়সা কটাই বা দিন! আর গারদে ঢুকে জীবন্ত হয়ে স্তর্দীর্ঘ মেয়াদ কানানো প্রায় মনুষ্যত্বহীন অবস্থায়…… ভাবতেও ভয় হয়। শিবানী কি ভাবছে? টুইল দেখল, শিবানী স্থির দৃষ্টিতে তার নিজের নখ দেখছে। আচ্ছা, শিবপদর ওপর শিবানীর কতটুকু কোমলতা? শিবপদর মনোভাব তো বিশ্বের প্রস্তাব থেকেই বোকা গিয়েছিল, কিন্তু শিবানীর নিজের……? বড়

চাশা মেয়ে কিন্তু ঠিক বোঝা যায় না ওকে...

ইতিমধ্যে জজ এসে বসেছেন, এবং সরকারী উকিল গলা বেড়ে কায়দাগাফিক একটু কেশে আদালতের অহুমতি নিয়ে জুরিদের সম্বোধন শুরু করেছেন। আসামীর উকিল শ্রেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের দিকে। পিছন থেকে জুনিয়র কিসফিস করে কি যেন বলছে—শিবানী ভাবে—এ সব অভিনয়! উকিলে-উকিলে এই ঝটাপটি যেন মোরগের লড়াই। কোর্ট থেকে বেরিয়ে ওরা আবার বন্ধু বা সহকর্মী হয়ে যায়! পিঠ চাপড়ায় পরস্পর, যে ক্ষেত্রে সে আত্মপ্রসাদে একটু ফুলে ওঠে, কেসের গল্প করে বেড়ায়। যে হারে কিছুক্ষণের জ্ঞাত হয়তো একটু মৃদু হয়ে যায় তারপর যে কে সেই। আসামী ফরিয়াদী, অবজেকশান, মি লর্ড—সব ভুলে গিয়ে আর এক কেস নিয়ে হাতড়ায়। সব অভিনয়!

অল গু ওয়াল'স এ স্টেজ—শিবানীর ঠোঁট নড়ে ওঠে আর কোর্ট রুম হল কিনিশড মিনিয়চার। বক্তৃতা পালা চলছে ততক্ষণ সবাই প্রাণপণে ভালো অভিনয়ের চেষ্টা করছে। যে যার পার্টের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে। আদালতে যারা ভিড করছে, কাল সকালে যারা কাগজ পড়বে, ঐ সরকারী উকিল যার ইংরেজী সন্মতান নতবেডে কিন্তু মুণের তোড় আছে, আর শিবদাসের ধূর্ত দৃষ্টি, উকিল—আর ঐ গম্ভীর মুখ আত্মমতেন জুরির দল—এদিকে দর্শক, রিপোর্টার, এদিকে স্বয়ং জজসাহেব—সবাই পাকা দ্যাক্টর। সবাই খুঁজছে চাইছে একেকটি। সে মিজেরি...? কি জানি—হয়তো এই নীরব প্রতিজ্ঞা, এও একরকম অবচেতন আকাঙ্ক্ষা...

সরকারী উকিল থামলেন। একটু থেমে জুরি বক্সের দিকে তাকিয়ে তাঁর শেষ চাল ছাড়লেন—আপনারা স্থিরভাবে ভালো করে বিবেচনা করে দেখুন—আসামীর অপরাধ প্রাণিত হল কিনা! উদ্বেগ, স্বযোগ এবং উপায় এ তিনটি বিষয় নিয়ে আপনারা এক কয়দিন প্রচুর তর্ক-বিতর্ক, সাক্ষা-বিশ্লেষণ শুনেছেন। উদ্বেগ সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আসামী মৃত বাক্তির কথাকে বিয়ে করতে অত্যন্ত ইচ্ছুক, কিন্তু সেখানে মস্ত বড় বাধা হল পিতার অমৃত। অবশ্য মেয়ে সাবালিকা তাঁর ইচ্ছা থাকলে বাপের অসম্মত সত্ত্বেও বিয়ে হতে পারত। কিন্তু শিবানী দেবী আপনারা সামনেই আদালতে আমার জেরায় স্বীকার করেছেন, তাঁর পিতার সঙ্গে ঝগড়ার পরও আসামী দু-তিন বার তাঁকে বাইরে পেয়ে বিয়ের প্রস্তাব করে। কিন্তু প্রতিবারই সে আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে। স্বতরাং আসামীর আক্রোশ থাকা অস্বাভাবিক নয় এবং সে আক্রোশ গিয়ে পড়েছে মূলত—বাপের ওপর। আশা করি—এটা আপনারা কাছে পরিষ্কার হয়েছে। দ্বিতীয় কথা, স্বযোগ। যে সম্বন্ধে ক্লিনিকের ঘাবতীয় লোক অর্থাৎ তিন চার ও তেরো নম্বর কামরার আটেগাও এবং স্বত্বাধিকারী, দকলের উক্ত আপনারা শুনেছেন এবং নিশ্চয়ই বুঝেছেন, স্বযোগের কোনো অভাব ছিল না। উপরন্তু উভয়ের মধ্যে আবার তীব্র বাদানুবাদ হয় এবং মৃত বাক্তির শেষ কথা—‘কে কাকে খুন করে

দেখা যাবে,—এ দিক থেকে অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। স্পর্শই প্রমাণ হচ্ছে, আসামী তাঁকে শেষবারের মতো শাসিয়েছিল। চার নম্বর কামরায় যখন স্টীম-বাথ নেওয়া হচ্ছে, সে সময়ে তেরো নম্বরের আট্টেগুন্ট কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে আসে। এই সময়ের মধ্যে চট করে বেরিয়ে এসে কাজ হাসিল করা আসামীর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়, বরঞ্চ সহজ। কেননা স্টীম-বাথের কামরা থেকেও আট্টেগুন্ট ঠিক এই সময়েই বাইরে এসে পিছন ফিরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল।

এর পর আসছে তৃতীয় প্রশ্ন—উপায়। এই বিষয়ে আপনাদের হয়তো কিছু ধিঁষা থাকতে পারে। কিন্তু ধিঁষার কোনো ঘাষা কারণ নেই। আসামীর তরফ থেকে বলা হয়েছে, অস্ত্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। আসামী সঙ্গে যে তোয়ালে এনেছিল গা মোছার জন্য সেটা তার তেরো নম্বর ঘরেই পড়েছিল যেখানে তার তোয়ালে রাখা অভ্যাস, ঠিক সেই জায়গাতেই। তোয়ালের মধ্যে ছুরি জাতীয় কোন অস্ত্র ছিল না, কোথাও রক্তের দাগ ছিল না, আসামীর জামা-কাপড়েরে নয়। কিন্তু কারণ অস্ত্র নির্ধোজ হওয়ার মানে এ নয়, আসামী খুন করতে পারে না। এমন কোনো জায়গায় সেটি হয়তো ফেলে দেওয়া হয়েছিল কিম্বা লুকিয়ে রাখা হয় যে কারুর নজরে পড়েনি। তারপর খুনের দৃশ্য দেখে সবাই যখন চকিত ও ব্যস্ত, আসামীর পক্ষে তখন চারদিকের সেই উত্তেজনা ও অত্যাশঙ্কতার স্বাবধা নিয়ে অস্ত্র কোথাও সরিয়ে ফেলা মোটেই আশ্চর্য নয়। এখন আমার নিবেদন—এর মধ্যে ‘রাজনৈবল ডাউট’-এর কোনো অবকাশ নেই...

শিবানী এবার অস্থির হয়ে উঠেছে, ঘন ঘন হাঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে নিচ্ছে। দু-একবার এ-দিক ও-দিক তাকাল। আরও কিছুক্ষণ কাটল। সরকারী ডাকল তখনও জুরিদের বোঝাচ্ছেন। জুরিদের মুখ অনেকটা নিবিচার, শিবানীর মনে হয়—ওদের হাঁচটা একই রকম এবং মতটাও এক... বোধ হয় অপরাধ সম্পর্কে কোনো সংশয় নেই ওদের মনে। কেবল একজনের দৃষ্টি শিবপদর দিকে নিবদ্ধ। যেন অত্যাশঙ্ক, কিছু ভাবছে বোধ হয়। ঘানর ঘানর বক্তৃতায় হয়তো বা অসহিষ্ণু। শিবানী আবার মুখ ঘুরিয়ে আদালত-কক্ষের প্রবেশ-দরজার দিকে তাকাল। দেখতে পেল শচীকান্তবাবু ঢুকছেন হাতে একটা ব্রাউন বগের মোড়ক। চোখা-চোপি হতেই শচীকান্ত ঘাড় নাড়লেন। শিবানী মুখ আবার ফিরিয়ে নিল, আশ্বে আশ্বে নিঃশ্বাস ছাড়ল। স্বস্তির। কিন্তু সময় তো আর নেই।

শীতলাচণ্ডকে শিবানী আশ্বে আশ্বে কি খেন বলল। চমকে উঠে তিনি একবার জজের দিকে তাকালেন, তারপর নিঃশব্দে আসন ছেড়ে শিবপদর জুনিয়র উকিলকে নিয়ে পিছন দিকে সরে গেলেন। সেখানে দুজনে শচীকান্তবাবুর সঙ্গে কি খেন বলাবলি করলেন। জুনিয়রের হাবভাবে একটা ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখা গেল। তারপর সকলে যে ঘর জায়গায় কিবে এলে, জুনিয়র উকিল তাঁর সিনিয়রের পিছনে

এসে বসলেন। ফিসফিস করে কথাবার্তা কিছুক্ষণ চলল এবং একপাশ কাগজ হাত-বদল হল। সরকারী উকিল বক্তব্য শেষ করে এনেছেন,—মাঝে মাঝে আড়-চোখে দেখে নিচ্ছেন ডিফেন্স তরফের গতিবিধি। সেদিকে একটা চাপা উত্তেজনা, মূচ্ছকর্তে গুঞ্জন, সবাই এমন কি জুরিরাও লক্ষ্য করছেন দেখে তিনি একটু চিন্তিত ও অন্ত-মনস্ত হয়ে পড়লেন। তারপর বক্তৃতা আর না বাড়িয়ে জুরিদের কাছে অভ্যস্ত নিবেদন জানালেন প্রতিটি বাক্যের ওপর জোর দিয়ে—‘আপনারাই হলেন শ্রেষ্ঠ বিচারক’ জজের দিকে মুখ ফিৰিয়ে যেন তাঁর অন্তঃকরণে তুলিয়ে বললেন ‘জজ হলেন আইনের চরম বাগ্মাতা; তিনি আপনাদের আইন ব্যাখ্যায় দেবেন কোনটা ঠিক প্রমাণ, কোনটা নয়—সেটা তাঁরই নিজস্ব এলাকা। কিন্তু তথ্যের বিচার করবেন আপনারা, দোষী অথবা নির্দোষ—এ ব্যয় দেবেন আপনারাই। জজ এবং এখানে আমরা সকলেই আপনাদের সূচি-স্থান সিদ্ধান্তের জগৎ প্রতীক্ষা করব...’

শিবপদর উকিল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে জামাতার কাছে বললেন, কয়েকটি তথ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হস্তগত হয়েছে। যদিও সাক্ষাৎকারের শালা শেষ হয়েছে, তবু সাক্ষাৎকারের জন্য শিবানী দেবাকে আবার কয়েকটি প্রশ্ন করতে অন্তর্মতি দেওয়া চাই।

জজ কিছু বিস্মিত কিছু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ তথ্যগুলি কি নতুন আবিষ্কার, আর এত দরদী-ই বা কেন উপস্থিত করা হচ্ছে? বার ডিফেন্স এগুলি অভ্যস্ত জরুরী মনে করেন, তাঁর ব্যক্তিগত কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। সরকার তরফের সম্মতি থাকলে মৃত ব্যক্তির কন্যাকে আবার ডাকা যেতে পারে।’ সরকারী উকিল দাঁড়িয়ে উঠে সাহায্য দিলেন।

শিবানী ধীরভাবে উইটনেস-বক্সের দিকে এগিয়ে গেল। শিবপদর দিকে একবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে প্রশ্নের জগৎ যখন অপেক্ষা করছে, তখন টুছু ঘাডা নেড়ে তাকে দূর থেকে উৎসাহ দিল। সওয়াল শুরু হল:

‘আচ্ছা, আপনার পিতার সঙ্গে ঝগড়ার পর আনামীর সঙ্গে আপনার কন্যাবার দেখা হয়েছে? তিনি কি ক্ষমা প্রার্থনা করে আপনার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব পুনর্বার বিবেচনা করে দেখবার জগৎ অত্বোধ জানান?’

‘হ্যাঁ—তিনবার। কিন্তু আমি রাজী হইনি। বদমাশজের জন্য শিক্ষা হওয়া উচিত বলে...’

কোট রুমে একটু চাপা হাসির শব্দ যেন শোনা গেল। জজ একটু ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘শেষ পঞ্চদশ ক্ষমা করার ইচ্ছা আপনার মনে ছিল কি...?’

শিবানী সোজা জবাব এ’ড়িয়ে বলল, ‘তাঁর তাত্ত্বিকতা কিছু ছিল না। জানতুম আমার মন পরিবর্তনের জগৎ সে অপেক্ষা করবে...’

ডিফেন্স উকিল প্রশ্ন শুরু করলেন, ‘পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট থেকেই কি জানলেন,

নাকি তার আগেই জানতেন, যে আপনার বাবা ক্যান্সার রোগে ভুগছেন...? তিনি কি এ বিষয়ে আপনাকে কিছু বলেছিলেন, মানে তাঁর অবর্তমানে বাড়ী-ঘর এবং আপনার ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন কি... ?

‘আগেই অনুমান করেছিলেন যে, বাম্বি দূরারোগী। আমাকে সরাসরি কোনো দিন কিছু বলেন নি। বাড়ীর ডাক্তার নিশ্চয়ই জানতেন আর বাকিটা জানেন পারিবারিক উকিল শীতলচরণবাবু।’

‘আচ্ছা তিনি কি ইদানীং নিজের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে বাঁচবার ইচ্ছা নেই ?’

‘হ্যাঁ, শরীর ভেঙ্গে পড়ছিল। আর বেশি দিন নয়, জানতেন। দু-একবার বলেছেন, নাঃ—আর বেঁচে লাভ নেই।’

‘আচ্ছা, তাঁর দেহ যে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল, মনের জোর কি সেই সঙ্গে...’

শিবানী আগেই উত্তর দিল, ‘তাঁর মনোবল অসাধারণ। প্রয়োজন হলে, নিজের জীবন নিজ হাতে শেষ করতে পারতেন। আর তাই করেছেনও।’

কোট্টে একটা সাদা পড়ে গেল.....প্রথমে সবাই স্তব্ধ, তারপর একটা চাপা আওয়াজ শ্রবণ হয়ে উঠল। কোটরুম অপেক্ষাকৃত শান্ত হলে জঙ্গমাহব শিবানীকে প্রশ্ন করলে, ‘আপনার এ উক্তির কারণ জানাবেন কি...?’

শিবানী তার বক্তব্য শুভিয়ে নিতে একটু সময় নিল। তারপর দীর কর্ণে বলে চলল—‘প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল—থুনের রকম দেখে যে থুনী, সে প্রাণ করে আসবে। যদি বাইরে থেকে লোক এসে ক্লিনিকে ঢেকে, তা হলে চটপট কাজ সেবে তাকে পালাতে হবে। এবং হতাশার জন্ম মাত-আটাইঞ্চ লম্বা কোনো অস্ত্র আনার দরকারও নেই।’

সকলের মুখে বিষয়ের প্রশ্ন দেখে শিবানী যেন ব্যাখ্যা করে বলল : ‘যে ব্যক্তির মগজে থুনের পরকল্পনা নৈবী আছে সে পাবলিক জায়গায় ডু ছুরি আনতে চাইবে না। একটা স্ক্রু ছুঁচ হাইপোডামিক সিরিজেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। অতএব, থুনী বাইরে থেকে আসে নি,—এই আমার ধারণা হল। ক্ষতের গভীরতা যেখানে তিন-চার ইঞ্চি এবং আড়াআড়ি ভাবে আধ ইঞ্চি, তাহলে অবশ্য একটু বড় গোছের ধারালো ছুরি ব্যবহার করা হয়েছে অনুমান করা ই স্বাভাবিক। কিন্তু তা হলে তাকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়। তারপর ভেবে দেখলুম—শিবপদর ঘারা এ ধরনের হত্যা সম্ভব নয়।’

শিবানী একটু থেমে আসামীর দিকে একবার তাকাল। বলল, ‘সে বদরাগী হতে পারে কিন্তু আসলে দুর্বল ও ভীত। তার গায়ে জামাকাপড়ে, তোয়ালেতে কোনো রক্তচিহ্ন ছিল না। অস্ত্র লুপ্তিয়ে ফেলা অতটুকু সময়ের মধ্যে—তাও অসম্ভব মনে হয়। হতবাক্য যুক্তি অনুসারে চিন্তা করে দেখলে, ছুরি আদৌ ছিল না—এই সিদ্ধান্ত

ছাড়া গতাস্বর নেই—'

গলা শুকিয়ে যাচ্ছে দেখে শিবানী এক গ্রাস জল চাটল। অল্প একটু জল খেয়ে নিয়ে আবার শুরু করল। কোর্টরুম একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে আছে—'ফতের ভেতরে এক টুকরো চায়ের পাতা ছিল, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে প্রকাশ। এই থেকেই একটা নতুন দিকে আশার ভাবনার মোড় ঘুরে গেল। চাকরকে জিজ্ঞাসা করে জে. ডিলুম, সেদিন অর্থাৎ বুধবার সে চা তৈরী করে দেয় নি। বাবা বারণ করেছিলেন। কেন? তাঁর বহুদিনের অভ্যাস হঠাৎ বদলালে কিসের জ্ঞান? যখন শূণ্য ফ্রাস্টটা শব্দে মিলে, তখন অল্প কিছু অভিপ্রায় ছিল বোধ হয়। তারপর গরম কানবোর মেয়ে ফ্রাস্ট পোলা খবরশ্য ছিল কেন? চা তো ছিল না। অথচ ফ্রাস্টের মুখের কাছে কয়েকটা চায়ের পাতা দেখা যায় পুলিশও তা নজর করেছে। সম্ভবত, চাকর ফ্রাস্টটা পরিষ্কার করে গিয়েছিল। কিন্তু চায়ের পাতাগুলো সব এক জায়গায় লেগে আছে আর একটি মাত্র লেগে আছে আর একটি মাত্র পাণি বাবার বুকোর ওপর গিয়ে পড়ল—ঠিক দেখাচ্ছে মাথা-করা হয়েছে! আর সেই পাতাটা ফতের ভিতরে গিয়ে দু'টুকরে হয়ে গেল। একমুহুর্তে যোগাযোগ আমার সঙ্গে বিধান করা শুরু হল। অল্প কিছুক্ষণ দিয়ে মনে নিতে পারলুম না।

বাবা খবর জানার সঙ্গে সঙ্গে হতাশ হয়েছিলেন, বীচেন চাইছিলেন না। কিন্তু নিজের বুদ্ধি ছাড়া কিছুই নেই। চেয়ার থেকে উঠে সেটা ছুঁতে গেলো কিংবা কোথাও লুকিয়ে দাঁড়িয়ে বাপা শাসন অসম্ভব। আশ্রয়তা খুঁজি মধ্যম—কিন্তু প্রমাণ পাচ্ছিলুম না। অল্প কিছুক্ষণ কানো হৃদয় পাই নি। শেষে ভাবতে ভাবতে একদিন মনে হল—লেবরেটরিতেই সন্ধান করতে হবে। যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায় তো সেখানেই মিলতে পারে। আর 'ক্লু' পেয়েও গেলুম খুঁজতে খুঁজতে—

ইনানীং বাবা লেবরেটরিতে বেশ সময় কাটাচ্ছিলেন। কি নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন, জানতে কীতুল হল। এটা-ওটা খেতে দ্রুত নজরে পড়ল দেয়ালের কাছে একটা গ্যাস সিলিন্ডার মাটিতে রাখা হয়েছে। ঘুরিয়ে গভীরে দেখলুম—কোনো লেবেল নেই। কি গ্যাস, জানবার উপায় নেই। কিন্তু এ তো হতে পারে না, কোনো কোনো গ্যাস যে বিপজ্জনক। লেবরেটরির জ্ঞান যারা যত্নশীল পাঠাতো, সেখানে খবর ধরলুম। বাবা জানালো, মৃত্যুর মাস খানেক আগে তারা কানন ডায়োসাইড—এর একটি সিলিন্ডার পাঠায়। স্ট্রীট ফ্রিয়ে গেল ফেরত নেওয়া হয় এবং আবার কুড়ি গাটীশ দিন পরে আর একটি সিলিন্ডার পাঠানো হয়। বাবার টেবিলের ডায়ারে পুরানো কাগজপত্র ঘেঁটে কয়েকটা বিল বার করলুম। দেখলুম, প্রত্যাহাতিন থেকে চার দেব করে বরফ সাপ্লাই করা হয়েছে—এই কানন ডায়োসাইড খার বরফ আসা—এ দুটো জিনিস একত্র করে দেখতে ও ভাবতে শুরু করলুম। কানন ডায়োসাইডের ফ্রি লং পয়েন্ট খুব নীচু—আশা ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, শচীকান্তবাবুর কাছে জেনেছিলুম—'

আদালত-ঘরে একটি পিন পড়ায়ও শঙ্ক নেই—সবাই উদগ্রীব হয়ে শুনেছে আর তাবছে—তারপর ?

শিবানী একটু থেমেছিল। দম নিয়ে আবার শুরু করল—“সিলিগুরি থেকে গ্যাস বেরিয়ে যখন বাইরের হাওয়ায় সঙ্গে মেশে, তখন মিহি পাউডারের মতো তুষারে পরিণত হয়, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। সেই সুর-সুরে বরফের গুঁড়ো যদি জোরে চেপে রাখা যায়, তাহলে শক্ত বরফ তৈরী হতে পারে। অর্থাৎ কমপ্রেসন করলে নরম ফুঁয়ে-ওড়া তুষার-কণা জমাট এবং অত্যন্ত কঠিন বরফ হয়ে দাঁড়ায়। তখন হঠাৎ আমার মনে একটা বড় রকমের সন্দেহ চমক দিয়ে গেল। বাবা হয়তো লেবরেটরিতে শেষ দিকে এইরকম পরীক্ষা নিয়ে বাস্তব থাকতেন। হয়তো ঐ গ্যাসের সাহায্যে গুঁড়ো বরফ সৃষ্টি করে তাকে একটা ছাঁচের মধ্যে ফেলে এমন কোনো অস্ত্র তৈরী করেছিলেন যা দিয়ে অনায়াসে ছুরির মতো মায়াবীক আঘাত করা চলে...”

শিবানী একবার শীতলাচরণের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর গায়ের কাপড়টা একটু টেনে ঈষৎ মুখ নীচু করে ধীর সংযত কণ্ঠে বলে চলল :

‘বাবা তাই-ই করেছিলেন। এ আমার নিশ্চিত ধারণা...’

জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, একটু স্বীকৃতি, ‘ওঃ আপনার ধারণা? কিন্তু তার সত্যতার কোনো প্রমাণ আছে কি?’

শিবানী মুহূর্তে কিছু স্পষ্ট স্মরণে বলল—‘আছে,—বলছি সে কথা। বাবা কাবন ডায়োসাইড জমিয়ে ছোরা বা ছুরি জাতীয় অস্ত্র বানিয়ে নিয়ে সেটা বরফে ডুবিয়ে রাখতেন। কয়েকবার পরীক্ষার পর তিনি নিশ্চয়ই সফল হয়েছিলেন, কেননা পরপর কয়েক দিন বরফ আনিয়ে মৃত্যুর ছু একদিন আগে বরফের অর্ডার বন্ধ করে দেন। পরীক্ষার আর দরকার ছিল না। যতটা লক্ষ্য এবং শক্ত অস্ত্রের প্রয়োজন, তা তৈরী হয়ে গেলে থার্মোস্ট্যাট সেটা রেখে দেন আগের বাতিরে। কারণ ফ্রাঙ্কে চা যেমন গরম থাকে, বরফও তেমনি ঠাণ্ডা থাকে। তা ছাড়া, অস্ত্র অস্ত্র চলত না। বরফের ছুরি এমন জিনিস—যা ঝপ করে বসানো যায় এবং ক্রিনিকের ষ্টিম বাষ্পকমের উগ্র গরমে তখনই গলে গিয়ে উড়ে যায়? অস্ত্র নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই ধরনের ছুরিই ব্যবহার করা হয়েছিল, নইলে চায়ের পাতার কোনো ব্যাখ্যা হয় না।

ছুরির দল নির্বাক হয়ে শুনেছেন, একজন শুধু প্রশ্ন করলেন—‘কেন হয় না?’

শিবানী জজের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ফ্রাঙ্কে চায়ের কিছু পুরানো পাতা ছিল। তার একটা ছুরির ডগায় নিশ্চয় লেগেছিল, নইলে ক্ষণের মধ্যে গিয়ে দুটি ছোট টুকরো হয়ে গেল কি করে...?’

জজ এবার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কিন্তু এ সবই তো আপনার নিজের অনুমান ও ব্যাখ্যা। সপক্ষে কোন প্রমাণ...?’

কথা শেষ হবার আগেই শিবানী ব্যাগ থেকে কি যেন একটা সবুজ-কালো জিনিস বার করে সামনে ধরল। বলল, 'এই যা প্রমাণ। এটা হলে ঐ ছাঁচের পয়েন্টেড মুখ, এরই মধ্যে গুঁড়ো বরফ ঠান করে জমিয়ে রাখলে ছুরির ছুঁচালো মুখ তৈরী করা যায়। অনেক খুঁজে শুধু শেষের এই অংশটুকু পেয়েছি। বাবার লেবরেটরিতে একটা পুরানো টেবিলের সাইড ড্রয়ারে ওটা পড়ে ছিল। এইরকম বাস্তব প্রমাণেরই দৃষ্টান্ত করছিলুম এত দিন আর ছুরির বাকী অংশটা কি দিয়ে তৈরী হল, সেটা বলতে পারবেন শচীকান্তবাবু।'

কোর্ট জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে শচীকান্তবাবু পেচন থেকে এগিয়ে এলেন। কোর্টের অধ্যক্ষ নিয়ন্ত্রিত ভাবে বক্তব্য পেশ করলেন : 'শক্তিপদ আর আমি সত্যীর্থ ছিলাম। উভয়েই এককালে বিজ্ঞান-চর্চা করেছি। ঠিকমতো ছাঁচ পেলে অমনি কঠিন ও মারাত্মক ছুরি বানানো যেতে পারে। শিবানী তার সন্দেহের কথা আমাকেই প্রথম জানায়। ভেবে দেখলুম—সন্দেহ অমূলক নয়। বাপের ছুঁচালো মুখটা খুঁজে পেয়ে সে যখন আমার কাছে আসে, তখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হল যে, বাকী টুকরোগুলো খুঁজলে পাওয়া যাবে। লেবরেটরিতে ভাঙা টেস্টিটিউব, পুরানো আর তার ফেলে-দেওয়া অকেজো জঞ্জালের মধ্যে গোল গোল করে একটা ভালকানাইট-খাপের অংশ পেয়ে গেলুম। শুধু ঐ মুগটা—যেটা সবচেয়ে দরকারী—শক্তিপদ বোধ হয় ড্রয়ারে আলাদা সাবয়ে রেখেছিল। শিবানীর কথাই ঠিক—কেননা আমাদের ধারণা শুধু ধারণাই থেকে যাবে, যতক্ষণ না শক্তিপদ যন্ত্র ব্যবহার করেছিল, ঠিক সেই জিনিস বানিয়ে লোকের সামনে ধরা যায়। এ কয়েকদিন ধরে কাবন ডারোজাইড নিয়ে ভালকানাইট-ছাঁচের মধ্যে যা-পরখ করে দেখে'ছি—তা এই'

তারপর সঙ্গে আনা সেই ব্রাউন মোড়ক খুলে একটা খার্ম বার করলেন শচীকান্ত। কোর্ট এবং জুরীদের সন্ধানন করে বললেন—'এর মধ্যে বরফ জমানো ছাঁচে ফেলা অস্ত্র রয়েছে। কুলশি বরফ যেভাবে টিনের গোলে তৈরী হয়, এও সেই রকম.....'

ফ্রান্স থেকে প্রায় সাত আট ইঞ্চি ঝকঝকে ঠাণ্ডা বরফের ছুরি বেটিয়ে আসতেই, জজ জুরি ও সমবেত সকলে নিঃশব্দে সেই হত্যার এতদিন অদৃশ্য ও পলাতক স্ত্রীটি দেখে নিলেন। একটা নিশ্বাস ... তারপর ধমধমে কোর্টরুম স্বতঃস্ফূর্ত করতালিতে হঠাৎ মুখর হয়ে উঠল।

জজসাহেব চেষ্টা জরুতি হেনে যা বললেন তার মমার্থ—আদালত ঠিক বুদ্ধমঞ্চ নয় এবং জনতার উৎসাহ শাস্ত না হলে কেস মূলতুবী থাকবে। তারপর সরকারী উকিলের দিকে সপ্রস্তাবে তাকাতে তিনি উঠে বললেন, 'সরকার এ মামলা প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত প্রসিকিউশান-পক্ষ এ বিষয়ে একমত'

'এবং আমরাও.....'

জুরির কোরম্যান সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে কোর্টকে সন্ধানন করলেন, 'আসামী

নির্দোষ—বর্তমান প্রমাণের পর আমরা এ কথা জানাতে চাই।’

শিবানী কোর্ট থেকে বেরিয়ে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছে। মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ—দীর্ঘদিন মানসিক ও শারীরিক চাপের অবশ্যস্বাভাবিক ফল। সামনে শচীকান্তবাবু চুই ও শিবানী। শীতলাচরণ পানাই ছিলেন, একবার আমতা আমতা করে বললেন, ‘শিবপদম খবরটা নিয়ে গেলে হত না……?’

‘থাক্ এখন……পরে তো দেখা হবেই……’ শিবানী ঈষৎ শ্বাস হেসে বলে। সে তখন ভাবছে জঙ্গলাহেবের শেষ প্রশ্নের কথা—‘আপনি কি মনে করেন, আপনার পিতার এই আত্মহত্যা ইচ্ছাকৃত—তিনি জেনে-শুনে এক নির্দোষ ব্যক্তিকে এভাবে জড়িত করে তাকে চরম অপরাধী প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন……?’

শিবানী চুপ করে ছিল—তারপর মুহূর্তে জবাব দিয়েছিল, ‘সম্ভবতঃ তাই……’ কি করে বোঝাবে সে—শ্রাস্ত্র ও যুক্তিনিষ্ঠ মানুষেরও অবচেতন মনে কিভাবে কাজ করে—স্বাস্থ্য মেজাজ এবং ক্রোধের জেদ মানুষকে কতটা নির্ভর করে তুলতে পারে……। মানুষের চরিত্র তার ব্যক্তিত্ব, তার কার্যকলাপ কি বিভিন্ন। এমন কি—বিরোধী সম্ভার সমাবেশে তৈরী হতে পারে না……?’

শিবানী গাড়ীতে উঠে বসল। সঙ্গে শুধু শচীকান্ত—রিপোর্টার ও ফোটোগ্রাফারের দল ছেকে ধরবার আগেই আদালতের কম্পাউণ্ড থেকে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন।

এক সাংবাদিক তাঁর দুই তরুণ সাহিত্যিক-বন্ধুদের নিয়ে আশ্রয় শেষ সুনানীর দিনে কোর্টে এসেছিলেন। লাঞ্চার আগেই তো কেস খতম। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁরা ভাবছেন, এখন কোথায় যাওয়া যায়। ছস করে গাড়ীখানা বেরিয়ে যাচ্ছে এমন সময় পাশ থেকে শিবানীর ক্লান্ত কঠিন মুখ তাঁর নজরে পড়ল।

বন্ধুদের বললেন—‘ঐ যাচ্ছেন শিবানী—কি আশ্চর্য শক্ত মেয়ে……সত্যি মাথাটা সাংঘাতিক ঠাণ্ডা…… নাঃ? আর কি একখানা ড্রামা……!’

বন্ধুদের একজন বলে উঠলেন—‘হ্যাঁ ড্রামাই বটে, তবে লিটিকের ছোয়াচ আছে। শক্তিপদ কেটে পড়লেন শিবপদকে ফাঁসিয়ে……কিন্তু ফাঁস ফাঁসে গেল……শিবপদ তো এখনই শিবানীরই পদে……!’

দ্বিতীয় বন্ধু অকৃতমস্ক ছিলেন, একটু থেমে বললেন—‘না, ও সনেট।’

‘চুলোয় থাক নাটক আর কাব্য!’ বললেন নবীন সাংবাদিক। ‘গলা শুকিয়ে কাঠ। ও দেশ হলে বলা যেত—এক পাক্তর হলে মন্দ হয় না। কিন্তু……কিন্তু অতঃপর……ককি হাউস ছাড়া গতি নেই।’

দ্বিতীয় বন্ধুটি গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—‘না এখন ফাস্ট ক্লাস টি ইজ ইণ্ডিকেটেড……’

একটি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

সাংবাদিক বললেন—‘তা হলে তাই.....আমার ফেভারিট টী-শপে যাওয়া থাক
ওরা ফার্স্ট ক্লাস অবশ্য শিকোটি স্মৃতি করে।’

ভুরু কুঁচকে সাহিত্যিক বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ব্রোকন তো

*

*

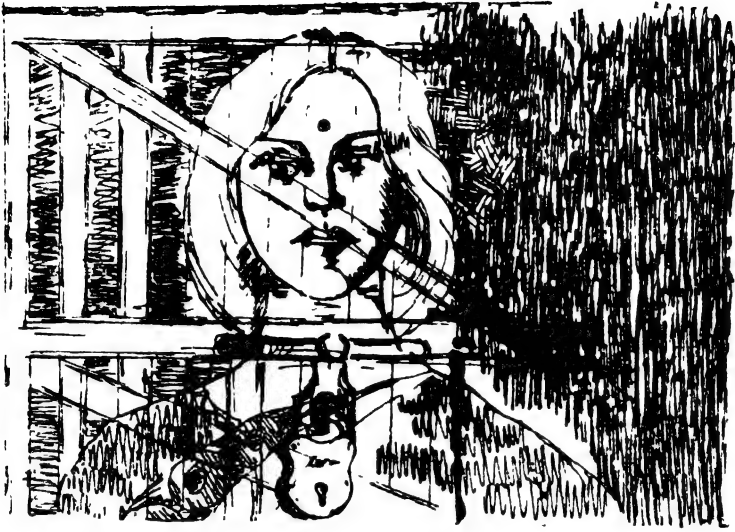
*

বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় : জন্ম ফেব্রুয়ারী ১৯০৬, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ,
ও অধ্যাপক হিসাবে সুপরিচিত। দীর্ঘকাল ইতিহাস অধ্যাপনার সঙ্গে তিনি সাহিত্য
চর্চায় নিজে থেকে নিযুক্ত রেখেছেন। কবিতায় তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ত্রিবিংশ দশকের
শেষভাগে। তারপর গল্প প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যে মননশীল লেখক হিসাবে
তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও কৃতিত্ব সমাদৃত হয়। প্রবন্ধ সাহিত্য, বিশেষ করে রস-নিবন্ধে ও রম্য
রচনায়, তিনি অগতম পথিকৃতির প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। সাহিত্যে ও ইতিহাসে
তাঁর অবাধ সঞ্চরণ। তাঁর কাব্য গল্প, রস-প্রবন্ধ, অনুবাদ এবং ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের
সংখ্যা কম নয়। এ ছাড়া, গোয়েন্দা ও ভৌতিক কাহিনী সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ
সুগভীর।

*

*

*



আমার প্রিয় সখী ।

সন্তোষ কুমার ঘোষ

আমার প্রিয় সখীর কথা লিখছি ।

সকালে খবরের কাগজটা খুলেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম । আমার হাত কাঁপছিল । আমার মুখও বিবর্ণ হয়ে গিয়ে থাকবে । আমি তো দেখতে পাইনি, রিফ্রেসমেন্ট ক্রমে আর যারা ছিল তারা বলতে পারবে । চায়ের পেয়ালার ফসকে পড়'ছিল, কোনক্রমে সামলে নিলাম । টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ধরে । দাম দিয়েছিলাম কি দিইনি এখন আর মনে নেই । অদ্ভুত গলায় একবার বলেছিলাম, বনরেখা বনরেখা আমার এখনই বেলপুলিশকে খবর দেওয়া উচিত এখনই, এখনই, এখনই ।

আমি যে অতটা ভেঙ্গে পড়েছিলাম তার অনেকটাই ভয়ে আর ক্লান্তিতে । সারারাত ঘুমোতে পারিনি । ওয়েটিং ক্রমে সমস্তকণ আলো জ্বলছিল, কোথা থেকে কিমে ফিরে আসছিল দু-তিনটে মশা, আমার কানে গোপন কোন কথা বলতে চাইল, কী সেকথ , আমি জানি না । ওদের ভাষা আমি বুঝতে পারিনি । হেলানো চেয়ারটাও আরামপ্রদ ছিল না । পিঠ আর কাঁধের কাছটা টন্টন্ করে উঠেছিল । ছারপোকার চোরা ছুরি তো ছিলই ।

আরও একটা জিনিস দেখলাম প্রাটিকর্ষটা কখনও ঘুমোয় নি ।

মাঝে মাঝে দূষ-পান্নার গাড়ি এসে দাঁড়ায়, ইপায় ; মনে হয় বেগে আছে । ওরা যোগেই থাকে, নিশান পেয়ে চলে, সেও যেন রাগত ভাবে ।

আমি চোখের পাতা খুলেছি আর দেখেছি। একবার প্রাটিকর্ষটার পায়চারি করেও এলাম। তখন সব ঠাণ্ডা, নিথর। কয়েকজন কুলা-কুঙলা পাকিয়ে শুয়েছিল, দপ্‌দপ্‌ করছিল স্নিগ্ধালের আলো। তারবাবু সোজা হয়ে বসে টেবটকা করছিলেন।

আবার এসে শুয়েছি হেলানো চেয়ারে। অস্বস্তি যায়নি। অস্থিরতা বোধ করছি। একী অনিচ্ছা রোগ আমাকে পেয়ে বসল। কেন ঘুমোতে পারছি কেন না, এই ভয়? ওয়েটি ক্রমে মাঝে মাঝে কারা আসছিল, খানিক বসে হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে ওরা চলে যাচ্ছিল। খুব মুহূর্তে কথ্য বলছিল কেউ কেউ, কী বলছিল আমি বুঝতে পারিহলাম না। প্রাটিকর্ষটার পায়ের শব্দে পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়েছি, আচ্ছন্ন চেতনা, আবিল দৃষ্টি, সব ছায়া-ছায়া দেখছি। ভয়ে আড়ষ্ট আমি ভেবেছি ওরা সবো যায়না কেন? আবার সরে গেলেও চমকে উঠেছি। একাকীত্ব নামে ভয়ঙ্কর একটা রাক্ষস এই ঘরেই কোথাও লুকিয়ে আছে, হয়তো এই হাট বাকটার পিছনে কিংবা মানুষ-প্রমাণ টেবিলটার তলায়, সে আমাকে একবার গ্রাস করবে। ভাগিন্স কারা ভারী ভারী মেল ব্যাগ ও-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবদি ঠেলে নিয়ে গেল, সেই ঘর্ঘর শব্দে আমি ভরসা পেলান, নইলে বুঝি বা মুর্ছাই যেতাম। সকালে উঠেই চোখে মুখে ভাল করে দল ডিটিয়ে দিয়েছি। চেহারা দেখেছি আয়নার। ছি, ছি, চোখের কোলে এত কালি! তারপর চায়ের ঘরে কী ঘটল আগেই বলেছি। আমার হাত থেকে খবরের কাগজটা পড়ে গেল, চেয়ার থেকে আমি পড়ে যাচ্ছিলাম! চোখে সূচাগ্র বিরক্তি আর বিষয় নিয়ে ওরা আমার দিকে চেয়েছিল। আমার মনের ভিতরে কী ঘটেছিল বলতে পারব না, আমি এ বাপারটা জানতাম, যেন জানতাম! কাল দারারাত জুড়ে আমার মনে কালো পিঁপড়ের মত ভয় ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসেছে, ছেয়ে ফেলেছে, দংশন করেছে। সেই ভয়ের উৎসে আমি নিমেষে পৌঁছে গেলাম।

আচ্ছন্ন অভিভূতের মত আমি চায়ের ঘর থেকে উঠে এসেছি। খেয়াল হতে দেখি, বসে আছি বেলপুলের ঘরে। আমার স্তটেকশটা আবারই সামনে রাখা, টেবিলের ওপরে।

মনে আছে, পুলিশ অফিসারটি মাথা নীচু করে কী লিখছিলেন, আমাকে দেখে মাথা তুললেন। একটু অবাক হয়ে থাকলেন, কিন্তু আমাকে বুঝতে দিলেন না ইজিতে একটা চেয়ার দাঁখিয়ে আবার লিখে চললেন।

আমি বসে আছি। মাথার উপর পাখা ঘুরছে, দেখছি বাড়ির কানো সবচে, ওঁর লেখা আর শেষ হয়না। একজন সেপাই এসে দাঁড়াল, সেলাম করল, ক্লিক করল গোড়ালিতে গোড়ালি মিলিয়ে, শুনতে পেলাম। লেগে কাগজটা তার হাতে তুলে দিয়ে অফিসার আমার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে ভাবি-ভাবি গলায় বললেন, বনবেশ্য রায়ের যত্না সম্পর্কে কী বলবেন, এবার বলুন।

এবার অবাক হবার পালা ছিল আমার। অফিসারটিও সেকথা বুঝে থাকবেন। হেসে বললেন, ভাবছেন, এ বিষয়ে আপনি কথা বলতে এলেন কী করে বুঝলাম, ওয়েল, আমরা সবাই শার্লক হোমস নই, কিন্তু হতে সাধ সবাইই অল্প বিস্তর আছে। ছোটখাট চমক দেওয়া আমার অভ্যাস। অথচ আমরা সামান্য পুলিশ, আপনাদের ডিটেকটিভ বইয়ে যারা মূঢ় হাসি ঠাট্টার পাত্র। গোয়েন্দা গল্প পড়ে নিশ্চয় আপনাদের ধারণা হয়েছে আমরা ইন্ট-কাঠের মতই নিরেট, খুন-টুনের কিনারা এ ছানিয়ার শুধু লখের গোয়েন্দারাই করে।

তা নয়, শ্রীলা দেবী, আমরাও করি। বেশি বড়াই করোচ্ছ বলে যদি মনে না করেন, তবে বলি আমরাই করি। সামান্য যা বুদ্ধি বিবেচনা আছে, তাই খাটাই। আর মনে মনে মানবেতর জীব বলে গালাগাল দিতে চান দিন, কিন্তু আমাদের, অর্থাৎ পুলিশের, পশুর মত ইন্টুইশন, মানে সহজাত বোধও আছে। তা দিচ্ছেই অনেক সময় অস্বাভাবিক ডিল ছুঁড়ি, দু-চারটে লেগেও যায়।

অফিসারটি সিগারেট ধরিয়ে আবার বললেন, আপনার নাম জানতে অবিশ্রুতি বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয় নি, আর ও বস্তুটি ইন্টুইশন দিচ্ছেও জানা যায় না।

সামুদ্রিক বিজ্ঞা দিয়েও হয় তো যায়, তবে আমি চোখ দিয়েই জেনেছি। নহাত নিরক্ষর ত নই, আপনার স্ট্রটকেনের ওপরেই যে লেবেল লাগিয়েছেন তাতে আপনার নাম লেখা আছে। এবার বলবেন, বনরেখা রায়ের সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে চান, ধরলুম কী করে? ফ্রাঙ্কল বলব, ওটা আন্দাজ। থানিকটা, পুরোপুরি নয়। আপনার নামের নিচে লেখা আছে পাটনা। বনরেখাও ওখানে থাকতেন। দিলাম টিল ছুঁড়ে। লাগল। না লাগলে আপনি প্রতিবাদ করতেন। এখনও করেনি।

আমার কপালে ঘাম ফুটছিল। অফিসারটি বললেন, আর দেখুন রেলপুলিশের ঘরে মেয়েরা সচরাচর পান না।

আপনি এলেন। এই জংশনে আজ গোলমালে কিছু ঘটেনি, ঘটলে হৈ-টৈ হত, আমরা এমনতেই জানাম। অতএব আপনি এমন কোন বিষয়ে কিছু বলতে চান, সেটা এখানে নয়, অত্র কোথাও ঘটেছে। যে ঘটনার কথা আপনি এইমাত্র জানতে পেরেছেন। সেটা কি হতে পারে? আপনাদের যাত্রীদের জানবার একটা উপায়, খবরের কাগজ। সেই কাগজেই শ্রীলা দেবী, আজ বনরেখা রায়ের মৃতদেহ আবিষ্কার ছাড়া চাকলাকর খবর আর কিছু নেই। সিগারেট নাবয়ে অফিসারটি পাখাটাকে আরও জোরে চালিয়ে দিলেন। কিন্তু ঠিক যখন হয়েছে, তখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এবার আপনার কথা বলুন।

তখনকার মত আমি শুধু বলতে পারলাম, এক গ্রাস জল।

সমস্ত গ্রাসটি ঢক্ ঢক্ করে নিঃশেষ করে আমি অফিসারটির হাতেই তুলে দিলাম। আমার হাত তখনও থর থর করে কাঁপছিল।

শ্রীলা দেবী, আপন খাতা স্ব বিচলিত হয়েছেন। তবু আপনাকে স্থির হতে হবে। অফিসারটির গম্ভীর কণ্ঠ শুনে পেয়েছি। একটু সাহসও খেন পেয়েছি।

বনবেশা রাগকে আপনি কতদিন থেকে জানতেন?

তিনি আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন।

আর?

মনে আছে, শুদ্ধিয়ে বলতে পারি নি, আমার গলা বারে বারেই কেঁপে গিয়েছে, কখনও অকারণে উঠেছে উচ্চগ্রামে, কখনও নিচের পর্দায় নেমেছে। তবু জানতাম, আমাকে বলতে হবে। বলতে হবেই। যখনই খেঁচ হারিয়ে গিয়ে, মাথা তুলে চেয়েছি অফিসারটির দিকে।

ওঁর পেন্সিলটি অক্লান্ত চলছিল। মাথার ওপর পাখাটাও অক্লান্ত চলছিল, আর গম্ভীরে স্টেশন ইয়ার্ডে মালগাড়ির সাক্ষিৎ-এর বিরাম ছিল না।

বনবেশা আমার বাগ্যসখা। কলকাতার একই পাড়ায় আমাদের বাসা ছিল, একই স্কুলে পড়েছি একই ক্লাশে।

সে ফার্স্ট ক্লাসে আমি হতাম সেকেন্ড।

আপনি কোনবার ফার্স্ট হতেন?

না, একটু লজ্জা পেয়েছে যেন। আবার বলেছে, একবারও না। আমি সেকেন্ড হতাম বটে, কিন্তু বনবেশা আমার চেয়ে চার ভালো মেয়ে ছিল। একটু খেন আমি আবার যোগ করলাম, শুধু লখা পড়ায় নয়, সব বিষয়ে।

অফিসারকে বলতে শুনলাম, অর্থাৎ?

আমি এসেছি প্রাণের তাগিদে, অদৃশ্য কোন দৈবশক্তির প্রেরণায়। বলতেই তো এসেছি, তবু লোকটা জেগে করছে কেন? বিরক্ত গলায় বলেছি, অর্থাৎ আপনিই করে নিন। খাভাস বললে আপনি তো লোকে নন। বেশ দোজাতাজি বলছি, লিখে নিন। বনবেশা রূপে শুধু খাখাচে কেন, বাংলা দেশের অনেক মেয়েকেই হার মানাতে পারত।

ওঁর বাড়ির সবুজ খুবই ভাল। যে আমার বাড়িতে আমি খেয়েপরে মানুষ, তিনি ওঁর টাড়াঘাটে ছিলেন। ওই পাড়াতেই ওঁর আরও তিন-চারটে বাড়ি ছিল বলে শুনেছি। আমার নজর পড়ার বই প্রায়ই কেনা হত না, বনবেশার কাছ থেকে ধার করে এনে পড়তাম। বরাবরই ওর খুব উদার মন, কখনও কিছু মনে করত না এমনকি আমাকে অনেকবার বলেছে, তোর নজর বই নেই বলেই তুই ফার্স্ট হতে পারিস না। থাকলে আমাকে নিশ্চয় হারিয়ে দিতিস। টিফিনের সময় ওর জলখাবার আমবা ছুঁজনে ভাগ করে খেতাম। এছাড়া মাঝে মাঝে কত ছোটখাটো প্রজেক্ট ও আমাকে দিয়েছে তার হিসেব নেই। বড় হয়েও আমাদের বন্ধুত্ব যায় নি। আমবা কলেজেও একই সঙ্গে পড়ি। সেখানেও আমাকে ও অনেক সাহায্য করেছে। তবে

গোয়েন্দা (প্রথম) - ১৮

আমাদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়েছিল তো, আমি সকালে-বিকালে ছোটো টিউশনি নিয়েছিলাম। তাই ক্রমান্বয়ে পাশ কোর্সে বিনয় পাশ করলাম, ও উঁচু অনার্স পেল। পরে ও এম-এ আর বি-টিও পাশ করেছিল।

আর আপন ? বিয়ে করলেন ?

অফিসারটির অশোভন প্রশ্নে বিব্রত একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমি এসেছি বনবেথার শোচনীয় মৃত্যু সম্পর্কে কিছু বলব বলে, অপ্রয়োজনীয় নানা প্রশ্ন তুলে ওর লাভ কী? সময় নষ্ট করতে পুলিশের জুড়ি নেই।

তবু মনের ভাব গোপন করতে হল। বিরক্তিতা স্বাভাবিক চেপে বললাম, না। বরং বনবেথাই বিয়ে করেছিল।

কবে শ্রীলা দেবী, কতদিন আগে ?

পড়তে পড়তেই।

কাকে বিয়ে করলেন বনবেথা দেবী ? কোন সহপাঠীকে ?

লোকটার কিছু সহজা-বুদ্ধি আছে আবার কয়েতই হবে। বললাম, হ্যাঁ। তাঁর নাম প্রসাদ রায়

আপন তাকে চিনতেন ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আশ্চর্য হয়ে বললাম, চিনতাম।

ঠিক ঠিক বলতে গেলে বলব, প্রসাদের সঙ্গে আমিই আলাপ করে দিয়েছিলাম। ঘটকালি ?

একবার উত্তর দিলাম না। নির্ভজ্ঞ না ছোড় লোকটা আবার বলল, এইবার বলুন তো শ্রীলা দেবী, এটা বিয়ে কি স্থগিত হয়েছিল ?

এবার আর নজরক সংঘত রাখতে পারিনি। ঝোঁকের সঙ্গে বলে উঠেছি, মাপ করবেন, অকৃত্রিম দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে খবর রাখা আমার ব্যক্তিগত বিষয়।

লগ্নাখানায় খানসামাটি টেবিলের উপর পোশাকটা বাজালেন। মনে হল, হয় তো একটু অপমানিত হয়েছেন। একটু পরে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন, সত্যিই আমার অপরাধ হয়েছে শ্রীলা দেবী! আপনি ক্রোধ, শোকাভূত সে কথাটা মনে ছিল না।

তবুলাম, এবারের উনি বলবেন, আচ্ছা যেতে পারেন। ছুটি পেরে আমি নিজের কোনওটি কাপ খুঁজে নিয়ে একটু কাঁদব, একটু ঘুমিয়ে নেব।

অন্য আশা করা ভুল হয়ে গেল। অফিসারটি আনাকে ছুটি মিলেন বটে, কিন্তু সাময়িক ভাবে বললেন, আপনি শুয়েটিংয়ের ফিরে যান শ্রীলা দেবী। শুধু একটা অনুরোধ আছে। পরের বাড়িতে যেন পাটনায় চলে যাবেন না। আমাদের চাক পুণেন্দু মোল্লার নাম শুনেছেন ? তিনি খবর পেয়ে দিয়েছেন দানবদে। ওই সেকটরেই খুনটা হয়েছিল কিনা। অকুস্থলের তদন্ত শেষে বোধ হয় শিগগিরই

কিবে আসবেন এখানেই। তিনি হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা হলে হাতে স্বর্গ পাবেন।

চীফ মৌলিক সত্যিই তহলোক। অসাধারণ চেহারা, অনেকদিন বাড়ীতে যাগা পাকা আমের মত রঙ। বললেন অসংখ্য ধনাবাদ শ্রীলা দেবী! আপনি নিজে থেকে আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন, কিভাবে আমাদের কৃষ্ণতা জানাব বুঝতে পারছি না। আমাদের পক্ষে আপনিই হবেন মেটিরিয়াল উইটনেস।

বলতে বলতে পকেট থেকে কাগজ পর বের করলেন সাহেব। খাপ থেকে চশমা বার করে নাকের ঘণাস্থানে সন্নিবিষ্ট করে বললেন—বাড়ি সাঁচ করে মৃতের জিনিসপত্র ঘেঁটে, কলকাতায় আর পাটনায় তার করে আমরা মান্যতা কিছু থবব নংগ্রহ করেছি, আপনাকে পেয়ে ভালই হল। আমরা ৫০টিমুটি যে তথ্য দাঁড় করিয়েছি, আপনাকে বলছি। আপনি কনফার্ম করবেন। যেখানে মনে হবে আমাদের ভুল হচ্ছে, শুধরে দেবেন। শুভুন।

মৃত বনবেথা রায়েব বয়স আঠাশ কি উনত্রিশ, এন, এ, বি-টি। পাটনার “গার্লস ওন স্কুলের” প্রবান। শিক্ষয়িত্রী। পাটনাতেই স্বামীর সঙ্গে বাস করতেন। স্বামী বিশেষ কিছু করে বলে মনে হয় না। শ্রীলা দেবী, ঠিক বলছি?

দানী বনবেথা, ঠিক।

প্রসাদ আর বনবেথার বিয়ে পরের ঘটনা আমার মনে ছবিব মত ভাসছিল। ওরা গোপনে বিয়ে করবার পরে অনেকদিন ঘটনাটা জানাজানি হতে দেয়ান। যখন হল, তখন কী চাকলোর সৃষ্টি হয়েছিল ওদের বক্ষণশীল পরিবারে। বাবার সেরা মেয়ে বনবেথা, তার জন্মে ওঁরা বাকপুত্র গড়বার কদনাস দেবেন ভাবছিলেন, সেই সময়ে এই বিপত্তি। মা কেঁপেছিলেন, বনবেথা টলেন। বাবা তক্তন করেছিলেন, ও ভাঙেনি। সেই সময় ওর অসামান্য মনের জোর দেখেছি। ওর দাদা নাকি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, প্রসাদটা তো এন্টা লোকাল। তোর নন্দু শ্রীলার সঙ্গেই ঘুবতো বলে শুনেছি। হি-হি, বন, তুই একটা বাজে লোকের—

দাদা! বনবেথা শালীনত ভুলে চিৎকার উঠেছিল।

ওর দাদাও সম্মান গণা ভাঙে বলেছিলেন, ঠিক বলছি। আমি জানি ও কী চায়। তাকে নয়, আমাদের টাকা।

বনবেথার মুখ রক্তশূণ্য হয়ে গিয়েছিল। ও কাঁপছিল।

ওর বিষয়া কাফা এখন বলেছিলেন, এখনও উপায় আছে। এ বিষয়ের বিচ্ছেদ হতে পারে। তুই মনটা খদ শক্ত করিস, আমি উকলের পরামর্শ নিতে পার।

বনবেথা তার মন শক্ত করেছিল। বাবা লোকাল বলেছে প্রসাদকে, বাবা তাকে শনৈশ করে অসংলুপ বলে তার মতামতকে এক কড়ার ময়ানাও দয়নি। এক কণ্ঠে মৌলিই তাদের আশ্রয় ছাড়ে এসেছে।

মনে মনে ওর মনের জোরকে সেদিন নন্দকার জানিয়েছি। বাববার কামনা

করেছি ওরা যেন জয়ী হয়। প্রসাদ আমার প্রতি সুবিচার করেনি, তবুও।

কলকাতায় প্রথম ছুবছর, দেখেছি। কী কায়ক্লেশ কেটেছে ওদের সংসার। প্রসাদ অনেক ঘোরাঘুরি করেও একটা কাজ জোটাতে পারে নি। বনবেশা গোটাতিনেক টিউশনি নিয়েছিল, অবসর সময়টুকুতেও বিশ্রাম না নিয়ে পড়া তৈরি করেছিল এম, এ, পরীক্ষার। পরে বি-টিও ভালভাবে পাশ করল।

বাণেশ বাড়ী থেকে কতবার ওকে ফরিঙ্গে নিতে লোক এসেছিল, যায় নি। গেল একেবারে শেষের দিন, পাটনার স্থলটিতে হেড মিসট্রেনের পাষ্টটা পেয়ে মাকে এসে প্রণাম করে।

আমি নিজে তখনও অকূল পাথারে ভাসছি। সেই টিউশা নই করছি একটা যায়, আর একটা ধরি। আমার বিয়ের দৌড় তো বি-এ অবধি। শুধু একটুকু সঞ্চল করে এখানকার মেয়েরা আর ভাল কিছু জোটাতে পারে না। নির্ভরযোগ্য একটা বর পছন্দ না। মনে পড়ল শেষ টিউশানিটাও যেদিন হাত ছাড়া হল, মামীমা বেশী রাত করে বাগায় ফেরার জন্য খোঁটা দিলেন, ঠাণ্ডা ভাতের খালি এ'গয়ে দিলেন, সেদিন আমিও ঠিক করে ফেললাম, আর নয়।

পাটনার একটা টিকিট কিনে নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম। বনবেশা বদলায় নি। একটু ভারীকী হয়েছে, পনোচিত গান্ধীও এসেছে মুখে, কিন্তু মনের প্রশমতা যায় নি। একটি গৃহ স্তম্ভের শরীরে মধ্য-যৌবনকে ধরে রেখেছে।

আমাকে দেখে খুঁশ হল। সব শুনে বলল, তাই তো, কী কমি। ষাক, ছ'চারদিন এখানে থাক তো। ব্যবস্থা একটা হবেই

এবং ব্যবস্থা সে একটা করে দিল। ওদের স্থলে। কোন টিচারের পোষ্ট তখন খালি নেই, একটা-কেরানীর কাজ ছিল। সেইটে আমাকে দিতে ওর কতো সঙ্কোচ। বারবার বলেছে, শ্রীলা একাজ তোর খোঁচা নয়। কিন্তু বিশ্বাস কর, সুবিধে পেলেই তোকে—

কুঞ্জতায় অভিভূত উপকৃত আমি তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বসেছি, বন ভূই আমার জল যা করলি, সেই ঋণ আমি জীবনে শোধ দিতে পারব না।

আজও কি পেরেছি ?

ওর পাশাপাশি এবটা বাগায় আমার থাকবার জায়গা ঠিক করে দেয় বন। পুরো কোম্পানির নয়, ছোট একখানা ঘর।

খান সেই সময়ে আমার মনে কিছু ছয়া ফেলে থাকে, সেটা ওদের দাম্পত্য জীবনের ছোট খাটো ছবি। গোয়েন্দাগিরি আমার স্বভাব নয়, তবু হঠাৎ মাঝে মাঝে ষটুকু চোখে পড়েছে, তা থেকে আমার বুকে বাকি থাকে নিষে ওরা সুখী হয় নি। বন কিছু বলতে চাইত না। প্রসাদও আমাকে কিছু বলে নি। সত্যি কথা বলতে কি আমাকে প্রসাদ যেন একটু এ'ড়িয়েই চলত, মুখোমুখি পড়ে গেলে

জড়সড় হয়ে যেত, ও বুঝি তখনও ভুলতে পারেনি ; আমাকে অকস্মাৎ একদিন ছেড়ে দিয়ে ও বনরেখাকে অবলম্বন করেছিল ।

সে সব তো কবেকার কথা কবেই চুকে গিয়েছে । আমিও কি দেই আঘাতের বেদনা একেবারে ভুলে থাকতে চাইনি ?

ওদের ঝগড়া প্রায়ই হত । নিষ্ঠুর কুৎসিৎ বচসা । আমি টের পেতাম । কতদিনই তো দেখেছি, বনরেখার মুখ খনখনে, গম্ভীর । শক্ত মেয়ে তাই, অন্য কেউ হলে কৈদে-ফেটে অনর্থ করত ।

প্রসাদ পাটিনায় সেনেও হুঁসিং করতে পারে নি । জুয়া খেলত, বাত কাটাত বাইরে । খেস খেলত । যেদিন জিতত, সেদিন হাত উপুড় করে পরচ কর -, হারলে বনরেখার কাছেই সেই হাত চিত করত ।

ত নিই অনর্থ শুরু হতো ।

কতদিন শুনেও পেরেছি বনরেখা দাঁতে দাঁত চেপে বলেছে দেবো না, আর এক পরশ দেবো না আমি । প্রসাদ বলেছে, আলবাত দেবে, আরও বিশী সব ইজিত করে, চটে গেলে বিশেষত মন খেলবে, ওর হুঁশ খকবে না, মুখের আলোও না ।

বনরেখাকে বলতে শুনেছি, বেরিয়ে যাও তুমি, বেরিয়ে যাও তুমি । প্রসাদ বেরিয়ে যেতও ঠিক তখনই নয় হয়তো কিছু পরে । কলকাতা এসে দিল্লীকলকাতা-টাকা দিয়ে থাকত । পরে হাতের আট-শতান বাদে কোন শনবার রেসে কিছু টাকা রোজগার করে লিল্জ লোকটা আবার পাটিনায় আবির্ভূত হত ।

বনরেখার জন্য গম্ভীর মনোতা বোধ করেছি ।

ওদের দাম্পত্য সম্পর্কের কীকিটা শহরসুদ্ধ একরকম জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, এসব বর্শাদিন চাপা থাকে না । দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও কে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরামর্শ দিয়েছে । আশ্রয় একটা দুর্গহের জেদ টেনে চলে লাভ কী । কিন্তু বহুশ্রম কান্ টানে, বা অন্য কা কারণে, জানিনা, বনরেখা কোনদিন রাজি হয় নি । বলত, না না, ছিছি । আমরা শিক্ষা বিভাগের লোক । এসব স্বাভাবিক হলে সব মান খোয়াব । লোকের কাছে কি মুখ দেখাতে পারব ?

যুক্তিতে জোর ছিল—তবু, আমার বরাবর মনে হয়েছে, ওর অনিচ্ছার কারণ অন্য : যে আকর্ষণে একদিন সব ছেড়ে প্রসাদের সঙ্গে চলে এসেছিল, সেটা ক্ষয়ে এসেছে বটে, কিন্তু ফুরায় নি । মৌলিক সাহেবকে মাভালে এসব কথাই বলতে হল । উনি জেরা করে ভেনে নিলেন । চেয়ারটাকে দেয়ালে ঠেকিয়ে অবশেষে বললেন আমরা কিছুকিছু ছেনোছলাম, বাকীটাও অনশ্রয়ই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের গোচরে আশত । শ্রীলা দেবী, আপনার কাছ থেকে নিভরযোগ্য কিছু খবর পেয়ে ভালই হল, থানকস, থানকস এ লট ।

কিন্তু তখনও ওঁর জিজ্ঞাসা ফুরায় নি । একটু জিরিয়ে নিয়ে, আমাকেও একটু

জিরোতে দিয়ে আবার একটি একটি করে অনেক কথা জানতে চাইলেন। আমাকে আবার, যা জানি, বলতে হল।

এবার পূজার ছুটিতে আমরা একসঙ্গে কলকাতা এসেছিলাম। বাপের বাড়ির সঙ্গে খানিকটা বোঝাপড়া তো হয়েছে গিয়েছিল, ওখানে বনবেখার উঠতে আর বাধা ছিল না। আমার মামার বাসাও কাছেই। রাজিই আমাদের দেখা হত!—এখানে মৌলিক সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, বনবেখার স্বামী? প্রসাদ রায়? সে আশে নি? একবার ইতস্তত করে বললাম—না, স্বপ্নরবাড়িতেই ওকে কেউ পছন্দ করে না, সে বাবা-টুকু ওর ছিল। মৌলিক সাহেব জ্বক্কিত করে কথাটা শুনলেন—আই মী। বেশ, বলে খান।

বললাম, ছুটি ছুরিয়ে এল। ঠিক ছিল এক সঙ্গেই আমরা পাটনা ফিরব। কিন্তু শতদিন আগে আমাকে আগ্রা যেতে হল। বনবেখাকে বললাম, আমার ফিরতে একটু দেরী হবে তাই—তুই আলাদাই যা। সে বলল—তা কেন শ্রীল? তুই শনিবার আসানসোল এসে থাকবি, আমি ওখান থেকে তোকে তুলে নেব।

বন্দোবস্তর কাক ছিল না, আগ্রায় কাজ চুকিয়ে আমি কাল সকালেই ফিরতে পেরেছি—

আগ্রায় আপনার কী সবকার ছিল? অবশ্য গোপনীয় কিছু হলে জানতে চাইব না। একটুখানি চুপ করে থেকে বললাম, বলতে কোন বাধা নেই। চাকরির একটা ইন্টারভিউ ছিল। নিজের অজান্তারাই কখন চোখ দুটি জলে ভরে গিয়েছে, হঠাৎ টের পেলাম। উচ্ছ্বসিত করে বলে উঠেছি, এ খেদ আমার মরলেও হবে না। অথচ একসঙ্গে এলে জানি না, হয়তো হয় তো বনবেখা বাঁচত, অন্তত এভাবে তার মৃত্যু হত না। মৌলিক সাহেব মন দিয়ে কথাটা শুনলেন, সবই বিবিলিপি, বাকিটা বলুন। তাও বললাম।

বিকেলের দিকের এক্সপ্রেসটায় বনবেখা এল। আমি প্রাটফর্মই ছিলাম। ও জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি বললাম, এ পাণ্ডি কেন বে, এটা মেন লাইনের নয়, গ্র্যাণ্ড কড দিয়ে যাবে। বনবেখা হেসে বলল, জানি। ওখানে নাথি না, ববাকবে খাচ্ছি, দাদার ওখানে। খালি দেখা করেছে কিরে আসব, সন্ধ্যার পরের বে কোন একটা গাড়িতে। তুই এখানেই থাকিস, আমরা রাতে পাণ্ডাব মেল ধরব। বললাম, আচ্ছা।

মৌলিক সাহেব, মনে হয়েছিল, কিছুছেন। কিন্তু পরে বুঝলাম, কান দুটি তাঁর লজাগই ছিল। খামতেই বললেন, তারপর? নিজেই হাসলেন। আপনাকে আর বলতে হবে না। আমিই বলছি মিলিয়ে নিন, বিকেল গেল, সন্ধ্যা হল, বনবেখা এলেন না। রাজি হল। আপনি একের পর এক ডাউন ট্রেন দেখছেন, বনবেখা কোনটোতেই নেই। তারপর একের পর এক আপ মেল আর এক্সপ্রেসগুলোও এল, গেল। পাণ্ডাব

মেলও কথা সময়ে চলে গেল। আর আশা নেই দেখে আপনি...খুব সম্ভব গুয়েটিংকমেই ফিরে এলেন। তাই না?

আমি বস্টিত হয়েছিলাম। অশ্রুট স্বরে বললাম, ঠিক তাই।

তারপর আজ সকালের কাগজে দেখলেন, মীতারাণপুত্র আর বরাকরের নামান্নাখি আয়গায় ওই এক্সপ্রেস গাড়ির একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় কান মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। বেশরই একজন বড় অফিসার ওই গাড়িতে মীতারাণপুত্র থেকে উঠেছিলেন। এই এক্সপ্রেসটার ওখানে দাঁড়াবার কথা নয়, তবু কাল দাঁড়িয়েছিল।

অফিসারটির দানবাজে জরুরী কাজ সূত্রে পেয়ে তিনি টিপ করে ওই গাড়িতে উঠে পড়লেন। কামরায় আসা নেতান, হুটচ টিপলেন। ট্রাকটাকে দিটের নীচে রাখবেন বলে ভিতরের দিকে ঠেললেন। ট্রাকটা ঢুকল না। আসার ঠেললেন এবার আরও জ্বরে। ট্রাকটা যেন পিঁয়ে পাক্সা খেয়ে ফরে এল। এবার দানবাজটি মস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন, তার কপালে এত শরতে: শেষের দিকেও ঘাম জমে উঠল। তবু ট্রাকটা ঢুকল না। পুনর্বার ট্রাকটাকে ঠেলে বসলেন। তখন, যা দেপলেন, তাঁর বস্তু জমে বরক হয়ে যেতে পারত। দিটের নীচে একটি মহিলার মৃতদেহ। ওখানে বসেই তিনি নিজের বকের বকু চলাচলের ধ্বনি যেন শুনতে পেলেন। গাড়ি পূর্ণ বেগে চলছে। বরাকরের ব্রাজ সামনেই। সমস্ত সাহস, দৃঢ়তা, ইচ্ছা একত্রে গ্রহণ করে অফিসারটি চেন টানলেন, গাড়ি ধামল। হল গাড়, নামনের ছাট টেশনে থবর গেল। তবু তাতে থবরটা রাষ্ট্র হল। ওখানেই লাশ নামান হল। তার টিকিট থেকে এবং ব্যাগ হাতড়ে নাম-ধাম, পাঁচয় পাওয়া গেল। শ্রীলা দেবী, এ সমস্তই আপনি কাগজে পড়েছেন। তবু ভয় পাচ্ছেন কেন? নিন, এই কঁকটা খেয়ে নিন। অনেকটা স্বস্তি বাধ করবেন। স্বস্ত্যান্তিতের মত গরম কফির কাপটা হাতে নিলাম। চুমুক দলাম। অবসর গলায় এললাম, এবার যাই?

মৌলিক সাহেবও যেন তজ্জাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, সচকিত হয়ে উঠে বসে বললেন, আপনি আমাদের অনেক উপকার করলেন। শ্রীলা দেবী, কাজ অনেক সহজ হল, আপনি এই ভূকানেই কিংছেন? ঠিকানাটা বেথে বান, কেস উঠলে আপনাকে হয়তো দরকার হবে। সাফী দেবেন। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।

আমাকে দরজা অবধ এগিয়ে দিলেন মৌলিক সাহেব। নমস্কার করে বললেন, আসার দেখা হবে।

হঠাৎ কী হল, আমি এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বিধাগ্রস্তভাবে বললাম, বনবেরা এখন কোথায়?

মৌলিক সাহেব খুব অবাক হয়েছেন, এমনভাবে বললেন, সে কী! সব জেনে এই কথা বলছেন? আনুল তুলে তিনি আকাশটা দেখিয়ে দিলেন।

অপ্রতিভ হয়ে বললাম, না না, সে কথা বলি নি।

—ও, দেহটা? ওর আত্মীয়স্বজনেরা খবর পেয়ে গেছেন, তাঁরা বোধহয় পয়ের পাড়িতেই সবাই আসছেন। শুধু ওর স্বামীর কোন খোঁজ পাইনি। শ্রীলা দেবী, আপনি আশঙ্ক করতে পারেন, প্রসাদ বায় এখন কোথায়?

বললাম, না। তবে যতদূর জানি, সে হয়তো পাটনাতেই। কাল আপনার সঙ্গে যখন বনবেথা দেবী জানলার দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন তখন ওর কাণ্ডায় আর কেউ ছিল? আবার সেই জেরা। জেরার পর জেরা। ওর হাত থেকে বেহাট পেতেই মুখে যা এল তাই যেন বলে দিলাম। —ছিল! যতদূর মনে পড়ছে, একজন ছিল। একেবারে ওধারের স্টিটে, একজন ভদ্রলোক। কেমন দেখতে শ্রীন, কি পোশাক পরেছিলেন? বললাম, বলতে পারব না। ওঁদেকে মুখ কি'রিয়ে তিনি শুয়েছিলেন। এতটুকু মনে আছে। আমি ভাল করে দেখতে পাটিনি। ওর কান্ডায় তখনও আলো জ্বলান হয় নি। ভদ্রলোকের পরনে পা-জামা ছিল, যতটা মনে করতে পারছি, বেশ লম্বা চওড়া সুপুরুষ।

আচ্ছা শ্রীলা দেবী, প্রসাদ বায় দেখতে কেমন?

কেন, বেশ লম্বা-চওড়া সুপুরুষ—

মৌলিক সাহেব হেসে উঠলেন। সেই হাসির বদলটো আমার একেবারে ভাল লাগল না। বিশেষ করে মৌলিক সাহেব হাসি খামচে যখন চললেন, আপনি কি শপথ করে বলতে পারবেন, শ্রীলা দেবী যে থাকে শুয়ে থাকতে দেখেছেন সে প্রসাদ বায় নয়? আমার মুগ্ধ শুকিয়ে গেল! স্বজ্ঞানসারে, অন-কভাবে আমি কি তখন প্রসাদকে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ফেললাম। জিঃ, তাই যদি হয়, তবে আমার অনুশোচনার যে অবশি থাকবে না। কাম্পিত গলায় বললাম, মিস্টার মৌলিক, আমি তো শুধু লম্বা-চওড়া আর সুপুরুষ বলেছি। এরকম ভাসা-ভাসা বর্ণনা থেকে আপনি হাজার হাজার লোককে তবে সনাক্ত করে বসবেন? মৌলিক সাহেব হাঃ-হাঃ করে হাসলেন —ওইখানেই তুল করলেন। সনাক্ত আমি কাউকে করেছি না। তবে ইঁা সন্দেহের একটা দিক আছে, সেটা ভেবে দেখতে চমক বটকি। আমরা কিভাবে সন্দেহ করি জানেন?

তবে ভয়ে বললাম কী ভাবে? ডাক্তার যেভাবে রোগ নির্ণয় করেন, সেই ভাবে। অর্থাৎ লক্ষণ আর নজির মিলিয়ে। শতকরা আশিটি ক্ষেত্রে ভুল হয় না। ধরুন, আমরা প্রথমে বিচার করি, মৃতের শব্দ কে বা কারা ছিল। কার সঙ্গে তার তুমুল কলহ হয়েছিল, বা হয়ে থাকে! মৃত্যুর কদিন আগে? তারপরে প্রশ্ন ওঠে, মৃত্যুর কার বা কাদের লাভ হল, কার পথের কাঁটা দূর হল, কে পাবে উইল বা ইন্সুরেন্সের টাকা। শ্রীলা দেবী, এখানেই আসে আত্মীয় সূত্বের কথা। ‘হু ডান ইট অথ্যাং’ ক করেছের পদ্ধতির পরের প্রশ্ন, কার স্বযোগ সবচেয়ে বেশী ছিল। কে বা কারা অকুস্থলে ঘটনার সময়ে ছিল, কে-কে ছিল না। যারা ছিল না, তারা বেকসুর খালাস। তবে

এই অল্পপস্থিতি বা আশ্রয় থাকে বলি alibi, প্রমাণ করা শক্ত, এতটুকু সন্দেহের অবসর থাকলে চলবে না। আর একটি ছোট প্রশ্ন থাকে, সেটা জানলে তদন্তের সময় আমাদের সুবিধা হয়। মৃতকে সবচেয়ে শেষে কে জীবিত দেবে। আর, মৃতদেহটি প্রথমে কার চোখে পড়ে। দৌড়াগাক্রমে আমরা এ দু'জনকেই জানি। বনবেরথাকে শেষবার জীবিত দেখেছেন আপনি, আসানসোলে মৃতদেহ প্রথম চোখে পড়ে বেলগুয়ে অফিসারটির। অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহে জানা গেল, ঘটনাটা আসানসোল থেকে সীতারামপুরের মধ্যে কোথাও ঘটেছে। এলা দেবী, আপনার সাফা নির্ভুল নয়, তবে এই সময়টুকুর মধ্যে শুধু কানরায় লম্বা-চওড়া বলে থাকে বর্ণনা করেছেন, সে ছাড়া কেউ ছিল না। সেই লোকটি যদি দেখতে প্রমানের মত হয়, তবে অবশ্যই আমরা খোঁজ নেব, প্রমান সেই সংয়ে পাটিনায় ছিল—না কলকাতায়, না গুই গাড়িতেই।

স্পষ্ট যেন দেখেছিলাম, প্রমানকে ঘিরে একটি ভাল ক্রমঃ ছাট হয়ে আসছে। মরিয়ার মত বলে উঠলাম, দাড়াটা তো আপনার চোখে লোকের হতে পারে। মৌলিক হাসলেন, আরও একবার সফেদে উদ্বেগ বা লাভের কথাটা অনন্ত স্পষ্ট এবং মোটা। নগদ টাকার লোভে শুণ্ড ধরনের লোকেরা এসব করে বটে, কিন্তু বনবেরথার দেবীর সঙ্গে টাকার গহন টানানি সামান্যই ছিল। আর, যতদূর বুঝেছি, 'আততায়ী' একটি গহনাও স্পর্শ করেনি, তাই সে লোকের প্রশ্ন এখানে অসম্ভব। তবে তাঁর হাত বাগ থেকে ছুশো টাক উদ্ধার হয়েছে। টাকাটা সামান্য, এর জন্যে কেউ মানুষ খুন করবে বলে মনে হয় না। আর এমতী কথা আপনাকে বাল শ্রীল দেবী, খান হাতে বনবেরথার প্রাণ গিয়েছে, সে অসম্ভবত ছিল না।

কিদি বুঝবেন?

তাহলে প্রত্যাধাতুর চিহ্ন থাকত। যে একাজ করেছে তাকে বনবেরথা চিনতেন। পাশে বসতে দিয়েছিলেন, হয়তো মুখোমুখি এসে গল্প করবে থাকবেন। তারপর সুযোগ বুঝে আশ্রয়িতা কাটিয়ে পড়ে, এবং বনবেরথাকে আত্মরক্ষার সুযোগটুকুও না দিয়ে গলা টিপে হত্যা করে। কঠিনালাতে গভীর ছুটি দাগ আছে। থাক বলব না আপনি আবার ভাবিয়েছেন আপনার মন এত দুর্বল! যাক অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি, আপনি একটা শুধু খবর বলুন। আপনার মনে আছে, বনবেরথা কাঁধের জামা-কাপড় পরেছিলেন।

কাপড় নষ্ট বললেন, আছে। সবুজ জাজেটের শাডী, আর লাল ওনারকোট। আশ্চর্য! মৌলিক বললেন, আশ্চর্য। ঠিকই মিলছে। মৃতদেহেও ওই পোশাকই ছিল। আপনি ছাড়া এই সেশনেই ওঁকে আর একজন দেখেছে। গাড়ির কণ্ডাক্টর গার্ড! তাকে ডেকে দাঁড় করিয়ে বনবেরথা বরাকর থেকে ফরবার গাড়ী কখন কখন আছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

এর মধ্যে আশ্চর্য কোনটা?

আশ্চর্য এই পোশাকটা। শ্রীলা দেবী, এই অক্টোবরের শেষে, দিনের বেলায় এই অঞ্চলে এখনও পাখা চালাতে হয়। কেউ কি ওভারকোট পরে ?

বনবেশা ভারি শীতকাতুরে ছিল। আমি বললাম। মৌলিক আমাকে নিজে গাড়িতে বসিয়ে দিলেন। গাড়ী ছাড়বার ঘটা পড়ল, উনি আশ্তে আশ্তে বললেন, প্রসাদকে আমরা স্বভাবতই সন্দেহ করব, শ্রীলা দেবী। কিছু মনে করবেন না। পূর্বনো কথা আপনি হয়তো একেবারে ভুলতে পারেন নি, প্রসাদকে এখনও সন্দেহ করেন, বা প্রীতির চোখে দেখেন—

না—না, আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম।

সে কথায় কর্ণপাত না করে মৌলিক বলে গেলেন, তাই তাকে বাঁচাতে চাইছেন। আর, আপনি হয়তো জানেন, গৌয়েন্দা কাহিনীতে প্রথমে এবং সহজেই বার ওপর সন্দেহ আসে, সে সাধারণত অপরূপ হয় না। আসল জাবনে কল্প ঠিক তার উল্টো। অন্তত আমার দীর্ঘ আ-জ্ঞতা তাই বলে। প্রথম অন্তরানটাট খুঁটি হয়। অতএব, শ্রীলা দেবী, প্রসাদ ব্যতীত আমরা খুঁজে বার করবই। এইটুকু জান গতকালে পাটনায় ছিল না। কলকাতায় ছিল কনা, তাও জানতে আমাদের দরী হবে না। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। উনি করেক পা সঙ্গে সঙ্গে এলেন। হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, আবার দেখা হবে।

উনি বললেন, নিশ্চয়ই।

বত তাড়াতাড়ি দেখা হবে ভেবেছিলাম, তার চেয়েও কিছু আগেই হল। বোধ হয় দু'তিনদিন পরে স্থল থেকে ফিরে দেখি, মৌলিক সাহেব। সেই শালপ্রান্তে উন্নত দেহ, কিন্তু বিনয়বানত ভঙ্গ। বললেন, নমস্কার। এই সঙ্কাবেলা পুলিশের লোক—আগন্তুক হিসাবে বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে হল না। তবু বসতে বললাম। কলঘরে গেলাম তাড়াতাড়ি। চোখে মুখে জলের কাপটা দিয়ে যেন সাহস ফিরিয়ে আনতে চাইলাম। ফিরে এসে দেখলাম উনি ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখছেন। বললেন, এনকোয়ারিভে এসেছি। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।

বললাম, বেশ তো, বহন।

উনি বললেন। দেখি, উত্তরদিকের জানলাটার দিকে বারবার চাইছেন। তাড়াতাড়ি বললাম, ওদিকেই বনবেশার কোয়ার্টার। বললেন, জানি।

আমি আবার বললাম, আগকাল বন্ধ করে রাখি। মৌলিক সাহেব কিছু কিনারা হল? উনি যেন অনামনস্ক ছিলেন। বললেন, কিনারা? ইয়া কিনারা প্রায় করে এনেছি। এখন শুধু হাতবড়া পরাতে পারলেই—

কে? অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা তীব্র চীৎকার আমার গলা চিরে বেরিয়ে এল। কে, মৌলিক সাহেব, প্রসাদই বা কি?

মৌলিক বহ্যময় ভঙ্গীতে হাসলেন, প্রসাদ? ইয়া, প্রসাদ হতে পারে। আরও

তু'—একটা খবর নিচ্ছি। আপনি কিন্তু একটা জিনিস আমাদের কাছে লুকিয়ে গেছেন, শ্রীলা দেবী, এট প্রজার ছুটিটা প্রসাদ কলকাতাতেই ছিল।

ছিল ?

মৌলিক ধীরে ধীরে বললেন, ছিল। এও জানি, বনবেথার সঙ্গে ওর প্রায়ই দেখা হত। বনবেথা দেখা করতে চাইত না, কিন্তু জুয়াড়ী, লম্পট লোকটা নাছোড় : মাঝে মাঝে বনবেথার কাছ থেকে দশ-বিশ টাকা কলকাতাতেও চেয়ে নিত।

আমি জানি।

জানেন, কিন্তু আমাদের বলেন নি। আপনি প্রসাদকে বাঁচাতে চেয়েছেন। গম্ভীর গলায় মৌলিক বলে উঠলেন, আপনাকে সেদিন বলি নি শ্রীলা দেবী, প্রত্যেক লক্ষ্যের ধীর ওপরে পড়ে অর্ধকাংশ বাস্তব ক্ষেত্রে অপরাধী সেই হয় ? তবে শুভন ! প্রসাদের মোটিভেরও মকাতা প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আপনি চেপে দিয়েছেন, কিন্তু কেনে ছ, শেষের দিকে ওদের কোনরকম দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। ডিপোজিট নীতি প্রমাণের ভয় বনবেথা অস্বিষ্ট হয়ে শেষ অবধি ভয় করেছিলেন। এবার কলকাতায় আইনজ্ঞের পরামর্শ নিতেই এসেছিলেন। উকিলের বাড়িতে গোপনে ঘরন বেতেন, তখন সঙ্গে কে থাকত জানেন ?

কে ?

আপনাদের স্কুলের সেক্রেটারির ছেলে মহাবীর। হয়ত—হয়ত বিবাহটা বিচ্ছিন্ন হলে বনবেথাকে সেই-ই বিয়ে করত। আপনি এদিকটা সম্পর্কে আমাকে বিশেষ কিছু বলেন নি, শ্রীলা দেবী !

আমার কচিতে বৈশিষ্ট্য ছিল।

অর্থাৎ সত্য গোপন করেছেন। ঠাক, আমার মুখেই তবে শুভন। মহাবীরও প্রজার ছুটির বেশীর ভাগ সময়েই কলকাতায় কাটিয়েছে। ব্যাপারটা প্রসাদও অনুমান করে থাকবে। কিন্তু প্রায় হয়ে সেও কলকাতায় যায়।

তারপর ?

মোটিভের কথা বলছিলাম। কলকাতায় গিয়ে বনবেথাকে অনেক বোঝান প্রসাদ, অনেক কাকুতি-মিনতি করে। কিন্তু বনবেথা অটল ছিল। প্রসাদকে সে দয়া করে দশ-বিশ টাকা দিয়েছে বটে, কিন্তু আমল দেয়নি।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, আমার ঘরের পর্দা কাঁপছে, জড়সড় হয়ে চৌকিতে বসলাম। কবলটা টেনে দিলাম পায়ের ওপর। বললাম, অর্থাৎ বলতে চান, হিংসার বেশেই প্রসাদ—

উহ ? শুধু হিংসা নয়। শ্রীলা দেবী, জেহুইন মোটিভও ছিল। বনবেথা দ্বারের দশ হাজার টাকার ইন্সিওরেন্সের কথাটা ভুলছেন কেন ?

এই টাকাতার নমিনি প্রসাদ, বিবাহ ছিন্ন হলে নিশ্চয়ই নমিনি বদলাত, টাকাতাও

বেহাত হত।

সেই মুহূর্তে টের পেলাম, প্রসাদের আর কোন আশা নেই, ফাঁসটা এর গলায় ক্রমশঃ ঝাঁট হয়ে বসেছে। ছ'হাতে ঠোথ ঢেকে আঁতে আঁতে বললাম, ওকে ওকে কি আপনারা গ্রেপ্তার করেছেন? না, শ্রীলা দেবী। একটুখানি মুস্থিল আছে যে। লোকটার মোটিভ যেমন আছে, alibi-টাও তেমনি যে জোরালো। সেদিন ও যে ওই গাড়ীতে ছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। বরং শনিবার ওকে কলকাতায় রেলের মাঠে বিকেলবেলাতেও দেখা গিয়েছে—অন্তত ছ'দাতজন লোক তার সাক্ষী। ও একটা বড় পেমেণ্ট পেয়েছে।

ডবল টোটের ছুটো লেগই মিলিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা প্রকাণ্ডে একটা বায়ে বন্ধুদের নিয়ে হস্তা করেছে। একই সময়ে লোকটা দিবা দেহধারী না হলে ছুটো জায়গায় হাজির থাকতে পারে না। ক্রাইম ডিকটেশনে শ্রীলা দেবী, অলৌকিকের স্থান নেই।

স্বতরাং?

স্বতরাং, আপাতত স্বতদূর মনে হচ্ছে লোকটা নির্দোষ। তবে কলকাতার পুলিশ ওকে এখনও নজরে রেখেছে। আসলে কেসটার এখন তদন্ত করছে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, আমরা রেলপুলিশ, তদন্তে সহায়তা করছি মাত্র।

শ্রোহিনীর মত শুনিলাম হাওয়া আরও জোরালো, আরও কনকনে হয়ে উঠেছিল বাইরের বাতাস। কয়েকটা ককুর বিশী সুরে ডাকছিল। বললাম, এখন আপনার তব কাকে সন্দেহ, মহাবীরকে? মৌলিক বললেন, আপনি বুদ্ধিমতী, মহাবীরকেও সন্দেহ করা যায় বৈকি। বিশেষতঃ, এর একটা আচরণ তো বুদ্ধিমত রহস্যজনক। আপনি কি জানেন, বনরেখার মৃত্যুর দিন থেকে লোকটা উধাও হয়েছে। এখানে নেই, কলকাতায়ও নেই।

নেই?

না। আরও শুনুন, এর নামে ওই গাড়ীতেই একটা বার্থ রিজার্ভ করা হয়েছিল। তবে ও যে স্টেশনে এসেছে, বা গাড়ীতে উঠেছে, তার কোন প্রমাণ নেই। প্র্যাটর্কর্সে রিজার্ভ বার্থের যাত্রীদের নামের লিস্ট যাব কাছে থাকে, সেও কিছু বলতে পারে না। অবশ্য তাতে কিছু প্রমাণ হয় না, কেন না ওরা অনেক সময় ভুল করে।

তবে কি ওই অপরাধী?

হতে পারে! মৌলিক চুপচাপ দিয়ে বললেন, ঠাণ্ডার দিনে এই জিনিষটি আরাম-প্রদ। হ্যাঁ, মহাবীর অপরাধী হতে পারে। তবে কী জানেন, ওর alibi অর্থাৎ অত্প্রস্থিতির জোরাল কোন প্রমাণ নেই বটে, কিন্তু মোটিভও তো তেমন কিছু নেই। বনরেখার মৃত্যুতে ওর লাভ কিসে? হয়ত, হয়ত মৌলিক ইতস্ততঃ করে বললেন, আরও এমন কিছু রহস্য আছে, যা আমরা জানতে পারি নি।

বলতে বলতে মৌলিক ঠুঁর চেয়ারটা আমার চৌকির কাছে নিয়ে এলেন, কানের কাছে মুখ এনে বললেন, শ্রীলা দেবী, আপনিও আমাদের সব কথা বলেন নি

আমি দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে সিলিন্ডার শিকারী টিকটিকিটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ক্রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলছি, কাঁ কাঁ বলে নি ?

ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল, মৌলিক উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলেন। ফিরে এসে স্থির কণ্ঠে বললেন, সবই বলব।

উনি এগিয়ে এসেছিলেন, আমি সরে গিয়েছিলাম। চৌকিটার একেবারে ওপাশে জানলায় ঠেস দিয়ে বসেছিলাম। বন্ধ জানালা, ওপাশেই বনরেখার কোয়ার্টার ছিল।

মৌলিককে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, চোখ বন্ধ করেছিলাম। আমার ছোট্ট ঘরটা জুড়ে একটি গম্ভীর কণ্ঠ, নিঃস্পন্দ, অবিচলিত অগ্নি কোন অন্তিম নেই।

সবার আগে আপনাকে আমাদের ছোট একটা ভুলের খবর দিয়ে শুদ্ধ করি, শ্রীলা দেবী, বনরেখা আসানসোল আর সীতারামপুরের মধ্যে নিহত হন নি। হয়েছিলেন বর্ধমান আর আসানসোলের মাঝামাঝি কোনখানে।

অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বলে উঠলাম, সে কি !

মৌলিক হাত ভুলে আমাকে ইঙ্গিতে থামতে বললেন। ব্যস্ত হবেন না। হ্যাঁ, বনরেখা সম্ভবত অণ্ডালের কাছাকাছি কোন জায়গায় খুন হয়েছিলেন। অন্তত আমাদের ডাক্তারি রিপোর্ট তাই বলে। আসানসোলের পরে যদি খুন হতেন, তবে সীতারামপুরেই তো ঠুঁর দেহ আবিস্কৃত হয়, অত তাড়াতাড়ি রিগর মার্টিন আসত না, শরীরটা শক্ত, ঠাণ্ডা আর ভারী হয়ে যেত না। আরও গরম থাকত। কিন্তু আমি বলে উঠলাম, আমি যে ওকে এখানে, এই স্টেশনেই দেখেছি মিস্টার মৌলিক। সে যে আমার সঙ্গে কথাও বলেছে। মৌলিক সাহেব আবার বললেন, আস্তে। আপনি দেখেছেন। ওখানেই তো যত খটকা শ্রীলা দেবী। আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিলেন। পরে কিন্তু ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেল। আপনি দেখেছেন। বনরেখা রায়েকে এই স্টেশনে একমাত্র আপনিই দেখেছেন শ্রীলা দেবী, আর কেউ দেখে নি। অত্যন্ত জোর দিয়েই বলে উঠলাম, মিথ্যা কথা। আপনি নিজেই বলেছেন, অন্তত আর একজন দেখেছে। এক্সপ্রেসের কণ্ডাক্টর গার্ড : বনরেখার সঙ্গে সে কথা বলেছে, আপনি নিজেই বলেছেন।

চোপ টি অতিশয় ছোট করে মৌলিক সাহেব বললেন, সে যদি আপনাকেই দেখে থাকে, শ্রীলা দেবী ? হেসে উঠলাম, সেই হাসি দেয়াল থেকে দেয়ালে ঘা খেয়ে আবার আমার কানেই ফিরে এল।

তখন বললাম, আপনি পাগল, মৌলিক সাহেব।

কণ্ডাক্টর কি লাল ওভারকোট দেখে নি ?

উচ্চহাসি দিয়ে মৌলিক সাহেব আমার হাসিটারই যেন জবাব দিলেন। শ্রীলা

দেবী, বুদ্ধিমতী হয়েও আপনি একটা যুক্তিহীন কথা বললেন। পোশাকটা তো আদলে খোলস। এক রঙের খোলস কি দুটো মানুষের হয় না ?

এবার আমার গলা কেঁপে গিয়েছে। তীব্র গলায় চৈচিয়ে উঠে দুর্বলতাটুকু চাপা দিতে চেয়েছি। কী, কী বলতে চান আপনি ?

আমার চোখ দিয়ে ঘৃণা, আতঙ্ক ফুলঝুরির মত ঝরছিল। হিস্ হিস্ করে বললাম, অতদূর কোথাকার।

মৌলিক সাহেব দরজার পাশে দাঁড়ালেন। নিবিচার গলায় বললেন, কোয়াইট। কিন্তু হত্যাকারী নই। শ্রীশ্রী দেবী, আপনার প্রিয় সখী বনবেশা রায়কে পূর্ব-পদিকল্পনা অমুঘায়ী হত্যা করার অভিযোগে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।

কতক্ষণ কেটে গিয়েছিল মনে নেই। হয়ত জ্ঞান হারিয়ে থাকব। মাথায় ফিরে এলে দেখি, ঘরে আরও অনেক লোক, তাদের আমি চিনি না। একজন ভয়লোক আমার নাকের কাছে স্বেলিং সন্টের শিশি ধরে আছেন।

মৌলিক সাহেবকেও দেখতে পেলাম। হেলান চেয়ারে কাত হয়ে পা দুটো শূন্তে তুলে রেখেছেন। ইঙ্গিতে ঠুঁকে আমি কাছে ডাকলাম। উনি এলেন। তখন আমিও অবসন্ন। ফাঁদ গলায় বললাম, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। বলুন। স্নেহার্জ কণ্ঠ, পূর্ব উত্তাপের লেশমাত্র নেই। ওদের চলে যেতে বলুন। মনে আছে, লকলে চলে গিয়েছে, বালিশে মাথা রেখে আমি শুয়ে আছি। মৌলিক সাহেব চেয়ার টেনে এনে কাছে বসলেন। কী বলবেন বলুন ? বললাম। নির্বোধের মত শানাল জ্ঞানি, তবু বললাম—কী করে—কথাটাকে আমি সম্পূর্ণ করতে পারলাম না। উনিই সহায়তা করলেন। কী করে ধরলাম জানতে চাইছেন তো ? সত্যি বলতে কি, প্রথমে আমার প্রসারকেই অপরাধী মনে হয়েছিল। কিন্তু খটকা লেগেছিল পোশাক-টাতে। একে লাল রঙ, তাতে অকালে ওভারকোট, এমন অদ্ভুত বনবেশা কেন পাবেন ? খেই পরে থাক, সে নিজের প্রতি অলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল, সন্দেহ রইল না। তখন ভাবলাম, কেন, কেন ? কোনও সন্দেহ নেই না, তবুও জানতাম না, ঘটনাটা আসানসোলের পশ্চিমে ঘটেছিল। ডাক্তারি বিপোর্টে যখন নিশ্চিতভাবে জানা গেল, বনবেশা অস্ত্রের কাছাকাছি কোথাও নিহত হয়েছেন, তখন খটকা আরও বাড়ল। লাল ওভারকোট পরা যে মহিলাকে আসানসোলে দেখা গিয়েছে। তিনি বর্দা বনবেশা নন, তবে কে ? তখন জিজ্ঞাসা হল, তাকে কে দেখেছে ? দেখেছে কণ্ডাক্টর গার্ড কিন্তু বনবেশা সে সেনে না, সে শুধু পাশাপটাকেই মনে করে রেখেছে। আর দেখেছেন আপনি। আপনি মৃত মৌলিকটির আপাত একু, শুধু পোশাক দিয়ে আপনার চোখে দুলা দেওয়া তো সহজ নয়। তবে, হ্যাঁ—

আমার ভাবনা সেই প্রথম স্পষ্ট সন্দেহের রূপ নিল। যে বর্দাশায়ের পর বনবেশাকে হত্যা করেছে, সেই পরে লাল ওভারকোট পরে আসানসোলে জানালা থেকে মুখ

বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু আপনার চোখে সে ফাঁকি দিতে পারত না। সে যে জ্বীলোক, তাতে সন্দেহ নেই, কেন না পুরুষ মেয়ের কোট পরবে না এবং অস্পষ্টভাবে যেন দুঃখে পরিলাল, হয় আপনাকে বাঁচাতে চান, নয়ত সেই আপনি কেননা বলিষ্ঠ, আসাননোলেও বনবেশে যে জঁপিতা ছিলেন এ কথাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য আপনি। তবে এমটা ঘটনা তখনও ছিল।

হত্যাকারীকে বনবেশে চিনতেন। সে তাঁর সঙ্গে পাশাপাশি বসেছে। এ ব্যাপারটা যদিও আপনার দিকেই আজুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তবু নিঃসন্দেহ হতে পারছিলান না একটা কারণে। যিনিই হত্যা করে থাকুন, তাঁর পায়ে তো অনেক জোর হবে। কেন না, বনবেশে সহজেই পরাভূত হয়েছিলেন। কোন ধস্তাধর স্বর চিহ্ন দেখিনি আপনি তো ভেমন বনশালা নন তবে?

এই তবেরও উত্তর পেলাম পোস্টমেন্টে রিপোর্টে। বনবেশের ফুন্ফুসে ক্লোরোফর্মের গন্ধ ছিল। আততায়ী কৌশলে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করে বনবেশকে অচ্ছন্ন করেছিল। বনবেশকে কেউ কোনদিন লাল ওভারকোট পরিহিত অবস্থায় দেখিনি। এটা তবে হয়ত আপনার। লাল ওভারকোটটা আপনি যে দজ্জিকে দিয়ে করিয়েছিলেন তার দিকানা ল'গ্রাং রেছি শ্রীলা দেবী। কিন্তু ক্লোরোফর্ম পেলেন কোথা থেকে জানাবেন?

উত্তর দিলাম না।

মৌলিক নিজেই বলে গেলেন, শেষ যে প্রশ্ণটির মীমাংসা বাকি ছিল, এবার সেটাকে নিয়ে পড়লাম। আপনার alibi। হত্যা যদি অণ্ডালে ঘটে থাকে, আপনি সেখানে থাক করে গেলেন। সকালেই তো আত্মা থেকে আপনি আসাননোলে এসেছেন। আবার অনুসন্ধান। শ্রীলা দেবী, দেখলুম আপনার স্টেটমেন্টের এই অংশটুকুও সহ নয়। আপনি আত্ম থেকে আসাননোলে তো ফেরেন নি, আগের দ্ব্যস্ত্রাৎ এন আর লাইন দিয়ে ফিরেছিলেন হাওড়ায়। তাপের বনবেশের সঙ্গে একই এক্সপ্রেসে এসেছেন, সম্ভবত বর্ধমান পর্যন্ত অফ কানরাঙ্গ। পরে, বর্ধমানে যখন বনবেশের গাড়ীতে ওঠেন, তিনি নিশ্চয় খুব শিহরিত আপনাকে ডেকে নিয়েছিলেন। শ্রীলা দেবী, মহাবীরের নামে হাওড়া থেকে ভূয়ো বার্থ রিজার্ভেশন—সও কি আপনিই করেছিলেন? শুধু সন্দেহটাকে নানা পথে হাড়িয়ে দেবার জরুর?

এবারও কান উত্তর দিলাম না।

আপনারা থেকে একটা অব্যয় স্ফটিক করে মৌলিক বললেন, এত প্রাণ, এত মতক আয়োজন কিন্তু শেষ পর্যন্ত বফা করতে পারেন না শ্রীলা দেবী। এই স্টেশনে আপনাকে সকালে তো কান দেননি। অনুমান করছি, কণ্ডাক্টর ওভার সঙ্গে কথা বলে আপনার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসান ইলুটো পদকের দরজা দিয়ে অলক্ষ্যে নেমে পড়েছিলেন। তার আগে আপনি নিজের লাল কোটটি খুঁজে যুতনেহে

জড়িয়ে দিয়েছেন, তাকে ঠেলে দিয়েছেন মিটের নিচে। নেমে এসে নিচের পোশাকে ঢুকেছেন ওয়েটিংরুমে। তখন থেকে সন্তুষ্ট রাষ্ট্র অনেকেই আপনাকে ওখানে দেখেছে। হতাশা কাণ্ডটা আসানন্দোনের শাসনামলে ঘটেছে, এটা যদি প্রমাণ হয়, তা হলে শ্রীলা দেবী আপনাকে ছোঁয়া যেত না। আপনার alibi পাকা হত।

আগুস্তে আগুস্তে বংশলান, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ওই কানরায় লম্বা-৫৭ ডা স্মুথফ্রন্ট এক ভক্তলোক ছিলেন।

শ্রীলা দেবী, সেও ভুলো। আর কেউ নাও থাকতে পারে। আপনার, মুখের কথা ছাড়া তার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই। তাকে আপনি সৃষ্টি করেছিলেন, বোম্ব হুম প্রদান রায় বা মহাবরের পিঠনে আমাদের ছুটিয়ে হয়রান করে দেবার জন্তে। না, শ্রীলা দেবী, আর মিথ্যা বাড়ান না।

আমরা ক্রান্ত, আপনিও ক্রান্ত।

আশ্চর্য, আমার ক্রান্তি কিন্তু দূর হয়েছিল। আমি সোজা হয়ে এসেছিলাম। হেসেছিলাম, ইং তখনও হাসতে পেরেছিলাম। একটু ঠাট্টা করে ছলাম মৌলিক সাহেবকে। ওর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলেছি, আমার স্বপ্নের এখনও কিন্তু প্রমাণ হয় নি। এত দীর্ঘ বক্তৃতাতেও মোটিভ বা উদ্দেশ্যের পশ্চাৎতা কৌশলে এড়িয়ে গেলেন। অথচ, আপনিই বলেছেন, উদ্দেশ্যেরও একটা সন্তোষজনক প্রমাণ থাকা চাই। বনবৈখা আমার বন্ধু নানাভাবে তার কাছে উপকার পেয়েছে। তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অবশিষ্ট নেই। তাকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করতাম, ভালবাসতাম। আমিই তার মৃত্যু ঘটাব, অল্প বয়স প্রমাণই আপনার কাছে থাক, এ কথাটা ব্যাখ্যা করে আদালতকে বোঝানো আপনার পক্ষেও সহজ হবে না।

গভীর আশ্রয়প্রভায়ে যে হাসি কোটে, সেই হাসি মৌলিক সাহেবের মুখে দেখলাম।

সে ব্যাখ্যাও আছে বৈকি শ্রীলা দেবী। ব্যাখ্যা আছে গুচ্ছ মনস্তত্ত্বে! আপনি নিজেই জানেন, বনবৈখাকে আপনি ভালবাসতেন না।

না, ঘৃণা করতেন। নিচের মনের ভাবটায় একবার চেয়ে দেখুন, শ্রীলা দেবী! আশৈশবকালের কি তাঁর হিংসা সেখানে সর্বত্রের ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল। তাকে আপনি ভালবাসার ভাল-মারফিস কাপড়ে ঢেকে রেখেছিলেন মার। আমাদের চেয়ে যারা শ্রেষ্ঠ, তাদের আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু ভাগ্যে কোনও দোষদলও বাসতে পারেন।

একটা হিংসা অহরহ মনটাতে ছোঁল মাঝে, ও কেন এত বড়, এত উদার, এত ভাল? কেন, কেন?

অপর্যাপ্ত বলে, পৃথিবীর বহু হীন কাজ এই হীনমন্ত্রতা থেকে যে ছোট, সে মুখে বশ্যতা স্বীকার করে, কিন্তু তলে তলে প্রতিহিংসার অছিলা খোঁজে। শ্রীলা দেবী, আপনিও সেই নিয়মের বাইরে নন। নিভাস্ত শিশুকাল থেকে দেখে আসছেন।

আপনাদের পরিবারে নিভা সন্টন, ওদের খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য। একটু বড় হয়ে জানলেন, বনরেখা আপনার চেয়ে বেশী বড়। ওকে হটিয়ে আপনি একবারও পরীক্ষার ফার্স্ট হতে পারেন না। খাবও বড় হয়ে আপনার দেখে আর নানা লোকের কথা শুনে টের পেলেন, বনরেখা আপনার চেয়েও রূপসীও। আগে শুধু ঈর্ষা ছিল, তখন থেকেই ঘৃণার শুরু, এই ঘৃণার বিষ হয়তো আপনার সচেতন মনেও অগোচরে একটু একটু করে জমতে থাকল। ভাবতেন, ও যেন কোথায় আপনাকে বন্ধনা করে, আপনাকে সব বিষয়ে হারিয়ে দিচ্ছে। সেই ঘৃণার পাথ ছাপিয়ে পড়ল সেইদিন, যেদিন আপনারই বন্ধু প্রদীপ গায়ের ও বনরেখা ছিনিয়ে নিল। প্রেমের প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রেও বনরেখা? সেদিন ও : চন্দ্র বড় শক্ত আপনার আর কেউ ছিল না শ্রীলা দেবী।

আপনার ম্যান চেনে পৌল তখন, যখন বনরেখারই দ্বার দান একটা চাকরি আপনাকে হাত পড়ে নিতে হয়। সেখানেও সে হুড-বস্ট্রাস, আপনি এরানি মাত্র। সেখানে সে অনেক বড়, চর পাবের। তার কাছে আপনার কৃতজ্ঞতা যত তার প্রতি বিষেষও দত্ত। দেখুন, এই কৃতজ্ঞতার বোঝা যত বাড়ে তত দুর্বল হয়। যাকে ঘৃণা করি তার করুণা যেন কাম হয়ে গলা জড়িয়ে ধরে। তখন—তখন শ্রীলা দেবী মনে হয় চিরজীবন একজনের কাছে ছাড়া হয়ে থাকার মত ম্যানি আর নেই। যারা মুখ বুজে নিয়ে যেতে পারে, তার বঁচে যায়। যারা তা পারে না তারা মুক্তির উপায় খোঁজে যেমন আপনি খুঁজেছেন। ঘৃণায় অন্ধ আপনারই একটা সত্তা স্থির করেছে, আর নয়, একে যদি কোনক্রমে দূর করে দিতে পারি, তবে আবার মাথা তুলতে পারব। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারব, নিঃশ্বাস নিতে পারব সহজে।

অশ্রুজল গলার নলে উঠেছে। মৌলিক সাহেব, আমি একটা পশু, না। মৌলিক সহানুভূতি দিয়ে আমার মাথায় হাত রেখেছেন। বললেন, না, আপনিও মানুষ। মাতৃষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচাব আপনিই আপনাকে নিষ্ঠুর আর অকৃতজ্ঞ করেছে। শুনে অঝোরে কাঁদছিলাম। কাঁদে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বিচারে সত্যপক্ষ দৃষ্টি করে একটি কথাও বলি নি। আমার অপরাধ নিঃশব্দেই প্রমাণিত হয়েছে। তবু, জালাব না কেন, হয়তো আমি স্ত্রীলোক নই, আমার প্রতি আদালতের করুণা হ'ল, হয়ত প্রথম অপরাধ বলেও, তিনি আমাকে প্রাপদত্তের বদলে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিলেন।

সেও আজ কত বছর হয়ে গেছে। আজ আমার কারও প্রতি কোন ঘেব নেই। মনে মড়ে পূর্ণেন্দু মৌলিককে, সেই ধীরোদ্ভূত, বুদ্ধিদীপ্ত রূপ। না তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই। বনরেখাকেও মনে পড়ে, তাকে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করেছি বটে, কিন্তু তারপর থেকে সত্যিই ভালবাসতে পেয়েছি।

গোয়েন্দা (প্রথম)—১২

সেই ভালবাসার প্রেরণাতেই তো আজ নির্জন সেলে বসে, লুকিয়ে কাগজ-কলম আনিয়ে লিখে দিলাম এক কাহিনী। আমার প্রিয় মরীচ যত্নের কাহিনী।

*

*

*

॥ সন্তোষ কুমার ঘোষ ॥ জন্ম ফরিদপুরে ১৯৩০ খ্রীঃ। সন্তোষকুমার ঘোষ পাঠকদের লেখক যন্ত্রাঙ্গ, লেখকদের লেখক হয়ত তাঁর চেয়েও বেশি। নাগরিক জীবনের দুঃখ বেদনা ও আশা নিরাশার বিখণ্ড প্রতিচ্ছবি তাঁর লেখায়। তাঁর গল্পের বা প্রবন্ধের উপস্থাপন। পাঠক মনে এক বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। বারনার্ড শায়ের নাটকের। প্রফেসর বা মুখবন্ধ যদি আকর্ষণীয় হয় তবে সন্তোষকুমার ঘোষের গল্প বা আলোচনার প্রস্তাবনা তাঁর চেয়ে কম উপাদেয় নয়। তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, মার্জিত ও ইঙ্গিতবহু বাক্য-বৈদগ্ধ্য তাঁর লেখার এক বিশেষ গুণ। মনের হৃৎস্পর্শিহীন অনুভূতি ও ভাবনাকে তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে ব্যক্ত করেন ভাষার নানান কারুণ্য ও শব্দ চয়নের স্বাভাবিক কুশলতায়। লেখক মূলতঃ জীবনপ্রেমী তাই বেদনা ও নৈরাশ্রময় জীবনের প্রেম-প্রীতির নিষ্করণ অভিষেক তাঁর প্রথম দিকের লেখায় স্পষ্ট। তবে তাঁর কলমের সোনালী আর্চডে আমাদের জগৎ ও জীবনের কোন দিকই অনালোকিত নয়। সন্তোষকুমার ঘোষ বোধহয় এমন একজন সাহিত্যিক যিনি জানেন না এমন বিষয় নেই আর লিখতে পারেন না এমন বস্তু নেই। তাঁর সর্বাস্বক ও সর্ববিষয়ক জ্ঞান তাঁকে আজ বাংলা সাহিত্যে এক অভিব্যক্তির আসন দান করেছে। প্রবীণ তিনি, নিষ্ঠুর আবার এক অর্থে নবীনও। সাহিত্যের সকল বিভাগই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর পরিশীলন, স্নেহ লালিত্য কাব্যের তাৎপর্য্যে অলঙ্কৃত তিলকে।

*

*

*

পূর্ব দিকে বর্ষা, পশ্চিমে চট্টগ্রাম, মাঝখানে যে পর্বতসঙ্কুল ভূখণ্ড, তার নাম পার্বতা চট্টগ্রাম। সাহেবরা বলতেন চিটাগড়, হিলট্রাক্ট্‌স্‌, বাংলাদেশ কিন্তু বাংলার সঙ্গে তার সম্পর্ক শুধু ভৌগোলিক, দৈহিক নয়, আত্মিকও নয়। বাংলার জ্ঞানলিলা আছে, নেই তার উন্মুক্ত বিস্তার। কোনো অব্যবহিত মাঠের প্রান্তে ভুইয়ে গড়ে না চূষনাকুল গগন ললাট। কোনো আদিগন্ত নদীর বুকে নেমে আসে না খলিতাঙলা সন্ধ্যা। বকভরা মধু বধ, ছয়তো আছে। কিন্তু কোনো স্তব্ধ অতলদাঘি কালোহলে পড়ে না তাবের অলঙ্করিত চরণচিহ্ন।

এদেশে মজা আছে। কিন্তু তার মৌলান্ত নেই। এঁদের শুধু আকাংক্ষা ছোট নয়, জাতেও ছোট। শুভ্রাং আনার চৌহদ্দির বাইরে। কর্মসূত্রের টান ধপন নেই, তখন আর কোনো ক্ষুদ্ররে এই পাণ্ডা বজ্রিত দেশে কানোনি। আমার পদধূলি পড়বে, এরকম সম্ভাবনা ছিল না। কল্পে বিশাল বিধে কানো, কোনো কখনও কার জন্তে বিবাতা পুরুষ দুটি অশ্বের ব্যবস্থা করে রেখে দেন, সে শুধু তিনিই বলতে পারেন। যা ছিল স্বপ্নের অগোচর; তাই একদিন বাস্তব ঘটনার রূপ নিয়ে দেখা দিল। সেটিলেন্টের টাবু ঘাড়ে করে আনার এক আত্মীয় টোল ফেলে ফিরছিলেন এই দেশের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। হঠাৎ রোগ ঘষায় পড়ে আনাকে স্মরণ করলেন। তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল তার দার সাশ্রম অন্তর। অন্তরে আমিও একদিন বাক্স বিছানা ঘাড়ে করে ঘরের মূলুকে পাড়ি দিলাম।

পার্বতা চট্টগ্রাম। গিয়ে দেখলাম, শুধু পার্বতা নয়, আরণ্য চট্টগ্রাম। যেদিকে ধতদূর দৃষ্টি যায় দুঃখ পাহাড় আর দুর্গম জঙ্গল। তারই বুক চিরে চলে গেছে নীর্ণ জলবেধা। তার নাম নদী। একটা বিশাল গাছের গুঁড়ির বৃকের উপর থেকে কাঠ খুঁড়ে খুঁড়ে তৈরি হয়েছে খোন্দল। তার নাম নৌকা। তাইই মধো বসে ঘোঁত হ'ল দিনের পর দিন। হঠাৎ একদিন অসময়ে নৌকা খেঁদে গেল। সামনে এপার-ওপার জোড়া বাঁধ। মাঝিরের কলরব শুনে কৌতূহল। লক্ষ্য করে দেখি, বাঁধ নয়, গভেষ্ট্র গমনে নদী পার হচ্ছেন পাহাড়া পাইথন। আর একদিন। সবে সন্ধ্যা হয়েছে তখন। গলুই-এর উপর বসে নিশ্চিন্ত মনে বেহুয়ো গান ধরেছি। মাঝির চাপা ধমক শুনে খেঁদে গেলাম। দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে জলপানরত চিতাবাঘ।

শুধু আধি নয়, পথের বাঁকে আছে বাধি, এমন জর ধার কবল থেকে কাকেরও নিস্তার নেই। তারপর আছে মাছির ঝাঁক। ভীমকলের চেয়েও বিষাক্ত। একবার ধরলে শুধু বসন্তা নয়, সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দেবে ক্ষত।

রাঙানাটি শহর থেকে দিন তিনেকের পথ। একখানি বসতিবিহীন পাহাড়ী গ্রাম। বনের ফাঁকে ফাঁকে দু-একখানা চালাঘর। জঙ্গল মুক্ত ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট ক্ষেত! সেখানে “ঝুম” চাষ করে মেয়ে পুরুষের মিলিত দল। লাজল গন্ধর বালাই নেই অদ্ভুত হাতিয়ার দিয়ে মাটি খুঁড়ে কিংবা আঁচড় কেটে একই সঙ্গে পুঁতে বা ছড়িয়ে দিয়ে ধান মকাই আর নানাবকম সব্জির বাজ। যেমন তৈরি হয়, কেটে ধরে তোলে ফসলের বোঝা।

আমার আত্মীয়টির আস্তানা ছিল গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে! মাধমরা হয়ে আমি যখন গিয়ে পৌছলাম, তিনি তখন মরে সবে বেঁচে উঠেছেন। করবার বিশেষ কিছুই ছিল না। আমার এই মশরারে উপস্থিত এইটুকু দিয়েই যেন তাকে কৃতার্থ করে দিলাম। বললাম একটা কিছু টনিক ঠানক খেয়ে চটপট সেরে ওঠো।

উনি হেসে বললেন, তুমি কাছে বসে আজ, এইটাই আমার সবচেয়ে বড় টনিক। আর কিছু চাইনা।

সাবাদিন তার টনিক জুগিয়ে অবকেল বেলা বোদ যখন পড়ে আসে, পাহাড়ী পথ ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ি। সেদিন অনেকটা দূরে চলে গিয়েছিলাম। কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে খেয়াল হয়নি। সঙ্গে ছিল স্টেট্‌লমেন্ট আফিসের এক চাপরাশি। অকস্মিক বটকিত কি একটা নাম, আজ আর মনে নেই।^{১০} যেখানে গিয়ে পড়েছিলাম ওরই কাছাকাছি তার বাড়ি। ষষ্ঠীয়বার কোনো চিতাবাঘের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে, এরকম ইচ্ছা ছিলনা। তাই হাঁটার বেগটাবেশ একটু বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল একটি চৌদ্ধ পনের বছরের পাহাড়া মেয়ে নেমে আসছে সামনের ঐ পায়ে চলা ঢালু পথ বেয়ে। তার পিঠে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নামছে একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধা, বোধহয় তার দৃষ্টিও নেই। আমরা পথ ছেড়ে দিয়ে বনের ধার ঘেঁষে দাঁড়ালাম। তারা অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। কিশোরী মেয়েটি একটিবার শুধু আমার দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোপ নামিয়ে নিল। দুটি কৌতূহল ভরা কালো হরিণ-চোখ। স্তম্ভ মুখখানি ঘিরে কেমন একটা বিষম আলোনিমা। আমরাও কৌতূহল হ'ল। আর একটু উঠে গিয়ে রাস্তার বাঁকে দাঁড়ালাম। ওরা নেমে গিয়ে যেখানে থামল, তার ঠিক সামনেই একটি পল্লব-ঘন বটের চারা। গোড়ায় বাধানো মাটির বেদি, স্বস্ত্র করে নিকানো। সজ্জীকে ঘাসের উপর বাসিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল কিশোরী আঁচলের বাঁধন খুলে বের কবল দুটি ছোট ছোট মোমবাত্ত আর একটি দেশলাই। বাতি দুটো জ্বলে পাশাপাশি বসিয়ে দিল বোদর উপর। তারপর একটুখানি পিছনে সরে এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রশাম করল; জানিনা কার উদ্দেশ্যে। অম্পট

অজিত কণ্ঠে বজ্রা কি বলে উঠল, তার পাগাড়ী ভাষায় বোধহয় কোনো প্রশ্ন। কিন্তু কিশোরীর কাছ থেকে কোনো জবাব এলনা। তারপর যেমন এসেছিল, তেমনি, করে আবার ওরা ফিরে চলল সন্ধ্যার ছায়াটাকা চড়াই পথ ধরে যাবার সময় আর একটা চকিত দৃষ্টি দিয়ে গেল আমার বিন্মিত মুখের উপর।

আমরাও চলতে শুরু করলাম। একটু অগ্ৰমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ নিঃশ্বাসের শব্দে পেছন ফিরে থাকলাম। ঠিক ওর মায়ের মত দেখতে হয়েছে মেয়েটা।

—স্বিচ্ছ কণ্ঠে যেন আপন মনে বলে উঠল চাপরাশি।

—তুমি চেন নাকি ওদের?

—চিনি বৈকি। ঐ হল ওদের ঘর মংখিয়ার মা আর মেয়ে।

মংখিয়া! চমকে উঠলাম। নামটা যেন তড়িৎ শিখার মত জ্বলে উঠল আমার স্মৃতির অন্ধকারে। প্রশ্ন করলাম, ‘কোন মংখিয়া? মংখিয়া জং?’

—হ্যাঁ, বাবু। আপনি জানলেন কি করে?

আমি জবাব দিলাম না। দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের কৃষ্ণাবরণ ভেদ করে আমার চোখের লাননে ভেসে উঠল একখানা মাল্জোলিয়ান ধাঁচের মুখ। তার উপর ছুটি ভাসাভাসা অসহায় চোখ। মংখিয়া জং।

মংখিয়ার সঙ্গে দেখা আমার চিটাগাং জেলে। চৌদ্দ বছর! হ্যাঁ; তাহ’ল বৈকি। এই গাঁয়ের কথাই সে বলেছিল। পাহাড় কেটে অতি যত্নে তৈরি ছোট ছোট ক্ষেত। তার পাশ দিয়ে উঠে গেছে যে চড়াই পথ সেইখানে তার বাড়ি। ছোট সংসার। বিষবা মা, সন্তের বছরের বৌ আর তার কোলে একটি বছর খানেকের মেয়ে। ভোর হতেই সে বেরিয়ে যেত “ঝুম”-এ। দু-তিনখানা গ্রাম ছাড়িয়ে দূর পাহাড়ের কোলে। প্রায় একবেলার পথ। বেশী ভাগ দিনই একা। ঘরের কাজ, মেয়েকে খাওয়াপান কাণ্ডে গছিয়ে কোনো কোনোদিন সিমুঁকিও তার সঙ্গ নেয়। সে-দিনটা সে আসতে পারে নি। মংখিয়া একটা গোটা ভূট্টা ক্ষেতের জঙ্গল সাক করে ছায়ায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল ধানিকক্ষণ। হাতে ছিল একটি নবর কচি ভুট্টার মোচা। ছাড়িয়ে মুখে তুলতে যাবে, পাহাড়ের বাকের আড়াল থেকে ভেসে এল স্বরের ঝঙ্কার। এ স্বর তার চেনা। শুধু চেনা নয়, এব সঙ্গে ছিল তার প্রাণের টান। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি, সকাল থেকে সকল কাজের মধ্যে এরই জন্মে মন ছিল তার উন্মুখ। জনহীন বনভূমি। তার উপর লুটিয়ে পড়ে গানের ঢেউ। কখনো কাছে, কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে, পাহাড়ের গায়। বেলা বেড়ে চলেছে। গাছের মাথায় ঝলমল করছে বোদ। ওরে ফিরবার সময় হ’ল। সে থেয়াল নেই মংখিয়ার। আবেশে বুঁজে আসছে চোখ দুটো। হঠাৎ মনে হ’ল গান তো আর শোনা যাচ্ছেনা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মংখিয়া। পাহাড়ের বাক ঘুরে এগিয়ে গেল। দু-তিনখানা ভূট্টা

কেত পার হয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল একটি ঝোপের আড়ালে।

‘ওখানে লুকিয়ে কি হচ্ছে তুনি?’

ধরা পড়ে গিয়ে উচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল মংখিয়া। তার সঙ্গে মিলিত হ’ল কল-হাস্তের কোমল স্বর।

—সিম্‌কি আসেনি কেন? প্রশ্ন করল নারী কণ্ঠ।

—এসেছে বৈকি। ঐ তো রয়েছে ওখানে—মংখিয়ার মুখে বহুস্তর হাসি।

—ইস্‌! তাহলে আর এত সাহস হতনা।

—কেন। ভয় কিসের?

—থাক; আর বাহাহুরি দেখিয়ে কাজ নেই। এবার বাড়ি যাও। বেলা হয়েছে।

—বাড়িই তো যাচ্ছিলাম। এমন সময়—

—কী হ’ল এমন সময়?—নাখাটা বানিকে হেলিয়ে মোহিনী ভঙ্গীতে তাকাল মেয়েটি।

—কিছু না। এই নাও।

মংখিয়া হাত বাড়িয়ে ভুট্টাটা এগিয়ে ধরল। মেয়েটি হাত বাড়াল না, এগিয়েও গেল না। সেইখানে দাঁড়িয়েই বলল, ‘কী শুটা?’

—বাঃ! গান শোনালে। বখ্‌শিশ নেবেনা?

—চাই না এমন বকশিশ—সমস্ত দেহে একটা দোল দিয়ে মুগ ফিরিয়ে নিল।

—না, সত্যি। তোমার জন্তে নিয়ে এলাম।

—ছুঁড়ে নাও ওখান থেকে।

—হাত থেকে নেবে না বুঝি?

—বাঃ! কেউ দেখে ফেলে যদি?

—কেউ নেই এখানে।

—ঐ জ্ঞাথ. দেখছে—বলে আঁজুল তুলে ধরল পাঁচের দিকে। একটা কাঠবেড়ালী লাজ নাড়ছিল, আর মাঝে মাঝে ষাড় ঘুরিয়ে দেখছিল বিজ্ঞের মত।

হুজনেই হেসে উঠল। মংখিয়া আর একটু কাছে এসে ভুট্টার মোচা তুলে দিল মেয়েটির হাতে।

—দাঁড়াও; আমি একা থাক বুঝি?—বলে মোচাটা ভেঙে অর্ধেকটা সে ফিরিয়ে দিল মংখিয়ার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মিলিত হাসির উচ্ছ্বাস। কিন্তু উঠতে না উঠতেই সে যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। মেয়েটির হাত থেকে খসে পড়ে গেল ভুট্টার ভগ্নাংশ। হুজনের মিলিত ভীত দৃষ্টি ঝোপের আড়ালে গিয়ে স্থির হ’য়ে গেল। দৃষ্ট ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সিম্‌কি। ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। দিদির একান্ত কাছটিতে এসে তার চোখের উপর চোখ রেখে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, ‘ছুঁয়ে দিলি!’

কঠে অপরিণীম বিশ্বয়, তার সঙ্গে অভিমান—স্বক অসুযোগ। দিদির কাছ থেকে কোনো সাড়া এল না। মংখিটা শুধু হয়ে পড়ল বুকের উপর। দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চাপ পুতুলের মত।

এবার স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল সিম্‌কি। নির্বাক চাহনি। কিন্তু তার ভিতর থেকে নির্গত হ'ল যে অগ্নিময়ী ভাষা মংখিয়ার কাছে সেটা কিছুনাও অস্পষ্ট নয়। হঠাৎ দেহনয় তরঙ্গ তুলে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। দূর হস্তে কোমরে জড়িয়ে নিল আঁচলখানা। তারপর ছুটে বেঁধিয়ে গেল ঝড়ের মত।

‘সিম্‌কি, শোন’—এতক্ষণে স্বর ফুটল দিদির কণ্ঠে। কিন্তু শোনবার জন্মে সিম্‌কি আর তখন দাঁড়িয়ে নেই। ‘কী হবে?’—শব্দকণ্ঠে বলল মংখিয়ার দিকে ফিরে। চোখে সমস্ত দৃষ্টি। মংখিয়া নিরুত্তর। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি ভাবল। তারপর হাতে একটা তাকিলোর ভজা করে ধীরে ধীরে বণনা হ'ল বাড়ীর পথে। প্রাচীনমন্ডী হিন্দু সমাজে যেমন ভাদ্রবৌ, মংখিয়াদের পাহাড়ী সমাজে তেমন বৌ-এর বড় বোন। স্পর্শ করা শুধু সামাজিক অপরাধ নয়, মহাপাপ। হিন্দু সমাজে তার ক্ষমা আছে। কিন্তু মংখিয়ার সমাজ এখানে ক্ষমা লেশহান নিন্ম। এই জাতীয় অপরাধের প্রাথমিক বিচার করবেন গ্রামের মোডল। তিনি যদি তুষ্ট না হন, কিংবা তার বিচারের পরেও যদি গ্রাম্য-সমাজ কঠ থেকে যায়, তখন অপরাধীর তলবপড়বে মহাপরাক্রান্ত মন্ত্ররাজার দরবারে। মন্ত্ররাজা! ইংরেজরা বলতেন বোহ'ম্‌ডা চীফ। তিনিই ছিলেন চিটাগড় হিল ট্রাকট'সের দালাই লামা। সমস্ত প্রজাকুলের দত্ত মুণ্ডের মালিক। বিস্তৃত তার এজিয়ার। ধর্মীয় বা সামাজিক রীতিনীতি সংক্রান্ত অপরাধ শুধু নয়, খুন জগম, চুরি ডাকাতি, ইত্যাদি গুরুতর ক্রাইম ও ছিল তার অলিখিত অন্তর্গত। জুনি তিনদিনের পথ থেকে ব্রিটিশ সরকারের থানা পুলিশ এসব ঘটনার সন্ধান পেত না। পেলেও অনেক সময় চূপ করে থাকত।

বাড়ির কাছে আসতেই মংখিয়ার কানে গেল তার শিশু কন্ঠার কান্না। ছুটে এসে দেখলে কঁদে কঁদে নীল হয়ে গেছে মেয়েটা। কেউ কোথাও নেই। মা তথাগত শিশু। সংসারে থেকেও নেই। গ্রামোপ্রান্তের কাণ্ড থেকে এখনো তার ফিরবার সময় হয়নি। কিন্তু সিম্‌কি? এতক্ষণে সে বোধহয় মোডলের বা উ গিয়ে দণ্ডখানা করে লাগাচ্ছে তার নামে। মেয়েটা বাঁচল কি মরল, সে প্রশ্ন আজ তার কাছে অতি তুচ্ছ। অম্মাত, অতুচ্ছ, পরিশ্রান্ত মংখিয়ার ভিতরটায় অগ্নি বৃষ্টি হতে লাগল।

তার অনুমান যে মিথ্যা নয়, জানা গেল একটু পরেই। বাড়ির বাইরে থেকে হাঁক দিল কর্কশ কণ্ঠে—‘মংখিয়া আছিস?’ মোডলের চাকর। কিন্তু নিজেকে সে ছোটখাট মোডল বলেই জানে, জাহিরও করে দেইরকম। একটা কড়া জবাব এসে গিয়েছিল মংখিয়ার মুখে। শামনে নিয়ে বেরিয়ে এল। খাড়া তলব। অম্মাত করলে

বন্ধা নেই। বিলম্ব করলেও বিপদ অনিবার্য। বারান্দায় বসে তামাক টানছিল মোড়ল। তার সামনে উঠানে দাঁড়িয়ে সিমুন্সি। কোমর জড়িয়ে তেমনি শক্ত করে বাঁধা আঁচলের বেড়। ফুলো ফুলো চোখ দুটিতে সম্ভ্র-ক্ষান্ত বর্ষণের চিহ্ন। উন্নত বৃক্ক অদম্য উত্তেজনার স্পন্দন। মংথিয়া এসে যখন দাঁড়াল পাশটিকে, একবার মাত্র সেদিকে তাকিয়েই মুখ ফিঁসিয়ে নিল অগ্নিদিকে।

—বৌ যা বলছে, সত্যি?—প্রশ্ন করল মোড়ল।

—হ্যাঁ; আমি ছুঁয়েছি ওর দিকিকে।

হাঁকা থেকে মুখ ফুলে বিষম বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে মোড়ল তারপর বলল, বেশ খানিকক্ষণ সময় নিয়ে, 'বলিস কি! ওহন! তোর পড় শানো, শুকুন। ওর পেছনে ঘুরে মবছিস কেন? ছুঁয়েই বা দিলি কেন? না কলে? ও পড় পাশ তো আর নেই!'

মংথিয়া নিকটবর্তী। কয়েক মিনিট থেমে আবার বলল মোড়ল, 'তাছাড়া ও মেয়েটা যে এক নম্বর নাকার, সে তো কারো জানতে বাকি নেই। তোর ওর মবদটাই বা ওকে ছেড়ে চলে যাবে কেন?'

এবার উত্তর দিল মংথিয়া, 'ছেড়ে যাবনি; বাঁধাটাটি গেছে থাক'র করতে।'

—চাকরি করতে, না আমার কপালে আগুন দিলে, অবশ্য কঠে জে উঠল সিমুন্সি।

হাত দিয়ে তাকে থামাবার ইচ্ছিত করে মোড়ল বলল, 'যাক, যা হবার তা তো হয়েছে গেছে। এবার শুদ্ধ হতে চলে নাথা মুড়োতে হবে, কাছের না। দিতে হবে বারো গুণ, তারপর সমাজ-খান্ডিয়ানো আছে। সেও অনেক তাঁহার বাপাব।'

সিমুন্সির দিকে তাক করে বলল, 'ভূমি ঘরে যাও, বৌ। ও গীট'কে শায়েস্তা করবার ব্যবস্থা আমি করছি। মাথা মুড়ে, লোহা পুড়িয়ে ছাঁকা দিবে—!'

'না—দুট গম্বুই কঠে বাধা দিল মংথিয়া। ওর কোন শেষ নেই, দোষ আমার। ওর গায়ে যদি কেউ হাত তোলে, আমি তাকে ছেড়ে দেবো না।'

'বটে!—বিস্মিত ক্রুদ্ধ কঠে চৌচিয়ে উঠল মোড়ল। তারপর নিজেকে সংযত করে বলল, 'বেশ। গায়ের ছোরাটা তাহলে মড্রাজার কাছে গিয়েই দাঁপিয়ে।'

পরদিন থেকে আবার যথারীতি কাজে লেগে গেল মংথিয়া। ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়ে কাস্তে নিয়ে। নিজের ক্ষেতে যোদন কাজ থাক না, জন থাতে অস্ত্রের জমিতে। বেলা গড়িয়ে গেলে বাড়ি ফিরে আসে। নিঃশব্দে দুটো খেয়ে নিয়ে আবার কোথায় চলে যায়। মার সঙ্গে যোগাযোগ কোনকালেই নেই। মেয়েটাকে আদর করত নায়ে নায়ে তাও ছেড়ে দিয়েছে। বৌ-এর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ। বাস্তব বাস্তব টহল নিয়ে অনেক রাতে যখন ঘবে ফেরে তার আগেই মেয়ে কোলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সিমুন্সি। ঘরের কোণে ঢাকা দেওয়া ভাত দুটো থেয়ে নিজের নির্দিষ্ট

জায়গাটিতে শুয়ে সেও কখন ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ঘুম ভাঙে, বৌ বিছানায় নেই।

এমনি একটা বৌত্রিশ দিন। মধ্যাহ্ন গড়িয়ে পড়েছে অপরাহ্নের কোলে। মাঠের কাজ সেরে বাড়ি ফিরেছিল মংখিয়া। ক্লান্ত এবং তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষুধার্ত। বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছে দুজন বিদেশী কোমরে তরুণীরা। মাথায় নম্র, স্বমদূত। মণ্ডরাজ্যের পাঠক এক নিমেষে চেনা গেল তাদের আকৃতি প্রকৃতি এবং স্বর্ধনার বহর দণ্ডে কানো বকমে দুটো। ভাত মুখে দিয়ে নেবার সময় চেয়েছিল মংখিয়া, সব তে পড়ে থুন সকাল খেলে বসে বসে এই যে এতখানি সময় নষ্ট হ'ল তাদের, স্ট কবার ভাবল না লোকটা। তারপর আবার ভাত খাবার সময় গেলো।

ঘরে ঢোকা মাত্র দারগোড়া থেকেই গেরয়ে পড়তে হ'ল। কিছুদূর এগোতেই চোখে পড়ল বাস্তব পড়ে পড়ে আছে মাড়ল, খার তার পানিকটা পেছনে গাছের আড়ালে শাওয়া কন সম্ভব বাড়ির আভাস। মংখিয়ার চোপছুটো দপ করে জলে উঠল। বিন্দু জালা সে লুকিয়ে রাপল নিধের কাছেই। একটিবার তাকিয়েই ফিরিয়ে নিল চোপ ছাট।

মণ্ডপ্রান্তাশাষ - মণ্ডরাজ্যের দরবার। তার চারদিকে ঘিরে রয়েছে মধ্যযুগের নির্মম কঠোরতা। রাজকীয় জীকজমকের মাঝখানে প্চারআসনে বসে এজলাস করবেন বোহমড চাক দুজের্য তাঁর আইন-কানুন, দুর্ভজ্য তাঁর বিধিনিষেধ। সে সব—যে ভক্ত করে, যে মাস দণ্ডের হাত থেকে তার নিস্তার নেই। দণ্ড মানাই দৈহিক নিপীড়ন। অ-রাপ ভেদে তার অমানুষিক বৈচিত্র্য। শুনেছি, কত হতভাগ্য আশামৌ ঘর থেকে দরবারে এসেছে আর ঘরে ফিরে যায়নি।

মংখিয়ার অদৃষ্ট প্রসন্ন ছিল, আর দেহটাও ছিল পাথরের তৈরি। সেটাকে টেনে নিয়ে কোনোরকমে এক দিন মংঘরে গিয়ে পৌঁছিল। কেমন করে আর কিদের জোরে, সে রহস্যানুজ্ঞেয় ভেদ করবে পারেনি। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। কাঙ্ থেকে ফিরে, বারান্দার উপর এসে পৌঁছা অশ্রুত দেহ থাকতে দেখে মা চমকে উঠেছিলেন। শুধু গোড়ানি শুনে বুঝেছিলেন তার ছেলে ফিরে এসেছে মণ্ডরাজ্যের দরবার থেকে : খানিকটা স্তম্ভ : বার দরবার পর ছেলেকে একদিন ওদিকে তাকাতে দেখে বলেছিলেন, 'বৌ বাড়ি নেই'। গোড়ালের ওখানে গছে বোধহয়। দাঁড়া, ডেকে নিয়ে আসি।'

'না—প্রান্তাশাষ দূত করে বলল মংখিয়া। সে স্বব শুনে মা-ও আর যেতে সাহস করেনি। পরদিন ভাতের পপ্টে তেল মাশিশ করতে করতে অনেকটা ঘেন কৈফিয়েতের ভরে 'না—মা', 'ছেলেমাছুষ' কোঁকের মাথায় বাড়াগাড়ি করে ফেলেছে। এখন ভাত আসছে না। মংখিয়ার কাছ থেকে ভাল মন্দ কোনো জবাব পাওয়া গেল না। একটু খেয়ে সব চড়িয়ে বললেন মা, 'তাই বলে ঘরের বৌ পবের বাড়ি পড়ে থাকবে নাকি বাড়ি আনতে হবে না?' মংখিয়া এবারেও নিরুত্তর।

তারপর দিন। রাত শেষ না হতেই যা চলে গেছেন মান্নিরে। মংখিয়াও কাটারি হাতে ধীরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ল মাঠের পথে। খানিকদূর গিয়ে কি মনে করে আবার ফিরে এল। কিন্তু বাড়ি ঢুকল না, তেমনি মন্ডর পায়ে এগিয়ে চলল মোড়লের বাড়ির দিকে। মোড়ল নেই। পুরো বুকের সময়। সেই রাত থেকে বেরিয়ে গেছে পাহাড়ে। তার বৌ আর দুটো ছেলেও গেছে খানিক পর। কোথাও কারো সাড়া শব্দ নেই। মংখিয়া এগিয়ে চলল! ভিতর দিকের উঠানে ঘরের কোলে ছায়ান্ন বসে মেয়েকে স্তন দিচ্ছিল সিম্‌কি। নিঃশব্দ চরণে সামনে এসে দাঁড়াল মংখিয়া। সিম্‌কির দৃষ্টি ছিল মেয়ের মুখে। প্রথমটা কিছু জানতে পারে ন। হঠাৎ ছায়া দেখে চমকে উঠল। চকিত চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখল সেই জানে। পালাতে গিয়েও পালান না। যেমন বসে ছিল তেমনি রইল। শুধু অনাবৃত বুকের উপর আলগোছে টেনে দিল খলিত আঁচলখানা। মংখিয়া দাঁড়িয়ে আছে ছাবির মত। নিজের স্বল্পাবৃত দেহের উপর সেই একাগ্র দৃষ্টি অশুভ করে সিম্‌কির ভারুচোখে ফুটে উঠল লাজবক্ত মুহূর্তসি। স্নিগ্ধ তিরস্কারের ঘরে বলল, ‘অনভা কোথাকার!’ তারপর, মেয়ের মুখ থেকে স্তন্যগ্র সরিয়ে নিয়ে বলল, ‘আর যেতে হবে না। এই জ্ঞাপু কে এসেছে।’ মেয়ে হাসল। দন্তহীন অন্তরঙ্গ হাসি। মংখিয়া নত হয়ে মেয়েকে কোলে তুলে নিল। একটিবার তার কোমল কর্চি গালদুটো ধরে আদর করল। তারপর তাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে, দুপা এঁগিয়ে এসে বৌ-এর গলায় বসিয়ে দিল কাটারির ঘা। মাথাটা যখন ছিটকে পড়ল মাটিতে, সেই শেষ স্নিগ্ধ হাসিটি বোধহয় তখনো তার চোখের কোণে মিলিয়ে যায় নি।

সংক্ষেপে এই হ’ল মংখিয়া জং-এর খুনের ইতিহাস। শুনেছিলাম তার মুখ থেকেই চিটাগং জেলের বারো নম্বর সেল-এর সামনে বসে। গুচ্ছিয়ে শাজিয়ে বলা আত্ম-কাহিনী নয়। প্রশ্নের জাল ফেলে সংগ্রহ করা তথ্য। দোভাষী ছিল আমার অক্সিস-রাইটার গুণধর চাকমা। বক্তার ভাষাকে ভাষান্তরে পিঁচে দেওয়াই হ’ল দোভাষীর কাজ। সে শুধু কাঠামো, তার মধ্যে সমুদ্র প্রাণের স্পন্দন কেউ আশা করে না। গুনধরের মুখ থেকে যে কাহিনী শুনেছিলাম, সেটা ভাষান্তর নয়, রূপান্তর। অন্তরের রং দিয়ে আঁকা সেই ভাষা ভাষা ঠাণ্ডেজ বাক্যের মধ্যে বাকরণ নিষ্ঠার পরিচয় ছিল না, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ছিল দরদার প্রাণের সনিষ্ঠ প্রকাশ। সে যেন অন্তের কথা নয়, দোভাষীর নিজেরই অন্তঃপ্রাণবদ্ধ অন্তরের বেন্দনাময় রূপ।

বেশ মনে আছে, শুনতে শুনতে কখন তন্নয় হয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ বাধা দিল একটা অতি পরিচিত ‘খটাম’ শব্দ। অর্থাৎ বড় জমাদার সবুট-সেলায় ঠুঁকে নিবেদন করলেন, ‘ফাঁসিকা খানা আয়া, ছজুরা।’ তার পেছনে কালিমাখা ‘চৌকাওয়ালার’ হাতে ঢাকা দেওয়া অ্যালুমিনিয়ামের খালা। খানা উদ্ঘাটিত হ’ল। শুধু খানা নয়, এই মৃত্যু পথঘাতীর অয়ের খালার সঙ্গে জড়ানো জেলরক্ষীদের

নীচব হৃদয় স্পর্শ।

ভাতের পরিমাণটা খেতে হয় দু—‘ডাবু’, অর্থাৎ সাধারণ কয়েদীর যে বরাদ্দ তার ডবল। সেই অনুপাতে ডাল তরকারি। সেদিনটা ছিল মৎসদিবস, অর্থাৎ সাপ্তাহিক fish day। ভাতের তুপের উপর তার যে ভিজিত খণ্ডটি লক্ষ্য করলাম তার আয়তনও চারভনের বরাদ্দের চেয়ে ছোট নয়। ফাঁসির আসামীর জন্তে এই যে বিশেষ ব্যবস্থা, এর পেছনে জেল কোডের অনুশাসন নেই, কতৃপক্ষের নির্দেশ বা অনুমোদন কিছুই নেই। এর মধ্যে যদি কোনো কোড থাকে, তার রচয়িতা জেলখানায় বহু নির্দত্ত ‘সিলাই জমাদার’।

খানা পরিবেশিত হ’ল। সেই সঙ্গে জমানারের পকেট থেকে বেরোল এক বাঙালি বিড়ি। এ বস্তুটিও খানার অঙ্গ। Condemned Prisoner অর্থাৎ ফাঁসির জন্তে অপেক্ষমান বন্দীর সরকার প্রদত্ত Special privilege। অন্য কয়েদীরা এ দাফিয়া থেকে বঞ্চিত।

ত্রি-সন্ধ্যা এই ফাঁসি—ষাট্চার খাত-পরীক্ষা ছিল আমার আইনবদ্ধ কায় তালিকার অঙ্গ। ঠিক পরীক্ষা নয়, পরীক্ষা। কি উদ্দেশ্যে এ আইন রচিত হয়েছিল, আমি জানি না। বোধহয়, যে হত্যাকাণ্ড সরকারের নিজস্ব অধিকার, তার উপর কেউ অধৈর্য হস্তক্ষেপ না করে, তারই জন্তে এই হুঁশিয়ারি।

মংখিয়ার কাহিনার বাকী অংশটা সংক্ষিপ্ত। সরকারী নথিপত্র থেকেই পাওয়া গেল এর বিবরণ। মজুরজাকে অগ্রাহ্য করে রক্তমাখা কাট্যার হাতে সে দোজা গিয়ে উঠল ব্রিটিশ সরকারে খানায়। শাস্ত সহজ কণ্ঠে জানাল, ‘এই দা দিল্লি বৌকে খুন করে এলাম! তোমাদের যা করবার করা’

বিচারের সময় নিম্ন বা উচ্চ আদালতে এর বেশি আর বিশেষ কিছুই সে বলেনি। আত্মপক্ষ—সমর্থনের কোনো ব্যবস্থা তার ছিল না। সরকারী খরচে একজন তরুণ উকিল তার হয়ে লড়েছিলেন। তিনি বারংবার প্রশ্ন করেছিলেন মংখিয়াকে—‘এ কথা কতটা সত্য নয় যে তোমার স্ত্রী ঐ মোড়লের উপপত্নী ছিল এবং ওর সঙ্গেই সে বাস করত?’

—না?

—এ কথা কি সত্য নয় যে ঐ মোড়লের উপপত্নী থাকাকালীন অবস্থায় পাশের বাড়ার আর একজন লোকের সঙ্গে তার গোপন প্রণয় ছিল?

—মিথ্যা কথা।

—এবং সেই কারণে ঐ মোড়লই তাকে খুন করে করে তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে?

—না; খুন আমি করেছি।

খুনী মামলার বিচার-স্থল দায়রা আদালত এবং তার জন্তে রয়েছেন বিচার

বিভাগের লোক, থাকে বলা হয় সেসন জজ। চিটাগং ছিল ট্রাক্টসের ব্যবস্থা অন্তরকম। সেখানকার দায়রা বিচারের ভার ছিল চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের হাতে। তিনিও নিজে থেকে কতগুলো প্রেরণ করেছিলেন খুনের রহস্য ভেদ করবার জন্তে। জানতে চেয়েছিলেন, 'কেন খুন করেছ? বৌ-এর বিরুদ্ধে কি তোমার অভিযোগ? কখন, কী অবস্থায়, কোন্ আক্রোশে নিজের বৌ-এর ঘাড়ে বসিয়ে দিলে দাঁ' এর কোপ?'

এসব কথার দু'চারটা জবাব দিয়েছিল মংখিয়া। ঠিক কি বলেছিল, তারপরে আর তার মনে নেই।

আপীলের জন্তে মংখিয়ার কোনো আগ্রহ ছিল না। গুণধর চাকমা একরকম জোর করেই তাকে রাজী করেছিল। তারপর আমার কাছে এসে বলল, 'আপীলটা, স্ত্রীর, আপনাকে লিখতে হবে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কিন্তু আমি তো উকিল নই।' গুণধর বললে, 'সেই জন্তেই তো বলছি। এখানে উকিলের বুদ্ধি চলবে না।'

—তবে কার বুদ্ধি চলবে স্ত্রী?

—বুদ্ধি নয়, স্ত্রীর, চাই শুধু একটুখানি হাট—

গুণধরের অসুযোগ কিনা জানি না, আপীল আমিই লিখেছিলাম। আপীল নয়, আবেদন। তার মধ্যে আইন ছিল না। সরকার পক্ষের সাক্ষীদের কথায় কোথায় অসঙ্গতি, কোথায় অত্যাতি, সে সব দেখিয়ে যুক্তি জাল বিস্তারের চেষ্টাও ছিল না। ছিল শুধু খানিকটা উচ্ছ্বাস।…… স্ত্রীর কাছে কী পেয়েছিল মংখিয়া? প্রেম নয়, অকৃত্য আনুগত্য নয়, শুধু লালনা, গুহতা আর অমাহুষিক নির্ধাতন। কোনো একটা মানুষের অন্তরের সমস্ত কোমলতা নিংড়ে ফেলে দিলে, তাকে নির্মম কঠোর ক্ষীণ করে তুলবার পক্ষে সেগুলো কি যথেষ্ট নয়? সে যদি সভ্য মানুষ হত, হয়তো ঐ স্ত্রীকে সে বর্জন করত, ভেঙে দিত বিবাহ বন্ধন, কিংবা হয়তো অমবে সজিত বিবাক্ত বিষেব লুকিয়ে রেখে তার সঙ্গেই অভিনয় করে যেত সারাজীবন। কিন্তু মংখিয়া সভ্য মানুষ নয়, পাহাড়ে জন্মে স্বচ্ছন্দে বেড়ে ওঠা প্রকৃতির হাতের মানুষ। সভ্যতার কপটতা তাকে স্পর্শ করেনি। আত্ম-সংযমের নামে আত্মপ্রবঞ্চনা সে শেখেনি। তাই তার বুকের ভেতরকার সমস্ত জিঘাংসা প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে ধ্বংসের নয়-মুতি ধরে। শিক্ষা-সংস্কৃতির মুখোশ পরে আপনি যেখানে শানিয়ে শুধু বাক্যবাণ প্রয়োগ করতাম, অরণ্যচারী মুক্ত মানুষ মংখিয়া সেখানে বসিয়ে দিল হুত্বার আঘাত।

তারপর লিখেছিলাম, সভ্য মানুষের জন্তে তৈরি যে আইন স্ববিজ্ঞ বিচারক তাই দিয়ে বিচার করেছেন বুনো মানুষের আচরণ। মংখিয়া যে খুন করেছে, যে-মন দিয়ে খুন করেছে, তাকে দেখতে হবে মংখিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে, তারই দৃষ্টি দিয়ে; শিক্ষা-মার্জিত সামাজিক মানুষের দৃষ্টি দিয়ে নয়। অজ্ঞতব করতে হবে তার সেই দুর্জয়

অভিমান, যার তাড়নায় সে নিজের হাতে বিসর্জন দিয়ে এল তার সম্ভব-বিকশিত বোবনা স্বর্ণ—প্রাতিমা, তার একমাত্র শিশু সন্তানের জননী।

সিম্ফি মরল, কিন্তু শেষ হ'ল না। তার মৃত্যু-দাহের সমস্ত ছঃসহ জ্বালা সে দিয়ে গেল এই নারীহন্তার দেহ মনে। তার কাছে কোথায় লাগে মৃত্যু দণ্ড! ফাঁসি তো তার শাস্তি হয়, শাস্তি।

উপসংহারে লিখেছিলাম, মংখিয়ার নিজের জন্মে না হোক, যারা রয়ে গেল তার উপর একান্ত নির্ভর—একটি নিষ্পাপ বন্ধা, আর একটি নিরশ্রাব শিশু,—তাদের মূৰ চেয়ে এই হতভাগা বন্দী শুধু বেঁচে থাকবার করুণাটুকু কামনা করে।

কদিনের মধ্যেই আপীলের কল বেরিয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। এই বকম আবেদনের যোতা যথার্থ উত্তর। অর্থাৎ, Appeal sumamari 'dismissed'। সরাসরি না-মঞ্জুর। তার কয়েকদিন পরেই কমিশনার সাহেব এলেন জেল পরিদর্শনে। এটা মেটা দেপবার পর ঢুকলেন ফাঁসি-ডিগ্রির চত্বরে। মংখিয়ার দেল-এর সামনে দাঁড়িয়ে জেলর সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, Who wrote his appeal?

—ডেপুটি জেলর মলয় চৌধুরী।

—তার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?

—ছুটেতে ছুটেতে এলেন জেলর সাহেব। বললেন, যাও, তোমার ডাক পড়েছে। তখন বলিনি যে ঐ সব পাগলামো করো না? একি তোমার বাংলা মাসিকের প্রবন্ধ যে আবোল তাবোল যা খুশি লিখলেই হয়ে গেল?

এবার বোঝো।

সুপারের অফিসে অপেক্ষা করছিলেন কমিশনার। প্রবীণ খেতাব মিভিলিয়ান। কাছে যেতেই সাগরে বলে উঠলেন, আপনি লিখেছিলেন আপনাল? I congratulate you—বলে, হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। স্ত্রীর আচরণ মতই উত্তেজক হোক, হঠাৎ কপে গিয়ে ঝাঁকের মাথায় খুন করেনি মংখিয়া। It was a planned affair. ভেবে চিন্তে খুনের উদ্দেশ্য নিয়েই সাগরেছিল মোডলের বাড়ি।

আমি প্রতবাদ করলাম না। সাহেব একটু অপেক্ষা করে আবার বললেন, তার চেয়ে বড় কথা,—বাই দি বাই, আপনি ম্যাডোনার ছবি দেখেছেন।

বললাম দেখেছি।

ভাবগভীর স্তরে বললেন কমিশনার, আমার বিশ্বাস, ওর চেয়ে সুন্দর, ওর চেয়ে পবিত্র সৃষ্টি সংসারে আর কিছু নেই। আপনার কি মনে হয়?

বললাম, আমার ধারণাও তাই।

সাহেব বললেন, মংখিয়ার চোখে সামনে ছিল সেই জীবন্ত ম্যাডোনা—A young mother suckling her little baby. যে কোনো একটা নারীমূর্তি নয়, তারই

হৃদয়বী তরুণী জী, আর তার কোলে শুয়ে স্তন-পান করছিল যে শিশু সেও তারই প্রথম সন্তান। Can you imagine a purer sight! But it could not soften his mind. এতটুকু দাগ পড়ল না তার মনের ওপর। What a hardened criminal আপনি বলছেন যে করুণার পাত্র। Absurd. He deserves no mercy. মৃত্যুই তার উপযুক্ত দণ্ড।

কমিশনার সাহেবের যুক্তি খণ্ডন করার মত কোনো তথ্য আমার হাতে ছিল না। তাই, শেষ পর্বস্তু চূপ করেই ছিলাম। হয়তো ঠর কথাই ঠিক এই খুনী লোকটাকে আমি যা দেখাতে চেয়েছি, সেটা সে নয়। মাহুষের অন্তরের কাছে তার কোনো দাবি নেই। তবু, পরদিন সকাল বেলা আবার ঘন গিয়ে দাঁড়ালম তার সেল-এর সামনে, আর সে চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে, —তার বিশাল দেহের সঙ্গে অত্যন্ত বেমানান ভীক, ভাবলেশ বঞ্চিত ছোট ছোট দুটি চোখ, —আমার কেবলই মনে হতে লাগল, কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে।

ফাঁসির দিন ধাং হ'ল। তার কদিন আগে ষথারীতি জিজ্ঞাসা করা হ'ল আসামীকে কাউকে দেখতে চাও?

মংথিয়া বলল, অনেক ঘণ্টা সন্ধ্যার পর, আমার নাকে ঘঁস একবার। সরকারী ব্যবস্থায় পাঁচ হুদিনের মধ্যেই তার নাকে নিয়ে আসা হ'ল। সেই শীর্ণকায় পান্ডিত্য রমণীর দিকে একবার নাকিয়েই বুঝলাম বার্কিফ তার দেহকে ছুঁয়ে নিলেও মনকে স্পর্শ করতে পারেনি তাকে দেখে একথা মনে হচ্ছিল যে, তার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র এবং সংসারের একমাত্র অবলম্বন আজ মৃত্যুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাকে স্মরণ করেছে। জেল গেট থেকে দুর্বল অবিচল পদক্ষেপে সেল-চত্বরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ফাঁসী ডিগ্রির নৌকপাট খুলে দেওয়া হ'ল। ফাঁসির আসামী ফাল ফাল করে করে তাকিয়ে রইল সেইদিকে। কাছে গিয়ে বললাম, বাইরে এস। তোমার না এমছেল।

অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উঠানে নেমে এল মংথিয়া। নত হয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে ধরতে গেল তার মায়ের পা দুটো। চোখের নিম্নে দুহান ছিটকে পিছিয়ে গেলেন যা। হাত নেড়ে নিষেধের স্বরে কি যেন বলে উঠলেন কুদ্ধ তাক্স পাহাড়ী ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল দোভাষী চাকমার গম্ভীর কণ্ঠ—Don't touch me; you are a sinner. পরমহর্ষেই কেমন কোমল হয়ে গল বুদ্ধার জড়িত স্বর। ডান হাতখানা উপরে তুলে বিড়বিড় করে বললেন, তথাগত তোমার মঙ্গল করুন।

মংথিয়া মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল ঐ তিরস্কৃত শিশুর মত। দুচোখের কোণ বেয়ে নেমে এল জলধারা। চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা কজন মাহুষ জীবন্ত নয়, চিত্রপিত। তাদের সচকিত করে আবার শোনা গেল বুদ্ধার স্পষ্ট তীক্ষ্ণ স্বর কী চাও তুমি আমার কাছে?

মংথিয়া চোখ তুলে তাকাল। ভয়কণ্ঠে বলল, চাইবার আমার কারো কাছেই কিছু

নেই, মা। সেজন্য তোমায় ডাকিনি। একটু কথা শুধু বলে যাবো। তাই তোমায় কষ্ট দিয়েছি।

মা অপেক্ষা করে রটলেন ক্ষণিক নিরতির পর আবার শুরু করল মংখিয়া, আমি যখন আর থাকি বা না থাকি, খানাদের বাড়ির সামনে যে জমিটুকু আছে যেখানে সে দাঁড়িয়ে থাকত, ঝুন্ থেকে ফিরতে যেদিন দেরি হ'ত আশার, সেইখানে, ঠিক সেই জায়গাটিতে একটা বের চাবা লাগিয়ে দিও। দেখো, জল দিতে যেন ভুল না হয়। তাপের গাছ যেদিন পাতা মেলতে শুরু করবে, একটু মাটি দিয়ে গোড়টা বাধিয়ে দিও। রোজ সন্ধ্যা বেলা তার নাম করে একটা করে বাতি জ্বলে দিও সেই বেদির ওপর। মেয়েটা যদি বাচে একটু বড় হ'লে, তারই হাতে ছেড়ে দিও এ কাজের ভার। বলা এটা তার বাবার শেষ ইচ্ছা : না (চমকে উঠলাম তার সেই ডাক শুনে) এটুকু ; শুধু এই কাজটুকু আমার জন্তে তোমরা পারবে না ?

কর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেল মংগিয়ায়। চোখ দুটো দুহাতে চেপে ধরে ছুটে চলে গেল
তার নির্দিষ্ট গেল এর ঘোঁ।

খারো কলঙ্ক নমি নশব পাথরের মত দাড়িয়ে রইলেন তার না : তারপর ধারে ধারে পা বাড়ালেন চিরে ঘাবার পথে : হঠাৎ মনে হ'ল পা ছুটো, তার কঁপে উঠল : শুণ্ণ ন : ন : ন : শুণ্ণর চাকনা ছুট এল : তার সঙ্গে একজন গুয়ার্ডার : তাদের প্রসারিত হাতের উপর লুটিয়ে পড়ল তপ : ক্ষণা বন্ধার সংগ্রাহীন শাণ দেহ :

২৭। সাক্ষ : (চাক্ষুঃ চক্ৰবর্তী) জন্ম পাবনা জেলায়, এখন বাংলাদেশে বালো
পিতৃহারা । দাদার স্বাধানে ও অভিভাবকত্বে পাবনার গওগ্রাম ছেড়ে কলকাতায়
আসেন । পাঁচটি বৎসর আত্মশিক্ষার পরে কলিকাতার উল্লেখযোগ্য মাকলা ও সরকারী
কাৰ্য্যশালায় তাকে নামের সহিত ভৰ্ত্তাশীলনে প্রায়শুপ করেছেন । তবে কলেজ জীবনেই
বিশিষ্টায় একটি কল্যাণকরেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্পাদক শ্রেয়স উপাধি প্রাপ্তপাধ্যায়ের
উৎসাহে স্বরসাহস্কর দ্বয়ের মধ্যে প্রবাসের সময়কালে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন । যৌবনে
রামধনু, শিশুসাধী প্রভৃতি শিশু মাসিকেও নামা স্বাদের প্রায় নিয়মিত লিখেছেন ।
তবে সরকারি কার্যের দায়-দায়িত্ব প্রাপ্তির ও বন্ধির সাথে সাথে নিয়মিত লেখায় ছেদ
পড়ে । পরবর্তীকালে কারাজীবনের বিচিত্র ও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গতার ক্রমঃ “লৌহকপাট”
গ্রন্থমালা তাকে লব্ধ প্রতিষ্ঠা সাহিত্যিকের মর্যাদায় ভূষিত করে । কাব্য বিভাগের
দায়িত্বপূৰ্ণ পদে থেকেও তিনি সাধারণ কারাবাসীদের ব্যক্তিবর্নের অসাধারণ সব কথা,
বাখা ও বেদনা অপরিণীত সহায়ভূতি ও মনস্ত দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর স্বর্ণালী
কলমের অবিশ্রান্ত আঁচে ।

বঙ্গলক্ষ্মীর ভাণ্ডারে অভিনব এক কাব্য সাহিত্যের প্রবর্তনা তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় তিনি বাংলা “কাব্য সাহিত্যে” পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন।



একটি নারী হত্যাকাণ্ডের কন বা

ড. পঞ্চানন ঘোষাল

[এই রহস্য কাহিনীটি পুলশের ডাইরি লেখার টেকনিকে লেখা। এটিকে ডাইরি সাহিত্য বলা হয় লেখক প্রথম বাংলা সাহিত্যে ডাইরি সাহিত্যের উদ্ভাবক। উপরন্তু এই ঘটনাটি সত্য ঘটনা ছিল লেখক নিজে তদন্ত করে এই হত্যাকাণ্ডের নিহত নারীর মৃত্যুর রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন।]

এই অখ্যাত নারীটি ছিল এই কলিকাতা মহানগরীর জনৈক বারবণিতা। এই সহায়-সম্মলহীন রূপজীবিনী নারীর জীবনকে অমূল্য জীবন বলা যায় না। সাধারণ মানুষের চোখে রাজপথে গাড়ী-চাপা পড়া বেওয়ারিশ কুকুরের মৃত্যু ও আততায়ীর অস্ত্রের আঘাতে ঘৃণ্য পল্লীতে এই দেহ ব্যবসায়িনী নারীর মৃত্যুর মধ্যে কোন প্রভেদ না

ধাকারই কথা। এই জন্ত তার অপমৃত্যুর করণ কাহিনী এই শহরের নাগরিকদের মধ্যে কোনও আলোড়ন আনেনি। এক তদন্তকারী অফিসাররা ছাড়া এই মৃত্যু নিয়ে অল্প কারু মাথা ঘামাবার কথা নয়। কিন্তু সমাজের এমন কয়টি মানুষ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে যে, পরবর্তীকালে এই মামলার জন্তে বহু লোকেই মাথা ঘামাতে হয়। প্রকৃতপক্ষে বিচারের সময় এই অখ্যাতা নিহত নারী প্রখ্যাত হয়ে উঠে। উপরন্তু এই ঘটনার সঙ্গে অপর একটি নারীর সাগা জড়িত থাকায় শহরের এই খুনটি নিয়ে চাঞ্চল্যেরই সৃষ্টি হয়।

১৯৩২ সালের উত্তর কালকাতার কোনও এক বেড়াপল্লাভে এই নিদারুণ খুনটি সংঘটিত হয়। এই সময় অল্প একটি মামলার তদন্ত ব্যাপদেশে আমাকে শহরের বাইরে যেতে হয়েছিল। হাওড়া স্টেশন হতে মোজা খানায় ফিরে শুনলাম যে, সহকারী অফিসাররা জনৈক নারীর অপমৃত্যু সম্পর্কীয় ঘটনার তদন্তে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয়া উৎসব আগত প্রায়। এই সময় পয়সার প্রয়োজন মানুষের বেশ থাকে। এই জন্ত বহু অত্যাচারী সুবিধে মৎ বেড়া নারীদের বাড়ীতে প্রথম হানা দেয়। এজন্ত আমি আমাদের এলাকারদীন বেড়াপল্লাভলিতে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থাও করেছি। এতৎ সবেও দেখানে কেউ খুন হলে তা আমাদের লজ্জার বিষয়। আমি চিন্তিত মনে খানার ছাবদা খাতা (জেনারেল ডাইর) টেনে নিয়ে সেটা পড়তে শুরু করলাম। তদন্তে ব্যস্ত হবার আগে হত্যাকারীর এতে একটা প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এই প্রাথমিক সংবাদের প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হলো—

“অমুক রাস্তার ১২নং কুঠির নিচের তলার সারদাসুন্দরী বাড়িওয়ালীর ভূতা কাণ্ডয়া কাহার এসে সংবাদ দলে যে, তাদের বাড়ীর দ্বিতলের একটি ঘরে সুখুয়াণী নামে এক নারী বাস করে। সাধারণত সে প্রতিদিন সকাল সাত ঘটিকার মধ্যে ঘর হতে বার হয়ে আসে। কিন্তু এইদিন বেলা এগারটাতো সের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসেনি। বাড়ির অগ্ন্যাগ্ন মেয়েরা তাকে ডাকাডাক করে, তারা দরজায় ধাক্কাধাক্কিও করে, কিন্তু তা সবেও ঘরের ভিতর থেকে সুখুয়াণী ঘরের বাইরে আসেনি। এমনকি, এতো ডাকাডাকিতেও স কোন সাড়া-শব্দ পৰ্যন্ত শোনা না। এই ব্যাপার ঐ বাড়ীর বাড়িওয়ালী-মাকে জানানো হলে তার আদেশমত সংবাদদাতা এই ঘটনাটি পুলিশে জানাবার জন্তে খানায় এসেছে।”

খানার ছাবদা খাতাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে আমি দেখলাম যে, উহার প্রথম ‘খাকে’ উপরোক্ত সংবাদটি লিপিবদ্ধ করে উহার দ্বিতীয় ‘খাকে’ জনৈক সহকারী অফিসার লিখে রেখেছেন, “এই খাতার ১নং খাকে বর্ণিত সংবাদের তদন্তে আমরা বহির্গত হলাম।” এই সংবাদটি দ্রুতগতিতে পড়ে নিয়ে আমি ভাবছিলাম, কি যে বাবা। খুন নয় তো! ঠিক সেই সময় সহকারীরা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে খানায় ফিরে এলেন। এঁদের হাসিমুখে খানাতে ফিরতে দেখে আমি আশ্চর্য

হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কি হে মার্ডার, না সুইসাইড?’

‘কখন ফিরলেন স্যার?’—আমাকে দেখে জনৈক সহকারী খুশি মনে উত্তর করলেন, ‘একে আপনি উপস্থিত নেন, তার ওপর এই আমেলা।’ আমরা একটু ভয় পেয়ে গিচ্ছলুম। যাক, এখন দেখা যাচ্ছে এটা একটা সাধারণ বাতানার—এ পিওর কেশ অব সুইসাইড। কিন্তু জ্ঞান লোকটি কেন আগ্রহতা করলো তা জানা পেলো না।

‘যাক স্যার! মেয়েটা ভালোয় ভালোয় নিজেই সব পদ্দলো’, প্রথম সহকারীর কথাটা শেষ হওয়া মাত্র দ্বিতীয় সহকারী বলে উঠলেন, ‘তা’ না হলেও যে আরও কতো কচি মাথা চি’বয়ে যেতো, তা কে জানে।’

‘ভাতো ভাই বুঝলাম।’ আমি নারাজি ভাবে ঘাড় নেড়ে সহকারীর এই উক্তি প্রত্যুত্তর বললাম, ‘কিন্তু আমাদের বন্ধুরা নিজেদের কচি মাথাগুলো এদের বাড়ী পঞ্চর ব’য়ে নিয়েই বা যায় কেন?’

এমনি হাস্য-বিহাসের মধ্যে আমার সহকারী ডেনাবেল ডাই’রিতে এই যন্ত্রহত্যার তদন্ত সম্পর্কে রিপোর্টটি লেখা শেষ করেছে, এমন সময় আমাদের বড়মহোব রাই-বাহাদুর পভাতনাগ মুখার্জি টেলিফোনে আমাদের খোঁজ করে বসলেন। টেলিফোনে আমার গলা শুনে তিনি আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, ‘সারে, তুমি কলকাতায় ফিরছো। বেশ বণ, তা’হলে ভালোই হলো। এইমাত্র এর পেলান যে ‘অমুক পাদায় একটা মেয়েকে মরা খপড়ায় পাওয়া গিয়েছে।’ বোমার অফিসাররা শুনলাম এটা আশ্চর্য হওয়া বলে বা দি’ব্ব এসেছে। কিন্তু আমার মনে হয় এটা সুইসাইড না শু হতে পারে। তুমি এখন নিজে দেখানে গিয়ে দেখো, এটা সত্যই সুইসাইড, না মার্ডার।’

টেলিফোনটির হ্যাণ্ডেল যথাস্থানে রাখা করে আমি একবার মাত্র সাবলাম। আমাদের ট্রেনটা স্টেটল করে পরের ট্রেনে এলেই ছতো। অকৃত ছ’ঘণ্টা পরে পৌঁছুলে এতো আশ্চর্য্য আর পোষানে ছতো না। পুরা এছদিন ট্রেনের ঝাঁকুনি দেখে যেতে কোলকাতায় পৌঁছিয়েছি। বিজ্ঞানমের লালদাস শাস্ত্রী দেহটা এমনিতেই বলিয়ে পড়তে চায়। মনের জ্বারে দেহটা চাক্ষা করে নিয়ে আমি সহকারী স’দকে জিজ্ঞাসনেন্ত্রে চাইলাম। তৎক্ষণে সহকারী তাঁর রিপোর্ট লেখা-খিরা কাজ শেষ করে ফেললেন। আমি তাঁর হাত থেকে ডাই’রি বইটা টেনে নিয়ে সেটা পড়তে শুরু করে দিলাম। তিনি তাঁর পিস্তুল রিপোর্টে ঘটনাস্থলের কয়েক ব্যক্তির বিবৃতির সহিত নিজেও একটা ন্যাংদোণ বিবৃতি সংযুক্ত করেছেন। এই সম্পর্কে তদন্তকারী সহকারীর বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

“আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখি যে, ঐ নারীর ঘরটির ছরার ভিতর হঠকৎ বন্ধ করা হয়েছে। এটি ঘ’র হতে পা’ব হয়ে আসবার মত ঐ একটাই মাত্র দরজা ছিল। ঐ দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে আমি বুঝতে পারি যে, ভিতর হতে অগ্নি বন্ধ করা হয়েছে। অগত্যা ভোর করে দরজা ভেঙে আমাদের ঐ ঘ’র ঢুকতে হয়। দুইজন স্থানীয় সাক্ষী

সঙ্গে এই ঘরে ঢুকে আমরা দেখলাম যে এক নারী বক্তাপ্রস্তু অবস্থায় তার বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শায়িত। এই মেয়েটির বয়স অনুমানে বিশ বৎসর মনে হলো। তার গায়ের রং উজ্জল, শরীরের গঠন বেশ গোন্দাল মতোল। মৃত্যুর পরও তার মুখটা চমকে কাঁচ কাঁচ মনে হয়। তার শরীরের উপর্যাংগে একটা গভীর ক্ষত দেখলাম। এই ক্ষতের এক কিনারা দিয়ে উঠে পড়িয়ে এসে পড়েছে। শরীর বিছানাতা রক্তের তোপ লেগে কালো হয়ে গেছে। অর্ধাঙ্গিদ্ধ হাত দুটি এলিয়ে দিয়ে যে যেন ধুমুচ্ছে। ভালো করে চেয়ে দেখলাম যে শরীর চক্ষুর পাশে অধঃখালিত অবস্থায় রয়েছে। একটা বারালো বক্তাপ্রস্তু পোষারা ছুরতীর হাতের কাছে ঝড়ে আছে। কিন্তু উগা তার হাতের লামালের বাইরে দেখা যায়। সম্ভবত প্রাণহানি এই মাটিতে পড়ার কালে উহা তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে। এই ঘরের এই একমাত্র দরজা ছাড়া বাস্তবদিকে হুটী নাক জানালা আছে। এই জানালায় মোটা গরাদ লাগানো আছে। এই জানালার দুটোর পাল্লা খোলা ছিল। ঘরের মধ্যে কোনও বাক্স ড্রয়ার ভাঙা দেখা যায়নি। ইত্যাদি।

যা নাকার দুটোকার পাশাপাশি বিনাকটির উপর তবিল গম্বিতে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তারপর অন্যকটি প্রদ্ব দরজায়। সেই দর প্রদ্বোত্তরপ্রদ্ব দর প্রদ্বোজনায় অংশ নিয়ে উল্লস করা হলো।

প্রঃ—জঁ বুয়লাম। একজু এটা মইসাইড ছাত্ত আর কিছু নয়, তা নাম বুঝছো ক'করে। মায় ভুনি এই বান বে দর দিক্কায়ে এসে কেন। এটা একটা মার্ডার কেসও তো হতে পারে?

উঃ—না না স্যার। একজুতেম মার্ডার কেস হতে পারে না। এক্ষেটা প্রেম-টেমে পড়ে ব আলাবস্থায় মায়সাত্ত করেছো। এর নবের মায় টা তো ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। আমরা সকলের সম্মুখে মট ভেঙে এর ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ওদিক ওই ঘরের জানালায় মোটা মোটা গরাদ রয়েছে। এদিকে একমাত্র এই মেয়েটা ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণ্য তার ঘরে ছিল না। এই পরিস্থিতি অবস্থায় তার ঘরে শুয়ে ছিল। বাইরে থেকে কাকি নাকি বাক্স তার ঘরে ঢোকা সম্ভব। এটা অবস্থায় কে আর কাকে খুন করবেন মাদিনে?

প্রঃ—আগে থানো থানো। আম-টেম ওরা কেনো বচা করে। একজু ওমবের বালাই ওদের নেই। এান বাক বইনো জালা-ময়গার প্রদ্ব। কিছু নাহুঘের নাম মহাশয়, যা মগযানো যাক তাই নয়। তখনই ওদের গা মগয়া হয়ে গিয়েছে। একজু এসব তাত্র ভাগে ওদের খল্লভূত না মগয়াবক কম। তবে শেষের দিকে উর্মি যা বললে তা ভেবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তুমি ভালো করে জেনেছে তো, এই ঘর হতে কোনও অথ বা অনজারাদি অদহত হয়নি?

উঃ—আজ্ঞে হাঁ। আমি এই ঘরের প্রতটি বাক্স, তোরঙ্গ ও আলমারী, মায়

ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারগুলো পঞ্চ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখেছি যে, সেগুলোর একটাও ভাঙাভাঙ্গ হয়নি। এইসব দ্রব্যের বাহ্যদেশে কোনও খস্কের আঘাত আমি দেখি নি। ওগুলো বাইরে থেকে খোলাও যায়নি। ওর প্রত্যেকটি বাক্স-আদি চাবি বন্ধ ছিল। আপনি স্যার এই অবস্থায় এটা খুল মনে করছেন কেন?

প্রঃ—তোমাদের সব কিছুই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেলো। ওর আঁচলে একটা চাবির কথা কি তোমরা কেউ ভেবেছো? তার সেই চাবির গোছা কি যথাস্থানে সন্নিবেশিত আছে? প্রথমত এই সব মেয়ের ঘরে দোখারা ছুরি থাকার কথা নয়। এরপর তার চাবির গোছা না পাওয়া গেলে চিন্তার বিষয়। বদলাকেরা কখনো কখনো এদের ঘরে এলেও তাদের হাতিয়ার তারা সেখানে ফেলে যাবে না। উঁহ, আমার ঘেন কি বকম সন্দেহ হয়। লাস কি তোমরা মগে পাঠিয়ে দিয়েছো?

আমরা এইবার ধান্য হতে বার হয়ে দুর্ধর্ষ মল্লিকবাবুর গুণধর পোত্রের শব্দরালয়ে এসে উপস্থিত হলাম। এঁদের বাটীর বর্তমান আবহাওয়া মল্লিক বাবুদের বাটীর মত সাবেকী নয়। অতি আধুনিকতার আবর্তনে এই বাড়ীর ছোট-বড় সকলে এরা হাবুডুবু। এখানে এসে প্রথমে আমরা ঐ মল্লিক বাবুর গুণধর পোত্রটিকে জিজ্ঞাসা-বাদ করলাম। তাঁরা বিবৃতির প্রয়োজনায় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দিলাম।

“আমার নাম বাবু অমুক মল্লিক, পিতার নাম অমুক মল্লিক পাঞ্জাবী বংশোদ্ভব হলেও ছয় পুরুষ আমরা বাংলা প্রবাসী। আজ্ঞে, ই্যা। আমাদের উত্তরাধিকারিত্ব এই প্রদেশে প্রচলিত দায়-ভাগের বদলে মিতাক্ষর আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জন্মের সাথে সাথে আমরা পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হই। পিতা কর্তৃক রাজ্য পুত্র হওয়ায় ভয় না থাকায় সহজে তাদের সাথে কলহে লিপ্ত হয়ে—এদেশে ভাই ভাই-এর মত পিতা ও তৎপিতার সাথে পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে আমরা সক্ষম। এই স্ববিধা থাকায় দুই পিতা বা পিতামহ সম্পত্তি নষ্ট করলে আমরা বাধা দিতে পারি। এদেশের পিতাদের মত পৈতৃক সম্পত্তি খুঁড়ে সম্মানদের এরা পথে বসাতে পারে না। এই জন্য আমরা পিতামহের সাথে দেওয়ানী মামলা করে সম্পত্তির জন্য পার্টিশন স্যুটে আমাদের লিপ্ত হতে হয়েছে। এই বিষয়ে আমাদের উভয়েরই অভিযোগ যে, আমরা পরস্পরে প্রপিতামহের আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়ে দিচ্ছি আজ্ঞে ই্যা! আপনি এই বিষয়ে ঠিক ঠিক বুঝে নিতে পেরেছেন। আমরা ধনী বংশীয় শুণ্ডায় বাল্যকালে আমাদের বিবাহ হয়। ঠাকুরদার খোলো বংশের বয়সে আমাদের পিতার জন্ম হয়। আমার স্বর্গত পিতার আঠারো বৎসর বয়সে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতামহ ও আমার বয়সের মধ্যে এজ্ঞা ব্যবধান স্বভাবতঃই খুব বেশি নয়। আমাদের মত এইরূপ বহু ধনী পরিবার এইভাবে বহু পুরুষ একত্রে বসবাস করতে পেরেছে। এইবার আমাদের আর কি জিজ্ঞাসা আপনি করতে চান তা বলুন।”

ভক্তলোকের এই বিবর্তি হলে ভারতীয় দৈনিক সমাজের এক নতুন দিকের আমি সন্ধান পেলাম। এখন আমার মনে হয় যে নবনারীর দিবাহের বয়স বেঁধে দিলেও বহু সামাজিক অপরাধের অবসান হতে পারে। অত্যাচার পিতা ও পুত্রের মধ্যেও মমতার বদলে পিঠোপিঠি ভাতস্নানভ ঈর্ষার উজ্জেক হওয়া অসম্ভব নয়। এই একটি কারণে পৌত্রের বর্তমানেও মাল্লিকবাব পুনরায় দার পরিগ্রহ করে তাদের সোনার সংসারে মামলা ঠিক করে পেরেছেন। এই মামলার সংশ্লিষ্ট দলী দরিদ্র নির্বিশেষে অন্ত কয়েকটি নব-নারীর জীবনের বার্থতার পিছনেও দেখা যায় এই বয়সের নীতিবিহীন তাবতন্য। তাই আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র এই বিষয় নিয়ে আর ভাববে কবে? এই ক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারি যে বয়সের সীমাবদ্ধ হেতু এদের পরস্পরের দুর্বলতা পরস্পরে জ্ঞাত হতে পেরেছে। একজ্ঞা এরা পরস্পরকে পরস্পরের প্রাপ্য সম্মান দিতে পারে নি। ফলে চরিত্র স্তম্ভের নারীর বয়স অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই এদের পুত্র-পৌত্রেরা সমালোক হয়ে উঠে। তাই এদের পারিবারিক সমস্যার সমাধান না হয়ে উঠা জটিলতর হয় উঠে।

এটার পাশে এই দলী ঘরের যুবকটিকে এই মামলার তদন্তের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন করি। আমার প্রাণটি প্রশ্নের উত্তর তিনি যথামতভাবে নিয়ে যান। আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো। এই সকল প্রশ্নোত্তর হলো— এই খুনে অন্ধনিত উদ্বেগ বুঝা যায়।

পঃ—ভম্! আপনার স্বর্গত পিতার বিষয় আমি উত্থাপন করবো না। আমি শুধু আপনার ও আপনার ঠাকুরদার বিষয়ে সজ্ঞান করবো। আপনার ঠাকুরদার মত আপনাকে পাত ও পাত না করে একনিষ্ঠতার পক্ষপাতী। এটা আপনার চেহারা দেখে ও কথাবার্তা শুনে ধারণা করেছি। আপনার স্ত্রী ও বনেদা ঘর হতে আপনাদের ঘরে এসেছেন। অতএব ঘরে এসে যাওয়া য, তিনি সুলক্ষী ও গুণবর্তী। আপনার ও আপনার ঠাকুরদার গাত্রবর্ণ দেখে বুঝা যায় যে, প্রেম করে বিবাহের বেওয়াজ আপনাদের পারবারে নেই। এইজন্মে প্রতি পুরুষের ঘরে সুলক্ষী বউ এসেছে। তা'না হলে আপনাদের গায়ের রঙ এক ফর্সা দেখা যেত না। কিন্তু আপনি এক পর—নারীপ পুণ্যভিলাষী হলেন কেন? এই সংবাদ আমার পূর্ব হতে সংগ্রহ করেছি, অতএব উহা গোপন করে লাভ নেই। এখন বলুন তাৎকাল হতে মুক্ত হয়ে হঠাৎ ফিরে এলেন কোন কারণে?

উঃ—মশাই, তাহলে আপনাদের নিকট সংসারের সকল বিষয় খুলে বলতে হয়। আমার স্ত্রীকে আমি যে ভালবাসি তা ঠিক। তার রূপে ও গুণে আমি মুগ্ধ। কিন্তু সে গান গাইতে পারে না, অথচ গান আমি বড়ো ভালবাসি। এই গান আমাদের বংশানুক্রমিক নেশা। এই চর্চা আমাদের অধিক অধ্যাপন হতে বক্ষা করে। কিন্তু নারীর সুললিত কণ্ঠে গান শোনার বামেলাই কাল হলো। তা'না হলে এতো ব্যাধা

আমাকে দেবার ঐ শয়তানীর ক্ষমতা হতো না। আমার স্ত্রী কিছুতেই গান শিখতে রাজি না হওয়ায় আমি ওর ঘরে গিয়ে পড়ি। পরে তারই দ্বারা বারে বারে অপমানিত হয়ে আমি বাড়ি কিরি। আমার গুণবতী স্ত্রী আমার মন বুঝে গোপনে গান শিখতে থাকে। এখন তিনি সুগায়িকার মতো গণা হয়েছেন। এখন আমি একান্ত রূপে আমার এই সাক্ষী স্ত্রীর অঙ্গুগত ভর্তা। আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আর কোনও দুঃখ বা অভিযোগ আমার এখন নেই। পরিবর্তিত অবস্থাতে পিতামহের বিরুদ্ধে মাংগলা পয়স্তু কটেস্ট করতে আমার মন চাইলো না। এইজন্য এই মাংগলা ইচ্ছা করে তাঁকে আমি জিতবার সুযোগ করে দিলাম।

প্রঃ—কয়েকটি বিষয়ে ঐ কুলটা নারীর প্রতি আপনার ভুল ধারণা আছে। আমরা তদন্তে জানেছি যে আপনাকে সে অটেল ভালবাসতো। তবু আপনার ও আপনার স্ত্রীর হিতার্থে আপনার মোহ দূর করার জন্তে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে আপনার সাথে অভ্যস্ত ব্যবহার করছে। এ কথা যারা জানে না তারা তা মানে না। কিন্তু আমরা তা জানি তাই-তা আমরা মানি।

উঃ—স্তার! এ সব কুলটা নারীদের ছলা-কলার অভাব নেই। যে ঘাই হোক এখন আমি আর ওকে ভালবাসি না। তাই বোধ হয় এতো স্পষ্ট করে আজ তা আমি বুঝতে পারছি। ঐ নারী আমাকে বহু আশা দিয়ে পরে অপমান করে ঘর হতে তাড়িয়ে দেয়। আমি মোহের কোঁকে আমাদের পূর্ব পুরুষের স্পর্শদণ্ড কয়েকটা পারিবারিক গহনা তাকে সাময়িক ভাবে পরতে দিই। কিন্তু ঐ গহনার চতুর্ভুজ মূল্যের বিনিময়ে ও সে ওগুলো আমাকে ফেরত দেয়নি। স্বগত ঠাকুমা বলতেন যে, ঐ গহনা বংশের বাইরের কেউ চোয়া মাত্র সে নিহত হবে। আমি জানি যে আমার সতী সাক্ষী ঠাকুমার ভবিষ্যদ্বাণী বৃথা হবে না। এখনও পর্যন্ত লক্ষ্যায় এ কথা আপনাকেও আমি জানাতে পারছি না। আমার ইচ্ছে হয় ওকে খুন করে ওগুলো উদ্ধার করে নিয়ে আসি। তবু ভালো আমার এই কীতিকলাপ আমার দুর্দান্ত ঠাকুরদা এখনও জানতে পারেননি। এ সব গুহ্ম তবু তিনি জানলে এতো দিন গুণ্ডা নিয়োগ করে আমাকে তিনি নিহত করতেন। এগুলি দয়া করে ওর খপ্পর হতে আপনারা গোপনে উদ্ধার করতে পারেন কি? এজন্য আমি দশ বিশ হাজার টাকা খরচ করতে রাজি আছি। দেখুন আপনারা তা যদি—

এই বুকের কথাবার্তায় বোঝা যায় যে বংশ পরম্পরায় খুনের নেশা এঁদের এখনও যায়নি। পূর্ব পুরুষরা হয়তো সাক্ষাৎ ভাবে বহু বস্ত্তিকে খুন করেছেন। এখন এঁরা তাতে ব্যক্তিগত ভাবে অপারগ থাকায় মপরের দ্বারা এই কার্য করিয়ে থাকেন। কিন্তু এই বিষয়ে এঁর ধুবন্ধর পিতামহকে বাদ দিলে সন্দেহ করার মত অস্ত্র কোনও মাল্লব নেই। তবে এই বুকের কথা-বার্তা শুনে বুঝা যায় যে, তিনি নিয়মিত সংবাদপত্রাদি পাঠ করেন না। এইজন্য তিনি তখনও জানতে পারেননি যে তাঁর

স্বর্গত ঠাকুরমাতার এতৎসম্পর্কিত ভাবস্বাদবাণী ইতিমধ্যে ফলে গিয়েছে এবং তাঁর পূর্ব প্রেমিকা এই হতাশাগিনা নারী ইতিমধ্যেই 'নহতা' হয়েছে।

এই ভ্রমলোকের দিকটা যা জানবার তা জানা শেষ হয়েছে। এখন এর স্বীকার একটি বিবৃত গ্রহণের প্রয়োজন। আমি এই সম্পর্কে প্রস্তাব দেওয়া মাত্র দাদাবাবু নামধেয় এই যুবকটি মুখ ঝাকালেন। এতো আধুনিক আবেগাওয়ার মধ্যে সেমও লাবেকী প্রথা তাঁর মনে কাজে লাগে করে। অথচ এর প্রবর্তনানে আমাকে তাঁর বিবৃতি নিতে হবে। অত্যাঁচর স্বীকার ভ্রাতার উপস্থিতিতে এঁর স্বীকারে জিজ্ঞাসাবাদ করা ঠিক হলো। কিন্তু এই যুবকের স্বীকার রক্তে ইতিমধ্যে আধুনিকতা জেঁকে বসেছে। তা'না হলে গান শিখে ব্রিডও পর্যন্ত বাওয়া করতে পারতেন না। ভ্রমহীলা দাব্যস্থর চেষ্টে এই সম্পর্কে বিবৃতি নিচ্ছে ছিলেন। এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো। “আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি এই বিষয়ে ঠিক বলেছেন। সমস্ত জন্মের সাথে সাথে তাদের প্রতি মায়ের অবতা স্নেহ আসে। কিন্তু তাদের প্রতি এই জাতীয় স্নেহ বয়স্ক পিতার মধ্যে শুধু দেখা যায়। এত বয়সে আমার তরুণ বয়সে আমার স্বর্গত স্বপ্ন ৭ এখনও পর্যন্ত অশিষ্ট দা-স্বপ্নের আসে না। এই তাঁদের স্ব-স্ব মনোবাদের প্রতি তাদের স্বভাব সুলভ মমতা থাকে না। কিন্তু তা বলে মনোবাদের প্রাত কর্তব্য কাজে তাঁদের কোন অবহেলা দেখিনি। কিন্তু হৃদয়হান কর্তব্যের শেষ দশা বোধ করি ভালো হয় না। বর্তমান মামলা মকদ্দমার মূলে আছে এই। এইবার আমি আমার নিজের বয়স বলবো। আমি বি-এ ক্লাশ পর্যন্ত কলেজে পড়েছি। কিন্তু বিবাহের সময় এই বিষয় আমাদের গোপন করে যেতে হয়। আমি মাত্র মামুলি লেখাপড়া বাড়িতে করেছি—এটুকু একটা মিথ্যা না বললে আমার এই সাবেকী পত্নী পরিবারের বৃহৎ সন্তান হতো না। আমাদের বিবাহের পর কিন্তু আমাদের সময় ভালোই অতিবাহিত হয়। কিন্তু মোং একদম আমার স্বামীর সাবেকী, পারশাদিক টান শুরু হয়। এতো সাধবানে থেকে এতো চেষ্টা করেও আমি তাকে ধরে রাখতে পারি না। ওঁর গায়ের বস্ত্রের ও চুলের গন্ধ হতে আমার মন্দে, হতে থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে স্বামীকে জানালে তিনি বেপরোয়া হবেন। শিক্ষিতা হওয়ায় এই সত্যটুকু আমার জানা ছিল। আমি কৌশলে তাকে সরমুখো করার চেষ্টা করি। সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমার মতো এক দরদী নারীর কাছে পড়েন। তিনি সহ্য করতে না পেয়ে আমি বিষ গোপনে অচৈতন্য হয়ে পড়ি। এই ঘটনা শুধু কুলের বরোবী ধনকুবেররা ঘটা করে এক সংবাদপত্রে তুলে দেয়। এর দ্বারা আমাদের পরিবারকে—বেইজ্ঞত করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাদের এই শত্রুতা আমাকে একদিন পুনরুজ্জীবিত করে দিলে। এই দরদী নারী এই সংবাদপত্রটি পড়ার পর এক বালক মারফৎ গোপনে আমাকে একটি ব্যক্তিগত পত্র পাঠায়। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় আমলা বাধায় আমাকে পিজালয়ে চলে আসতে হয়। এইখানে এই মহিমময়ী নারী আমার সাথে

দেখা করে আমার এই দুর্বলতার কারণ জানায়। আমি এই মহিলার গান রেডিওতে বহুবার শুনেছি। তার পন্থাব মাত্র আমি তার কাছে গান শিখতে রাজি হই। প্রতি সপ্তাহে দুই দিন অশীম পৈর্ষের সাথে সে আমাকে শিখিয়েছে। স্বামীর মন জয় করার জয় করার জন্তে দুইটি গান সে আমাকে ভালো করে শেখায়। স্বর, তাল, লয়ের নিপুণ অর্থ না বুঝেও শুধু অভ্যাস ও অনুকরণ করে করে গান হু। হু হু ওরই মত আমি গাইতে শিখি। এরপর ওরই চেষ্টায় একদিন আমার ভাইও ওর সাথে একটি গান রেডিওতে গিয়ে আসি। এরপর হতে দীর্ঘ দীর্ঘে আমার স্বামীর বার দিন কমে। আমি এতো ভালো গান জানি বুঝে তিনি অশোক হয়ে যান। কিন্তু আমি যে উচ্চশিক্ষিতা তা তিনি তখনও জানেন না। আজ্ঞে ইয়া। আপনি এই বিষয় ঠিকই বুঝেছেন। আমি বি-এ পথ পড়লেও আমার স্বামী মাস্ট্রিক পাশ। কিন্তু ঘর-সংসার ওরান্নাবান্নার কাজে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন কোথায়! তবে আমাকে ঠিক পথে চালানোর জন্যে এর প্রয়োজন আছে সত্য। এই নারীকে আমাদের সাবেকী গহনা উপহারের বিষয় এই নারী আমাকে বলে। তার সাথে পরামর্শ করে গোপনে গুলো আমাদের পারিবারিক আলমারীতে রাখা আমরা স্থির করি। আমার অল্পবিসে এই যে, আমার সাথে যে তার আলাপ আছে তা স্বামীকে জানাতে পারি না। এই কুলটা নারীর সাথে ঘরের বৌ এর আলাপ আছে শুনে আমার স্বামী তা বরদাস্ত করতেন না। আজ্ঞে ইয়া। সত্যি। আমার এই স্নেহময়ী দিদি আমাকে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু স্বামীর মত আমি এই উপকারী বান্ধবীকে ঘৃণা করি না। তাকে আমি বাংলার এক শ্রেষ্ঠ নারীরূপে ভক্তি করে থাকি। আজ্ঞে, আমার স্বামীর সংবাদ পত্র পড়া অভ্যাস নেই। কিন্তু সংবাদপত্র পড়া আমার বৈশিষ্ট্য বর্ধ। তাই এই নিদারুণ নারীহত্যার সংবাদটি আমি মাগজে পড়েছি। এর জন্য দুই রাত্রি আমি কেঁদে বিছানা ভাসিয়েছি। ইষ্ঠাং তার মৃত্যু না হলে এই গহনা এতোদিনে আমরা নিশ্চয়ই ফেরত পেতুম। এই গহনাগুলো না পেলে আমার স্বামী ও দাদাশুভ্রের বিবাদ কোনও দিন মিটেবে না। কিন্তু গুলো কিরে পাওয়া মাত্র এই বিবাদ ক্ষিপণের মধ্যে মিটে যাবে। ওর সাথে আমাদের পূর্ব পুরুষদের আশীর্বাদ মিশানো আছে। উচ্চশিক্ষা পাওয়া সত্ত্বেও এই সংস্কার আমারও মনে বদ্ধমূল। আপন সংস্কার কিরে পাওয়ার পর আমার স্বামীরও মনে এজন্তে এতটুকু শান্তি নই। আমার ভয়, এতে তিনি আত্মহত্যা না করে বসেন। এখন আপনারা—”

এই ভক্তমহিলা উচ্চশিক্ষিতা হলেও তিনি একজন ভারতীয় নারী। মূলতঃ তিনি তাঁদের পারিবারিক সংস্কার আঁকড়ে ধরে থাকার পক্ষপাতী। এই কারণে যেকোনও বিশ্বাসী পরিবারের মধ্যে তিনি সগৌরবে আমার মাথা নত হয়ে আসে। তাঁর এই দীর্ঘ বিবৃতিটি করার পর তাঁকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। এই সুশিক্ষিত ভক্ত-মহিলা তার বখাষ উত্তরও দিয়েছেন। আমাদের এই প্রশ্নোত্তরগুলি নিয়ে উদ্ধৃত

করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—আপনি শুনেছেন যে আপনার দাদাশুভ্র মল্লিকবাবু প্রৌঢ় বয়সে জনৈকা বালিকাকে বিবাহ করেছেন। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে কৌতূহল হয়। আপনারা কি তাঁর ঐ বালিকা বধূটিকে অপেনাদের শাবকী বাটিতে স্থান দেবেন?

উঃ—বাংলা দেশে একটি বিখ্যাত সাধকের উক্তি আছে—‘যতপি আমার গুরু ভুঁড়া বাড়ী যায়, তখান ঘানার তিনি প্রাণের গোঁসায়।’ এই দিক হতৌচাচর করলে তাঁর মনোলাচনাতে আমাদের অধিকার নেই। ঠাকুরবাবু তাঁর এই বয়সে সেবা-যত্নের জন্য কাজাল হয়ে উঠেন। তাঁদের মধ্যে কলহ না হওয়া পর্যন্ত আমি ঠেকে সেবা-যত্ন করতাম। এ কথা ঠিক যে এই বয়সে তাঁর যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষা দরকার। ঐ বালিকা তাকে সেবা যত্ন দ্বারা মুগ্ধ না হলে ঐ অঘটন ঘটতো না। ঠাকুরবাবু মোহ দূরঃ করার পর ঐ অধলা বালিকে পরহার করলে আমি অধিক দুঃখিত হবো। প্রয়োজনের আওতায় আমাদের ধনদৌলত আছে। এর এর কিছুটা অর্জন করার গৌরব আমি মৈত্রিক সম্প্রতিভাগী মানুষদের স্থান পরভূক প্রদাচ্ছ মনে করি।

প্রঃ—আজ্ঞে, রোডও অফিসে ঐ মৃত্যু নারীর পারিচাতি এক কর্তা ব্যক্তি আছেন। আপনি প্রাম্পত্তি পোগ্রাম পেয়ে শুধুনে যুতাহাত করতেন। ঐ সম্বন্ধে মৃত্যু দিদির কাছে কোনও কিছু শুনেছিলেন? এটুকু মনে করে এ বিষয়ে আপন জানালে আমাদের উপকার হয়।

উঃ—আজ্ঞে, রোডও অফিসে ঐ কর্মকর্তাটিকে আমি বহুবার দিদির সাথে দেখেছি। তাই ভ্রাতৃলোকে বলে কয়ে আমার মৃত্যু দিদির রোডওর পোগ্রাম আমার পক্ষে যোগাড় করে। এটা না হলে আমার মত কাচা নতুন আর্টিস্ট ওখানে এতো শীঘ্র পাত্তা পাবে কেন? আমি এইটুকু শুধু জানি যে তিনি ঐ দিদির কাছে যথেষ্ট সহ করতেন।

আমার আসল প্রশ্নের আপনি কোনও উত্তর দিলেন না। আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, ঐ ভ্রাতৃলোকের স্বভাব-চরিত্র কিরূপ? আর তাঁর সাথে আপনার ঐ দিদির সম্পর্কটাই কি ছিল? এইটুকু জানতে পারলে এই নারী খুন সম্পর্কিত তদন্তের পথে আমরা অনেকটা দূর এগিয়ে যেতে পারি। আমাদের আশা এই যে সম্বন্ধে আপনি যথেষ্ট আলোকপাত করবেন।

উঃ—ভ্রাতৃলোকের সংসারণ স্বভাব-চরিত্র প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর ও দিদির পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। এতে ঐ ভ্রাতৃলোকেও অগ্রায় হলেও দিদির কোন অগ্রায় নেই। আমি এই উভয় ব্যক্তির এই দুর্বলতাকে ভগবানের নির্দেশ মনে করতাম। এর কারণ দিদির কাছে তার বিগত দিনের জীবনী আমি শুনেছি।

সাক্ষী পরস্পরের মুখে শুনা কাহিনী হতে আমি যা এত দিন অনুমান করেছি,

একণে এই ভদ্রমহিলার মুখে তা সত্যরূপে শুনে পুরোপুরি মেনে নিতে পারলাম। এই বাপারে এই ভদ্রমহিলার একটি বিতায় বিবৃতি আমাকে লিপিবদ্ধ করতে হয়। এই বিবৃতির একটি সংক্ষিপ্তসার নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

“আজ্ঞে! ঐ ভদ্রলোকের সহিত বাল্যকালে মৃত্যু দিদির বিবাহ হয়। কিন্তু জোর করে ছোট মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দেওয়াতে মন বিক্ষুব্ধ হয়। উনি বাসর ঘর হতে উঠে বাইরে ঘাওয়ার অছিলায় উদ্বাণ হয়ে যান। ভদ্রলোক লেখাপড়া বেশি শেখেন নি। কিন্তু এখনও এমন দুটি বিভাগ আছে যেখানে লেখাপড়া না করলেও উন্নতি করা যায়। এই দুইটি বিভাগ হচ্ছে যথাক্রমে পুলিশ ও রেডিও বিভাগ। ভদ্রলোক পালিয়ে দিল্লী চলে গিয়ে রেডিওতে ভর্তি হন। সেখানে তিনি তাঁর মনোমত এক বয়স্ক কন্যাকে বিবাহ করেন। এরপর তাঁর এই বিভাগে শটন: শটন: উন্নতি হতে থাকে। দম্প্রতি কালে দিল্লী হতে এই শহরের ট্রেনে তিনি বদলী হয়েছেন। মেয়েদের চোখে পুরুষ অপেক্ষা বহুগুণে সতর্ক। তাই শেষ পর্যন্ত উনি দিদির চেনেন নি, কিন্তু মৃত দিদি ঠিক প্রথম দিনেই তাঁকে চিনতে পারেন।” এর শেষে বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করে ক্ষণ মনে আমি এই হারানো মানুষ ক’টির জীবন সম্বন্ধে ভাবছিলাম। নতুন ধাঁচের গহনার প্রাচুর্য পুরানো গহনাগুলি গেঁহিয়া পদব্যাচা হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখা গিয়েছে যে, সেই পুরানো গহনা আবার আপন গৌরবে ফিরেছে। এমন কি, তারা ঐ সময় এই নতুনদের অপভ্রান্ত করে তুলেছে। এক সময় দেখা যায় যে, মাতৃষ কমবয়েসী কনেকে পছন্দ না করে বয়স্ক কন্যার পাণিগ্রহণে পক্ষপাতী হয়েছে। আবার কয়েক বছর পরে দেখি যে বয়স্ক নব্বু জন্তু খাবাখুঁজি কবছে। ঐ মৃত্যু নারী ভাগ্যে যে সময় তার বিবাহ হয় তখন যুবকদের বয়স্ক ববুদের কন্যা উপর ঝোঁক পড়ে, কিন্তু আজ তাঁর এই পূর্ব মত হয়তো পরিণতি হয়েছে। তার এই দ্বিতীয়া জীবিত হতে নিশ্চয়ই তিনি এখন শান্তি পান না। তা তিনি পেলে এমনভাবে বারমুখো হতেন না।

এই সকল সাক্ষী-সাক্ষিণীর বিবৃতির মূল্য এই মানলাতে বেশি নয়। কাল থেকে আমাদের পুরানো চোর ও পেশাদারী থুনেদের শিছনে ধাওয়া করতে হবে। তাই এনিকের আলতু-কালতু কাজ আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। আমরা আর এখানে কালক্ষেপ না করে রেডিও অফিসের দিকে বড়না হয়ে গেলাম। রেডিও অফিসে এসে ঐ কর্মকর্তাটিকে খুঁজে বার করি। আমরা তাঁর নিরালা ঘরে বসে তাঁর একটি বিবৃতি গ্রহণ করি। এই বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

“সত্যি! আমার ছ’ছবার বিবাহ হয়েছে। কিন্তু এ বিষয় আপনারা জানেন কি করে? প্রথম বিবাহের বিষয় আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা মনে পড়ে। আমার প্রথমা জীবী এখন কোথায় তা জানি না। তাঁর সাথে বিবাহ হলেও কুশণ্ডিকা হয় নি। আজ্ঞে।

আমার পারিবারিক সম্পর্ক এখন মর্যাদাসিক কিন্তু এত পড়ে আপনি জানেন কি করে। এক বয়স্ক শিক্ষয়িত্রীকে আমি বিবাহ করেছি। ছোট কন্যাকে বউ করে নিজেদের ভাবধারা দিয়ে নিজেদের মত করে মানুষ করে নেওয়া যায়। কিন্তু এই সকল বয়স্ক কন্যারা বাইরের কোনো মানুষের মন নিজস্ব চিত্ত প্রস্তুতি সমেত পথের ঘরে ঢুকে সেখানেকার শাস্তি নষ্ট করে। এই ভুল শুধাবার কোনও উপায় নেই! সত্য! একটা গহনা কদিন আগে পার্শ্বের মাগে পড়েছে। ওর ভিতর এইরকম লেখা ছিল—‘এটা আশাবাদের দল তৈরির মা আমাকে দেন’ কিন্তু উহাতে প্রেরকের কোনও নাম-ঠিকানা নেই। এটা উপলক্ষ্য করে আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে আজও কলহ হয়েছে। আজ্ঞে! ডাক আশ্চর্য বিষয় আপনি অবতারণা করলেন আপনারা পুলিশ হলেও দৈবজ্ঞ হন কি করে? এই লক্ষপ্রতিষ্ঠ লক্ষ্যভ্রষ্টা মহিলার উপর আমার দুর্বলতা ছিল। কিন্তু এত দুর্বলতা কেন আপনি সংগ্রহ করলেন তা জানি। তার সংবনশীল হাসির প্রতিটি কণিকা যেন ফুট হয়ে কণে পড়ে। আমার মনে হতো সেই বৃষ্টি কতোঘূর্ণের আমরা আপনার লোক। এই কল্পনায় সে রেডিও আকর্ষণে আনেন নি। এটা একটা শামাঙ্ক ঘটনা হলেও এক্ষেত্রে আমার মন বাবে বাবে উতলায়। আমার মনে হয় তার কান্ড শব্দ অস্বাভাবিক হলো। তবে এই মহিলার সাথে আমার যা কিছু সম্পর্ক তা মানসিক। এই কঠিন চরিত্র নারীর সাথে আমার লৈনিক সম্পর্ক ঘটে নি। আমার রেডিও-জাবনের অভিজ্ঞতা হতে বলতে পারি যে, এত কোন কিছু ঘটা বা না ঘটা নারীদের উপর একান্তরূপে নির্ভর করে। কিন্তু আমার বলতে বাধা নেই যে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সে এতটুকুও দায়ী ছিল না।”

রেডিও-অফিসের এই কর্মকর্তার বিব্রতটি লিপিবদ্ধ করার পর তাকে তার সংসার সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে। তিনি এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। তার সাথে কথাবার্তা করে আমি বুঝে যে তাঁর জাপানে একই সাথে দুটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমি অবাক হয়ে ভাবি যে এই দুইটি দুর্ঘটনা তার মত একজন সংলোককেও এক সাথে সইতে হলে। যানাদের অতঃসম্পর্কও প্রমোত্তরগুলি নিয়ে উদ্ধত করা হলো।

প্রঃ—আপনার বর্তমান পারিবারিক অশান্তির বিষয় শুনে আমরা সত্যিই দুঃখিত। আপনার গৃহের শান্তি এটুট খান্দলে আপনার প্রাতিভার আরও বিকাশ ঘটতো। এখন আপনি আমাকে বলুন যে এই শহরের এক ধনী মল্লিকবাবুর এক কর্মচারী আপনার বাণীতে এতো ব্যতায়িত করেন কেন? আমরা শুনেছি যে মল্লিকবাবু তাঁর এক ভগ্নীকে নামে মাত্র বিবাহ করেছেন। এই ধরনের ব্যক্তদের সাথে আপনার জীবিত বাইরে বেয়োন। তাঁদের সাথে আপনাদের সম্পর্কটা একটু খুলে বললে ভালো হয়।

উঃ—ওহো! এইবার আমি বুঝতে পারছি যে সেই সব বিষয় আপনি আমাদের জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমার বাস্তবী রেডিওর লক্ষ প্রতিষ্ঠ গায়িকা অমুকার নিকট

হতে আপনারা এ সব শুনেছেন। উনি ঐ লোকটি সম্বন্ধে কয়বার মৌখিকভাবে আমাকে সাবধানও করেছিলেন। ঐ লোকটা এমনিই ত বাড়িতে এসে এটা ওটা ফাই-করমাজ খাটে। আমাদের স্বামী জীকে লোকটা খুব ভক্তি করে। আমাদের সাথে ওর কোনও স্বার্থের সম্পর্ক নেই। আজকে আমার জী ওকে নিয়ে সকালে একটু মার্কেটে বোরয়েছেন। কিন্তু এত বেলা পর্যন্ত ওরা ফিরলো না! তাই একটু হুচিস্তায় আছি এই যা—

প্রঃ—আমাদের খবর এই যে, আপনাদের স্বার্থহীন ঐ সেবকটি এই কয়দিনে আপনার সর্বনাশ সাধনের পথে বহু দূর পযন্ত এগিয়েছেন। আপনার সাথে আপনার ঐ বান্ধবীর মেলা-মেশার বিষয় তিনি আপনার জীকে নিয়মিত জানিয়ে থাকেন। এইভাবে আপনার জীবন বিধ্বস্ত মন আপনার প্রতি তিনি ধার-বিষয়ে দিয়েছেন। এখন কথা হচ্ছে এই যে, তাঁরা দুজনে এ বাড়িতে আর নাও ফিরতে পারেন

‘আজ্ঞে! আপনারা ইতিমধ্যে দেখছি আমাদের সম্বন্ধে বহু সংবাদ সংগ্রহ করেছেন।’ ভদ্রলোক অমুক বাবু একটু ঘান হামি হেসে উত্তর দিলেন, ‘কিন্তু আপনার শেষোক্ত আশঙ্কাটি অমূলক। এতো শীঘ্র উনি আমার ঘাড় হতে নশ্চয়ই নামবেন না। তবে আমাদের ঐ বংশব্দ লোকটি গুর বাতন মাত্র। আরও বড় খুঁটিতে গুর ভাগা বাঁধা। গুর যা করবার তা উনি বাড়িতে থেকে করতে চান। অমুকা দেবার নামের সাথে ওর নাম উঠাবেন না। এতে অমুকা দেবীর মর্যাদার হানি হবে। পারে, যে করেই হোক আমাদের ঘরের সকল কথা যখন আপনারা জেনেছেন তখন লজ্জার খাতিরে এই বিষয়ে আপনাদের কাছে কোনও কিছু আর গোপন করলাম না। তবে আপনার ঐ বান্ধবীর সঙ্গে এত সব যা কিছু তার দোষ তা সামান্যক। একটু সাবধানে এই সব সামান্য দোষ তার সেবে যাবে। আমার ঐ বান্ধবী কিন্তু সত্য সত্যই আমার এক শুভাকাজিনী বান্ধবী।’

‘জম! আপনি বুঝতে পারি যে আপনি অচরের সাথে ঐ মহিলাকে ভালবেসে-ছিলেন, আমি একটু ভেবে ভদ্রলোককে বললাম, ‘তাহলে একটা দারুণ দুঃসংবাদ আপনাকে নিতে হয়। আপনার বান্ধবী ঐ ভদ্রমহিলা আর এ রূপতে বেঁচে নেই। তিনি কোনও এক শত্রু কর্তৃক নিহত হয়েছেন।’ এতদ্বারিতক্রে আরও একটি তদন্ত-লব্ধ সত্য সমাচার আপনাকে জানান দিই। ঐ মৃত ভদ্রমহিলাই একদিন আপনার প্রথম স্ত্রী ছিলেন। এটুকু আপনি না জানলেও আপনার বান্ধবীমত্নাঃ প্রথমা স্বার তা জানা ছিল।’

আমার মুখ হতে এত দুঃসংবাদটি নির্গত হওয়া মাত্র—‘এঁা!’ এই বলে তিনি একবার মাত্র ঠেঁচিয়ে উঠেছিলেন। এরপর হঠাৎ একটা খট খট ধড়াম আওয়াজ শুনে আমরা চমকে উঠলাম। সম্মুখের চেয়ারে এই ভদ্রলোককে আর দেখা যায় না। ঐ চেয়ার সমেত ভদ্রলোক এই খাস কামরার ঢুকে পড়ে। কিন্তু পরক্ষণেই ভদ্রলোক উঠে

পড়ে ইশারায় সকলকে সরে যেতে বলেন। হঠাৎ মাথা ঘুরে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন, এখন তাঁর প্রেসার ভালো আছে—এই কথা কটি তাঁর মুখে শুনে জনতা শান্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করে। আমি শুকনো হয়ে ভাবি, এই ভদ্রলোককে এবার আমি কী বলবো। কিন্তু আমাকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে ঐ ভদ্রলোকই আবার সাথে প্রথমে কথা কইলেন।

‘মহার! আশা করি তার মৃতদেহ আমাদের পুলিশ-মর্গে এখনও রক্ষিত আছে’, ভদ্রলোক এবার একটু শান্ত হয়ে আমাদের বললেন, ‘আমার এই ধারণা সত্য হলে ঐ মৃতদেহ সংকারের ভার যেন আমাকে দেওয়া যায়। আমার এই প্রথম জীবন সংকার ও আত্মের আমিই বোধহয় একমাত্র স্বীকারী। তার এই শেষ কার্য সনাদ করা আমার একটি পবিত্র কর্ম। ভদ্রলোককে এই আকিঞ্চন মৃত্যু নারী জেনে যেতে পারিনি। সে বেঁচে থাকলে এই ইচ্ছা এর থাকতো কিনা বলা শক্ত। ভদ্রমহিলা বেঁচে থেকে যা পান নি, মরে তা তিনি পেয়ে গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে মৃতদেহ তখনও মর্গের বরফ-ঘরে রক্ষিত আছে।

*

*

*

ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল। অপরাধ বিজ্ঞান গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের নিকট এত অতি পরিচিত নাম। অপরাধ ও অপরাধীর গতি প্রকৃতি, কার্যকারণ বিশ্লেষণ ও অন্বেষণে লেখকের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা আমাদের চমৎকৃত করে। ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল জীবনের অধিকাংশ সময় পুলিশ বিভাগের নানা দায়িত্বে রত থেকে এ সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার ফলশ্রুতি তাঁর বহু গণপ্রকাশিত ‘অপরাধ বিজ্ঞান’ গ্রন্থমালা। উল্লিখিত “একটি নারী হত্যাকাণ্ডের কিনারা” কাহিনীটি পুলিশের ডাইরি লেখার টেকনিকে লেখা। তাই এক অভিনব ডাইরি সাহিত্যের প্রবর্তনা ঘটে লেখকের অনবদ্য লেখনীতে। লেখকের অধিকাংশ লেখাই সত্য ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাবে সুবাসিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মৌলিক গবেষণার জন্য “ডক্টরেট” উপাধিতে ভূষিত করেছে।

*

*

*



খুন---চুঁচু

স্বপ্নাংকুর জমার গুপ্ত

..... 'ওরা খুন শ্রবণে ক্ষিত্ব
খুনের মধ্যে সন্ততা নেই'

সেদিন শহরে হবতাল। উপলক্ষটা নেনে নেই। নবাচনের শরিং ঘোষণার দাবি বা ওইরকম একটা কিছু। সারা দুপুরটা তাস খেলে কাটিয়ে বিকেলের দিক। আমরা ক'জন বন্ধু পাড়ির হুলায় চতুর্থাংশ পর্যায় বৈঠক লাগায়। কুটির দিগে ওখানেই আড্ডা বসে আমাদের। দিবা-নিজা সেবে চতুর্থাংশ পর্যায়রাত তক্তাপোষে ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছেন। হাতে গড়গড়ার নল, আগুনটা তখনও ভাল করে ধরেনি বলে হয়তো টানতে শুরু করেননি। আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখে স্মিতহাস্তে অভ্যর্থনা জানানলেন তিনি। তক্তাপোষের ওপর পাতা ফরাসের ওপর আমরা বসে

পড়লাম চতুর্মুখাবু ক'দরে। পকেট থেকে নসিাব ডিবেটা বের করে বসে এক টিপ নসিা নাকের ভেতরে গুঁজে দিয়ে বিবিসিফি বললে, 'আজকের কাগজে তালতলার খুনের খবরটা পড়েছে, 'চতুর্মুখাবু? কাগজের বাপার বলুন তো! লোকটা খুন হল রাস্তার পথের পাড়ার লোক অনেক পল, পুলিশের লোকের সঙ্গে গেল সঙ্গে সঙ্গে, জাঁপে গেল লাশটাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে, আর ওখানকার খানার 'দারোগা' বলে কিনা, ওই দোরের পথের বাপা গায়নি মোটেই। শহরের ছোট বড় সব হাসপাতালেই খোঁজ করা হয়েছে, লাশের পানা নেই।' গভগভার নোংরা লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চতুর্মুখাবু বললেন, 'এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ ধরনের ঘটনা হৈ যে প্রথম ঘটনা নয়। আগেও ঘটেছে কখনো এত জায়গায়, তবে তা নিয়ে কেবল মাথ সামায় নি। আগার স্বচক্ষে দেখা একটা ঘটনার কথা মনে পড়েছে এই প্রসঙ্গে।' তোমরা যদি শুতে চাও তো বলি।'

'বলুন' সাংসার বললান আমরা সবাই।

'সাবা হয়ে বসে চতুর্মুখাবু বলতে শুরু করলেন।

যে কালো রাস্তা জাফর থেকে প্রায় পনের বছর আগেকার তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চালায়, পুণ্ডরিক যুদ্ধের ফলাফল অনেক চতুর্ভাষা কারাবের বদল। গেলো যুদ্ধে। দেশে পড়ুকাল নিক্কী হয়ে বসে থাকার পর আমিও হঠাৎ চাকরি পেয়ে গেলাম বোম্বাই শহরে এক বিদেশী সঙ্গীতগিরি প্রতিষ্ঠান। শহরের যে পাড়ায় বাসা নিলাম সেখানে লোকের বসতি ছিল অপেক্ষাকৃত কম। পাড়াটা ছিল বেশ শান্ত ও নিকম্প্রাণ। রাত দশটার সময় দবাচ ভায়ে পড়ত খাওয়া-দাওয়া করে। শুধু দু-চারটে বন দেয়াড়া চাকরা সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরত রাত দশটার পরে। পাড়ার বেশির ভাগ বাসিন্দা ছিল মধ্যবিত্ত চাকুরে। দবাচি ভদ্র সম্প্রদায় কোনকম আমেলা সৃষ্টি হয় এমন কিছু পক্ষ দিতে না। কেউ যে খার মিজের কাজ নিয়েই বাস্তু, অন্তের বাপাশারে নাক গলাবার সময় ছিল না কারো। প্রতিবেশীদের মধ্যে একজন ছিল পাটাল বাজায়। শহরে একটা নামডাক তার ছিল হয়েছে, কাপাও কোন কামরে ডাক পড়লে বাড়ি ফিরত একটু রাত করে। ছুজন ছিল সুপারমার্কার, টিউশনি দেবে বাড়ি ফিরে রাত শটো নাগাদ। তবে মাঝে মাঝে দেবদাম, রাস্তার ধারে ল্যাম্প-পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে ওরা ছুজন 'বিশ্বসংসারে যাবতীয় সমস্যা নিয়ে আনোচনা' করছে অনেক রাত পর্যন্ত। একজন ছিল শেয়ার মার্কেটের দালাল। প্রতি শনিবার পাদারে সে এক বন্ধুর বাড়ি যেত সিয়ান্স করতে। শেয়ার মার্কেটের হালচাল সম্পর্কে প্রেতাঙ্গানের কাছ থেকে নির্দেশ নেওয়া হয়তো বাতিল ছিল তার সিয়ান্স করে সে বাড়ি ফিরত রাত বারোটার পর। পাড়ায় কোন অশান্তি ছিল না। বছর দুই আগে অবশ্য একদিন রাতে এক মাতাল হল্লা করছিল পাড়ার মধ্যে। কিন্তু পরে প্রকাশ পায়, নন অন্তের পাড়ার লোক, নেশার ঘোরে তুল করে আমাদের পাড়ায় ঢুকে

পড়েছিল।

পরস্পরকে আমরা জানতাম ভাল করেই। শুধু একজনের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানত না কেউই। এ লোকটি আমাদের পাড়ায় এসে বাস করতে শুরু করে মাস পাঁচ-ছয় আগে। নামটা সঠিক কেউ জানত না আবদুল গালিব কি আবদুল তালিব হবে। চেহারা আর পোশাক দেখে আমরা ধরে নিয়েছিলাম ও ইরানী। প্রতিদিন রাত্রে বাড়ি ফিরত সওয়া এগারটায়। পাঁচ নম্বর বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটে ও একা থাকত। ওর স্ত্রী-বকা কাঁ ছিল কেউই জানত না। সারাদিন ও থাকত বাড়ির মধ্যে, বিকেল পাঁচটার সময় ও বেরুত হাতে চামড়ার একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে। রাস্তার মোড় পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে বাসে চেপে যেত পারাবেলের দিকে। আবার ঠিক রাত সওয়া এগারোটায় বাস থেকে রাস্তার মোড়ে নেমে ঢুকত আমাদের পাড়ায়। পরে প্রকাশ পায়, পারাবেল একটা কাফেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও নাকি মিলিত হত জনকয়েক ইরানীর সঙ্গে এবং তাদের সঙ্গে কি সব আলোচনা করত অনেক রাত পর্যন্ত। তবে পাড়ার একজন প্রবীণ লোক বললেন, ও কখনোই ইরানী নয়, কারণ ইরানীরা নাকি রাতে অত সকাল সকাল বাড়ি ফেরে না।

তখন শীতের মাঝামাঝি রাত সওয়া এগারোটা হবে, খাওয়া-দাওয়ার পর আমি একটু বিমোচ্ছ, এমন সময় পরপর পাঁচটা গুলির আওয়াজ কানে এল। তোমরা হয়তো শুনে হাসবে, প্রথমটা আমার মনে হ'ল যেন আবার আমি বালা বয়সে ফিরে গিয়েছি। আবার যেন সেই ছোট্ট ছেলেটি হয়েছি আর আমার সমবয়সীদের সঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়ির উঠানে মহোল্লাসে ফটকা ফটাচ্ছি। সত্যি বলতে কি, আওয়াজটা বেশ মিষ্টি লাগল কানে। পরমুহুর্তেই আমার তজ্জা হঠাৎ ছুট গেল— বুঝতে পারলাম, সামনের রাস্তায় পিস্তল ছুঁড়ছে কেউ। তাড়াতাড়ি জানলার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, পাঁচ নম্বর বাড়ির সামনে রাস্তার ওপর কে একজন মুখ খুঁড়ে পড়ে আছে, ডানহাতে চামড়ার একটা ব্যাগ। কিন্তু ঠিক সেই মুহুর্তে রাস্তায় পায়ের আওয়াজ শুনেতে এলাম এবং একজন কনস্টেবলকে দেখা গেল রাস্তার বাঁকে। পাঁচ নম্বর বাড়ির সামনে সে ছুটে এল বাস্তবাবে, দুহাতে আহত লোকটিকে তুলে ধরবার চেষ্টা করল একবার, কিন্তু পর মুহুর্তেই তাকে আবার মাটিতে নামিয়ে রেখে অক্ষুটস্থরে কি যেন বলে ছইশিল বাজাল! চোখের পলকে আরেকজন কনস্টেবল ছুটে এল রাস্তার অপর দিক থেকে।

তাড়াতাড়ি চটিজোড়া পায়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। পাঁচ নম্বর বাড়ির সামনে গিয়ে দেখি, ওখানে ইতিমধ্যেই পাড়ার কয়েকজন এসে হাজির হয়েছে—গাটার বাজয়ে, স্থলমাতারদের একজন, শেয়ার মার্কেটের দালাল আর আশপাশের বাড়ির দুজন দারওয়ান। ওরা সম্ভবত একটু রাত করে শুতে যায়, তাই গুলির আওয়াজ শুনেই ছুটে এসেছে। যারা শুয়ে পড়েছিল তারাও কেউ কেউ উঠে পড়েছে। বারান্দায়

দাড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে বাস্তার দিকে। ওরা হয়তো নেমে আসতে ভয় পাইছিল না। খুনের ব্যাপারে কে কখন অহেতুক জড়িয়ে পড়ে বলা যায় না।

ইতিমধ্যে কনস্টেবল ছুজন আহত লোকটিকে চিত করে দিয়েছে। লোকটির মুখের দিকে নজর পড়তেই আমি মডয়ে চোঁচয়ে উঠলাম, ‘জ্যা! এ যে দেখছি আমাদের সেই ইরানী ভদ্রলোকটি! ভদ্রলোক কি মৃত?’

‘হাম নেহি জানতে, ডাক্তার বোলনে সাকেগা।’ জবাব দিলে একজন কনস্টেবল, মনে হল যেন সে খুব ঘাবড়ে গেছে।

সীতারবাদক এগিয়ে এসে কাঁপা গলায় বললে, ‘তোমরা এখানে ঠেকে ফেলে রেখেছ কেন? তোমাদের কি কাণ্ডজ্ঞান নেই?’ তার গলার আওয়াজে রাগের চেয়ে ভয়টাই জুটে উঠল বেশি।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন এসে জড় হয়েছে ওখানে। শীতে আর ভয়ে আমাদের শরীরে বাঁতিমত কাঁপুনি ধরে গেছে, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে ভীষণ ভাবে। কনস্টেবল ছুজন আহত ব্যক্তির শাশে হাঁটু গেড়ে বসে ঝুঁকে পড়ল তার মুখের ওপর এবং ঐক জান কেন, তার কোটের বোতাম ক’টা খুলে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে বাস্তার বাকি একটা ট্যাক্সি এসে থামল এবং ট্যাক্সিচালক গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল বাস্তার কাঁ দেখবার জন্তে। সম্ভবত সে ভেবেছিল মদ খেয়ে কেউ বেশামার হয়ে পড়েছে এবং ওকে গাড়িতে তুলে বাড়ি পৌছিয়ে দিলে বেশ কিছু টাকা ওর কাছ থেকে আদায় হতে পারে।

‘এখানে কী হয়েছে মশাই?’ ট্যাক্সিচালক জিজ্ঞেস করল বিনয়ের সঙ্গে।

‘একজন লোক গু-গু-গুলিতে আহত।’ স্কুলমাষ্টার বললে ভীত সন্ত্রস্তভাবে, ‘ওকে তোমার গাড়িতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে যাও। এখনও হয়তো লোকটিকে বাঁচানো যেতে পারে।’

‘জানেন তো এসব ব্যাপারে ভাড়া খাটতে যাওয়ার কামেলা অনেক।’ ট্যাক্সিচালক বললে ইতস্তত করে, ‘তবে আপনারা যখন বলছেন, আপনাদের অহুরোধ ঠেলতে চাই না আমি। একটু অপেক্ষা করুন, গাড়ি নিয়ে আসছি।’ তারপর সে মন্থরপদে গাড়ির কাছে গেল এবং গাড়িটা নিয়ে এল আহত লোকটির নিকটে।

‘ওকে এবার তুলে দাও গাড়িতে।’ ট্যাক্সিচালক বললে কনস্টেবল ছুজনকে লক্ষ্য করে।

কনস্টেবল ছুজন ইরানী ভদ্রলোককে তুলে ধরল এবং কোনরকমে ওইয়ে দিল ভেতরের সিটে। লোকটি তেমন হুটপুট নয়, তবে কিনা মরা মানুষকে নাড়াচাড়া করা বেশ শক্ত কাজ।

‘দোস্ত, তুমি চলা যাও উনকা সাথ। হম গবাহৌ (সাক্ষীদের) নাম আউর পাভা গোয়েন্দা (প্রথম)—২১

লিখ লেখে।' প্রথম কনস্টেবল বললে দ্বিতীয়কে উদ্দেশ্য করে। তারপর ডাইভারের দিকে ফিরে বলেন, 'তুমি জলদি চলা যাও হাসপাতাল মে, দেব মাং করনা।'

'জলদি!' মুখাবকৃত করে বললে ডাইভার, 'জাম তো বলেই খালাস। আমার গাড়ির ব্রেক গেছে বিগড়ে, জলদি যেতে গিয়ে বিশদে পড়ব না.ক?'

কনস্টেবল কোন মন্তব্য করল না। গাড়ি চলতে শুরু করল।

বুঝশকট থেকে একটা নোট বই বার করে প্রথম কনস্টেবলটি হিম্মিতে বললে, 'আপনাদের নাম আর ঠিকানা বলুন। সাক্ষী হিসেবে আপনাদের তলব করা হতে পারে।'

তারপর সে আমাদের নাম-ঠিকানা টুকে নিল নোট বইতে এক এক করে। নাম-ঠিকানা লিখতে বেশ কিছু সময় নিল সে। বাইরে জোর হাওয়া বইছিল, কনস্টেবল চলে যেতেই বাড়ি ফিরলাম। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, এগারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট। মাত্র দশ মিনিট লেগেছে ব্যাপারটা চুকে যেতে।

তোমরা হয়তো ভাববে, ব্যাপারটা নিতান্ত সাধারণ, কিন্তু আমাদের মত এ ভ্রম পল্লীতে এ ধরনের ঘটনা স্বাভাবিক চাঞ্চল্যকর। পাশের পল্লীর লোকেরা বেশ একটু গোঁববোধ করছিল এর জন্য। সকলকে তারা সর্ববে বলছিল, ওই ভয়াবহ ঘটনাটা ঘটেছে তাদের পাড়ার কাছেই ওখান থেকে আর একটু দূরে যারা থাকত তারাও এই গৌরবের ভাগ নিতে ছাড়ল না। তারা বললে, ঘটনাটা অবশ্য ঘটেছে ওপাশের এক রাস্তায়, তবে গুলির আওয়াজটা তারা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল। আমি তোমাদের হলক করে বলতে পারি, মনে মনে ওরা সবাই স্ক্রু ও বিরস হয়েছিল ঘটনাটা তাদের এলাকায় ঘটেনি বলে। অবশ্য দু'চারটে রাস্তার ওধারে তাদের আস্থানা, তারা ব্যাপারটাকে আমল দিল না মোটেই, তারা বললে, কে একজন ওখানে খুন হয়েছে বটে, কিন্তু ওই ব্যাপারে এমন কিছু নেই যা নিয়ে মাথা ঘামানো যেতে পারে। এটা যে নিছক ঈর্ষা ছাড়া কিছু নয়, তা না বললেও চলে।

বুঝতেই পারছ, পরের দিন সকালে খবরের কাগজে দেখবার জন্য আমরা সবাই ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। পাড়ার ওই খুন সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য জানার আগ্রহ তো ছিলই, তাছাড়া আমরা উল্লাসিত হয়েছিলাম এই কথা ভেবে, যে খবরের কাগজে আমাদের পাড়ার উল্লেখ থাকবে নিশ্চয় এবং ওই প্রসঙ্গে পাড়ার লোকেরা মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথাও বাদ পড়বে না। এটা সর্বজনবিদিত সত্য যে খবরের কাগজে আমরা নেই ব্যাপারটাই সবচেয়ে পড়তে ভালবাসি যা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। খবর, রাস্তায় একটা বঁড় লরিতে চাপা পড়েছে আর সেই কারণে যানবাহন বাহত হয়েছে পনের মিনিট। খবরের কাগজে এ ঘটনার খবর উল্লেখ না থাকে, তা হলে যারা ওই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে, মনে মনে তারা কষ্ট হবে এবং কাগজটা তাজিলাভের ঠেলে রেখে দেবে টেবিলের একপাশে। তাদের অভিযোগ, খবরের কাগজ বিশ্বাসঘাত-

কতা করেছে তাদের সঙ্গে। তারা কতকটা অপমানিত বোধ করে এই ভেবে যে, দুর্ঘটনার তারা প্রত্যক্ষদর্শী, যা তারা নিজস্ব সম্পদ বলে দাবি করতে পারে, খবরের কাগজ সেটার উল্লেখ করার প্রয়োজনই বোধ করে নি। তোমরা যদি জিজ্ঞেস করো, খবরের কাগজ কেন স্থানীয় সংবাদ ছাপে, তাহলে আমি বলব, স্থানীয় সংবাদ ছাপা না হলে ওই সব প্রত্যক্ষদর্শী খবরের কাগজ বয়কট করতে নিশ্চয়ই।

বিশ্বাস করো, একখানা খবরের কাগজও আমাদের পাড়ার ওই হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ পথত করে নি। রীতিমত ভডকে গেলাম আমরা। খবরের কাগজের পাতাগুলো যতসব সামাজিক দুর্নীতি আর রাজনৈতিক দলাদলির খবরে ভর্তি। মনে মনে ভাবি চটে গেলাম খবরের কাগজের ওপর! এমন কি, একখানা ট্রামগাড়ির সঙ্গে ট্রামগাড়ির সংঘর্ষ ঘটেছে, সে খবরও ছাপা হয়েছে বড় বড় হরফে শিরোনাম দিয়ে। খবরের কাগজ যে নিতান্ত বাজে, এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না।

ক্ষোভ ও বিরক্তি যখন সোচ্চার হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় বিদ্রোহ-চমকের মত গাটারবাদকের মনে হঠাৎ নতুন একটা চিন্তার উদয় হল। সে বললে, পুলিশ কর্তৃপক্ষ হয়তো ওই খুনের বাপাতিটা আশাতত চেপে রাখবার জন্তু খবরের কাগজওয়ালাদের অসুবিধা করে থাকবে, যাতে তাদের তনুতে কোন বকম বিষ নেই। ঘটে এবং তার ওই কথায় আমাদের ক্ষুব্ধ মন স্বাভাবিক হ'ল অনেকটা। খুনের বাপারে আমাদের অন্তর্মুগ্ধতা গেল বেড়ে এবং এই জটিল রহস্যের সমাধানে আমাদের সাক্ষী হিসেবে তলব করা হতে পারে এই কথা ভেবে গর্ব অনুভব করলাম আমরা।

কিন্তু পরের দিনও খবরের কাগজে ওই খুনের কোন উল্লেখ দেখতে পেলাম না এক পুলিশের তরফ থেকে কেউ এল না আমাদের জিজ্ঞাসাগার করবার জন্তু। তবে সবচেয়ে অসুখ মনে হ'ল যেটা, সে। হচ্ছে এই যে, একটা দিন কেটে যাবার পরও পুলিশ এসে পাঁচ নম্বর বাড়ীতে ইরানী ভদ্রলোকের ফ্ল্যাট সার্চ করা না বা সৌল করে দিয়ে গেল না। বাপাতিটা প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিল আমাদের মনে। গাটার বাদক বললে, 'পুলিশ হয়তো ওই খুনের বাপাতিটা চাপা দিতে চায়। এর পেছনে কি রহস্য রয়েছে ভগবানেই জানেন।'

তৃতীয় দিনেও যখন খুনের বাপাতিটা খবরের কাগজে বেরল না, তখন আমাদের পাড়ায় রীতিমত ক্ষোভের সঞ্চার হল। সবাই বদ্বপরিকর হ'ল, এ সম্পর্কে একটা কিছু করবার জন্তু। সকলেই একবাক্যে বললে, "ইরানী ভদ্রলোক ছিল আমাদেরই একজন, তার এ শোচনীয় মৃত্যুর প্রতি পুলিশের উপেক্ষা অসহনীয়। এ ব্যাপারের একটা হেস্তুনেস্ত করতেই হবে। আমাদের পাড়ায় যদি কোন এন.পি. বা খবরের কাগজের লোক থাকত, তাহলে পুলিশ নিশ্চয়ই নৈষ্ক্রিয় থাকতে পারতো না।"

পাড়ার বৈঠকে ঠিক হ'ল, থানায় গিয়ে আমাদের প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং দাবীপত্রকে জিজ্ঞেস করতে হবে, কেন এমন গাফিলতি করা হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশীর

খুনের ব্যাপারে। আর এই কাজের ভার পড়ল আমার ওপর। আমাকে ওরা মনোনীত করল কেন, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। হয়তো আমার এই জাঁদবেল চেহারাখানাকে দেখে ওদের ধারণা হয়েছিল আমি ছাড়া আর কেউ ঘায়েল করতে পারবে না দারোগাকে।

পরের দিনই সকালবেলা থানায় গিয়ে দেখা করলাম দারোগা জব্বার সিং-এর সঙ্গে। দারোগাকে আমি জানতাম অল্পখল। লোকটা বেজায় গম্ভীর ও তিরিক্কে। লোকে বলত, ও নাকি প্রেমের ব্যাপারে হতাশ হয়েছিল যৌবনে এবং সেই কারণেই চাকরি নেয় পুলিশে। দারোগাকে বললাম, ‘দেখুন স্তার, লালবাগে যে খুনটা হ’ল, সেটার সম্পর্কে আপনারা কী করছেন জানতে এমেলি আমি পাড়ার লোকেরা বুঝতে পারছে না, এ ব্যাপারটা গোপন করা হচ্ছে কেন?’

দারোগা যেন আকাশ থেকে পড়ল!

‘খুন? কই, আমাদের কাছে কোন খবর আসেনি তো।’

‘বা! মাত্র তিনদিন আগে রাস্তায় খুন হ’ল আমাদের পাড়ার এক ইরানী ভ্রলোক। নামটা কি যেন আবজুল আলিব না আবজুল তালিব। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল দু’জন কনস্টেবল, একজন আমাদের নাম আর ঠিকানা নিয়ে নিল, সাক্ষী হিসেবে দরকার বলে, অপরজন আহত ভ্রলোককে নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে গেল হাসপাতালে।’

‘কী সব বলছেন, আপনি?’ দারোগা বললে একটু ঝাঁজের সঙ্গে, ও সম্বন্ধে আমাদের কাছে কোন রিপোর্ট আসেনি এ পর্যন্ত। আপনাদের ভুল হয়েছে।’

‘ভুল? অন্তত বিশ-পঁচিশজন ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেছে—আমরা সবাই এ সম্বন্ধে এজাহার দিতে পারি।’ মনে মনে রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

‘দেখুন স্তার, আমরা সবাই রেসপেক্টেবল সিটিজেন্ এই খুনের ব্যাপারে আপনি যদি আমাদের মুখ বুজে থাকতে বলেন, আমরা তা পারব না। বিনা প্ররোচনায় একজন নিরীহ মানুষকে গুলি করে মারা—এটা কোন ভ্রলোকই বরদাস্ত করতে পারে না। খবরের কাগজে আমরা লিখব এ নিয়ে।’

‘তুহুন।’ ধমক দিয়ে বললে দারোগা। চোখালটা শক্ত হয়ে উঠল তার। রীতিমত ভড়কে গেলাম আমি। ‘যা ঘটেছে ঠিক ঠিক বলুন।’

আমি তখন আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনাটা যথাযথ বর্ণনা করতে লাগলাম। শুনতে শুনতে রাগে দারোগার মুখখানা লাল হয়ে উঠল। ঘটনার বর্ণনা শ্রম্ভে যখন বলতে শুরু করেছি, ট্যাক্সিতে যুত ব্যক্তিকে তুলে দিয়ে প্রথম কনস্টেবল তার সঙ্গাকে বললে, ‘দোস্ত, তুমি চলা যাও উনকো সাথ।’

‘হুম……’

কথাটা আমাকে শেষ করতে না দিয়েই অমনি দারোগা নাকটা ফুলিয়ে গর্জন করে

উঠল, “যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। ওরা আমাদের লোক কিছুতেই নয়। আপনারা তখন পুলিশ ডেকে ওই লোকগুলোকে ধরিয়ে দিলেন না কেন? সাধারণ জ্ঞান যাদের আছে, তারা সবাই জানে ইউনিফর্ম পরা পুলিশের লোক ‘দোস্ত’ বলে সম্ভাষণ করে না পরস্পরকে। সাদা পোশাকে যেসব পুলিশ ঘোরাফেরা করে তারা গুটা করতে পারে, তবে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ করবে না কোনদিন। আপনার মত বুদ্ধু আমি দেখিনি আজ পর্যন্ত। ওই লোকগুলোকে পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত ছিল আপনার।”

টোক গিলে আমতা আমতা করে বললান, ‘কেন বলুন তো?’ ‘ওরাই তো গুলি করেছিল আপনারদের পাড়ার ওই ইরানিকে,’ হুকুর দিয়ে উঠল দারোগা, ‘আর যদি গুলি না-ই করে থাকে, এ বাপারে ওদের হাত ছিল নিশ্চয়ই। কতদিন আপনি ও-পাড়ায় আছেন?’

‘বড় ছুই।’ জবাব দিলাম আমি।

‘তাহলে আপনার জানা উচিত, রাত সওয়া এগারোটায় একজন কনস্টেবল ডিউটিতে থাকে লালবাগের মোড়ে, এরপর খানিকটা তফাতে আরেকজন থাকে খোদাদাদ সার্কেলের কাছাকাছি, আরো কিছুটা এগিয়ে ফের আরেকজন কনস্টেবলকে দেখতে পাবেন কিংস সার্কেলের মোড়ে—যার বীটের নম্বর হল ৩২২। আপনারদের রাস্তার মোড়ে—সেখান থেকে আপনারদের ওই কনস্টেবলকে ছুটে আসতে দেখেছিলেন, সেখানে আমাদের কনস্টেবলকে দেখা যাবে রাত বারোটোর পর, যখন সে ওই পথে কোয়ার্টারে ফেরে ডিউটির শেষে। আশ্চর্য, শহরের প্রত্যেকটা চোর—বদমাসের এ খবরটা জানে; আর আপনারা ওখানে এতকাল রয়েছেন অথচ জানেন না এটা! আমার মনে হয় আপনার ধারণা প্রত্যেক রাস্তার মোড়েই পুলিশ থাকে, তাই না? ওই মুহূর্তে আমাদের কনস্টেবল যদি আপনারদের রাস্তায় এসে হাজির হত, তাহলে মস্ত একটা ফ্যাসাদে পড়ত সে। নিয়ম অনুযায়ী ওই সময়ে তার থাকবার কথা লালবাগের মোড়ে। তাছাড়া ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করেও আমাদের কাছে কোন রিপোর্ট পাঠায় নি সে। বুঝতেই পারছেন, তাহলে বাপারটা দাঁড়াতে অন্তরকম।’

একটু ইতস্তত করে বললাম, ‘তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু বুনের বাপারটা পরিষ্কার হ’ল না তো?’

ততক্ষণে দারোগার মেজাজ অনেকটা নরম হয়ে এসেছিল। সে বললে, ‘গুটা অবশ্য আলাদা বাপার। আমার কি মনে হয় জানেন মিস্টার শর্মা? গুটার মধ্যে একটা ঘৃণা চক্রান্ত রয়েছে—বাইরে থেকে যা বোকবার উপায় নেই। ওরা ওদের মতলব হাঁসিল করবার জন্যে প্রাণ করেছিল নিখুঁতভাবে। প্রথমত: ইরানী বাজে কখন বাড়ি করে, তা ওরা জেনে নিয়েছিল। দ্বিতীয়ত: ও একলে পুলিশের গতিবিধি

সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিল ওরা। তৃতীয়তঃ পুলিশের কাছে খুনের খবর পৌঁছবার আগে পুরো ছটো দিন সময় পেয়ে যায় ওরা। আমার মনে হয়, ওরা সময় থাকতে পালাতে চেয়েছিল অথবা খুনের প্রমাণ নিশ্চিৎ করার মতলব করেছিল। এখন ব্যাপারটা পারকার হয়ে গেছে কি আপনার কাছে?’

‘না, ভালরকম হয় নি?’ মাথা চুলকে বললাম আমি।

টেবিলের ওপর থেকে জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে একটৌক পেয়ে দারোগা আবার বলতে শুরু করল : ‘ওরা নিজেদের দুজন লোককে পুলিশ সাজাল, তারপর সেই দুজন এসে দাঁড়িয়ে রইল আপনাদের রাস্তার একটা কোণে ইরানীকে গুল করার উদ্দেশ্যে। অবশ্য এমনও হতে পারে, ওরা ওখানে অপেক্ষা করতে লাগল ওদের দলেরই আরেকজন এসে ইরানীকে গুল না করা পর্যন্ত। সে যাই হোক, আপনারা খুবই খুঁশ হয়েছিলেন পুলিশকে অত তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে হাজির হতে দেখে! ওরা যেন কল পুলিশ, তা বুঝতে পারেন নি মোটেই!...হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছিলাম, প্রথম কনস্টেবল যখন হুইশল বাজাল, তখন তার আওয়াজটা হয়েছিল কেমন?’

‘আওয়াজটা ছিল একটু ক্ষীণ। তবে আমার মনে হয়েছিল, ও বোধহয় সীতের দরুন একটু কাবু হয়ে পড়েছিল, তাই জোরে হুইশল বাজাতে পারেনি।’

প্রদত্ত হাঙ্গামে দারোগা বললে, ‘ক্ষীণ তো হবেই এক্ষেত্রে জোরে বাজানোর কোন সার্থকতা ছিল না। আপনারা পুলিশকে ব্যাপারটা না জানান—এটাই ছিল ওদের লক্ষ্য। সময় পাওয়া গেলে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া সহজ হবে ওদের পক্ষে। আর আমি বাজি বেধে বলতে পারি ট্যাক্সিচালক ছিল ওদেরই একজন। ট্যাক্সির নম্বরটা আপনার মনে নেই হয়তো?’

‘নম্বরটা লক্ষ্য করি নি আমরা।’ জবাব দিলাম কুণ্ঠিতভাবে।

‘তাতে কিছু এসে যায় না।’ মন্তব্য করল দারোগা : ‘নম্বরটা যে খাঁটি ছিল না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্দেহ। ওই ট্যাক্সির সাহায্যে ওরা ইরানীর মৃতদেহটা গায়েব করে ফেলেছিল। তবে আপনার জেনে রাখা ভাল, ও লোকটি ইরানী নয়, তুর্কী—আর ওর নাম আবদুল গালিব বা আবদুল তালিব নয়, ওর নাম আসলে আবদুল খালিব। আমার কাছে এসেছেন বলে ধন্যবাদ জানাই আপনাকে। তবে এ সম্পর্কে আপনারা যদি একেবারে চূপ করে যান, তাহলে উপকার করবেন। কারণ এ ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করলে আমাদের তদন্তের অস্ত্রবিধা ঘটবে। অত্যা এটা খুব সম্ভব একটা স্বাভাবিক হত্যাকাণ্ড এবং এর পেছনে একজন ভয়ঙ্কর ধড়িওয়াজ লোক রয়েছে নিশ্চয়। রাজনীতি—বুঝেছেন কিনা, অত্যন্ত নোংরা—জঘন্য। ওরা খুন করবে, কিন্তু খুনের মধ্যে সততা নেই।’

এর পরে ওই ব্যাপার নিয়ে নিয়ে তদন্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু খুনের উদ্দেশ্য করা পড়েনি। তবে যারা খুন করেছিল, তাদের নাম জোগাড় করেছিল পুলিশ।

কিন্তু অপরাধীরা তার অনেক আগেই সরে পড়েছিল শহর থেকে কাজেই খুনের ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের পাড়ার হঠাৎ যে মহাদা বৃদ্ধি ঘটেছিল তা যেন উবে গেল কপূরের মত। কেউ যেন পাড়ার ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে নিয়ে গেল নির্ধম হাতে।

*

*

*

সুধাংশুকুমার গুপ্ত। কলকাতায় পাঠ্যাবস্থাকালে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হন। বাংলার অধিকাংশ নামী ও দামী পত্রপত্রিকায় লিখে এসেছেন। রহস্য ও গোয়েন্দা গল্প রচনায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ। অনুবাদেও সক্ষম। তাঁর লেখা অনুবাদ গ্রন্থ ‘বিশ্বসাহিত্যের দেবী মল্ল’ স্বধীমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। শিশুসাহিত্যেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। মৌচাক প্রদত্ত স্তম্ভীচক্র পুরস্কার পান। পেশায় শিক্ষাব্রতী। কলকাতায় মিটি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনার সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যের সাধনা করেছেন। বর্তমানে অবসর ভীবে প্রস্তুত।

*

*

*



কে যেন

তারা প্রণব ব্রহ্মচারী

‘ঘটনাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি।

সব শুনেছিল, সব জানত বলবীর সিং আগে থেকেই। তবু কেন যে কারো কথা মেনে নেয়নি, প্রত্যক্ষদর্শীদের কোন বিবরণ বিশ্বাস করতে পারেনি কেন—তা নিজেও বোধহয় ভেবে দেখেন একটাবারও। দেখলে একটা নিদারুণ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হ’ত না।

পড়তে হল বলবীর সিং এর নিজেরই গোয়াতু’মির জন্ত। কিন্তু তখন নিকপায়। বিভীষিকার নিশ্ছিন্ন অন্ধকারের মধ্যে আটকে পড়েছিল সে। বেকবাব পথ খুঁজে পায়নি কোন দিক দিয়েই। বেকতে চেষ্টা করেছে, পাশাতে চেষ্টা করেছে, মুক্তি পেতে চেষ্টা করেছে। পারেনি, সমস্ত চেষ্টা বার্থ হয়েছে তার। বাঁচবার জন্ত প্রাণপণে খুঁজেছে কত না। এক পা পিছু হটতে গিয়ে মৃত্যুর গহবরের দিকেই এগিয়ে গেছে আরো পা পা।

নিয়তির আকর্ষণের মতো একটা অন্তত আকর্ষণ যে দীর্ঘে দীর্ঘে খেলিয়ে নিয়ে আসছিল নিজেও খল্পের ফেলবার জ্ঞান — প্রথম প্রথম বুঝতে পারেনি মোটে। ভয়ভ্রাস মনের কোণে উঁকি মারেনি একবারও। আঠারো বছরের বলিষ্ঠ তরুণ বেশ স্বচ্ছন্দ গতিতেই চলেছে হাম্‌খুসি মানুষটা সন্ধ্যাদের সঙ্গে হাম্‌-মস্কানা করতে করতে চলেছে পাহাড়ী পথ মাড়িয়ে—ডাঙায় উঠে উৎরাইয়ে নেমে। সময় সময় আত্ম-প্রত্যয়ের ছাপ কুটে উঠেছে সারা মুখশা-নায়।

গভীর শাদের ধার নিয়ে নিভীক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে, আবার কখনো বন্ধুদের হাত ধরে টানাটানি করেছে তাকে অনুসরণ করে চলছে। শাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সভয়ে আত্মনিদান করে উঠেছে বন্ধুগণ। একটু উনিশ-বিশ হলে, পা কসকে গেলে রঞ্জে নেই আর কান মতল তলে যে তলিয়ে যাবে তার হাদিস পাবে না আর জীবনে কেউ। বন্ধুদের অনেকে বলবীরের কাছ থেকে ছুটে পালায় দূরে—অনেক দূরে।

হো হো করে হেসে ওঠে বলবীর সিং। কেঁপে ওঠে ধর ঈর্ষ্যদেহ। কেঁপে ওঠে পাহাড়-না। কাঁপন ধরে কাছের বন্ধুদের বুকের তলায় তলায়। হাসিটা ভালো লাগছে না একদম, বিচ্ছিন্ন বকমের। হাসি দেখে মানুষের হাসি পায়, কিন্তু এ হাসিতে একটা কান্নার সুর বেজে উঠেছে তাদের কানে

পথের ভদ্র মনের ভদ্র ঘোচাবার জ্ঞান যে হঠকাবিতা করেছে সে, যে আত্মসত্ত্ববিতা দেখাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, মানুষটা বুঝি কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। আরো ভয়ংকর হয়ে উঠতে তার আচরণ-ব্যবহারে। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। একটা উন্নত ভাব পেতে বসেছে একে। এই উন্নততাই তাদের ভদ্র স্রবতে ভদ্র ধরাচ্ছে বেশী করে। গুরুজনদের আদেশ নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছে। যে রাস্তায় পা বাড়াতে নিষেধ, জঙ্গল খানদের যে দিক দিয়ে যেতে একেবারে বাধা—ইচ্ছে করেই ও সেই রাস্তায় সে দিক দিয়েই যাচ্ছে। এ জিদের ফলাফল ভালো হবে না। হতে পারে না জানা কথাটি। তবু অবাস্তিত অলক্ষণকে ডেকে আনিবার জ্ঞান ও যেন খুব তৎপর হয়ে ঠেছে।

অদৃশ্যলোকের এক গজানা দুর্দান্ত মন দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছে বুঝি বলবীর সিং-এর মনের ওপর। কেমন ঠেচ্ছে ওকে। পরিচিতদের কাছে ও অপরিচিত। অ দুনিয়ার অন্ত মানুষ। বন্ধুদের চোখে ক্রমে মৃত্যুমান ভ্রাস হয়ে উঠতে লাগল বলবীর সিং।

যে ক'জন কাছে ছিল, তাদের অভয় দিতে গিয়ে, অতি দুঃসাহসী ভাব দেখাতে গিয়ে কাল হ'ল বলবীর সিং-এর। নানা অজুহাত দেখিয়ে এক এক করে সরে গেল তারা। অন্ত পথ ধরল। পিতৃদত্ত জীবনটা তারা বেঘোরে খোয়ানতে পারবে না।

সকলে চলে যেতে দেখে বলবীর সিং ফেটে পড়ল রাগে। কুর্গা লোকের মুখশা-না

দিয়ে রক্ত ফেটে বেহোয় আর কি। বিকৃত স্ববে চিংকার করে বলে উঠল—যে ভয়ের জন্ত তোরা সব পালাচ্ছিস সেই ভয়ই ধরবে তোদের দেখিস। বুকে হাত চাপড়েছিল।—এ বান্দা তোদের আগেই গাঁয়ে ফিরে যাবে বহাল তবিরিতে। যত সব উরপোক—ভীতুর দল।

ঘেঁষায় মুখ ফিরিয়ে চলার মোড় ঘুরিয়ে দিল বলবীর সিং। আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ গতিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগল। যারা ছেড়েছে ওকে তাদের ঘেন্না হাড় পাঞ্জরী মাড়িয়ে দলে পশ্বে দিয়ে চলতে লাগল।

মনে উদ্ধত ভাবটা পেয়ে বসলে দৃষ্টি স্বচ্ছ থাকে না। ঘোলাটে ঘোঁরাটে হয়ে যায়। বিভ্রান্তির মোহে আচ্ছন্ন মনে তখন ভুল দেখা ভুল পথে চলা ভুল ধোঁয়া সবই ঠিক ঠিক মনে হয়। বলবীর সিং-এরও হয়েছিল তাই। সে যা কিছু ভাবছে ঠিক। যা কিছু বুঝছে ঠিক। যে পথে চলেছে সে পথও ঠিক।

এই মনগড়া সব ঠিকই বৈঠক হয়ে গেছিল বলবীর সিং-এর শেষ পথন্ত।

ছপুর বোদ্ধবের প্রথর তেঙটা কমেছে তখন। বিকেলের ছায়া-শ্রম্ভ ঠাণ্ডামিটে চাওয়া বইতে শুরু করেছে। বলবীর সিং-এর মনে মুখে খুশির আনন্দ। একা চলার মুক্তিবাদ জীবনে পেরেছে এই প্রথম। এই প্রথম যেন নতুন আনন্দের দুনিয়ায় একবারও মনে হচ্ছে না সে একা। মনে হচ্ছে সে অনেক। একাই একশো।

পাহাড়-বনের জঙ্গ-জানোয়ার গাছ-গাছালির সঙ্গে একাক্ষ হয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। আমগাছটার তলায় ঝরনার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল খানিক। তরতরিয়ে চলেছে ঝরনার ফটিক জল। ঝরনার ধার ধরে পাহাড় বেয়ে বেয়ে তরতরিয়ে নামতে লাগল সেও। জলে ভর্তি ডোবাটার কাছে এসে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। হুঁহাতে ঝাঁচলে ঝাঁচলে জল তুলে মাথায় মুখে দিতে লাগল। খেতে লাগল।

হাসছে বলবীর সিং। জল খাবার সঙ্গে সঙ্গে নাকি মাথা টলে! গা ঝিম ঝিম করে। চোখে ঘোঁরা দেখে বেহেশ হয়ে পড়ে। হাঁশ ফিরে আসে না আর কখনো কারো। সব ভুল। সব মিথ্যে। ভয় দেখানো স্রেফ। এ-জলে মৃত্যুবিস নেই। তার প্রমাণ বলবীর সিং বেঁচে রয়েছে। পায়ের চাপে শুকনো ডালপালা ভেঙ্গে ঝাওয়ার মড়মড় আওয়াজে তাকাল সে কার্ণ গোন্ডেন-রড পাছগুলোর দিকে। হয়তো কোন বন্ধু তাকে নিয়ে কৌতুক করবার জন্ত এইভাবে শব্দ করছে। তাকে ভেঁড়ে দিয়েও গাছের আড়ালে আড়ালে ভায়ার মত অতুসরণ করছে।

ভুল ভাঙল। গাছগুলোর কাছে এসে ফাঁকে চোখ রেখে রেখে কোন লোককে দেখতে পেল না সে। দেখতে পেল কেবল মশমল-মহুগ শিং নাড়তে নাড়তে পশ্চিম দিকে উল্লংখাসে ছুটে পালাচ্ছে একটা শয়র। শয়রটা যে খুব ভয় পেয়েছে, ওর আকাশ ফাটানো চিংকারে তা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। ওর চিংকারের সঙ্গে নীল-ঝাড় মাগপাই পাখি ছুটোও গলা মিলিয়ে ভয় ধরানো চিংকার করছে।

এদের এ-ভাবে চিংকারের পিছনে, দৌড়ানোর পেছনে, ওড়ার পেছনে যে একটা সত্যি ভয়ের কারণ আত্মগোপন করে থাকে পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ভালো বকমেই জানে বলবীর সিং। অল্প সময় হলে সে-ও ভয় পেত। আত্মরক্ষার জন্য আত্মরক্ষাতে দৌড়ানোড়ি করতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। সে জানে, এই দৌড়ানোড়ির কলেই অনেকে বাঁচতে গিয়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছে। আবার স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেও একই দশায় পড়তে হয়েছে কাউকে কাউকে।

এসব জানা সত্ত্বেও, শব্দ-মাগপাই-এর অলঙ্ঘনে চিংকার শুনেও ঘাবড়াল না বলবীর সিং। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে নান্দ্রিধায় চলতে শুরু করে দিল আবার। এ-টা অজানা অজুহাত আনন্দের টেড খেলে যাচ্ছে তার ভেতরে। সে বীর। নামে যেমন প্রকৃতিতেও তেমন। এই থকর্গায়-এর মধ্যে তার সমকক্ষ নেই তার কেউ।

মনে মনেই নাজের গর্ব-অহংকারের তারিফ করতে করতে বলবীর সিং-এর বুকখান ফুলে দশভাঙ হয়ে উঠতে লাগল যেন। নিজেকে পূর্ব আশ্চর্য ঠেকল ওর। কেমন করে কোন্‌ যাদুমন্ত্রের প্রভাবে হঠাৎ এরকম হয়ে গেল ও। আগেকার মনটা অদ্ভুত-ভাবে বদলে গড়ে একেবারে। মনে হচ্ছে সে সকলের চেয়ে জ্ঞানী। সকলের চেয়ে বুদ্ধিধার। ভয়ভর তার জন্ম নয়, দুর্বলদের জন্ম, অজ্ঞানীদের জন্ম।

ইচ্ছে করেই কাঁটা ঝোপের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে দেখতে চলতে লাগল বলবীর সিং। কোন কিছু লক্ষ্যে পড়ে ফিরা। পারাপ কিছু পড়ছে না ওর চোখে। পারাপের ভিতর সৌন্দর্যের পদরাই দেখতে ও।

মাথার ওপর মাগপাই পাখি ছুটো একনাগাড়ে উড়তে উড়তে চলেছে। শব্দটা ওপাশ দিয়ে ওর সামনে এসে পড়ে আবার দৌড়তে শুরু করল প্রাণপণে। এরা সাধারণতঃ হিংস্র প্রাণী বাঘ বা অল্প জন্তুর আবির্ভাবেই এই রকম করে থাকে। এসব জানা কথা বলবীর সিং-এর মনের কোণ থেকে মুছে গেছে একেবারে। মৃত্যুর হয়তো মাদকতা আছে একটা। মাগপাই-এর নীলরঙে বলবীর সিং-এর চোখে নেশা লাগছে। তন্ময় হয়ে যাচ্ছে। হুঁচোখে ঘুম নামছে বুঝি।

এইভাবে আচ্ছন্নের মতো কতক্ষণ চলেছিল, কতক্ষণ কেটেছিল, তার কোন খেয়াল ছিল না। খেয়াল হ'ল একটা হিমেল বাতাসের ঝাপটা লেগে গেলে সর্বশরীরে। সচেতন হয়ে উঠল বলবীর সিং। হুঁহাতের তালু ঘষে ঘষে গরম করতে লাগল। বুকের ওলায় বক্তৃতা বুঝি জমাট বেঁধে যাবে এক্ষুনি। সর্বদিকে রক্ত চলাচলের জন্তু পাহাড়ের ফাটল ভিড়িয়ে ভিড়িয়ে দৌড়তে লাগল।

হঠাৎ পূর্ব দিকে তাকিয়েই যেন কেমন হয়ে গেল বলবীর সিং। নেপাল পাহাড়ের পেছনে স্বর্ষ ঢলে পড়েছে। দেখা যাচ্ছে না। রক্ত লালে লাল হয়ে উঠেছে আকাশটা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল একটু। যতখানি দৃষ্টি যায়, চকর দিয়ে এক হুঁচোখ।

ভয় ধরছে ভেতরে। দিশেহারা হয়ে পড়ছে। গাঁও-ডেয়ার ফেরবার পথ থেকে একদম সরে এসেছে। সজীবদের সজ ছেড়ে বেকুবির করেছে বেশ বুঝতে পারছে। এতক্ষণ যেন একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। স্বাভাবিক মানুষের ফিরে এসেছে আবার বলবীর সিং। জনমানবশূন্য পাহাড় বনভূমিতে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রমাদ গুণছে। কি করবে, কোথায় যাবে, কোথায় আশ্রয় পাবে ভেবে কোন কুল কিনারা পাচ্ছেনা।

অলক্ষ্যে থেকে একটা অশুভ ছায়া যখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে তখন মাহুকের অহুভূতি একটা অজানা আশঙ্কার আঁচ পায়। কেন পায় তা কেউ জানে না। কিন্তু তবু পায়। এক্ষেত্রে বলবীর সিংও সেট আঁচ পেতে লাগল বুঝি। মৃত্যুর বিভীষিকা অহুভূতির স্তরে স্তরে জেঁকে বসতে লাগল তার। বেকুবির সময় মা-বাবার ফিরতে বারণ করার কথাগুলো বারবার কানে বাজতে লাগল। দেয়ী হলে ফিরে না। সজীবদের কাছছাড়া হবে না মোটে। যে-ই বেরোয়ায় হয়েছে, তারই বিপদ ঘটেছে। অনেক সময় অনেককে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে—

“মায়ের সজল হুঁচোখ চোখের সামনে ভেসে উঠছে কেবল বলবীর সিং-এর।

বাড়িতে ফেরবার পথ দেখতে পাচ্ছে না চোখের সামনে। যেখান থেকে আসছিল, সেই টনকপুতুর বাজারে ফিরে যাবারও পথ দেখতে পাচ্ছে না। পেলও কোন জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব নয় সন্ধ্যার আগে। সন্ধ্যা নামছে। অন্ধকারে যেন আলোর কণিণ বেধা দেখতে পেল বলবীর সিং। পূর্ণিমা হয়ে গেছে তবে হুঁমিন আগে। চাঁদ উঠবে থানিক পরে। জোৎস্না বয়ে পড়বে আকাশ থেকে। পাহাড়ী ছেলের পাখুরে বাস্তায় চলতে অসুবিধে হবে না। জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে হাঁসিয়ায় হয়ে চলতে পারবে।

কিছুক্ষণ পর সামান্য একটু ক্ষয়া চাঁদ উঠল আকাশে। খুব সচেতন হয়ে চলেছে বলবীর সিং। বাঁচবার আলুলিবিজুলিই তাকে ঠেলে ঠেলে চালাচ্ছে। বলবীর সিং তার ভীতসন্ত্রস্ত মন আর ক্লান্ত দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারছে না আর।

জামবনটাকে পাশ কাটাতে গিয়ে আচমকা ও কার পায়ের শব্দ শুনে পেল স্পষ্ট। চমকে উঠল মুহূর্তে—কি যে হয়ে গেল কিছু বুঝে উঠতে পারল না। প্রাণভয়ে প্রাণপণে ছুটতে লাগল সামনের দিকে।

বেশ বুঝতে পারছে, জাম বনের আড়ালে তার পা ফেলার সমান তালে তালে পা ফেলে তাকে অহুসরণ করে দৌড়াচ্ছে অগ্জজন। সময় সময় মনে হচ্ছে যেন একজন নয়, আরো কেউ-কেউ আছে। একসঙ্গে অনেকের পায়ের শব্দের কথা শোনেনি, এখানের ভয়াবহ কাহিনী শোনার সময়। হয়তো মনের ভ্রম। ভয় থেকে উৎপত্তি। একটু একটু করে সাহস ফিরে পাচ্ছে আবার। বোধহয় শোনা কথাই সন্ধ্যা নামতে মনের কানে প্রতিশব্দ হয়ে বেজে উঠছে নিজেরই পায়ের শব্দ। এইভাবেই মনের

চোখে এবার শোনা কথারই অনেক রূপ দেখতে পাবে। পূর্ণমাত্রায় মনের সাহস বজায় রাখতে এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে বলবীর সিং পথ চলতে লাগল।

খানিক যেতে না যেতেই আবার একটা ধাক্কা খেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না প্রথমে। হুঁহাতে চোপ রগড়ে নিল বার বার। না, মনের ভুল নয়, চোখের ভুল নয়। যা দেখেছে সত্যি। তবে এ দেখা যে একেবারে বিধা-সংশয় মুক্ত ভা নয়। যাকে দেখছে, সে শরীরী না অশরীরী—কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। ধাঁপায় পড়ে যাচ্ছে : জায়গাটা সম্বন্ধে বহু রকমের ঘটনা অনেকেরই কানে কানে হেঁটে বেড়ায় প্রায় সব সময়। সম্পূর্ণ আশা-আকাজক্ষা নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই মাটিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে কেউ কেউ। ওদেও অতৃপ্ত আত্মাই আসে নাকি এখানে। ঘুরে বেড়ায় নাকি পাহাড়ের চূড়ায়, খাদে, বনে-জঙ্গলে গাছের ছায়ায় ছায়ায়।

এসব মনে নেয়নি কোনদিন বলবীর সিং। বিশ্বাস করে নি। কিন্তু এই মুহূর্তের পরিবেশ পরিস্থিতিতে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। সাহসের ভিত্তি বিশ্বাসের ভিত্তি ফাটল ধরছে।

জাম বনটা পোয়য়ে এসেছে। এদিকটা বেশ ফাঁকা। একটা গাছ থেকে আর একটা গাছের বাবধান অনেকখানি। গাছের আড়ালে নিজে লুকিয়ে রেখে রেখে চলতে গিয়ে ছায়ামূর্তিটা বালিমাটির বুকে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে অল্প গাছের গুঁড়ির আড়ালে এসে পৌছোচ্ছে। বুকটা কঁপে উঠল বলবীর সিং-এর। এ যেন শিকারীর শিকার ধরবার প্রস্তুতি চলছে। ছায়ামূর্তি তাকে নজরবন্দী করে রেখেছে বেশ বুঝতে পারছে।

অশরীরী নয়, ও শরীরী : অশরীরীদের কুলুজিতে একটা গাছ থেকে আর একটার বাবধান পূরণ করতে দেয়া লাগে না একটুও। চোখের খলক পড়ার আগেই কায় সমাধা হয়ে যায়। কিন্তু এখানে হামাগুড়ি দিয়ে পূরণ করতে হচ্ছে। এ ছায়ামূর্তি নির্ঘাত মানুষ চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, মিশ-কালো বীভৎস দর্শন মানুষটা শেষ গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। এরপর আর গাছ নেই খানিক দূর পর্যন্ত। হয়তো মাথায় নতুন কিছু মতলব আঁটছে বলেই তার চলার পথে অনুসরণ করছে না আর।

করবে না যে এমন কোন কথা নেই। হঠাৎ ঝাঁপিয়েও পড়তে পারে তার ওপর। পড়লে সেও ছেড়ে কথা কইবে না যত শক্তিই ধরুক না কেন লোকটা, মৃত্ত স্থবিধে—একা। ওকে ঘায়েল করতে অস্থবিধে হবে না কোন। ঠাকুরদার রক্ত বয়ে যাচ্ছে বলবার সিং-এর ধমনীতে শিরা-উপশিরায়। জঙ্গলে বাঘের খপ্পরে একা পড়ে গেছিল একবার ঠাকুরদা। তার মতো সজীব পাליয়ে গেছিল ওকে ছেড়েও। বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়বার মুখেই ধারালো টাঙি নিয়ে আক্রমণ করেছিল ঠাকুরদা। শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদার

হাতেই পঞ্চপ্রাপ্তি হয়েছিল বাঘটার।

যাকে দেখল, সে এদেশের নয়। রঙে চেহারায়েই মালুম হচ্ছে গুজব—কিছুদিন হ'ল এসেছে এখানে। একজনকে দেখলেও—জেনেছে, আরো নাকি অল্প অল্প লোক আছে এদের দলের চারিদিকে ছড়ানো। লোকগুলো বাঘের চেয়েও নাকি হিংস্র। দেবী হলে তবুও বাঘকে মারতে পারা যায় ধরতে পারা যায়। কিন্তু এদের ব্যাপারে কেউ কিছুই করতে পারছে না। বছর খানেক ধরে ওদের ধরবার জ্ঞাত চেষ্টা চলছে দারুণভাবে। সমস্ত বার্থ হয়ে যাচ্ছে। ওরা পথিকের সর্ব্ব লুণ্ঠ করে নেয় মওকা বুকে। কেউ বাধা দিলে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

এ হেন দুর্বৃত্তদের হাত থেকে ধন-প্রাণ বাঁচাবার জ্ঞানই কতকগুলো এলাকা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব এলাকার ধারে কাছে আসে না কেউ। জ্বিদের বংশ এসেছে বলবীর সিং। বাড়ির লোকের কথায় অবিশ্বাস করার ফল হাতে হাতে ফলতে বসেছে। তার প্রমাণ সাক্ষাৎ সমুদূত রয়েছে পাচতলায়।

মির্জাই-এর তলার কোমরের কাছে হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখে মিল ভালো করে কোমরে জড়ানো টাকার খলিটা পাক দিয়ে শক্ত করে ঠিক বাঁধা আছে। ডান-দিকে ভোজালিটাও ঠিক আছে। ভোজালিটার ওপর হাত রেখে চলছে। এ-পথে এ-সময় এটাই একমাত্র সম্বল।

চোখ কান বুদ্ধি সজাগ রেখেই চলছে বলবীর সিং। চতুর্দিকে তাকাচ্ছে। বিশেষ করে পিছনে। লোকটা এখনো দাঁড়িয়েই আছে একভাবে। কিন্তু এর মুখটা ঘুরছে কিরকি তার চলার গতির সঙ্গে সঙ্গে।

মাগপাই পাখি দুটো এতক্ষণ কোথায় ছিল কে জানে। আচমকা এসে মাথার ওপর দিয়ে চিংকার করতে করতে উড়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বিকৃত স্বর পাহাড় বনভূমি কাঁপিয়ে তুলে ছ'কানের পরদা ফাটিয়ে দিল যেন। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে মাল্লুঘটা। ছুটে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ডানপাশ কিরতেই বুক টিপ টিপ করে উঠল আরো। প্রথম জনের মতো ওই বকম চেহারায়েই আর একজনও ছুটে আসছে ঝাঁক থেকে।

বুঝতে আর বাকি বইল না বলবীর সিং-এর—বিকৃত স্বরের চিংকারটা কিসের ইঙ্গিত। একজন শিকারী আর একজনকে কাছে ডাকল। শিকার ফাঁদে পড়ে গেছে। ফাঁদ থেকে যাতে বেরতে না পারে—ভালো ভাবে শঙ্ক করে আটকে ফেলতে হবে ঘিরে ফেলে।

সমুখ সমরে একজনের সঙ্গে লড়বার জ্ঞাত প্রস্তুত হয়েছিল বলবীর সিং। এখন দেখছে দুজন। আরো কাছে কিনা, তাই বা কে জানে। এখানে যদি হারিয়ে যায় বলবীর সিং—কেউ কোন দিন জানতেও পারবে না কি করে কোনখানে হারাল সে।

জানছে এ মরণফাঁদ থেকে উদ্ধার হবার কোন উপায় নেই আর তার, তবুও বাপ

থেকে ভোজালিটা বার করে নিল তাড়াতাড়ি। টনকপুর বাজারে বাদাম-কমলালেবু বিক্রির টাথার থলটায় হাত বুলিয়ে নিল একবার। তাকে শেষ না করে কোমর থেকে খুলে নিতে পারবে না ওয়া এটা। জীবন থাকতে সে এটানিতে দেবেনা ওদের কিছুতেই। এই টাকা থেকেই তাদের পরিবারের জীবন চলে। এ টাকা নায়ের জীবন, ভাই-বোনদের—সবার।

দাঁড়িয়ে পড়ল বলবীর সিং। দৌড়ে শালিয়ে ওদের কজা থেকে রেহাই পাওয়া যাওয়া যাবে না আর তাছাড়া কোন পথই পাচ্ছে না কোনো দিকে যাবার। মাথার ভেতর সব গুলট-পালট হয়ে যাচ্ছে গাঁয়ের রাস্তার নিশানা ঠিক করতে। একটা চৌকোণা পাথরের ওপর বসল নিজের অগোচরেই।

বসে বসে দেখছে আর অবাধ হয়ে যাচ্ছে বলবীর সিং। লোক দুটো তার কাছ বরাবর এসে থমকে গেল। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ইঙ্গিতে কি যেন নাববে বলল একজনকে আর একজনকে। তারপর যে ভাবে ওরা এসেছিল সেই ভাবেই ছুটতে ছুটতে চলে গেল আবার সেই পথ ধরেই।

দেখছে বলবীর সিং ডাইনে বাঁয়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। হলে যাচ্ছে ওরা দু'জনে ছুঁদিকে। ধারে ধারে তক্তলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। শিকারকে গ্রাসের মধ্যে পেয়ে ছেড়ে চলে যাওয়া কেমন করে সম্ভব? বলবীর সিং নিজের ডান হাতের শক্ত মুঠোয় ধরা ভোজালিটার দিকে তাকাল। তাঁদের আলোয় বেশ চক্ চক্ করছে। এতে ভয় পেয়ে চলে যাবার কারণ নেই ওদের, ওদের দু'জনের হাতের ভোজালিও তার লক্ষ্য এড়ায়নি। এর চেয়ে ঢের বেশী বড়। ঢের বেশী চকচকে। হঠাৎ নিচের দিকে নজর পড়তেই শিউরে উঠল বলবীর সিং। পায়ে তলায় ছুঁপালে আর এক মৃত্যু-ফাদ—গভর খাদ। চৌকোনা পাথরটার একটা কোণের সামান্য অংশ পাহাড়ের একটা দিকে ঠেকে আছে মাত্র। বাকি তিন দিক ফাঁকা। লুপ্ত বুলছে। এই জগুই শিকার ছেড়ে চলে গেছে শিকারীরা। শিকার ধরতে গিয়ে তাদের নিজেদের প্রাণ হারাবার সম্ভাবনা ছিল ধখেই। দুর্বৃত্ত হয়েও নিজেদের প্রাণের মমতা থেকে এক পাও সরেনি ওরা। স্বপরের প্রাণ নেওয়া যাদের কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার, নিজের প্রাণ দেবার সময় তাবাই হাবার অতি ভীক।

এবারে বাঁচবার পথ খুঁজে পেয়েছে বলবীর সিং। এই খাদের ধার দিয়ে দিয়ে পল্লব থেকে বেরুবার চেষ্টা করবে সে। বেরুতে পারবে নিশ্চয়ই যেখানে যেখানে খাদ, সেখান দিয়েই চলবে। অতি সন্তর্পণে বসে বসেই পাথরটা থেকে নেমে পড়ল। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে চলতে শুরু করল আবার।

চলছে তো চলছেই। এবার কারো পায়ে শক্ত পাওয়া যাবে না কোন দিক থেকেই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ওকে ছেড়েছে দুর্বৃত্তরা তাহলে সত্যিই।

অনেকটা পথ এসে গেছে। ম্যাগপাই পাখি দুটো আবার মাথার ওপর দিয়ে

চিংকার করতে করতে চলে গেল। দুর্বৃত্তরা ছেড়েছে তাকে কিন্তু এরা তো কিছুতেই ছাড়ছে না। এখানে আশার স্তূপ থেকেই মাঝে মাঝে ওই দুটো তাকে ছায়ায় মতো অনুসরণ করে চলেছে। হঠাৎ হঠাৎ কোথা থেকে আবর্তিত হচ্ছে কে জানে? চিংকার করে যেন একটা বিপদের সংকেতই আনিয়ে যাচ্ছে। এবারগাটা এর আগে হয়নি। কিন্তু মহা আশ্চর্য, এখন তোলপাড় করছে ভিতর। এটা আশ্রয় একটা বিশ্বাসী মানুষকে পাবার জন্য বড় ছটপট করছে মন। ছুটেতে ইচ্ছে করছে খুব। ছুটেছে ছুটেছে ছুটেছে। সামনে কুঁড়েঘর দেখে ধড়ে প্রাণ এল যেন। লোকালয়ের কাছে এসে পড়েছে এবার। আর ভয় নেই।

কুঁড়েঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আর ভেজানো দরজার পাশায় টোকা মেঝে আওয়াজ করল। কোন সাড়া পেল না ভেতর থেকে। আস্তে আস্তে ঠেলতে খুলে গেল দরজা। জোৎস্না এসে পড়েছে দক্ষিণ দিকের ভাঙা জানালা দিয়ে। ঘরের মাঝখানে চারপাশে চাপ চাপ অন্ধকার। ঘরে কেউ নেই। এটা একটা পোড়ো ঘর। ভেতরে ঢুকল বলবীর সিং। অবশ্যই হয়ে পড়েছে খুব। বাতের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখবার, মাথা গোঁজবার ঘে একটা ছায়ার পেয়ে গেছে—এটাই মস্ত ভাগ্যের জোর তার।

ভিতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে জানার দিকে দিকে গিয়ে বলল—একটু বিশ্রাম করার জন্য। বাতে বিপদের ঝুঁকি মাঝায় নিয়ে বুঝা পথ খুঁজে হয়রান হওয়ার চেয়ে এই আশ্রয়টুকু যথেষ্ট নিরাপদ। সকালে রাত্তা খুঁজে বার করা সহজ হবে।

ঘুমছে চোখ তুলে আসছে বলবীর সিং—এর মনে মনে ঈশ্বরের ধন্যবাদ জানাচ্ছে তাঁর এই করুণার জগৎ—আশ্রয় মিলিয়ে দেবার জন্য। ঈশ্বরের স্বর্গে বাধা পড়ল, ঘুম মাথায় উঠল পিঠে মাথায় গরম নিঃশ্বাস পড়তে।

পেছনে ফিরে তাকাল। জানালার ভাঙা খুঁটাতে একটা ছোট্ট মুখ আটকে রয়েছে। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে নদশ বহুরের ঢেলের মুখ ওটা। ছেলেটার সর্বশরীর দেখে মনে হয় ও খুব ইপ্সাচ্ছে। মুখ দিয়ে নাক দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে ছাড়ছে। বাইরের থেকে ভাঙা খুঁটাটার মুখটায় বলবার শংকে এক দৃষ্টে দেখছে। চোখের জল পড়ছে না।

ছেলেটাকে দেখে খুব আনন্দ হ'ল বলবীর সিং—এর মানুষের মুখ দেখতে চয়েছিল। প্রকৃত মানুষের মুখ দেখতে পেরেছে সে। এ যেন ঈশ্বর প্রেরিত দেবশিশু। চোখে চোখ পড়তে ফিক করে হাসল ছেলেটি। বলল—তুমি কি ভয় পেয়েছ?

ঘাড় নাড়ল বলবীর সিং—না পায়নি।

হেসে উঠল জোরে ছেলেটি, তাঁর সঙ্গে আছে কেউ?

আবার ঘাড় নাড়ল বলবীর সিং—না কেউ নেই।

আমি কি তোমার কোনও সাহায্য করতে পারি?

কচি গলায় ভরসা দেওয়ার কথা শুনে ছেলেটাকে সাক্ষাত ঈশ্বর ভেবে সবল

বলবীর সিং । তাকে উদ্ধার করতে এসেছেন স্বয়ং ।

নিজের বিপদের কথা জানাল বলবীর সিং ছেলেটিকে । অমুঝোব করল তাকে উদ্ধার করে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে । ছেলেটি এদিক ওদিক তাকাল । কি যেন দেখল, কি দেখে হানল । তারপর হাসিমুখেই ওর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে । লোক নিয়ে এসে নিয়ে যাচ্ছি তোমায় ।

দৌড়ে চলে গেল ছেলেটি । কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল । সঙ্গে ছুঁজন লোক । কারা এল, তাদের দেখে কাঁপুনি শুরু হল ভেতরে । এরা বলবীর সিং-এর অজানা অচেনা নয় । ভেবেছিল, ওরা পালিয়ে গেছে, তাকে ছেড়েছে । তার ধারণা ভুল । পালানোটা ওদের মস্ত কৌশল । শিকারের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে শাকে খেলিয়ে খেলিয়ে নিজেদের কঠিন কানে আটকে ফেলা ।

এবার এদের হাতে নিশ্চিন্দ মৃত্যু তার । বাঁচার কোন আশা নেই । সব দিক দিয়েই নিরুশায় সে । বাচ্চাটা ছুঁজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে । দেবশক্তির মুখোশ পরা সাক্ষাৎ দানব ও । মানুষ শিকারী ছুঁটোর মতো ওরও হাতের ভোজালিটা নাক কবর রয়েছে তার দিকে । ওদের চণ বাচ্চাটা, এমন দিনের আলোর মত সব কিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে তার কাছে । পোড়ো ঘরটার আসবার আগে অবধি এতখানি পথ নিঃসাদে পা টিপে টিপে অনুসরণ করে চলেছিল ছবুঁভদ্রা তাকে ।

অনেককে এই ভাবে সকলেও অগোচরে গুম খুন করেছে ওরা । এদের একজনকেও শেষ করে মাঝতে পারে যদি সে, তাহলে তার অনেক পুণ্য । মরেও শান্তি ।

যে রকম তৈরি ওরা, সামান্যসামানি আক্রমণ প্রতিরোধ খুব মুশকিল । ভোজালিটা বার করেই ওদের সামনে থেকে কাগের দিকে সরে গেল ।

মুহুর্তে কি ঘটায় গেল বুঝতে পারল না । বোঝবার আগেই সব কিছু ঘটে গেল । কোণটার সরে যাওয়া মাত্র সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল । পায়ের তলার নরম মাটি ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠে সজোরে ওপর দিকে ধাক্কা মেরে ছিটকে ফেলে দিল মেঝেয় !

বলবীর সিং-এর পিড়ি ঘাওয়ার সুযোগ নিতে চেষ্টা করল সঙ্গে সঙ্গে ছবুঁভদ্রদের একজন । ভোজালি টু চয়ে এনিয়ে এলো, কাঁপিয়ে পড়বে । পড়া হল না । আর্তনাদ করে নিজেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল । বলবীর সিং-এর সমস্ত স্নায়ু অবশ হয়ে গেছে । হাত পা দেহের কোন অঙ্গই নড়ছে না । চেষ্টা করেও তুলতে পারছে না । চোখের পলক পড়ছে না চয়ে আছে তো চয়েই আছে । রক্ত নিশ্বাসে দবছে ।

মেঝেয় পা রাখেনি সে । বেথোঁছল বিষাক্ত পাহাড়ী ছায়াডায়াড সাপের দেহের ওপর । সাপটার গুথ-নিশ্বাস ভেঙে যেতে ক্রুর আক্রোশে ফুলে উঠেছিল । বিরাট লম্বা সাপটা ভীষণ হয়ে উঠেছিল । অসংখ্য নিশ্বাসের গজন গজোঁছল । সবার মতো কণা বিস্তার করে, চেরা লকলকে লাল জিভ বার করে দাঁড়িয়ে উঠেছিল মানুষ প্রমাণ । বলবীর সিংকে মরণ ছোবল মারবার মুখে মানুষ শিকারীর প্রথম জন সামনে এসে গোরেন্দা (প্রথম)—২২

পড়ার বিষয়ক ছোবল বসিয়ে দিয়েছিল ওয় পিঠেই।

বিশায় জম আর হলেটা প্রাণভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল বলবীর সিংকে ছেড়ে। বলবীর সিংকে ওরা ছাড়লেও হামাড্রায়াড ওদের পিছু ছাড়ল না। বিহাৎ গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ওদের পিছু পিছু।

এদমর আর কিছু জানে না সে। কিভাবে রাত কেটেছে—ঘুমিয়ে না একটা আচ্ছন্ন অবস্থায়—তার কিছুই মনে নেই একেবারে।

ভোরের আলো যখন চোখে এসে পড়ল, তখন সচেতন হয়ে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল রাতের বিভীষিকা, মনে পড়ল এক এক করে সব। শিউরে উঠল সামনেই দুর্ভাগ্যের মৃতদেহ দেখে। ওর সারা অঙ্গ নীলে নীল হয়ে গেছে।

উদয় সূর্যের আলো লেগে যেন দেহমন স্নায়ু সতেজ সবল হয়ে উঠল আবার বলবীর সিং-এর। উঠে দাঁড়াল। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল কুঁড়ে ঘর থেকে। ফিরে যাবে বাবা-মার কাছে আবার।

কুমায়ুন রেজিমেন্টের অদমর-প্রাপ্ত হাবিলদার বলবীর সিং-এর মুখে তার নিজের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি। একটা বিশ্বয়ের ষোর কাটতে না কাটতে নতুন করে উপস্থিত হল আর একটা।

গায়ের মির্জাইটা খুলে ফেলে বলবীর সিং দেখাল। জানাল, আঠারো বছর বয়সের জীবন তার যেন বিষময়কর-অক্ষত দেহে বেঁচেছে, তেমনি 'বিশ্বীয় বিশ্বযুদ্ধেও শত্রুপক্ষের গোলাবৃষ্টির মধ্যে যেখানে তার দলের একজনও ফেরেনি—সেখানে আশ্চর্য-ভাবে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছে সে।

*

*

ভার্য্যাপ্রণব ব্রহ্মচারী : আজকের বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের পটভূমিকায় যে সমস্ত লেখক অভিনবত্ব ও অন্তর্গততা এনেছেন তারা প্রণব ব্রহ্মচারী মশাই তাদের অন্তর্গত।

ভজ্ঞানধারার সাথে রহস্য ও রোমাঞ্চ সৃষ্টিতে লেখকের মপার কৌতূহল ও কুশলতা আমাদের সাহিত্যে এক নতুন সংযোজন। অত্যন্ত মনোজ্ঞ জাল বনে ঘনীভূত বহুস্তরের ক্রম অগ্রসরন তাঁর বহুল পঠিত লেখকদের অগ্রতম করেছে। তিনি ভ্রমণ করেছেন পর্বত, কন্দর, গুহা ও হিমালয়ের পর্বতারের বহু স্থান, বহু নিভৃত প্রান্তের নীরব প্রান্তর যেখানে মানুষ আমাদের সভ্য ও আধুনিক জীবনের জটিলতা হতে অনেক দূরে হস্ত হার ও জটিলতর কোন রহস্যবৃত্ত জীবনের সাধনায় নিরত।

*

*

*

* শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা-কাহিনীর সংকলনে লেখাটি দিলুম। বাস্তবের গোয়েন্দা কাহিনী থেকেও রোমাঞ্চকর অদৃশ্যলোকের কোন এক অজানা শক্তির গোয়েন্দার কথা বলা হয়েছে এ কাহিনীতে। ঘটনাটি সত্য।



ছিদ্রানুগী ইন্দ্রনাথ ।

অদীশ বর্ধন

‘গোয়েন্দা আমরা প্রভে‘কেই’, দাঁতে কামড়ানো চুপের ফাঁক দিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে নেল ইন্দ্রনাথ । ‘প্রাত্যহিক জীবনে কে গোয়েন্দা নয় বলতে পারো ?’

চাইনিজ প্রিন্স পল পাথার নৈরদ্র করেছিল কাবিতা সাদা বাংলায় চিংড়ি পলোডা । পাকস্থলী পরিপূর্ণ হওয়ার পর শুরু হয়েছে নির্ভেজাল খাড্ডা ।

‘ময়ে-গোয়েন্দা’ অংশ ঘরে ঘরে সোণামীদের ওপর নজর রাখার সময়ে, মুচকি হেসে চুটকি ছাড়ল কবিতা : ‘যেমন আগার ঘরে আমি গোয়েন্দা ।’

ইন্দ্রনাথ রসিক শব্দ মুড়ে ছিল না ! তাই একতাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে, ‘যেমন ধরো উকিল, ডাক্তার, আকসার, ব্যবসাদার, রিপোর্টার । হোয়াইট হাউসের ভিৎ কাঁপিয়ে ছাড়ল হুজুর রিপোর্টার । গিয়েছিল চুরির ঘটনার ধোঁজে—পেলে সাপের সন্ধান । শুরু হল গোয়েন্দাগিরি । টেলিফোনে খবর নিতে হবে ? প্রশ্ন করে চুপ করে থাকে দশ সেকেন্ড । জবাব না এলে বুঝতে হবে প্রশ্নের জবাব হবে ‘হ্যাঁ ?’ টেলিফোন ও বখন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াল, তখন হোয়াইট হাউসের ‘কেউকেটা’-টির সঙ্গে দেখা করার স্তোত্র জানানো হত ঝুল বারান্দায় কোনে ফুলদানি বসিয়ে । দেখা লাক্ষাতের সময় জানানো হত পরের দিনের নিউইয়র্ক টাইমস-এর ২০ নম্বর পৃষ্ঠায় । সেই পৃষ্ঠার ঘড়ির কাঁটা একে গোপন সংবাদদাতা জানিয়ে দিতেন কোথায় কখন দেখা

পাওয়া বাবে তাঁর। আস্তব, তাই না? গোয়েন্দা সাংবাদিকের দৌলতেই সিংহাসন-চ্যুত হলেন বহু কু-কর্মের নায়ক প্রেসিডেন্ট নিকসন।'

আমি বললাম, 'নতুন কথা কিছু শুনি না।'

ভূত তুলে ইন্দ্রনাথ বললে, 'নিকসনের ছিদ্র অবেষণ করে শুধু একখানা বই লিখেই বব আর কার্ল আজ পর্যন্ত শিটেছেন এক কোটি চোদ্দ লক্ষ টাকা। বই লেখার আগেই প্রকাশকের কাছে পেয়েছেন পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার। প্রেরা পত্রিকা লেখাটা ছেপেছে ত্রিশ হাজার ডলার দিয়ে। ফিল্ম প্রোডিউসার গিনেমা করবেন বলে দিয়েছেন সাড়ে চার লক্ষ ডলার। পেপার ব্যাক বার করার অন্তে নালাম করে বইটার দাম তুলে দিয়েছেন চল লক্ষ ডলার পর্যন্ত। পুলিশের পুরস্কার পর্যন্ত পকেটে পুরেছেন ঠাৱা। যুগাক-ইচ্ছে যায় আমার কেসগুলো বব আর কার্লের হাতে তুলে দিই। কলমের জোর থাকলে কি না হয়।'

মাথা গরম হয়ে গেল আমার : 'নিজেকে বিরাট মনে করছিল মনে হচ্ছে? আমার না হয় কলমের জোর নেই, তোরও গোয়েন্দাগিরির জোর এমন কিছু নেই যে রাতারাতি পৃথিবী বিখ্যাত হবে। এত অহংকার ভাল নয়। পতনের পূর্ব লক্ষণ।'

যেন স্তন্যেই পায় নি, এমনি ভাবে জানালা দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে ইন্দ্রনাথ আত্মগতভাবে বলে চলল, 'যত ভাবি, ততই অবাক হই। গোয়েন্দা কে নয়? সব মাল্টিই নিজের নিজের পেশায় অল্প 'বস্তুর গোয়েন্দা। চিন্তাকে যে ডিম্বাশ্রমে আনতে পেরেছে, বুদ্ধিকে যে একাগ্র করতে পেরেছে, পর্যবেক্ষকে যে প্রয়োগ করতে পেরেছে—গোয়েন্দা হবার যোগ্যতা তাঁর মধ্যে আছে। ভাল ডাক্তারকেও ফাঁদ পেতে বোগকে লঙ্ঘন করতে হয়। এই রকম একটি চরিত্র থেকেই শার্লক হোমস এবং সুবিখ্যাত ডিটেকটিভ মেমডের সৃষ্টি করেন কোনান ডয়েল। অফিসার যদি অন্ধ হয়, কারবারী ভোগা বুদ্ধি হয়, তাহলে লুঠেরা জোচ্চোররা ছাদনেই রাজ্য হয়ে বসত। বুদ্ধির লড়াই চলছে সর্বক্ষেত্রে। এরকম টুকটাক অনেক ঘটনা আমার জানা আছে। অফিসার নিজেই গোয়েন্দা হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছে কোম্পানীর।'

'তা টিট', সায় দিল কবিতা : 'প্রবন্ধকরা ছুট জীবাপুর মতই কিলবিল করছে আশেপাশে। যে যত ভাল গোয়েন্দা, সে তত নিরাপদ। কথাগুলো দাম্য কথা সন্দেহ নেই; কিন্তু আমার নিরীহ সোয়ামীকে ঠেস দিয়ে কথা বলার ঠিক দরকার বলতে পারো?'

'কেন বলব না বলতে পারো?' চুকট নামিয়ে বলল ইন্দ্রনাথ, 'স্ট্যানলী গার্ডনার, সিরিল হোয়ার—এঁরা প্রত্যেকেই পেশায় ডাকল। তাই তাঁদের গোয়েন্দা গল্পে অত ধার। কোনান ডয়েল, নীহার গুপ্ত পেশায় ডাক্তার—তাই লেখাও সুবধার। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, জি-কে চেস্টারটন সাহিত্যের শত্রুটি—গোয়েন্দা গল্পেও তার আভাস। কিন্তু আমাদের যুগাক রায়েক কি গুণ আছে বলতে পারো। না, না, চটলে

চলবে না। গুণীর কাছে প্রশস্তির চেয়ে সমালোচনার কদর বেশি।’

‘কিন্তু এর নাম ছিত্রাশ্বেষণ—সমালোচনা নয়।’ মুখ টিপে হেসে বলল কবিতা।

‘ছিত্রাশ্বেষণ করাই নে, আমার কাজ।’ চুকট ফের কামড়ে ধরে বলল ইন্দ্রনাথ।
‘নিশ্চিত চক্রান্তে ছিত্রা খুঁজে বার করার সাধু নাম হল গোরেন্দাগিণি। ‘সত্য’ আর ‘ছিত্র’ এক্ষেত্রে একই টাকার এপিঠ ওপিঠ।’

মুখ লাল করে বললাম, ‘এ শোধ আমি তুলব, ইন্দ্র। এখন থেকে তোকে ‘ছিত্রা-শ্বেষণী’ ইন্দ্রনাথ বলেই চালাব—‘সত্যাশ্বেষণী’ নয়।’

অটু হেসে বললে ইন্দ্রনাথ, ‘ভালই তো, তাতে এক টিলে ছ’শাখি মরবে। তোর ভাষার স্নায়বের অভাব প্রকাশ পাবে। আর, এতদিন বাদে আমার কপালে একটা খেতাব প্রস্তুত জুটবে।’

এমন সময়ে কবিতা বলল সবিস্ময়ে, ‘ওকি অবনীবাবু, নাক টিপে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?’

রাগ জল হয়ে গেল দরজার দিকে তাকাতেই। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অবনী চাটুসো দাঁড়িয়ে সেখানে। তর্জনী আর বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে টিপে আছেন বাঁ-নাকের বাম চিত্র। ‘প্ৰত্নাত্মিক কণ্ঠে, ‘দেখছি ডান ফুটোর নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা।’

তাৎক্ষণ হয়ে বললাম, ‘সে আবার কী?’

নাক ছেড়ে দিয়ে বাঁ-পা আগে বাড়িয়ে ধরে পরস্পর করলেন অবনীবাবু। বললেন, ‘শাস্ত্র তো মানেন না। মানলে এত দুর্ঘটনা দেশে ঘটত না।’ সকৌতুকে বললে ইন্দ্রনাথ, ‘ইডা আর পিজলার বাপার মনে হচ্ছে।’

ভীষণ খুশি হলেন অবনীবাবু: ‘যাক, জানেন তাহলে। শুভকর্মে চক্রনাড়ী প্রশস্ত। মানে, বাঁ-নাকে নিশেষ পড়লেই শুভকর্ম করা উচিত।’

‘এখন কোন্ নাকে পড়ছে দেখলেন?’

‘বাঁ-নাকে। সেইজন্তেই তো বাঁ-পা কেলে চুকলাম মশায়।’

‘অশুভ ঝগড়াটে পড়েছেন মনে হচ্ছে?’

টাক চুলকে বললেন অবনীবাবু, ‘আর বলেন কেন, একবারে নিশ্চিত প্রট মশাই—‘ক্যাডনডেলটাকে ধরেও ধরতে পারছি না।’

দুপাড়ে আমার পানে চাইল ইন্দ্রনাথ। বলল, ‘ছিত্রা খুঁজতে হবে তো? বলুন, বলুন, ছিত্রাশ্বেষণী হাজির।’

‘বলব কি মশাই, রাত দুটোর সময়ে সে কি উৎপাত! বন-বন-বন। বুঝছেন তো কিসের উৎপাত? টেলিফোন। টেলিফোন! যতক্ষণ মরে থাকে, ততক্ষণ খুঁমিয়ে চেয়ে জিগিরে বাঁচ মশাই। জাস্ত হলেই প্রাণাস্ত।’

‘যাক, যা বলছিলাম। রাত দুটোর সময়ে আবহাওয়া হল টেলিফোনের বাঁদবামি। ঠিক যেন খুঁড়ি কাশি। ইচ্ছে হল দিই বাটাতে এক ডোজ ‘স্পজি’, খাইয়ে।’

হোমিওপ্যাথি বিদেশ থেকে এসেছে বলে এত হেনস্থা করবেন না। গরু হারালে শুধু গরু খুঁজে পাওয়া যায় না। বাদবাকি সব হয়। মহাত্মা হ্যানিমান বলেছেন—

‘বাচলে। বা বলতে বাচ্ছিলান ভুলে গেলাম।...ও হ্যাঁ, নিশ্চয় প্রতি। রাত দুটো! টেলিফোন। ঘুম ভাঙতেই তেড়েমেড়ে বিসিভার খামচে পরে চেষ্টা করে উঠলাম, ‘কে? এত রাতে কিসের দরকার?’

অমনি মিষ্টি গলায় তোংলা স্বরে ককিয়ে উঠেছিল একটা মেয়েছেলে : ‘অবনীবাবু? বা-বাচান! ওরা আ—আ—আমাকে কিডগ্রাপ করতে আসছে।’

‘সে এক জালা মশায় ভগবান তোংলাদের মেয়েছেন। আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু কথা বলতে গেলে বলুন দিকি মাথা গরম হয় না?’

‘ঘাই হোক, হড়বড় করে তোংলাতে তোংলাতে মেয়েটা বললে, পার্ক টেবিলের দশতলার ক্যাট থেকে গায়েব করতে আসছে ডাকাওয়া। এক্ষুণ না এলেই নয়।’

কথার শেষ পর্যন্ত শোনা গেল না, কড়—ড—ড করে গেল লাইনটা কেটে। খাটম বোমা কাটিয়ে মরছি; অথচ টেলিফোনটা পর্যন্ত নিখুঁত শানাতে পারি না। মাইক্রো-স্কোপ আনাই বিলেত থেকে। ঘেমা ধরে গেল মশাই দেখে শুনে।

ওই রকম টেলিফোন পেলে চূপচাপ থাকা যায় না। দূরভাষিনীর মুণ্ডপাত করতে করতে খড়াচুড়া এঁটে নিলাম। পার্ক স্ট্রীটেই বগন বদলি হয়েছে, তখন পার্ক টেবিলে না গিয়ে তো থাকা যায় না। বেবোতে বাচ্ছি, এমন সময়ে আবার উৎপাত। ফের টেলিফোন।

এবার অবিকল সেই রকম মেয়েলি গলা। সেইরকম মিষ্টি, কিন্তু যেন সদিবসা—মানে আপনাদের ছেলেছোকরাদের ভাষায় সেন্সি। শুধু যা তোংলা নয়।

‘ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। প্রথম মেয়েটার নাম হিমি, দু-নম্বর মেয়েটার নাম হিমা। হিমি নাকি হিমার ছোটবোন। হিমা কান্না কান্না গলায় বললে, এখুনি নাকি হিমিকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে মেয়ে চোরেয়া। ঠিকানাও বলে দিল। একই ঠিকানা। পার্ক টেবিলের দশতলা।’

দুজন সেনাই আর একজন অফিসারকে নিয়ে ছুটলাম তত্বনি। নিজের বাস্তা। পার্ক স্ট্রীটে অবশ্য রাত বলে কিছু নেই। দশতলা পার্ক টেবিলের সামনে আসতে না আসতে দেখলাম, সত্যি সত্যিই একটা মেয়েকে কাঁধের ওপর তুলে বেরিয়ে আসছে একজন গোয়ার ক্রাসের লোক। পেছনে আরও দুজন। ওরা এসে দাঁড়াল একটা উইলিঙ্গ জীপের সামনে।

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে মোড় ঘুরল আমার জীপ। ফুল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। টহলদারি পুলিশ কার্য হলে অত জোরে জোরে ছুটত না। খড়্‌বাজ মেয়েচোরেয়া তা বুঝেই বোধহয় মেয়েটাকে ছুঁপাতে কলেই ঢুকে পড়ল পার্ক টেবিলে।

মহা কাপরে শড়লাম তাই দেখে। মেয়েটাকে সামলাবে না ঝাউনড্রেনগুলোর পেছনে দৌড়াবে। বুড়ো বয়েসে আমি তো আর ছুটে পার না। পার্ক টেরে বাড়িখানাপ চাউখান কথ্য নয়। ফ্রাটের সংখ্যাই তো আড়াইশত। শয়নান তিনটে কোথায় পুড়িয়ে আছে দেখতে হলে আরো সেপাই চাই। আমি তাই মেয়েটাকে ঘোঁরে চাটিয়ে একজন সেপাই নিয়ে ফিরে এসাম খানায়। পরে তান ভাঁও সেপাই পাঠলাম বটে—কিন্তু ওদের আর টিকি দেখতে পেলাম না। উইলীও জাঁপটাও নাকি চোরাহ জাপ

চুলোয় খাও স কথ্য। কানাদেও শুধু হল খানায় ঢুকলেই দেখি কি আমার অফিস ঘরে বসে আবকল, নেহরকম চেহাওয়ায় একটা মেয়ে। বলব কি মশাই, ঠিক বেশ সন্দেশের ছাচে তৈরি মুখ চোখ। যমজ। বুকেছেন? বোমা, অমন চোখে বড় বড় করে শাকও না মা। আরো আছে। শেষকালে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতেও পারে।

অজ্ঞান মেয়েটার জ্ঞান ফেরানোর ব্যবস্থা করলাম। যমজ বোনের পরিচয়ও পেলাম। হিম আর হিমা। বড় গোঁফের মেয়ে মশাই। শত্রে আতুরে চেহারা। আইবুড়ো। অথচ বাপ এখনই দশভ্রা বাবোতলা বাড়িতে একটি ফ্রাট কিনে দিয়েছেন। ব্রাহ্মানির খেল, তো, বলবার কিছু নেই মেয়েগুলও হয়েছে তেমনি।

মক্কগে! ওদের কথা শুনব বলে বসতে না বসতেই রাতবিবরেতে আর এক আপদ বলুন দিক, কি আপদ? কল্পনাও করতে পারবেন না, মশাই। মুগাকবাবু অবস্থা আমাকে নিয়ে ঠেসে কারিকচার লিখছেন, কিন্তু বললে রাগ করবেন জানি ওঁর কল্পনা শক্তিও তো তেমন নয়।

খোনার মুখ তার হল কমন? আসল কথানা বলে বাজে কথা বলছি বলে? বুড়ো হয়েছি তো। বিটায়রের সময় হয়ে এল। ওং এন্টু ফালতু কথা বলে ফেলি। কিছু মনে কোর না। কি বলছিলাম? ও ঠাণ্ডা আর একটা আপদ। ধরতে পারেন নি তো কি খানায়? মেয়েছেলে মশায়, আর একটা মেয়েছেলে! ভোর চারটের মধ্যে হস্তদন্ত হয়ে খানায় ঢুকল আর একটা মেয়েছেলে। অকল অল্প দুজনের মত দেখতে।

বললে পত্রায় থাকেন না মশায়, খানাসুদ্ধ লোক বোমক গেল তিন তিনটে একই চাঁচর সন্দেহ দেখে। সরেশ সন্দেহ। কিন্তু এরকম কাণ্ড কখনো দেখেন হোল লাইফে। যমজ পশন্ত দেখে ছ, কিন্তু—কিন্তু তিনটে মেয়ে একই ডিম ফুটে বেরোন কি বলা উচিত মুগাকবাবু—যমজ! ঠিক, ঠিক। যমজ! যমজ বোনই বটে। নামও শুনলাম তিন নববের। হিমু, মানে, হিমি, হিমা আর হিমু হল তন বোন। তিনজনবই তিনটে খানখানি ফ্রাট। তিনজনই আইবুড়ো। তিনজনই ফ্রাটে

পৌঁচেছে অনেক রাতে গ্রাণ্ড হোটেলের বিউটি কনটেই থেকে। তিনজনেই ড্রেসিং টেবিলে একটা করে চিঠি পেয়েছে। তিনজনের চিঠিতে লেখা আছে— বাপের পকেট থেকে লাখখানেক টাকা খসিয়ে না আনলে, খাঁচায় পোরা হবে সেই রাতেই। রাজী থাকলে জানলায় টচের আলো জ্বলে রাখতে হবে এক মিনিট—রাত ঠিক দুটোর সময়ে।

‘রূপকথা শোনাচ্ছি, ভাববেন না যেন। বাস কলকাতায় এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা মোহন সিংজকেও টেকা মারতে পারে মশাই।

‘সাক্ষ্যপাঞ্জা শুধু রোমাঞ্চের পাতায় কেন, এই শহরেই আচ্ছাদিত পাবেন। হিমি হিমা, হিমুর কাহিনীও স্ট্রেন্ডার ছান ফিকশন। মানে তিন তিনটে বাচেলার যেনে— বাচেলার কিনা ভগবান জানেন—একা একা ফ্লাটে থাকে—বাপ মা অল্প বাড়িতে কুঁতি করে নাগর নাগরী নিয়ে—এ ভাবা যায় না!

‘এই দেখুন আবার আলতু ফালতু বকতে আরম্ভ করেছি। দেখছি আমার নিজেরই ব্যাং—কার্যত খাওয়া উচিত। হোমিওপ্যাথি ওষুধ মশাই, বাচালতার দাওয়াই মশাই।

‘সাক্ষ্যে আবার সব গুলিয়ে গেল। ও ই্যা...হিমা আর হিমু চালাক যেনে। চিঠি পেয়েই টর্চ জালিয়ে সন্ধান করেছে জানালায়। হিমি করে নি। তবে ভয়ের চোটে সটান ফোন করেছে আমাকে। তারপর টেলিফোন পেয়েই ওরা দুজনেই ছুটে এসেছে খানায়। এবার শুধুন, আসল কারবারটা।

‘তার আগে মালম্ভী, একটু চা-টা হবে; কফি-টফি না হলে গলাটা ইদানিং বড্ড শুকিয়ে যায়। আদর্শ? বেশ! বেশ! মালম্ভী বামাদের সাক্ষ্য শচী দেবী—মুগাঙ্কবাবু ভগবান বাক্তি। আমার গিন্নীটি হয়েছে বেয়াড়া টাইপের। কেউ চা চাইলেই এমন মুখখানা করবে, যেন ঘরে চিনি নেই।

‘গেল বা। আবার অল্প লাইনে চলে এসেছি। সেদিন একটা আমেরিকান নাটক দেখলাম মশাই। আমার হয়েছে ঠিক সেই অবস্থা। এক বুড়ো এক বুড়ি। দুজনেরই দ্বিতীয় বিয়ে। দুজনেই খালি ভুলে যায়। দুজনেই এক পার্টনারের স্মৃতি, আরেক পার্টনারের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। আমার হয়েছে.....

‘ধুস্তোর! কি বলছিলাম? ও ই্যা...আসল কারবারটা। আসল কারবারটাই বলা হয়নি এতক্ষণ। হিমি হিমা আর হিমুর মা’টি হলেন আর এক শচী দেবী! এই...এই...এই জ্ঞানো না! কি বলতে কি বলে ফেললাম ইন্ডিয়ান শচী দেবীর একটা মন্ত দুর্নাম আছে, জানো তো? যখন যায়, তখন তার। পুরোন ইন্ডকে হঠিয়ে স্বর্গটা যে দখল করবে, শচী দেবী হাসি হাসি মুখে অমনি তার হৈসেল ঠেলতে আরম্ভ করে দেবেন। হিমি, হিমা, হিমুরা জননীটি অনেকটা তাই। মানে সোলাইটি গার্ল। গার্ল এককালে ছিল—এখন পাক্সা লেডী। ফাংগন, মিটিং, পার্টি নিয়েই ব্যস্ত।

স্বামীর নাম? এখনো বলি নি? হাঁঃ, হাঁঃ! এই জন্মেই বোধ হয় ডি. সি. পোর্টে প্রমোশনটা আটকে গেল আমার। ভদ্রমহিলার স্বামী কারবারী। কোচিন খেঁচে নারকেল এনে কলের ঘানিতে নিয়ে তেল বাব করে সাপ্লাই দেন নানান কোম্পানিতে। বি, এম পি তেলের নাম শোনেন নি? খাটি নারকেল ভেল বলতে আর কেউ নেই এখানে।

‘কোটি কোটি টাকাঃ মালিক হওয়ার পর ভদ্রমালিকের মতিভ্রম হয়েছে বোধ হয়। বিশেষ করে প্যালালিসিসে কোমর থেকে নিচু পর্যন্ত অবশ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মাথায় নাকি ভুত চেপেছে। অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যবসার পারিকল্পনা ফাঁদছেন। মানে শেষ পর্যন্ত কারবারটাকে তুলে দেওয়ার মতলব আর কি।

‘একটা প্রান শুনবেন? কোচিন আর সিলোন থেকে জাহাজ ভর্তি নারকেল এনে নাকি শোষাচ্ছে না। ঠিক করেছেন, চাষ করবেন নিজের দেশেই। সুন্দরবনে নারকেল ফলিয়ে দেশের চেহারা পাল্টে দেবেন। হাসবেন না! হাসবেন না প্রানটা একেবারে অবাস্তব নয়। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা বাঁধবে কে? পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের পায়ে রিজার্ভ ফরেস্ট আছে, সেখানকার নোনা মাটি আর আবহাওয়া নাকি নারকেল চাষের উপযুক্ত। উনি ঠিক করেছেন যেখানে একলাখ নারকেল চাষা লাগাবেন। মোটামুটি আট থেকে দশ বছরের মধ্যে ফল দেন এক একটা নারকেল গাছ। গাছ যতদিন বাঁচবে, ফলও ততদিন মিলবে। একলাখ চাষার মধ্যে পঁচাত্তর হাজার চাষাও যদি বেঁচে থাকে, মন্দ কি? গাছ পিছু বছরে মাত্র একশ’ টাকা নারকেল ধরলেও, বছরে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা নীট লাভ।

‘কিন্তু পঁচাত্তর লক্ষ টাকা? নারকেল তেল, নারকেল দড়ি ইত্যাদির জন্মেও কলকারখানা গড়ে তোলা যাবে খানে। ফলে, সুন্দরবন অঞ্চলের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। সুন্দরবনে হঠাৎ ক্রাইম বেড়ে যাওয়ার কর্তাদের গরম মাথাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। হাতে পয়সা এলে চুরি ডাকাতির সাধ কার বা থাকে বলুন?

গভর্নমেন্ট প্রকল্পটি লুকে নিয়েছেন। রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে জমিও দিয়েছেন! তাতেই লেগেছে গৃহ বিবাদ। মানে, বি এম পি অয়েল মিলের মালিক সনাতন প্রসাদের সঙ্গে তার বিবাহ বিবি অহল্যার।

নাথানা শুনেছেন? অহল্যা! মেয়েদের মুখে সুনাম মা নাকি সত্যিই অহল্যা—রূপের দিক দিয়ে। বাবা শুই ছন দেখেই টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিলেন অহল্যাকে। মেয়েদের জোলুখ দেখলেই অবশ্য খানিকটা আঁচ করা যায়। কিন্তু মায়ের ছিটে ফোটাও নাকি ওদের বরাতে জোটেনি।

কি বলছিলাম মা লক্ষ্মী? কর্তা-গিন্নীর ঝগড়ার কথা তাই না? সুন্দরবনে নারকেল চাষ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই গিটিমিটি লেগেছে বাপ-মায়ের মধ্যে—বলল স্বমজ মেয়রা। সনাতন প্রসাদ নাকি নিজে তো মরতে বসেছেন, মরার আগে কারবার

পশুস্ত্র মেয়ে যাবেন। থাক্গে, সে সব ঘরোয়া কেছা। মেয়ে তিনটের ওপর এই সময়ে নেকনজর পড়ল কোন হারামজাদাদের, জানবার জন্তে শুক করলাম তদন্ত। সে রকম তদন্ত, কিছু মনে করবেন না ইন্দ্রনাথবাবু, আশীর্বাদ পারবেন না। অত ব্যক্তি শইচার ক্ষমতা আপনাদের নেই। মুগাকবাবু অবিখ্যাত রুটিন তদন্ত বলে যথেষ্ট বিদ্রোহ করেন আমাদের পদ্ধতিকে। কিন্তু রুটিন তদন্ত একবার করতে আসুন না। কাছা খুলে যাবে।

‘তদন্তের ফিরিস্তি দেবেন না। তবে কি জানেন, তদন্তই সার হল। বজ্র আটুনি ক্ষমতা গেরোর মত আর কি! মেয়ে তিনটিকে কিছুতেই ফ্লাট থেকে সরানো গেল না। সনাতন প্রসাদের স্পেশাল রিকোর্ডেস্ট কনস্টেবল বসিয়ে রাখলাম ফ্লাটের গোড়ায় দিন কয়েকের জন্তে। কিন্তু সাতটা দিনও গেল না।

এবার আসছি আসলে আসল বাপারে। রিয়াল মিষ্টি এইখানেই। কান খাড়া কবে শুনুন মুগাকবাবু। দয়া করে, নেস্টট গল্পে আমাকে একটু ক্রোডট দেবেন।

সনাতন প্রসাদের ফ্যাক্টরিতে কিছুদিন আগে বিদ্রোহী লেবার মুভমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। জানেন তো, আশ্চর্যকর অমিত-কর্মচারীরা কোম্পানির ভবিষ্যৎ নিয়েও ভাবে। ম্যানেজমেন্টকে যা খুশি তাই করতে দেয় না। ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিং করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

সনাতন প্রসাদ তার ধার ধারেন নি। সুন্দরবনে নারকেল চাষ প্রক্ষেপে সরাসরি লরকারের সঙ্গে চুক্তিতে নেমেছেন। ফলে, আতঙ্ক দেখা দিয়েছে কারখানায়। লীডারও কিছু না পেলে লেবার ভাড়াতে পারে না। এই ইস্যু নিয়ে ওরা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করল কারখানায় যে, সনাতন প্রসাদের প্রাইভেট কোয়ার্টারের সামনে সি-আর-পি বসাতে হল চৌপরিদ নরাত।

আরও খবর পেয়েছি মশাই। অহল্যা দেবী নিজের নাকি কারখানার লোককে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। লীডারকে ডেকে উল্লেখ দিয়েছেন। উদ্বেগ, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। অমিতদের চাপে যেন স্বামীর ভড়কে যান এবং নারকেল চাষ শিকিয়ে তুলে রাখেন। বড় ঘরের বড় ব্যাপার। দেবে দেবে চাপ পড়ে গেল।

হঠাৎ হিমা—হিমা—হিম্বর কেন্দ্রে টেকআপ করার সাত দিন পরে, একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। সেদিন রাতে একটা বিদ্রোহী বাড়িতে নেমন্ত্রণে গিয়েছিলেন অহল্যা দেবী। আশ্চর্য বাড়ির নেমন্ত্রণ। বাতরিতে লগ্ন। তাই ঠিক করেছিলেন, ভোররাত্তে ফিরবেন। রাত ন’টার সময় সেজে গুঞ্জে নিচে নেমেছিলেন। কারখানার পাশেই গুন্ডের কোয়ার্টার। সি-আর-পদের বলেছিলেন, কর্তা একলা রইল। যেন একটু নজর রাখা হয়। আঙুল তুলে দেখিয়েছিলেন, আলো জলছে তিনতলায়। বলেছিলেন, ‘একটু বরং দাঁড়িয়ে যাই। আলো নিভিয়ে উনি শুয়ে পড়লে যাব।’ ড্রাইভারও দেখেছে আলো জলছে। তারপর সবার সামনেই আলো নিভে গেল। অর্থাৎ

সনাতন প্রসাদ মাথার কাছে বেডহুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘুমের আয়োজন করছেন। তিনতলার আর কেউ থাকে না—আলসেসিয়ান কুকুরটা ছাড়া। সনাতন প্রসাদ কাউকে বিশ্বাস করেন না রাতে—কুকুর ছাড়া।

অহল্যা দেবী তিনতলায় দরজায় নিজে চাবি লাগিয়েছেন। একটা চাবি ছিল ভেতরে—সনাতন প্রসাদের বাচ্চিশের জন্য। দরজায় ইয়েল লক লাগানো। একবার চাবি লাগালে নিশ্চিন্ত। বিষে বাড়ি যাচ্ছেন বলে কাছে হাণ্ডবাগ রাখেন নি। তাই চাবির গোছা রাখতে দিয়েছিলেন ড্রাইভারকে। বিদুষী বিবি তো—অস্ট্রিডেট লেডী। আঁচলে চাবি বাঁধলে ইজ্জত চলে যায়।

পরের দিন সকালবেলা কুকুরের হাঁকডাকে চমকে উঠল চাকর-বাকর দাবোয়ান থেকে আরম্ভ করে সি-আর-পি পর্যন্ত। চাকরবাকররা দোকান থেকে ছুটে গেল তিনতলায়। সবাই শুনে, আলসেসিয়ান কুকুরটা ভেতর থেকে দরজা আঁচড়াচ্ছে আর ভাষণ চোঁচাচ্ছে। কোনদিন কিন্তু এভাবে চোঁচায় না সে।

আচ্ছা জানা তো। দরজা খোলারও উপায় নেই। চাবি নেনসাহেবের কাছে। ঘরে আলো জ্বলছে। কিন্তু সাহেব তো কুকুরটাকে পমক দিচ্ছে না।

ভোর ছটায় এসে পৌঁছিলেন অহল্যা দেবী। কুকুরের হাঁকডাক শুনে আর দরজার সামনে চাকর-বাকরের জটলা দেখে ড্রাইভারের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুললেন। কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন কাঁড়বের দিকে। তারপর ফিরে এসে গেলেন বেডরুমে।

চাকরবাকররাও ছুটে গেল চিংকার শুনে। দেখল, সনাতন প্রসাদ মরে কাঁঠ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়। চোখ খোলা। মুখের ওপর মাছ উড়ছে।

জানেন তো, মরা হাতির দাম লাখ টাকা। ডাক পড়ল—ই ঘাটের মড়। অবনী চাটুঘোষ। চুলচেরা রুটিন তদন্ত করে তো মশাই বিলকুল ভাবাচাকা খেয়ে গেলাম। ঘর বন্ধ। চাবি ড্রাইভারের কাছে। আর একটা চাবি সনাতন প্রসাদের বাচ্চিশের তলায়। বিষে বাড়ির সবাই সাক্ষী—অহল্যা দেবী আর ড্রাইভার দুজনেই বাড়ি ছেড়ে নড়েননি। সনাতন প্রসাদেরও বিছানা ছেড়ে ওঠার ক্ষমতা নেই। বড স্ট্রাইচ টিপে না হয় আলো নিভিয়েছেন রাত নটায়। কিন্তু আলোটা জ্বলল কে সাগরাত আলো জ্বলেনি—সি-আর-পির সাক্ষী। ভোরবেলা বন্ধ ঘরে আলো জ্বলল কে? সনাতন প্রসাদ? কি যেন বলেন! তিনি তো তখন মরে ভূত। ময়না ওদন্তে দেখা গেল, তিনি হার্টকেল করছেন রাত নটায় থেকে দশটার মধ্যে। মানে আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর ঘুমের মধ্যেই শরীর ত্যাগ করেছেন! আলো তাহলে জ্বলল কে? ভূত? আলসেসিয়ানের পক্ষও সম্ভব নয় দাঁতে কামড়ে আলো জ্বালানো। সেক্ষেত্রে স্ট্রাইচ দাঁতের দাগ থাকেই। মনিব মারা গেছে বুকেই সে দরজা খুলতে চেষ্টা করেছে, চেষ্টা-রহে—স্ট্রাইচ টিপে আলো নিভয় জ্বালানি। কে টিপল স্ট্রাইচ? তবে কি সি-

আর-পি'রা মিথ্যা বলেছে? আলো সারারাত জ্বলছিল, কিন্তু বাটারা ঘুমোচ্ছিল বলে দেখিনি? এখন মানতে চাইছে না?

একটা স্ট্রোকের ফলেই শুয়ে পড়েছিলেন সনাতন প্রসাদ। চিন্তা ভাবনাও ইদানিং খুব বেড়েছিল। হার্ট আর অত ধকল সহিতে পারেনি। ফাইনাল স্ট্রোকটি শেষ হয়ে গেছেন। বিধাতার কি লীলা! এত টাকার মালিক! মৃত্যুশয্যায় মুখে জলটুকুও পেল না। কারও দেখাও পেলনা। তা না হয় হল, কিন্তু আলোটা জ্বাল কে?

না, না, যা ভাবছেন তা নয়। আলো যে জ্বলছে, তার নাম জানতে আমি আসি নি। শোনাতে এলেছি। বুঝলেন না? কে আলো জ্বলছে, পুলিশ গোয়েন্দারা ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না, আশাদেরও ব্রেন আছে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, কারখানার ওয়ার্কস ম্যানেজারের সঙ্গে অহল্যা দেবীর একটু গুপ্ত প্রণয় ছিল। ভ্রলোক খুবস্বয়ং। বিলেত ফেরত, ব্যাচেলার। আর কি চাই বলুন? আরো খবর পেয়েছি—পতিদেবতাকে রোজ স্বহস্তে ওষু খাওয়াতেন অহল্যা দেবী। এ ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করতেন না সনাতন প্রসাদ। সুনবেন আরও? সনাতন প্রসাদের হার্ট হোচট খেয়ে খেয়ে চলছিল বলে একটা ওষু দেওয়া হত আর পাঁচ ফোঁটা মানে অমৃত, দশ ফোঁটা মানে বিষ—হার্টের রুগীর পক্ষে। মোহাই মুগাকবাবু, ওষুটার নাম ডিজেস করবেন না। আপনারা—লেখকেরা বড় অববিবেচক হন। যা সুনবেন তাই লিখবেন, তারপর আরো একশোটা খুনের কেস নিয়ে নাকের ভলে চোখের ভলে হতে হবে আমার মত অনেক বান্দাকে। একটু বুঝে-সুঝে লিখবেন মশাই। জানেন তো শতং বম মা লিখ।

আচ্ছা মুশকিল তো, আবার বে-কটে চলে গেলাম। আসল কথাটা তো বলি নি। বিয়েবাড়িতে ষাওয়ার আগে কর্তা-গিন্নীতে বেশ খানিকটা বচসা হয়েছিল, চাকব-বাকবরা সনেছিল। চড়া গলার ধমক দিয়েছিলেন সনাতন প্রসাদ। অহল্যাও হুকথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরই সেজেগুজে হোল নাইট বাইরে থাকবেন বলে বেগিয়ে গিয়েছিলেন অহল্যা। ষাবার আগে সেই ওষুটা খাইয়ে গিয়েছিলেন কর্তাকে রোজকার মত রাত ন'টায়।

‘এখন কথা হচ্ছে, ক’ ফোঁটা খাইয়েছিলেন? আমি বলব দশ ফোঁটা মানে সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিলেন সনাতন প্রসাদ। প্রমাণ এখনও পাইনি, কিন্তু বিষয় মানে বিষ—বিষয়ের লোভে সবই সম্ভব। আর এখানে তো নাগর জুটেছে। ঘরে পঙ্গু স্বামী কাঁহাতক আর সহ করা যায়? স্তবরাং পতিদেবতাকে তিনি সরিয়ে দিয়েছেন ধরে নিলাম। কিন্তু আলোটা কিভাবে জ্বললো সেইটাই তো বুঝতে পারছি না।’

দাঁড়ান, দাঁড়ান, এখনো শেষ হয়নি। আরো একটা জবর খবর শুনিয়ে দিই। শোনবার পর কিন্তু চোখ জুটো কোটির থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারে মা লক্ষী। সাবধান! সাবধান!

হিমি, হিমা—হিমু, এই সময়কে ফ্ল্যাট থেকে লোপাট করার যড়যন্ত্রটি কে এঁটেছিল জানেন? কল্পনা কখন তো। পারলেন না তো? দুয়ো দুয়ো! স্বয়ং গর্ভধারণী মশাই। অহল্যা দেবী নিজে লোক লাগিয়ে মেয়েদের লোপাট করতে চেয়েছিলেন। কেন? কেন—আবার মেয়েরা কোন গতিকে জেনে ফেলেছিল মায়ের হাতে বাবার জীবন বিপন্ন হলেও হতে পারে। অথচ সবাইকে বলা যায় না। তাই ওরা ঠিক করলে আবার দোর পরবে: অহল্যা দেবী ফোলে শিরায় শিরায়। মেয়েদের মতলব টের পেয়ে পুলিশের নজর অন্তরিক দৃষ্টিতে ঘুরিয়ে দেবার জ্ঞান ইচ্ছে করেই মেয়েদেরকে গায়েব করতে আরম্ভ করলেন। আসলে পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। অর্থাৎ সেই রাত্রে আমাকে স্নেহ বোকা বানিয়ে ছেড়েছেন অহল্যা দেবী তার ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে। মেয়েরাও বিহ্বল হয়ে পড়ল হঠাৎ সেই উৎপাতে। বাপের কথা খেয়াল রইল না।

তার সাতদিন পরেই কাজ হাসিল করে ফেললেন অহল্যা দেবী। তিনি জানেন, মেয়েরা বাপকে বাঁচাতে চেয়েছে ঠিকই, কিন্তু মাকে ফাঁসাতে চায় নি। পুলিশের লোক কাছে এলেও তারা মায়ের নাম করত না। বাবা মারা যাওয়ার পর তো আরো বাব' হয়ে যায়। সনাতন প্রসাদ মারা যেতেনই, না হয় দু'দিন আগেই তাঁর কষ্ট খুঁচিয়ে দেওয়া হল। মাকে ফাঁসিয়ে ঘরোয়া কেলেকারী ফাঁস করে আর লাভ আছে কী? বলব কি মশায়, গোটা ফ্যামিলিটাই যেন কেমনতর। সব ছাড়া ছাড়া। অথচ তালে ছাঁশয়ার। মা থেকে মেয়েরা পর্যন্ত কেউ একটি কথা ফাঁস করেনি। কিন্তু আমার নাম অবনী চাটুয্যো। ঠেঙিয়ে নকশালি তাড়িয়ে। কি বললেন? খুব বাহাদুরি করেছি? চাকরি মশাই চাকরি! চাকরি করতে গেলে নিজের ছেলেকেও মাটিতে পুরতে হয়, নকশাল তো ছায়!

এখন বলুন, প্রতিটা নিশ্চিহ্ন কিনা। বেশ বুঝতে পারছি, সনাতন প্রসাদ এমান এমান মরেন নি। কিন্তু শালা কিছুতেই তা প্রমাণ করতে পারছি না। নিশ্চিহ্ন প্রতি একটা ছিদ্রও আবিষ্কার করতে পারছি না। একি গেরোয় পড়লাম বলুন তো? আলোটা কে জ্বলেছে, তা তো জানি। কিন্তু জ্বালাল কি করে তাইতো বুঝি না। বেশ বুঝছি, ছিদ্রটা ওইখানেই। ওই ছিদ্রটা আবিষ্কার করতে পারলেই ফাঁসিয়ে দেব অহল্যা দেবীকে।

ম্যারাখন বক্তৃতা থামতেই কবিতা বললে, ‘আপনার কফি জুড়িয়ে গেল। চাইনিজ প্রিন্স বালুগোলা পর্যন্ত ইটের গুলি হয়ে গেল।’

‘জ্যা! কখন এল এসব? বলানিতো।’ আংকে উঠে প্লেট ভর্তি চিংড়ি পকোড়া আক্রমণ করলেন অবনী চাটুয্যো।

‘বলতে দিলেন কই? স্বভাব মুখ খুলতে গেলাম, ততবারই তো দাবড়ানি দিয়ে থামিয়ে দিলেন।’

মুখ ভর্তি পকোড়া নিয়ে ঐ-ঐ-ঐ করে কি যেন বললেন অবনী চাটুয্যো, বোকা

গেল না।

হাসি চেপে ইন্দ্রনাথ বলল, ‘আন্তে আন্তে খান, বিষম লেগে যাবে। খেয়ে নিয়ে চলুন ঘরটা দেখে আসি।’

কোথ করে গিলে নিয়ে বললেন অবনীবাবু, ‘কার ঘর?’

‘সনাতন প্রসাদের।’

‘হা পোড়া কপাল! সপ্তাহও বামায়ণ শুনে নীতা কার বাবা! আরে মশায়, এখনো বুঝলেন না কটিন-তদন্তে আমরা কিছুই বাদ দিই না?’

‘কটি আর লুচির মধ্যে যা তকাং, আপনার তদন্ত আর আমার লুচি—না তদন্তেও সেই তকাং অবনীবাবু!’

‘মানে? মানে? মানে? এত অবিশ্বাস আমার ওপর কেন?’ বলেই থণাং করে আরো দুটো পকোড়া মুখ গহ্বরে ঠেসে দিলেন অবনীবাবু।

‘দেখবেন, হাসনালীতে যেন আটকে না যায়।’ বলল ইন্দ্রনাথ, ‘আপনি এত সূক্ষ্মর ভাবে সব কথা বললেন যে, অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই উঠে না। জলন্ত বর্ণনা যাকে বলে—আপনার বর্ণনাও তাই। বায়োস্কোপের ছবির মত সব চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি বলেই একটা খটমট জায়গা ভেরিফাই করতে চাই।’

মুখভর্তি পকোড়া চিবানো বন্ধ করে জিজ্ঞাস্য চোখে তাকালেন অবনীবাবু। ভাবখানা—খটমট জায়গাটা আবার কোথায় দেখলেন মশায়?

ইন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিলে, ‘অহল্যা দেবী বিষয়েবাড়ি থেকে এসে দরজা খুলেই কিন্তু বেডরুমে যান—যা সবাই যায়। উনি কুকুরটাকে নিয়ে করিডরে গেলেন কেন?’

চোখ দুটো আন্তে আন্তে চানাবড়ার মত করে ফেললেন অবনীবাবু।

ইন্দ্রনাথ আরো বললে, ‘উনি কি তা হলে জ্ঞানপাপী? উনি কি জ্ঞানভেদে শোবার ঘরে মৃতদেহ পড়ে রয়েছে? কুকুরের অস্বাভাবিক টেচামেচির পর দরজা খুলেই গুঁব উচিঁত ছিল অস্বস্থ স্বামীর কাছে ছুটে যাওয়া। কিন্তু কেন উনি করিডরে গেলেন, জানি গিয়ে দেখতে চাই।’

কর্ণনালী দিয়ে মস্ত ডেলাটাকে পাকস্থলীতে চালান করে দিয়ে বললেন অবনীবাবু, ‘একটু দাঁড়ান। আর মোট চারটে আছে।’

ইন্দ্রনাথ আগে থাকতেই শিথিয়ে পড়িয়ে রেখেছিল অবনীবাবুকে।

সনাতন প্রসাদের ঘরে ঢুকে তাই অবনী চাটুঘো সোজা চলে গেলেন বেডরুমে। অহল্যা দেবীকে আবোল তাবোল কথায় আটকে রেখেছিলেন সেখানে।

ইন্দ্রনাথ করিডরে ঢুকেই বাঁদিকে গেল। শেষ প্রান্তে একটা কাঠের বাস। আলসেসিয়ানের শোবার জায়গা। বাসটো তখন খালি। কুকুর বেরিয়েছে চাকরের সঙ্গে হাওয়া পেতে।

ইন্দ্রনাথ আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল, কি করতে হবে। তাই হেঁট হয়ে কাঠের

বান্ধটা সন্নিবেশে রাখল পাশে ।

বান্ধের তলায় একটা ময়লা লিথোলিয়াম পাতা । লিথোলিয়ামটাও তুলে ফেলল ইন্দ্রনাথ ।

তলায় একটা কাঠের পাটাতন লম্বায় একফুট, চওড়ায় একফুট, দেওয়ালের গা ঘেঁষে কাঠের ঢাকনির গায়ে পেন্সিল ঢোকানোর মত একটা ফুটো ।

ছিত্রপথে কড়ে আঙুল চুকিয়ে পাটাতনটা উঠিয়ে ফেলল ইন্দ্রনাথ । মেঝের চৌকণো গর্তে একটা বাথ বুলানো । ইলেকট্রিক মিটার আর বেন স্নইচের জবল সেখানে । হালফাসনের বাড়ি তো—দেওয়ালের গায়ে কিছু নেই ।

পকেট থেকে টর্চ বের করে খুঁটিয়ে দেখল ইন্দ্রনাথ । কাঠে ঢাকনির যেখানে ফুটো, ঠিক তার তলায় কাঠের গায়ে দুটো ছোট ছোট ছিত্র । বেন জু লাগানো ছিল । বেন স্নইচের মাথা থেকে দুটো তার বেরিয়েছে । একটা তারে কিন্তু ব্র্যাকটেপ জড়ানো ।

সমুপর্ণে ব্র্যাকটেপ খুলে ফেলল ইন্দ্রনাথ তার না ছুঁয়েই । তারটা সত্যিই কাটা । দুটো প্রায় জুড়ে ব্র্যাকটেপ দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে । বাথের তলায় ছোট্ট একটা টুকরো । সোনার ছিপির টুকরো ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রনাথ ।

ফিরে এল শোবার ঘরে । অহল্যা দেবী গালে হাত দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে শুয়েছেন অবশ্যবাবুর ফালতু বক্তৃতায় ।

ভদ্রনাথেরা নিঃশব্দেই অপূর্ব সন্দর্ভ । খুঁত কোথাও নেই । ব্যস হয়তো তিরিশ, মনে হলো মাঝো কম ।

ইন্দ্রনাথের দৈর্ঘ্যে বেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন অবশ্যবাবু । চোখের মধ্যে প্রস্রাব ফুটিয়ে জানতে চাইলেন—হল কিছু ?

গম্ভীর মুখে—বলকহান চোখে অহল্যা দেবীর পানে চেয়ে বলল ইন্দ্রনাথ, ‘নমস্কার, আপনার নাম ইন্দ্রনাথ রত্ন । পাইভেট ডি.টকটিভ । আপনার কাছে শুধু দুটি জিনিস চাইবে এলাম ।’

প্রতি নমস্কার করলেন অহল্যা, ‘বলুন’ ।

‘একটা কলংবেলের টোপা স্নুচ । আর একটা ছোট সোনার ছিপি’—নিমেষ মধ্যে নিরুচ্চ হয়ে গেলেন অহল্যা ।

অবশ্যবাবুর শানে ফিরে বলল ইন্দ্রনাথ, ‘এখন গ্রন্থার করতে পারেন ।’

আবার চিংড়ি পকোড়া । আবার কফি । সবগরম বৈঠক ।

ইন্দ্রনাথ বললে, ‘ছি ত্রা য়ে য়ী ছিত্র খুঁজতে গিয়ে সত্যি সত্যিই ছিত্র বের করে ফেলল ।’

‘কেনটা কিন্তু এখনো আমার কাছে পরিত্যক্ত হয় নি।’ উৎকট গম্ভীর হয়ে বললাম আমি।

‘ইহুসুসে হবে না। অবনীবাৰু নিশ্চয় প্লটের ছিটটা তার অজ্ঞানে গুনিয়ে দিয়েছিলেন। তোরা প্রত্যেকে গুনেছিস। আমিও গুনিছি। কিন্তু এই যে বললাম, যার চিন্তার ভিসি প্লেন, বুদ্ধির একাগ্রতা আর পর্যবেক্ষণ প্রয়োগ শক্তি আছে—সে ছাড়া গোয়েন্দা হওয়া কাউকে মাছে না। তাই নিশ্চয় প্লটের ছিট আমার মাথায় এসে গেল, তোদের মাথায় এল না।’ কবিতা একদম না বাঁটিয়ে ভাল মানুষের মত মুখ করে বলল, ‘হার মানছি ঠাকুরপো। কিন্তু আর সামনেস বেথো না। প্রেমার উঠে যাচ্ছে।’

প্রশ্ন হয়ে ইস্তনাথ বললে, ‘আমি এখানে বসে আঁচ করেছিলাম আলোর তারে এমন কিছু কারচুপি করা হয়েছিল যা অহলা দেবীর অসুপস্থিতিতে আপনা থেকেই আলো নেভাবে বা জ্বলাবে। ঘরের মধ্যে প্রাণী ছিলেন দুজন। সনাতন প্রসাদ আর কুহুর। সনাতন প্রসাদ চলৎশক্তিহীন এবং আলো যখন জ্বলছে বা নিভেছে—তখন তিনি মৃত। জীবিত-প্রাণী বলতে হইল শুধু কুহুরটা। কুহুরটার সঙ্গে আলো জ্বলা নেভার কোন সম্পর্ক নেই তো। অহলা দরজা খুলে ঢুকেই কুহুরটাকে নিয়ে করিডরে গেছিলেন কেন? করিডরেই কারচুপটা নেই তো? হতে পারে কুহুরটা না জেনেই পুশ বাটনে চাপ দিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছে, আবার জ্বলিয়েছে। কিন্তু নিভেছে স্বাক্ষে—কুহুরের শোবার সময়। জ্বলেছে তোহে—কুহুরের ওঠার সময়। তবে কি শোবার জায়গাটাতেই টেপা সইচটা আছে।

‘তাই তিন তলায় গিয়ে আমি আগে গেলাম করিডরে। দেখলাম, সত্যিই কুহুরের শোবার বাক্স রয়েছে সেখানে। সুসংবদ্ধ চিত্রা আর শৃঙ্খলাবদ্ধ যুক্তিঃ প্রথমটি যদি ঠিক হয়, পরেরগুলোও সঠিক হতে পারে। তাই বাক্স সরিয়ে দিলাম—কি—ক পেলাম তা আগেই বলেছি।

‘যেন সইচের একটি তার কেটে, সেই তারে বাড়তি তার জুড়ে এনে লাগানো হয়েছিল একটি টেপা সইচে। সইচটা জুড়ে লাগানো হয়েছিল কাঠের ডালার ছোট্ট ফুটোর ঠিক তলায়। সইচের ভেতরে কনটাক্ট প্লট দুটোকে হেঁচক দিয়ে বৈকসে এমন জায়গায় বাঁধা হয়েছিল, যাতে বাক্সের মধ্যে কুহুর শুয়েই ঢাকনি চেপে বসলে সইচের ওপর। কলে কনটাক্ট কেটে যাবে। মানে আলো নিভে যাবে। কুহুরটা বাক্স থেকে নেমে এলেই ডালাটা সইচের ওপরে উঠে যাবে—আলো জ্বলে উঠবে। অর্থাৎ সইচ বাটম টিপে ধরলে আলো জ্বলে; ছেড়ে দিলে নেভে। এই সইচে ঠিক তার উল্টো ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। টিপলে নিভবে, ছাড়লে জ্বলে।

‘কিন্তু ছিপিটার ভূমিকা কি?’ শুধোলাম আমি।

‘কাঠের ঢাকনিটা সইচের মাথায় ঠেকাছিল না বলেই ফুটো দিয়ে লোহার ছিপি

এঁটে দিয়েছিলেন অহল্যা দেবী : ছিপির তলাটাই জুইচের ওপর চেপে বসে আলো নিবিয়েছে কুকুরের শোবার সময়ে। ঘরে ঢুকেই ঐ ছিপিটা মদিয়ে নেবেন বলে অহল্যা দেবী সংগে সংগে করিডরে গিয়েছিলেন। পুশ বাটম সবিয়েছেন পরে ধীর স্বপ্নে।

বিমূঢ় কণ্ঠে কবিতা বললে, ‘দয়জা বন্ধ করে অহল্যা দেবী নিচে নামার আগেই তো কুকুরটা বাস্কে গিয়ে শুয়ে পড়তে পারত। তাহলে আলো নেবার ব্যাপারে সি-আর-পি’দের নামী রাখা যেত না?’

হাল ছেড়ে দিয়ে ইন্দনাথ বললে, ‘জন্মে এমন দেপি নি। আরে বাবা, খান কয়েক বিস্কুট শোবার ঘরে ছড়িয়ে এলেই তো হল! কুকুর বিস্কুট না খেয়ে শুতে আসবে না। ততক্ষণে অহল্যা দেবী নিচে পৌছে যাবেন। সি-আর-পি’দের চোখে ‘মাগুল দিয়ে দেহিয়ে দেবেন—ঘরে আলো জ্বলছে। গয়েছেড় তাই। সব কবুল করলেন অহল্যা দেবী।’

যমজ মেয়ে শিনটে? বোকার মত জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম আমি? সঙ্গে সঙ্গে তেঁর উঠে ছলল কান : মরণ আর ক? দে খোঁজে তোমার সরকার চী?’

অশ্রীশ বসু : জন্ম ১৯৩২—কলকাতার মার্গসেন্টাইন স্কুল-এ। গত ১০০০ের দশকের বিশ্বব্যাপী ঘনামান, বঙ্কিম, ফোর্ড আর মন্ট্যাগু হুইটম্যানের দিন-রাতের জন্ম-গ্রন্থ করে শু বিজ্ঞান কবিতার গ্রন্থ ছাড়াও যে বিষয়ে লেখকের আগ্রহ বোধহয় ও অপরিমিত আগ্রহ তা হচ্ছে কল্পনা মিশ্রিত, প্রযুক্তি পূর্ণ রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনীর আলোচনা। তাই বিজ্ঞান ভিত্তিক রহস্য ও রোমাঞ্চকর কাহিনী রচনার লেখকের পারদর্শীতা অনস্বীকার্য। তবে গোয়েন্দা গল্পের চটুল, চতুর্থ ও তির্যক ভাষা বিজ্ঞানের আড়ালেও এক ঘনীভূত রহস্যের মায়াবী বিস্তারে অশ্রীশবাবুর স্বাভাবিক কুশলতা আমাদের চমৎকৃত করে। লেখকের হিমানির সাহসিকতা, মোমের হাত, কংক্রীট বুট ইত্যাদি গ্রন্থ সমাপিকা পাত।



মণ্ডলবাড়ীর মৃত্যু রহস্য

প্রবন্ধ

—লালবাজারে গোয়েন্দা বিভাগে চাকলা জাগলো।

স্থানীয় এম-এল-এ স্বয়ং এসেছেন গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। গণাবর নগরের স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই পাশাপাশি পর্বাস্ব মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

আজ্ঞহঁ সকালের ব্যাপার। প্রতিবেশী দীক্ষ কর্মচারীর চোখেই দৃশ্যটা প্রথম পড়ে। দীক্ষ এসেছিল তার প্রাপ্য আট আনা পয়সা নেবার জন্য। আজ্ঞকেই দেবার 'কড়ায়' ছিল। আবুল নেবে কি, কপাট ঠেলে সম্মুখ মণ্ডলবাড়ী 'হাঁ' করা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে নিজের মূগই হাঁ হয়ে গেছিলো। তবু ডাকডাকি করেছে, শেষে হাঁ দিয়ে দুজনকেই নাড়িয়েছে দুজনই মরে কাঠ। দীক্ষও কাঠ—ভয়ের চোটে।

গঙ্গাধরের বাড়ীর অনতিদূরে থাকেন স্থানীয় এম-এল-এ রণজিৎ ঘোষ। বুদ্ধি করে দীক্ষ তাঁকেই খবরটা দিয়েছে। রণজিৎবাবু এসেছিলেন। ঘরে ঢুকে মৃতদেহ দুটো দেখে কেন উদাস হয়ে গেছিলেন। এই তো জীবন! পরক্ষণে সশ্বিত ফিরে আসতেই একটা টান্সি করে সোজা লালবাজারে চলে এসেছেন গোয়েন্দা বিভাগে। স্বয়ং বাবু এম. এল. এর লালবাজারে উপস্থিতিতে এই মৃত্যুটাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো।

খুন-খারাবি না হয়ে যায় না। তাই রণজিৎবাবু না বললেও বুদ্ধি করে বড় কর্তা শিক্ষিত কুঁরকে সঙ্গে নিলেন। জাঁপে রণজিৎবাবু আর কর্তা তো থাকলেনই, অধিকন্তু খাবও দুজন মেনাই চললেন ঘটনাস্থলে। পথে যেতে যেতে রণজিৎবাবুর কাছ থেকে বিশেষ কিছু খবর আদায় করা গেল না, দীক্ষ যা দেখেছে, রণজিৎবাবুও

তাই দেখেছেন, এর বেশী নয়। ভদ্রলোক বেশ চাপা, বড়কর্তা ভাবলেন—মুখে কিছু না বললেও অনেক কিছু জানেন মনে হচ্ছে। থাক, স্বচক্ষে দেখে স্বকর্মে শুনে সব সন্দেহ ভঞ্জন করলেই চলবে,—ভাবলেন তিনি।

একটু পরেই জাপ পৌছে গেল মণ্ডলবাড়ীর সামনে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়ে উঠেছে; স্বয়ং এক দল বলাবলি করছে। পুলিশ দেখে সবাই চূপ মেয়ে গেল। জনতার দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্ট হলেন বড়কর্তা। কুকুরকে কাজে লাগলে অশাকল্য নাও হতে পারে। তাছাড়া অপরাধ বিজ্ঞানে বলে, অপরাধ করার পর অপরাধী কোতুলবশতঃ ঘটনাস্থলের আশেপাশে ঘুরঘুর করে।

তবু একবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, যদি এদের মধ্যে কাউকে আসামী বলে সন্দেহ হয়। এদের মধ্যে কতৃষ্ণাণ্ড একটি লোককেই বেশ শক্তিমানে বলে মনে হচ্ছে। ভাঁড়িও টাঁকি মারছে, তল টকটক পড়েছে। গলায় একটা মোনার মকচেন, জিজ্ঞেস করে বর্ণজিৎবাবুর কাছ থেকে জানলেন, ইনি এখানকার মাচটে বর্জীদাস বুনবুন-ওয়ালা; বহুদিনের দামিন্দা, ছ'গানা বেশন মণ, একটা মগষের তেলকলের মালিক। তাশাড়া একটা কাবোবও রয়েছে তাঁর। মালিকের লোক। না, মালিকের দামিন্দা নয়, খোদ রাজপুতনায় আনি বাউ। লোকগুলোর হাড়ি জিরাঙেরে দেহ, কক্ষ বেশ-বাস। নবু বলা তো বাস না, এদেরকে কেউ হয়তো কোনো আক্রোশবশতঃ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে মস্তাক গলাবর মগুনকে হত্যা করে বংশনাশ করেছে তার। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লাশ হুটোকে তললেন বড়কর্তা। দেহের কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই, বাত্রে ঘনকঃ সর্পি গায়ে মনে গতে পারে। চোব দুটো খেন কিলের আভাতে কোঠির ছেতে পোষের খান্তে চাইতে। বারাবর খুঁজে এমন কোনো খাঙও পাওয়া গেল না বাত্রে দ্বিগু, মগুন বলে সন্দেহ জাগে। তাহাড়া মৃতের পেট বেশ খালি-খালি। হবোজা মগো হি বোন স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর হেতু?

গোয়েন্দা দামিন্দা।

অবশেষে জনতার মধ্যে কিছু লোককে বাছাই করে তাদের বক্তব্য শুনেন তিনি। বর্জীদাস বুনবু ওয়ালার গাৎ যায় না। এমন একটা সর্পি যুবতী বৌয়ের মৃত্যুতে খেন বর্জীদাসই বেশী স্ক্রয় হয়েছে বলে মনে হোল। মৃত্যুর কারণ সঠিক করে কেউ বলতে পারলো না তবে এটুকু জানা গেল, স্বামী-স্ত্রী একমাত্র ধাবৎ ধরে ছিল না, কোথাও খাটা-খাটনি পাওয়া যায় কিনা দেখতে গেছলো। গতকাল মস্তাকতেই ফরেজিন পথে দিগু কর্মচারের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তবে কি ওরা কিছু টাকা-পয়সা সঙ্গে করে গিয়েছে তবে বাতের অকসারে কেউ মেয়ে ফেলেছে? —গোয়েন্দা বড় চিন্তিত হালেন। তাই ‘শিক্ষিত’ কুকুরটাকে ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু না-কাকর হাড়ি কামড়ে পড়লো না কুকুরটা। অগত্যা লাশ হুটোকে জীপে তুলে এনে শব-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা করে লালবাছারে ফিরে এলেন বড়কর্তা।

পরদিন রণজিৎ ঘোষ এম-এল-একে পুনরায় লালবাজারে দেখা গেল। মণ্ডলদেয় মৃত্যুর কারণটা তিনি জানতে এসেছেন। তাঁর এলাকার সোকেরা ক্ষেপে আছে— সেই গরজেই তিনি এসেছেন। বড়কর্তাকে বেশ চিন্তাক্লষ্ট দেখা গেল। এই রণজিৎ ঘোষই কি অপরাধী? এত লোক থাকতে তাঁরই বা এত গরজ কেন? কিংবা এমনও হতে পারে, এই ভদ্রলোক হত্যার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছেন। হাজার হোক এম-এল-এ বলে কথা তাই খাতির করে বসিয়ে ময়না তদন্তের রিপোর্ট আনতে পাঠালেন গোয়েন্দা।

একটু পরেই রিপোর্ট এলো। দেখেই চমকে ওঠেন গোয়েন্দা। “না না, এ হতেই পারে না।” চৈচিয়ে বলেন তিনি, ‘সম্পূর্ণ অসম্ভব! আমাদের মান ইজ্জত সব বাবে। সে সঙ্গে আমার চাকুরীও।’

“কি হয়েছে স্যার?” শান্ত কণ্ঠে রণজিৎ বাবু প্রশ্ন করেন।

“এই দেখুন রিপোর্টে কি লিখেছে” বড়কর্তার দাঁত থিচুনি।

“আমিও তাই জানতাম,” রণজিৎ বাবু বলেন, “আমি ঠিক এটা দন্দেহ করেছি।”

“করেছেন তো মাথা কিনেছেন।” তেলে বেগুন জলে উঠেন বড়কর্তা, “জানতেন তো, বলেন নি কেন? তা হলে এত কষ্ট করে যেতাম না! ব্যাপারটা স্থানীয় বানাদ দারোগার ওপরই ছেড়ে দিতাম।”

“তা তো দিতেন, কিন্তু তাতে মৃত্যুর আসল কারণটা কি চাণপড়তো না? তাই তো স্বয়ং আপনারা নিয়ে গিয়ে ‘অনাহারে মৃত্যু’র একটা পাকাপোক্ত ‘রেকর্ড’ করিয়ে নিলাম। বিধানসভায় কত বক্তৃতা দিয়েছি, তথ্যসহ পত্রসংস্থান দিয়েছি মুখ্যমন্ত্রীমশাই ফুংকারে তা নস্যায় করে দিয়েছেন! আমাদের এই স্বাধীন রাষ্ট্রে বিশেষ করে সুজলা, সুফলা, শশা-শ্যামলা বাংলার অনাহারে মৃত্যু অসম্ভব তাঁর কাছে। আশা করি এবারে আর অস্বীকার করতে পারবেন না, কি বলেন? আচ্ছা, চলি স্যার! আমাকে আবার এই অনাহারে মৃত্যুর একটা সার্টিফিকেট কাঁপ বের করতে হবে।”

*

*

*

॥ প্রবন্ধ ॥ জন্ম মেদিনীপুর জেলার বিভাগপুর গামে। মূলতঃ হামির গল্পের লেখক হিসাবেই পরিচিত। প্রবোধচন্দ্র বসু “প্রবন্ধ” ছদ্মনামে গল্প লেখেন। লেখকের “বিংশ শতাব্দীর শেষ ডিটেকটিভ” “হেসে থুন” ইত্যাদি গল্প হামির মাথের বহুস্ত ও বোঝাঙ্কের স্বাদ এনে দিয়েছে। তাঁর গোয়েন্দা গল্পের ভীতি বিহীন পরিবেশে হামির ছোঁয়া এক অভিনব শিল্প সৌকর্যের পারচায়ক। লেখকের তিন পকেট হামি (কাটুন সহ), দুই পকেট হামি, ইত্যাদি গল্প সমাধিক পরিচন্দ।

*

*

*